আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

বসুমতী --- সাহিত্য --- মন্দির
১৬৬, বহবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মূল্য—২॥০ টাকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীশশিভূষণ দত্ত,
বসুমতী প্রেস, কলিকাতা।

বলয়গ্রাস

—:*:—

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

বলয়গ্রাস

—:০:—

১

অতি শৈশবের বিস্মৃত স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ালে দু'খানা অস্ফুট ছবি মুহূর্তের জন্য চোখের উপর ভেসে ওঠে লীলার। একখানা—যেটা বারে বারেই মনে পড়ে···প্রকাণ্ড একটা রান্নাঘর, বড় বড় দুটো তিনটে উনুন জ্বলছে রাক্ষসের মতো ···কালো কালো দু'টো লোক হাঁড়ি কড়া হাতা বেড়ি নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সেই উনুনের ধারে···বিবিধ মসলা-যুক্ত নানাবিধ সুখাদ্যের সুবাস যেন ভারাক্রান্ত করে রেখেছে সেই ঘরের আবহাওয়া···তার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সব শব্দের ভীড়।···শিলে হলুদ ছাঁচার দুমদুম্ শব্দ—মশলা পেশার একটানা শব্দ—গরম কড়ায় জল ঢালার বিশেষ পরিচিত একটি শব্দ—প্রত্যেকটি খণ্ড খণ্ড শব্দ মিলিয়ে একটি অখণ্ড শব্দরূপ।···

সেই প্রকাণ্ড ঘরের এক কোণে বসে আছে রোগা হ্যাংলা একটা মেয়ে···শাঁখের মতো সাদা সরু সরু লিক্‌লিকে হাত-পা, চুলগুলো রুক্ষ, বারোমাস রুগ্‌ণ বলে তেল-জল পড়ে না মাথায়।···

এই গন্ধ আর শব্দলোকের মাঝখান থেকে কিছুতেই উঠে যেতে পারে না সে, আগুনের আঁচে সিদ্ধ হয়ে গেলেও না। এক দিকের পায়াভাঙ্গা একটা খুরসি পিঁড়িতে বসে দুলে দুলে গুণ্ গুণ্ করে অবিরত কেঁদেই চলে। সে কান্নারও অবশ্য একটা ভাষা আছে···সে ভাষা ভিক্ষার।···যতো রকম ভোজ্য-বস্তুর নাম তার জ্ঞান-জগতে ধরা পড়েছে, একে একে সেইগুলি উচ্চারণ করে করে সে শুধু বলতে থাকে "দাও"। "ভাত দাও", "মাছ দাও", "আলু দাও," "চিনি দাও"—প্রার্থনার আর শেষ নেই। যেন অতোটুকু বয়সেই জেনে ফেলেছে সে —সত্যকার প্রাপ্য পাওনা তার কিছুই নেই, আবেদনের জোরে যেটুকু আদায় করা যায়।···তবে সে আবেদনে কর্ণপাত করবার মতো সহৃদয়তা কারুরই বড় দেখা যায় না। চড়াই পাখীর ছানার মতো ছোট্ট এই মেয়েটা যেন বাড়ীসুদ্ধু সকলের বিরক্তি উৎপাদনের একটা কেন্দ্র।···কাক বা বেড়ালের মতো 'দূর দূর' 'ছাই ছাই' ভাব রয়েছে সকলের মনে, নেহাৎ মানুষজাতীয় জীবটাকে তাড়া দিয়ে পাড়াছাড়া করা অথবা উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলেই বোধ করি ভাঙ্গা ওই পিঁড়িখানা অধিকার করে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে।···দেখা যায় দিনের পর দিন তার সেই একঘেয়ে আবেদনের ভঙ্গী।······

আরো একটা ছবি···বোধ করি আরো অস্ফুট।······ মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে, চিত্রবিচিত্র লতা-আঁকা দেওয়াল···আর্শি আলমারি ছবি পুতুলে সাজানো রূপকথার রাজবাড়ীর মতো একটা ঘর···মাঝখানে তার উঁচু পালঙ্কের উপর ধপধপে বিছানায় রূপকথার রাজকন্যার মতোই একটি মেয়ে।···দিনের পর দিন শুয়ে থাকাই তার কাজ···কেউ কোনো দিন উঠে বসতে দেখেনি তাকে।···ছোট যে মেয়েটা চোরের মতো চুপি চুপি এসে উঁকি মারে আনাচ-কানাচ থেকে, ঘরে ঢুকতে সাহস পায় না—সেও কোনো দিন দেখেনি কেমন লাগে এই রহস্যময়ীকে—বিছানায় উঠে বসলে···অলঙ্কারের ঝিলিক্ মেরে ঘুরে বেড়ালে।···এ মহলে আসা তার পক্ষে যে দুঃসাহসসিক অপরাধ, এটুকু বোঝবার মতো না হোক্ অনুভব করবার মতো জ্ঞান সেই ক্ষুদে মেয়েটার ছিল না তা' নয়, তবু কী যেন একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল এই ঘরের প্রত্যেকটি ইটকাঠের।···সেই অর্থহীন অন্ধ আকর্ষণের হাত এড়াবার মতো শক্তি ছিল না তার, তাই গালমন্দ, তিরস্কার-প্রহার সব কিছুর ভয় তুচ্ছ করে সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে আসতো তিনতলায়—এই রূপকথার মহলে।···দুর্বল হাঁটুতে হাত দিয়ে পা টিপে টিপে উঠে এসে কিছুক্ষণ হাঁফাতে হতো এই অগস্তি সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রমে,—তবু আসা চাই।

হয়তো এই রহস্যময় আকর্ষণের কারণ ছিল—সেই রূপকথার রাজকন্যার ততোধিক রহস্যময় আচরণ। ছোট মেয়েটা যেন বুঝতে চায়···কেন এই অদ্ভুত ব্যবহার।··· ঘরে আরো লোক থাকলে—আশেপাশে দাস-দাসী ঘুরলে —কী অকরুণ রূঢ় দৃষ্টিতে বিদ্ধ করতো তাকে শয্যাশায়িনীর কালো দু'টি চোখ।···সে দৃষ্টি মুখের ওপর পড়লে যেন মুখের চামড়া জ্বালা করতে থাকে, চোখের উপর পড়লে চোখ না বুজে উপায় নেই।···

কিন্তু ঘরে কেউ না থাকলে?

অদ্ভুতভাবে বদলে যেতো সেই দৃষ্টি।···অগ্নিবর্ষী কালো সেই চোখ দু'টি কোমল হয়ে উঠতো কী এক সকরুণ মমতায়, ফুটে উঠতো একটি সস্নেহ প্রশ্রয়ের আহ্বান।

ছোটোদের আমরা যতো ছোটো ভাবি ততো ছোটো হয়তো নয় তারা, তা নয়তো দৃষ্টির ভাষা বুঝবার ক্ষমতা কোথায় পেলো অতোটুকু মেয়েটা?

এই দু'খানি ছবি।···

বিস্মৃত স্মৃতির ভাণ্ডার হাতড়ালে এই দু'খানা ছবিই সিনেমার ছবির মতো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে লীলার।

রোগা হ্যাংলা সদাকুণ্ঠিত সেই মেয়েটার সঙ্গে কি কোনোখানে কিছু যোগ আছে লীলার? যৌবনপুষ্ট নিটোল এই বাহুদুটির মাঝখানে কি লুকোনো আছে সরু লিকলিকে রক্তহীন সেই হাত দু'খানা?

লীলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

২

কেবলমাত্র লীলার স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে কাহিনীর গতি অচল। লেখনীকেই পাঠাতে হলো সেই বিস্মৃত ইতিহাসের অনুসন্ধানে।

মেয়েটার নাম টুনি। নিতান্তই ক্ষীণ আর দুর্বল বলে বোধ হয় বাহুল্য-বর্জ্জিত এই নামটা বাহাল হয়েছিল তার। কিন্তু কষ্ট করে এতটুকু নামটাও বড় একটা কেউ উচ্চারণ করে না, সকলেই বলে—'মেয়েটা'। সভ্যতার বালাই ত্যাগ করে 'ছুঁড়িটা' বলবার মতো লোকেরও অভাব নেই। সে ডাকের মধ্যে অবহেলার সঙ্গে হয়তো মেশানো আছে একটু করুণার সুর।

সারা সংসারের উচ্ছিষ্ট করুণার কণায় ধীরে ধীরে পুষ্ট হ'তে থাকে টুনি। কারণ এ বাড়ীতে তার সত্যকার দাবী-দাওয়া কিছুই নেই। বাড়ীর গিন্নীর অতি দূর সম্পর্কের—অঙ্ক কসে নিরূপণ করবার মতো সম্বন্ধের—এক ভাইঝির মেয়ে টুনি।

এই ভাইঝিটিই তো গলগ্রহ। যেবার দীর্ঘকালের জন্য তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন মহালক্ষ্মী, বৃন্দাবনের পথে দেখা হওয়ায় নাকি কেঁদে পড়েছিলো তরুবালা তাঁর কাছে। তাই নিতান্তই দয়াপরবশ হয়ে তা'কে আশ্রয় দিয়েছিলেন মহালক্ষ্মী—বড়লোক পিসীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'বার ভয়ে যতো না হোক, বিনামূল্যের একটি সেবিকা লাভের লোভেই হয়তো।···তা'ছাড়া অন্য কোনো গূঢ় কারণ যদি থাকে, সে একান্তই মহালক্ষ্মীর আর তরুবালার ভিতরের কথা।···লেখনীর অবাধ গতিও সেখানে একটু থমকে দাঁড়াতে বাধ্য।

কারণটা যাই হোক, মহালক্ষ্মীর এই উদারতা যে প্রশংসার যোগ্য, তা'তে আর সন্দেহের কি আছে? আজীবনের সর্ত্তে দস্তি একটা বিধবাকে ঘাড়ে নেওয়াই তো যথেষ্ট, তার ওপর আবার একটা ফাউ।···তিন মাসের একটা ক্ষীণপ্রাণ মেয়ে তরুবালার কোলে, যেটাকে নাকি গর্ভে নিয়ে বিধবা হয়েছিল তরুবালা।

বহু তীর্থ ভ্রমণ করে দীর্ঘকাল পরে মহালক্ষ্মী গৃহে ফিরলেন তরুবালাকে সঙ্গে নিয়ে, টুনি তখন মাস পাঁচেকের। শাঁখের মতো সাদা রক্তহীন রং, সলতের মতো হাত-পা, কিন্তু একমাথা কালো রেশমের মতো চুলের বেষ্টনীর মধ্যে নিখুঁৎ সুন্দর মুখখানি আশ্চর্য্য নিটোল।···তরুবালার স্বামী যে রূপবান ব্যক্তি ছিল, তা'তে আর দ্বিমত থাকে না টুনুকে দেখলে। হৃষ্টপুষ্ট শ্যামলদেহ তরুবালার কোলে টুনু যেন বিস্ময়কর—বেমানান।

৩

মহালক্ষ্মী বাড়ীর কর্ত্রী, কাজে কাজেই তাঁর কাজের ওপর কথা কইবার সাহস অবশ্য কারুরই ছিল না, কিন্তু আড়ালে-আবডালে নিন্দে করতে তো বাধা নেই! তরুবালার আগমনের পর প্রথম প্রথম সারা সংসারের তলায় তলায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো বইতে লাগলো এই অসন্তোষের মৃদু গুঞ্জরণ, মহালক্ষ্মীর বেয়াক্কেলের নিন্দে।···নিন্দে যারা বেশী করে করলো, হিসেব মতো তাদেরও আশ্রিতার দলেই ফেলা চলে, তবে 'এ পক্ষ' এই যা। অর্থাৎ মহালক্ষ্মীর স্বামীকুলের দিক থেকে এঁদের সম্বন্ধের হিসাব নির্ণয় করতে হয়।

অতএব—আচম্কা একটা যোয়ানবয়সী বিধবা ভাইঝিকে বৃন্দাবনের পথ থেকে কুড়িয়ে আনা মহালক্ষ্মীর যে মোটেই সুবিবেচনার কাজ হয়নি, এটা তাঁরা নেপথ্যেও বলাবলি করবেন না, তা' কি করে সম্ভব? সুধুই কি তাই? আজ যে ক্ষুদ্র শিশুটিকে 'ফাউ' স্বরূপ ধরা হচ্ছে, সেইটিই কি একদিন 'একখানি' হয়ে উঠবে না? তবে?

মহালক্ষ্মী রাশভারী মানুষ, কথা কানে এলেও তিনি ততক্ষণ গায়ে মাখেন না, যতক্ষণ না কেউ মুখের সামনা-সামনি উচ্চারণ করে। কাজেই ধীরে ধীরে তরুবালাও ক্রমশঃ এ সংসারের একজন হয়ে গেলো। মহালক্ষ্মীর সমালোচনা জুড়িয়ে এলো।···টুনি বাড়তে লাগলো—'হেলায় ছেদ্দায়' যে ভাবেই হোক।

তীর্থভ্রমণের ফেরৎ আরও একটি মস্ত বিপদ সঙ্গে আনতে হয়েছিল মহালক্ষ্মীকে—সে তাঁর একমাত্র সন্তান মণিমালার দুরারোগ্য ব্যাধি। পনেরো ষোলো বছরের কিশোর মেয়ে,

আরামে আয়েসেই লালিত, মা'র সঙ্গে তীর্থে তীর্থে নানা দেশ ঘুরে অনিয়মে অত্যাচারে তার স্বাস্থ্যে ধরলো ভাঙন।···মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত শান্তিতে তীর্থভ্রমণের পুণ্য অর্জ্জন করবার পরিবর্ত্তে মহালক্ষ্মী যখন হঠাৎ আসমুদ্র-হিমাচল তীর্থযাত্রার আয়োজন সুরু করে দিয়েছিলেন, তখন বিস্ময় প্রকাশ করতে বাকী রাখেনি কেউ। মহালক্ষ্মী তাদের প্রশ্নের জবাবে হেসে বলেছিলেন—"ধরো যদি আজ বাদে কাল মরেই যাই, মেয়ের বিয়ে বরং তোমরা দিতে পারবে, কিন্তু আমার পরকালের ব্যবস্থা আমি না করলে······?"

বত্রিশ বছরের মহালক্ষ্মীর পরকালের চিন্তাটা অতো জোরালো না হ'লেও হয়তো ক্ষতি ছিল না, যদি সধবা থাকতেন। কিন্তু আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থার নিয়মানুসারে বিধবা মহালক্ষ্মীর মুখে কথাটা বেমানান পাকামি শোনালো না—বত্রিশ বছর বয়স সত্ত্বেও না।

মেয়েকে রেখে যাবার জন্যেও খুড়ী জ্যেঠী পিসীর দল অনুরোধ করতে ত্রুটি করেননি। মহালক্ষ্মী বললেন—"ওরে বাবা, মণিকে ছেড়ে তীর্থ? তা'হলে ঠাকুরঝি, জগন্নাথের বদলে পুঁইমাচা দেখাই সার হবে আমার।"

সেই তীর্থ সেরে যখন মণিমালাকে প্রায় শয্যাগত অবস্থায় নিয়ে ফিরলেন মহালক্ষ্মী, তখন অনুযোগ অভিযোগের শেষ রইল না, কপালে হাত ঠেকিয়ে মহালক্ষ্মী শুধু ভাগ্যকে দেখালেন।

রূপকথার রাজপুরীর মতো সেই তিনতলার প্রকাণ্ড মহলে নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার দিন কাটে। ডাক্তারের নিষেধে গোলমাল করতে বড় কেউ আসে না, দাস-দাসীরা হাঁটে পা টিপে টিপে, কথা কয় খাটো গলায়—মহালক্ষ্মীর বিরক্তির ভয়ে হিতৈষিণী আত্মীয়ারাও বেশী আসতে সাহস পান না।

মাসের পর মাস কাটে, বছর ঘুরে যায়···তরুবালার তিন মাসের ছোট্ট মেয়েটা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোন্ ফাঁকে একদিন হাঁটতে শেখে, শেখে সিঁড়ি উঠতে।

উঠতে শিখে রক্ষা নেই, রূপকথার রাজকন্যার মহল তাকে ক্রমাগত টানতে থাকে।···তিনতলায় উঠে যাবেই সে···সদ্য-প্রভাতের অসতর্ক অবসরে—নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের নির্জ্জন মুহূর্ত্তে।

ছোটোখাটো সংসারে যেমন আহার আয়োজন কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও কাজের একটা ছেদ আছে, কিছুটা অবসর আছে বিশ্রামের, বড়ো সংসারে তেমন নয়। বিশেষতঃ এ রকম 'বারো ভূতের' সংসারে—যে সংসারে পুরুষের চাইতে চার গুণ বেশী নারী-বাহিনী।

দুপুরবেলা দাসীরা যদি বা আঁচল পেতে একটু গড়িয়ে নেয়, ঘুম নেই এঁদের এই সব নিকট এবং দূর সম্পর্কের জ্যেঠী খুড়ী পিসীর দলের।

চৈত্রের দুপুরের মাদকতাময় আবহাওয়ায় দক্ষিণমুখী বড়ো বারান্দায় এক সার বঁটি পেতে তেঁতুল কাটতে বসেছেন বিন্দু-পিসী, নিভা-পিসী, ও-বাড়ীর জ্যেঠী, বড়ো খুড়ীমা আর হুগলীর বৌদি।

আর বসেছে তরুবালা।

যদিও তরুবালা থাকলে অনেকেরই যথেচ্ছ আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটে—যেহেতু তরুবালা 'ও পক্ষ', তবু বারণ করবার তো উপায় নেই।···

মহালক্ষ্মীর সমালোচনাবর্জ্জিত নিরামিষ গল্পই চলছিল তরুবালার উপস্থিতির অসুবিধায়—এমন সময় যশোদা ঝি বিরক্তিবিকৃত মুখে টুনিকে একটা 'নড়া' ধরে টানতে টানতে এনে তরুবালার কাছে বসিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই ন্যাও তোমার আহ্লাদে খুকীরে! আবার উঠে গেছলেন ওপর কোঠায়।···ধন্যি বলি বাবা মেয়েকে, এতো লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তবু মেয়ের হায়া নেই গা! কি মধু যে আছে ওপর কোঠায়!

তরুবালা বঁটি ছেড়ে উঠে পড়ে, ক্রন্দনরত মেয়েটাকে তুলে নিয়ে বলে—ও হতভাগা মেয়ে, এই না তোকে ঘুম পাড়িয়ে এলাম আমি? ভালো এক জ্বালা হয়েছে বাবা। নে চল্। গেরস্থর কোনো কাজ করতে দেবে না আমায়।···

তরুবালা উঠে যেতেই সমবেত কণ্ঠে যে বিদ্রূপব্যঞ্জক শব্দটি ধ্বনিত হয়ে ওঠে, সে কেবল মহিলা-মহলেরই একচেটে।

—আহা মরে যাই, উনি নইলে গেরস্থর কাজ সব পড়ে থাকবে!

—মেয়েটাকে ইচ্ছে করে লেলিয়ে দেয় ওপরে, আমরা তো আর বুঝি না কিছু।···

—কি জানি, তাতেই বা লাভ কি বুঝি না কিছু।

—আহা, নিভা ঠাকুরঝি যেন ন্যাকা! মেয়েটার রংটা কটা আছে, যদি গিন্নীর নজরে ধরে যায় তা'হলেই তো আখের গুছোনো হয়ে গেল।

—নজরে ধরার কসুরও তো কিছু দেখি না বড় বৌ। এই তো সিদিনকে একটু বেশী জ্বর হয়ে 'তড়কা'র মতো হয়েছিল বুঝি মেয়েটার, অমনি ডাক্তার এসে হাজির! আর আমার ফুলিটা যে আজ মাসখানেক ধরে 'ঘুংড়ি' কাশিতে ভুগছে, সেদিকে লক্ষ্য আছে কারুর? যা করতে পারে ওই তুলসীপাতা আর মধু।

—বড় জ্যেঠি, তুমি তো তবু সব দেখো না—হুগলীর বৌ টিপে টিপে বলে—তরুর ঘরে যদি ঢুকে দেখো একবার। বোতোল বোতোল বিলিতি দুধ, বিস্কুট, ন্যাবানচুষ, অভাব কিছুর নেই! তা' সবই লুকোছাপি। বাই'র দেখানো যেন কতো দুঃখী।

—ওরে বাবা, যতোই হোক বাপের কুলের সম্পর্কের টান, তার মিষ্টত্বই আলাদা। নইলে ওই তরু—গলা খাটো করে বিন্দুবালা ফিসফিসিয়ে বাকী যে কথাগুলি বলেন—সেটা আর যাই হোক, তরুর পক্ষে সম্মানজনক মোটেই নয়।

—এই তো আমরা যে যেখানে পাচ্ছি—খাচ্ছি দাচ্ছি, শুচ্ছি বসছি,—তরুবালার নিজস্ব একখানা আস্ত ঘর।

—হুঁ। আরো কতো হবে দেখো এর পর। মণির তো ওই অবস্থা, কি বা ভরসা আছে মেয়ের, শেষ পর্য্যন্ত ওই শুঁটকি ছুঁড়িটারই কপাল ফিরবে আর কি!

—ঝাঁটা মারো না!

স্পষ্টবাদিনী বিন্দুবালা একটিমাত্র ঝাঁটার সাহায্যে কথার উপসংহার করে দিয়ে তেঁতুলে মনোনিবেশ করেন।

এর পর যা আলোচনা হয়, সে নিতান্তই মহালক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে।···

তরুবালার বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ তার সবগুলিই যে 'বিন্দুপিসী কোম্পানী'র অত্যুক্তি, এমন অপবাদ দেওয়া যায় না তাঁদের নামে। আলোবাতাসবর্জ্জিত নীচের তলায় একখানা স্যাঁৎসেঁতে ঘর হ'লেও সত্যিই আস্ত একখানা ঘরের মালিক তরুবালা একলা। গৃহসজ্জার আর কিছু বলাই না থাকলেও বিছানাপত্রগুলো মানুষের মতো। আর শিশু-পালনের উপযুক্ত উপকরণও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে টানতে টানতে এই ঘরে নিয়ে এসে তরুবালা ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে দিলে মেয়ের গালে। টুনি কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সাধারণ শিশু-জনোচিত ভঙ্গীতে 'ভ্যাঁ' করে কেঁদে উঠলো না, বসে রইলো হেঁটমুণ্ডে, সুধু রক্তহীন ফিকে গোলাপী ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগলো একটু একটু।

হয়তো বা অপ্রত্যাশিত আক্রমণ ঠিক অপ্রত্যাশিতও নয়, মায়ের কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার পেতেই অভ্যস্ত টুনি! একমাত্র সন্তান হ'লে কি হয়, মেয়ের ওপর যেন একটা বিজাতীয় জাতক্রোধ আছে তরুবালার। কারণে অকারণে তাই শাসন করতে পেলে ছাড়ে না। চড়াই পাখীর হাড়ের মতো সরু সরু হাড়ওয়ালা কচি গাটুকু চড়-চাপড়ে ক্রমশ যেন শক্ত হয়ে উঠছে বেচারার। কিন্তু ভারি এক মজার দুর্ব্বলতা আছে তরুবালার, নিজের মেয়েকে মারবে তাও যেন লুকিয়ে, পাঁচজনের চোখের আড়ালে এই ঘরটায় টেনে এনে।

অপরের সামনে যে ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, সেটা তাই সামঞ্জস্যহীন উল্টোপাল্টা।

তাই, মেয়ের ওপর যখন বিরক্তি-বিদ্বেষ ভাবটা লুকোতে পারে না তরুবালা, তখন পাঁচজনে বলে—আহা, এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন মেয়েটা একেবারে দু'চক্ষের বিষ! ও সব লোকদেখানেপনা লো, লোকদেখানেপনা! এই অবস্থার ওপর মেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতা করলে লোকে যে গায়ে ধুলো দেবে।

আবার যখন দৈবাৎ—কি কারণে বলা শক্ত—টুনির একটু কপাল ফেরে, তখন তাঁরাই ঠোঁট-মুখ উল্টে মন্তব্য করেন—আহা, ঢং দেখে বাঁচিনে, মেয়ে নিয়ে আদিখ্যেতার আর শেষ নেই।—

তরুবালাকে সমীহ করে কেউ আড়ালে-আবডালে এ সব কথা কইবে, এতোটা মর্য্যাদা সত্যিই দেওয়া চলে না তাকে। যে যা বলে—কান বাঁচাবার চেষ্টা না করেই বলে। মুখচোরা তরুবালা উত্তর-প্রত্যুত্তর করে না, সুধু টুনিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সমস্ত রাগের শোধ তোলে [illegible] পিঠের উপর।

'এত লোকের ম[illegible] হয় না লক্ষ্মীছাড়ি'—দাঁতে দাঁত চেপে মেয়ের [illegible] স্নেহাশীর্ব্বাদ-টুকু বর্ষণ করে তরুবালা তাকে বিছানায় ফেলে [illegible] থাবড়াতে থাকে···ততক্ষণ থাবড়ায় যতক্ষণ না তার সজাগ ইন্দ্রিয়গুলো [illegible] আসে···[illegible] শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুশিরা···নতুন পৃথিবীকে দেখ[illegible] বিস্মিত কৌতূহলী দু'টি চোখ মুদে আসে একান্ত অনিচ্ছাতেও।···

ঘুমপাড়ানোর এই স্থূল কৌশলটাই তরুবালার আয়ত্ত। ঘুমপাড়ানী গানের নিরবচ্ছিন্ন একটানা সুরের যে মাদকতা শিশুর দেহে-মনে আনে নেশার অনুভূতি, সে বিদ্যা বা তথ্য তরুবালার জানা নেই।

সমারোহের সঙ্গে পিটানো কাজ চলছে, হটাৎ পিছন থেকে মহালক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো—ও কি হচ্ছে তরু? ছাত পিটোচ্ছিস না কি?

তরুবালা চম্‌কে পাংশুমুখে তাকায়।···এ সময় মহালক্ষ্মীর এ মহলে আসাটা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত।···তিনতলায় মেয়ের মহল ছেড়ে কোনো দিনই বড়ো নামেন না।

তরুবালা বিব্রতভাবে বলে—কি করবো? একবার ধরে-বেঁধে ঘুম না পাড়ালে তো স্বস্তি নেই। এই তো আবার উঠে গিয়েছিল তিন তলায়।—

—সে তো জানি—মহালক্ষ্মী গম্ভীর ভাবে বলেন—আমিই তো পাঠিয়ে-দিলাম যশোদাকে দিয়ে। সে যাক্—কথা হচ্ছে, আজকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে অনেক কথা হ'লো, উনি বলেছেন মণির যা অসুখ, ওকে এভাবে এখানে রেখে সারিয়ে তোলার আশা কম। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে—আজকাল যা সব নতুন চিকিৎসা উঠেছে তার ব্যবস্থা করতে হয়। তা আমি ঠিক করছি আসছে সোমবারেই যাবো। বৃথা দেরী করে লাভ কি?

মহালক্ষ্মী যখন মনস্থ করে ফেলেছেন 'যাবো', তখন আর তার রদবদল নেই, এটা তরুবালা এই বছর দেড়েক

কাছে থেকে হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছে। কিন্তু এতো লোক থাকতে তরুবালার কাছে নিজে এসে, সে খবর দেবার তাৎপর্য্য কি? পরামর্শ করতে নিশ্চই নয়। তবে?

বুঝতে না পেরে তরুবালা একটা অবান্তর প্রশ্ন করে—তুমি সুদ্ধু যাবে তো? তা'হলে কি করে এখানের সংসার চলবে?

—সেটা একটা ভাববার মতো কথা নয়, মণির প্রাণের চাইতে তো আর কিছুই বড়ো হবে না।···এখন কথা হচ্ছে, তুমি কি করবে?

—আমি?

তরুবালা হতাশদৃষ্টিতে তাকায় পূজনীয়া পিসীমার গম্ভীর মুখের পানে।

তরুবালার নিজের সম্বন্ধে ভাববার কিছু দায়িত্ব আছে না কি? বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে সে-ই একদিন তো নিজের ভালোমন্দের সব কিছু ভার শপথ করে অর্পণ করেছে মহালক্ষ্মীর চরণে।

হয়তো সেই চরম দুর্দ্দিনের দিনে—মানুষরূপী শয়তানের নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতায় যখন একেবারে তলিয়ে যেতে বসেছিল তরুবালা, তখন 'আশ্রয়' বলে আঁকড়াতে অপর একজন মানুষের শরণাপন্ন না হয়ে সেই গোবিন্দজীকে ধরলেই সত্যিকার আশ্রয় মিলতো তার, কিন্তু সে ভরসা কোথায় পাবে তরুবালার মতো নেহাৎ সাধারণ মেয়ে!

বরং বারবার মানুষকে বিশ্বাস করেই ঠকবে, তবু ভগবানকে বিশ্বাস করতে পারবে না।

তরুবালার অসহায় মুখের চেহারা মহালক্ষ্মীর চোখে পড়লো কি না বলা শক্ত, না পড়াই সম্ভব। কারণ এ ঘরের গঠনপ্রণালী এমন যে, ঘরে মানুষ থাকলে তার অবস্থানভঙ্গীটুকু ছাড়া আর কিছুই বিশেষ চোখে পড়ে না।

সেকালের লোকেরা যে 'গবাক্ষ' কথাটার মূল অর্থ সঠিক হৃদয়ঙ্গম করতো, তা সেকেলে ঘরগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায়। যাক্—মুখের চেহারা দেখুন আর না দেখুন, মহালক্ষ্মী অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলেন—বলছি, আমি না থাকলে তুমি ওটাকে নিয়ে এখানে ঠিকমতো মানিয়ে চলতে পারবে তো?

—তুমি না থাকলে? ওরে বাবা—

—'ওরে বাবা' কি রে? পারবিনে?

—দোহাই পিসীমা—তরুবালা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে—সে পারবো না। তার চেয়ে তুমি আমাকেও নিয়ে চলো কলকাতায়।

—তাও ভাবছিলাম—কিন্তু কথা হচ্ছে মণিকে নিয়ে। ওকে যদি কোনো পাহাড়ের দেশে চেঞ্জে টেঞ্জে নিয়ে যেতে বলে—

তরুবালা কাতর কণ্ঠে বলে—তুমি যেখানে যাবে আমাকে সেইখানেই একটু ঠাঁই দিও পিসীমা, তোমার পায়ে পড়ি, একটা ঝিও তো লাগতো তোমার? এদের কাছে একলা ফেলে রেখে যেও না আমায়।

—দেখি কি হয়—মহালক্ষ্মী চিন্তান্বিত স্বরে বলেন—কি যে ভালো কি যে মন্দ বোঝাই শক্ত। যাক্, ভগবান যা করাবেন তাই করবো। তবে ওই কথাই থাকলো। আজ এই শুক্রবার—আসছে সোমবারেই রওনা। মেয়েটাকে একটু সাবধানে রেখো, আবার রোগটোগ বাধিয়ে অসুবিধেয় না ফেলে।···ঘুমিয়েছে?

—হ্যাঁ ঘুমোলো—বলে সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে থাকে তরুবালা। আর মনে মনে ভগবানকে সহস্রবার ধন্যবাদ দেয়—কিছু আগে মেয়ের উপর যে আশীর্ব্বাণী প্রয়োগ করছিল সেটা মহালক্ষ্মীর কর্ণগোচর হয়নি বলে।

মহালক্ষ্মী আর বেশী কথা বলেন না, ধীরে ধীরে চলে যান। এমনিতেই তো যথেষ্ট বেশী কথা বলা হয়ে গেছে।

৪

উল্লিখিত সোমবার আসে···ডজন দুই ঘণ্টার সাহায্যে দিন-রাত্রির ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়ে চলেও যায় আর পাঁচটা দিনের মতোই। সুধু এ সংসারে দিনটি আসে একটি বিশেষ চেহারা নিয়ে।

মণিকে নিয়ে অনিশ্চিত কালের জন্য এ সংসার থেকে বিদায় নেন মহালক্ষ্মী।

শেষরাত্রি থেকে মাঝরাত্রি পর্য্যন্ত যেখানে বিস্তৃত ছিল মহালক্ষ্মীর বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র, সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া বড়ো সহজ নয়, তবু তাঁর নিস্পৃহ অনাসক্ত মুখ দেখে মনে হয় এটা বুঝি অনায়াসেই ঘটছে, ভেতর থেকে কোনো কঠিন চেষ্টা নেই বুঝি।···

তবু—কান্নাকাটির হাত এড়াবার জো নেই। মহালক্ষ্মীর বিরক্তির ভয়েও আজ আর কেউ চুপ করে থাকতে রাজী নয়, ফোঁসফোঁসানির প্রতিযোগিতা চলে। পুরনো দাস-দাসী থেকে সুরু করে আত্মীয়-স্বজন পাড়াপড়শীর ভীড় জমে যায়।···

অবশ্য এতো শোকপ্রকাশের কারণ যে মহালক্ষ্মীর চরিত্র-গত জনপ্রিয়তা—এমন মনে করবার হেতু নেই। গম্ভীর মহালক্ষ্মী এদের সঙ্গে দিনান্তে একটাও কথা ক'ন কি না সন্দেহ, কিন্তু মহালক্ষ্মীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর লোহার সিন্দুকের ওজনটাও তো ভুলে যাওয়া চলে না!

বৎসর দুই-আড়াই আগে প্রায় এমনি ব্যাপার ঘটেছিল—মহালক্ষ্মীর তীর্থযাত্রার দিন। তবু—সেদিন ফিরে আসার

একটা নির্দ্দিষ্ট দিন বা আশা ছিল। আর—আনুরক্তির প্রমাণ দিতে, সুস্থ সবল কন্তাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে যাওয়াটাকে এতোটা শোকাবহ করে তুলতেও চক্ষুলজ্জা ছিল কিছুটা।

মহালক্ষ্মী এই অভিভূত জনতাকে দু'চারটি মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে গাড়ীতে উঠলেন, মণিকে আগেই তোলা হয়েছিল স্ট্রেচারে করে। কিন্তু পিছনের গাড়ীখানায় বুড়ো সরকার মশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুবালাকেও মেয়ে কোলে নিয়ে উঠতে দেখে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠলো জনতার মধ্য থেকে।···তরুবালার যাওয়ার কথাটা সকলের জানা ছিল না।···"ও বাবা, উনিও চললেন বুঝি ?···তা আর যাবেন না, উনিই যে এখন সকলের চেয়ে সুয়ো।"···"হুঁ, সেই যে কথায় বলে 'বাপের বাড়ীর বেড়ালটাও মিষ্টি' তা মিথ্যে নয় দেখছি—"···"হ্যাঁ গো পিসি, তোমরা এমন 'ডাগু-খাগু' মানুষ থাকতে—ওই খুকীর মা সোমত্ত মাগীই পথের সঙ্গী হিসেবে সুবিধে—হ'লো ?"···"হ'লো তো দেখছি! কেমন তলে তলে ঠিক করা, মা গো—কাগে-পক্ষীকে টের পায়নি যাবে বলে—"···"গিন্নীটি তো সোজা নয়—গুরুজনের মানমর্য্যাদা রাখতেও জানেন না, চক্ষুলজ্জারও বালাই মাত্তর নেই, নইলে আর কাউকে না হোক বড় জ্যেঠীকেও তো বলতে পারতো সঙ্গে যেতে ?"···"বড় জ্যেঠী চায়ও না যেতে, অরুচি! মেয়ের যে কী রোগ তা সেই ভগবানই জানেন, আর ওই ছেনাল মাগীকে যে কোন্ চুলো থেকে কুড়িয়ে এনে মাথার মণি করা হয়েছে তাও ভগবানই বলতে পারেন··· আমার তো দেখে শুনে ভালো মনে হয় না।"···"যা বলেছো বড় জ্যেঠী, কথাটা তুললে তো বলি—মাগীর বয়েস তো নেহাৎ কম নয়, পঁচিশ-ছাব্বিশ কোন্ না হবে ? অথচ দেখলে তো মনে হয় 'কড়ে-রাঁড়ী'। তবে ? তবেই বলো তোমরা, কোলে তিনমেসে কচি আসে কোথা থেকে ?"···"ছি ছি, গলায় দড়ি!"

মহালক্ষ্মীর গাড়ীর চাকার ধুলো মিলিয়ে যাবার আগেই চোখের জল মিলিয়ে যায় তাঁর শোকাহত পরিজনবর্গের।··· অস্ফুট গুঞ্জন ক্রমশ উদ্দাম হয়ে ওঠে।

৫

টুনির সত্মোন্মেষিত জ্ঞান-জগতে আর যাই থাক্ বৈচিত্র্যের বালাই কিছুই ছিল না। চারখানা-চাকাওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে চড়ে বসলে যে এতো স্ফূর্ত্তি লাগে এ কথা আগে কে জানতো ?···এতো লোক কেন ?··· এতো কথা কেন ?···কিন্তু এ কি! এ কি! কৌতূহলী দুই চোখ মেলে দেখতে না দেখতে টুনিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল যে!···বাড়ী থেকে বেরোনো টুনির এই প্রথম, গাছপালা ঘরবাড়ী সব কিছুই তার চোখে অদ্ভুত নতুন···এই নতুনের সমারোহের মাঝখানে দৃষ্টি যায় হারিয়ে···একটা জিনিস ভালো করে দেখবার আগেই আর একটা···আবার, আবার। উত্তেজিত শিশুমন প্রশ্নে মুখর হয়ে ওঠে—মা মা, ওতা কি ? ওতা ?

তরুবালা বার কয়েক মেয়ের কৌতূহল প্রশমিত করেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—বক্ বক্ করিস্ নে, থাম্। চুপ করে থাক্—তা' নয়—এটা কি! ওটা কি!—অস্থির করে তুলছে একবারে!

সরকার মশাই এতোক্ষণ তীব্র এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টুনি ও তস্য জননীকে লক্ষ্য করছিলেন, কিন্তু তরুবালার ঝঙ্কারের পর যা বলেন সেটা কোমলই শোনায়—আহা, অবোধ শিশু, বলছে বলুক না। যা-তা বলে বুঝিয়ে দিলেই তো হলো।

অবোধ শিশুকে 'যা-তা' বুঝিয়ে দেওয়া যে অন্যায়, এতো আধুনিক মতবাদ সরকার মশাইয়ের কাছে [illegible] যায় না, তা'ছাড়া—ও তো টুনি। ওর জন্মে ওর থেকে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার কি ? কণ্ঠস্বরে [illegible] স্নেহের আভাস পাওয়া গেলো সেই তো অনেক, যথেষ্টের বেশী।

—মেয়েটিকে তো চেনেন না—তরুবালা গজ্ গজ্ করে বলে—আস্কারা দিলে আর রক্ষে থাকবে না, জ্বালাতন করে মারবে।

অতঃপর সরকার মশাই নিস্পৃহভাবে গাড়ীর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে টুনিও তাঁর পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়, কারণ মা'র ঝঙ্কার সত্ত্বেও আরও বারকয়েক জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে একটি চড় খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকে সরকার মশাইয়ের মতোই গম্ভীর মুখে।

ফিটন থেকে ট্রেণ···ট্রেণ থেকে ট্যাক্সী।···টিনের শেড্ দেওয়া গ্রামের ষ্টেশন থেকে লৌহময় বিরাটমূর্ত্তি হাওড়া ষ্টেশন। দৃশ্যের পর দৃশ্য···অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় অভূতপূর্ব্ব ছবি। চলমান ঘরবাড়ী, নদী-প্রান্তরের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত নতুন রূপ, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা গাছের সারিগুলোর লম্বা দৌড়!···সবই নতুন, সবই রহস্যময়, সমস্তই উত্তেজনাকর।···কিন্তু এতো ঐশ্বর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আর থাকে না টুনির, গাড়ীর দোলার নেশায় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসে বিস্ময়বিস্ফারিত দুটি চোখ।···

কাপড়-চোপড়ের পুঁটলির মতো মায়ের কোলের মধ্যে পড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরিত হতে হতে এসে পৌঁছে যায় আবার এক খাঁচার মধ্যে।···নতুন বাসার একটা ছোট্ট ঘরের কোণে কে যেন মাদুর পেতে রেখেছিল, মেয়েকে এনে তার ওপরে শুইয়ে দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে তরু। টুনির শরীরের ওজনটা প্রায় টুনি পাখীর কাছ-ঘেঁসা হ'লেও বেজায়

ধরে গেছে বাবা। ছেলে বইতে মোটে ভালোবাসে না তরুবালা. বরং তার বদলে ধান সেদ্ধ করতে দাও ওকে, তা' পারবে।

মহালক্ষ্মীর নিপুণ ব্যবস্থায় কলকাতার এই নতুন বাসায় বামুন, চাকর, আসবাবপত্র, সংসারযাত্রার খুঁটি-নাটি কোনো উপকরণেরই অভাব হয় না, এখন সার্থক হয় মণি সেরে উঠলে।

কিন্তু মণি কি সেরে উঠবে ?···এই বাসি ফুলের মতো পেলব সুকুমার দেহখানি ভরে উঠবে স্বাস্থ্যের লাবণ্যে ? তার জীবনে কি এখনো রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ? জীবনকে নতুন করে গড়বার সুযোগ পাবে আবার ?

মৃত্যু পরাজয় মেনে ফিরে যাবে—মাতৃস্নেহের কাছে ?

৬

দিন কাটে···মহাকাল এগিয়ে চলে পারহীন প্রান্তরের পথ বেয়ে।···কখনো এগিয়ে চলে মৃদুমন্থর শ্লথ গতিতে—পায়ের শব্দ ধরা পড়ে না···কখনো উদ্দাম পদধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে পথ।···দিন-রাত্রির অন্তহীন আনাগোনার অবসরে নিঃশব্দে আবর্তিত হতে থাকে পৃথিবী।···নিঃশব্দে রচিত হতে থাকে ইতিহাস—পৃথিবীর ইতিহাস···জাতির ইতিহাস··· রাষ্ট্রের ইতিহাস।

কিন্তু ক্ষুদ্র মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস লেখবার গরজ কি কারো নেই ? সে ইতিহাস কি নিতান্তই তুচ্ছ ? অবহেলা করে পাতা উল্টে যাবার মতো ?··· জীবনযুদ্ধের সেই অনাদৃত ইতিহাস কি মহাযুদ্ধের ইতিহাসের মতোই রোমাঞ্চকর নয় ? অথচ সে হিসেব কে রাখে ?

কে হিসেব রাখতে যাবে টুনির মত নগণ্য জীবের জীবনের কয়েকটা বছর কেটে গেলো কি ভাবে ?···বোদা বিস্বাদ নীরস কয়েকটা বছর।

বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক কতকগুলো দিনের সমষ্টি। বাড়ীর যা আবহাওয়া সেটা আর যাই হোক শিশুচিত্ত-বিনোদনের উপযুক্ত নয়।···এই দীর্ঘ চারটি বছর ধরে এ সংসারে চলেছে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের নিরন্তর যুদ্ধ। বারে বারে মৃত্যু ফেলেছে তার হিমশীতল ছায়া—বাড়িয়েছে নিঃশব্দ থাবা···থমথমে বাড়ীখানা যেন প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে সহসা ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে যাবে চারদিকের নিথর গাম্ভীর্যের বাঁধ। যারা পা টিপে টিপে চলছে, কথা বলছে ফিস্ ফিস্ করে—তারা আছড়ে পড়বে উন্মত্ত অধীরতায়, চীৎকার করে উঠবে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে।

সে আশঙ্কা আজ আর নেই অবশ্য···মৃত্যু ফিরে গেছে পরাজয় মেনে, তবু—অভ্যস্ত নিয়মে, এখানে হাসিটা বে-আইনী, ফূর্তিটা ধৃষ্টতা, সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলাটাও যেন বেমানান।

বয়স্কদের জন্য তৈরী এই অনুশাসন টুনিরও না মেনে উপায় নেই।···'শিশু' বলে আলাদা কিছু অধিকার পাবে, এতো মূল্যবান শিশু সে নয়। প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির বিদ্বেষ-বিদ্বিষ্ট দৃষ্টিতে ধরা পড়ে—টুনি কতো অনাবশ্যক অবান্তর।

যুদ্ধরত সেনাপতির পিছনে জোগানদার পদাতিক সৈন্যের মতো মহালক্ষ্মীর ছায়ানুগামিনী তরুবালার মূল্য তবু চোখে পড়ে মাঝে মাঝে···কিন্তু টুনি ?

টুনি কেন ?

টুনিকে কে চায় ?

টুনি কবে কার কি উপকারে লাগবে?

টুনির বিরুদ্ধে বোধ করি ভগবানেরও ষড়যন্ত্র।

তা নয় তো তরুবালার পর্যাপ্ত মেয়ের ওপর এমন বিতৃষ্ণ ঔদাসীন্য কেন। এ কি নিরুপায় মাতৃহৃদয়ের ক্ষুব্ধ অভিমান ? না কি সৃষ্টিকর্তা তরুবালার হৃষ্টপুষ্ট নিটোল দেহখানির মধ্যে মাতৃহৃদয়টুকু দিতেই ভুলে গেছেন ?

কারণটা যাই হোক—টুনি নিরাশ্রয়।

কেবলমাত্র ইটকাঠের আচ্ছাদন ছাড়া সত্যকার আশ্রয় নেই তার—এ তথ্যটুকু যেন এই বয়সেই জানা হয়ে গেছে টুনির। জানা হয়ে গেছে বলেই সে নিজেকে গুটিয়ে ছোট করে রাখে সকলের দৃষ্টির আড়ালে, সঙ্কীর্ণ করে রাখে নিজের পরিধি।

আশ্রয় নেই—তবু আশ্রয় ভিক্ষা করতে যাবে এতো খেলো স্বভাব তার নয়।

সঙ্গীহীন খেলাহীন নিরাশ্রয় শিশুচিত্তের খোরাক কোথায় তবে ?···

গ্রামের বাড়ীতে—পুরনো আমলের জমিদার-বাড়ীর বিরাট গাম্ভীর্যপূর্ণ চেহারাটাতেও তবু যেন একটা খোরাক ছিল, ছিল একটা রহস্যঘন পরিবেশ—যে রহস্য প্রায় অস্ফুট-বাক্ শিশুকেও ভরিয়ে রাখতো আপন ঐশ্বর্যে।

কতো ঘর···কতো দালান···ঈষৎ অন্ধকার চাপা চাপা কতো সিঁড়ি কতো দিকে, মোটা মোটা থাম দেওয়া তিন সারি খিলানওয়ালা বিরাট ঠাকুরদালান···'ভোগের ঘর' 'নৈবেদ্যের ঘর' 'বাসনের ঘর'—ঠাকুরেরই আলাদা একটা সংসার।···কী অদ্ভুত নির্জ্জন সেই দিকটা···একলা গিয়ে পড়লে গা ছমছম্ করতে থাকে···নিস্তব্ধ দুপুরবেলায় ঠাকুরদালানের কার্ণিশের অজস্র খোপে খোপে বহুকালের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়ে পুষ্ট অসংখ্য পায়রা-দম্পতির একটানা গুঞ্জনধ্বনি যেন মনকে নিয়ে যায় কোন অজানা রহস্যলোকে···যেন অস্ফুট আভাস এনে দেয় পূর্বজন্মের জ্ঞানজগতের স্মৃতির।

ঠাকুরবাড়ীর মহলটা রহস্যময় হলেও ভীতিকর সন্দেহ নেই···কিন্তু আকর্ষণ তো ভয়েরই।···অবশ্য ঠাকুরের প্রসাদী দুখানি বাতাসা ও একটি নারকেলনাড়ুর আকর্ষণও তুচ্ছ নয়। এটি টুনির নিত্যবরাদ্দ ছিল। টুনিকে ডেকে এনে প্রসাদের ভাগ দেবার সখ ভটচায মশাইয়ের না থাকলেও, পুজোর আগে থাকতে মন্দিরের দোরগোড়ায় 'হা পিত্যেশী' ভাবে বসে থাকা অবোধ শিশুটাকে নিতান্ত বঞ্চিত করাও সত্যি কিছু আর সম্ভব নয়।

সন্ধ্যা-আরতি এবং মঙ্গল-আরতির নিয়মিত সময়ে ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দে ঠাকুরবাড়ী মুখর হয়ে ওঠবার আগেই যে চুপটি করে দরজার কোণে এসে বসে থাকতো টুনি।···

নেহাৎ অবোধ ছিল বলেই হয়তো মান-অপমান বোধটা তখনো প্রখর ছিল না টুনির, এখন হলে—দাক্ষিণ্য দেখাবার সুযোগ ভটচায মশাই পেতেন কি না সন্দেহ।··· এখন তো রাত-দিনের ঝি নীরদা যখন-তখন বলে—তোমার এই ছ'বছরের মেয়ের পেটে, তরু দিদিমণি, ষোলো বছরের মেয়ের বুদ্ধি! উঃ, কী পাকা মেয়ে বাবা, জ্ঞান টনটনে!

নেহাৎ অত্যুক্তিও করে না নীরদা, বয়সের পক্ষে বাস্তবিকই ভারি পাকা মেয়ে টুনি। কিন্তু সেটা কি নিতান্তই অকারণ? (বয়সের হিসেব কি সব ক্ষেত্রে দিন মাস বছরের হিসেব দিয়েই হয়? অবস্থাই কি বয়সের মাপকাঠি নয়?)

অনাদৃত জীবনের বয়স তাড়াতাড়িই বাড়ে বৈকি! (বিমাতার সংসারে পালিত যে শিশু, তার বয়স—মাতৃস্নেহপুষ্ট শিশুর চাইতে অনেক এগিয়ে চলে না কি? তার চিন্তাজগৎ অনেক বেশী বিস্তৃত নয় কি?)

মনকে ছড়িয়ে বসবার জায়গা বাড়ীর মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া শক্ত। এ-বাড়ীতে কল্পনার অবকাশ নেই কোনোখানে। রূপকথার রাজকন্যাও সকল রহস্য হারিয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে।···তাকিয়ে দেখলে নিতান্তই মানুষের মতো লাগে। রূপটা হয়তো আছে—কিন্তু নেই সেই রূপকথার গৌরবটুকু।

ঘর ছেড়ে তাই যখন-তখন রাস্তার ধারের বারান্দায় এসে বসে থাকে টুনি। চুপচাপ বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কলকাতার রাস্তার মুহূর্তে পরিবর্তনশীল দৃশ্যবৈচিত্র্য অন্তত চোখ দুটোকে আটকে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।··· মনকেও মাঝে মাঝে দোলা দেয় বৈকি।

দুরন্তগতি মোটর গাড়ীর তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ···ফিটন গাড়ীর টক্‌টক্ টক্‌টক্ আমিরী চালের শব্দ···রিক্‌শ গাড়ীর অলসমন্থর ঠুংঠাং শব্দ, সাইকেলের হঠাৎ সচকিত করে দেওয়া কিড়িং কিড়িং শব্দ···নানা ভাবে টানতে থাকে মনকে। কখনো উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়ে নিয়ে যায় দূরদূরান্তরে···কখনো ভালো জামা-জুতো পরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জায়গায় আরোহী হিসেবে নিজেকে বসিয়ে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে···কখনো উদাস হয়ে আসে মন, নিরুপায় হতাশ্বাসে।···দৃষ্টি আসা-যাওয়া করে চলমান ব্যক্তির পিছু পিছু।···এতো লোক কেন? এতো ছুটোছুটি কিসের? কোথায় যায় এরা? কোন্‌খানে ওদের বাড়ী? কারা থাকে ওদের বাড়ীতে? আচ্ছা, ওরাও কি ঠিক মানুষের মতো খায় ঘুমোয়, কথা বলে? নাকি লম্বা এই পথটা ধরে সুধু পথ চলাই ওদের কাজ? টুনির মতো ছোট মেয়েও যায় বৈকি, কতোই তো যায়। হয়তো কারুর হাত ধরে বেড়াতে চলেছে আনন্দে গৌরবে টলটল করতে করতে—হয়তো উচ্ছ্বসিত আনন্দে বক্‌বক্ করতে করতে চলে অভিভাবকের পিছু পিছু—হয়তো ভাইবোনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে হাসতে ঠেলাঠেলি করতে করতে চলে খুশির খেয়ালে।

আলাদা জগতের জীব ওরা। টুনির সঙ্গে কোনোখানে মিল নেই ওদের।···ওই যে লাল জামা-পরা ছোট্ট মেয়েটা—টুনির চাইতেও অনেক ছোট, ও রোজ কোথায় যায়? নীরদা বলেছিল—বাপের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে যায়।···'পার্ক' কথাটার অর্থ বোঝে টুনি, নীরদাই একদিন নিয়ে গিয়েছিল দয়া করে।···কিন্তু বাপ কি? বাপ কাকে বলে? এ বাড়ীতে ও শব্দটা নেই কেন?···মা, বড়দিদিমা, রাঙামাসী, নীরদা, খোকার মা, বামুন ঠাকুর ইত্যাদি বাড়ীর প্রত্যেকটি সদস্যের কথা আলাদা-আলাদা করে চিন্তা করে টুনি।···সকলেই তো মস্ত বড়ো বড়ো, ওদের বাবা না থাকার তবু যেন কিছু যুক্তি আছে।···

কিন্তু টুনি? টুনির কেন বাবা থাকবে না?

অনেক ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্তেই এসে পৌঁছেছে টুনি, বাবা না থাকাটাই খারাপ; বোধ করি সব কিছু দৈন্যের মূল কারণই এই বাবা না থাকা।···হয়তো 'বাবা' নামক কোনো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলে টুনির পক্ষেও অসম্ভব হয় না—লাল জামা আর সোনালি জুতো পরে রোজ রোজ পার্কে বেড়াতে যাওয়া।···

কিন্তু কোথায় সেই সৌভাগ্যের দেবতা?

টুনির বাবা নেই,—টুনির বাবা মরে গেছে।

নীরদা মাঝে মাঝে জ্ঞানবুদ্ধির সহায়তা করে টুনির। টুনির বাবা মরে গেছে, তাই টুনির মা'র গায়ে নেই চুড়ি বালা হার, পরনের কাপড় অতো বিচ্ছিরি।···রাঙামাসীর মা, বড়দিদিমারও যে চুড়ি-বালা কিছু নেই···সে ওই রাঙামাসীর বাবা মরে গেছে বলেই না?···বড়দিদিমার কাপড়েও পাড় নেই সত্যি, কিন্তু তবু কী সুন্দর সাদা

ধপ্‌ধপে। চুড়ি-না-পরা হাত দু'খানিও কেমন চমৎকার গোল গোল গোলাপী! কী সুন্দর মা রাঙামাসী!

আর টুনির মা? টুনির মা যেন নীরদার মতো।···কিন্তু কেন? কেন টুনির বাবা নেই? কেন টুনির মা নীরদার মতো?

লোহার রেলিঙের ওপর মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে টুনির ···ইচ্ছে করে নিজের হাতটা কড়কড় করে কামড়াতে।··· চেষ্টা করতে গিয়ে লাগে···শেষ পর্য্যন্ত সব আক্রোশের ফল ভোগে গায়ের জামাটা।

পার্কে-বেড়াতে-যাওয়া মেয়েটার মতো লাল টুকটুকে জামা নয়, সাদাসিদে আধময়লা জামাটার খানিকটা মুঠো করে চেপে ধ'রে প্রাণপণে চিবোতে থাকে টুনি, চিবিয়ে চিবিয়ে ঝাঁজরা করে ছাড়ে।···

কিন্তু জামাটা তো সত্যি খাদ্যবস্তু নয়!

দু'চার ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা সুরু হয়। পেটের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, হাত-পা ঝিমঝিম করে আসে।

আগে আগে নিতান্ত শৈশবে বুঝতে পারতো না টুনি, কেন এমন হয়। সুধু বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারতো না, ডুকরে কেঁদে উঠতো।

এখন বুঝতে পারে কেন এমন হয়।

টের পেয়ে গেছে কিসের এই যন্ত্রণা। বিশ্রী বিরক্তিকর এই অবস্থাটার নাম 'ক্ষিধে পাওয়া'। ভারি ভয় করে টুনি এই অবস্থাটাকে—ভয় করে, ঘেন্না করে, মারতে ইচ্ছে হয় এই ক্ষিধে পাওয়াকে। সে যেন জানতে পেরেছে এর কাছেই তার পরাজয়।

শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে, মনের সমস্ত রাগ দিয়েও শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করা যায় না এই যন্ত্রণাদায়ক শত্রুকে। হার মানতে হয় তার কাছে। তা' হার মানা ছাড়া আর কি? মান খুইয়ে সেই তো এক সময়ে গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়াতে হবে রান্নাঘরের দরজায়!

ইচ্ছে করে কেউ কি ডাকবে টুনিকে?

খাবার জন্যে নির্দিষ্ট সময়টা পার করে দিয়েও দেখেছে সে। প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই টলবে না—চাওয়ার কষ্ট স্বীকার করবে না। হায়, হায়! কেউ ডাকে না, বরং অনেক প্রতীক্ষা, অনেক সংযমের পর যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়, তখন তরুবালা ওর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করে স্বচ্ছন্দে বামুন ঠাকুরকে বেপরোয়া হুকুম দেয়—ঠাকুর, একে কম করে খেতে দাও, বোধ হয় ক্ষিধে নেই।

রাগে দুঃখে অভিমানে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে থাকলেও নিতান্ত মরীয়া হয়েই টুনিকে বলতে বাধ্য হতে হয়—"ক্ষিধে আছে"।

কিন্তু তরুবালা সে কথা বিশ্বাস করিতে চায় না। প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলে ওঠে—হুঁ, ক্ষিধে আছে বৈ কি! তা'হলে আর তুমি এতোক্ষণ রান্নাঘরের দোরে এসে ধন্না দিতে না? না ঠাকুর, শুনো না তুমি ওর কথা।

মাতৃকর্ত্তব্যের অনেকটা পালন করা হলো মনে করে তরুবালা অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে পান-দোক্তার সরঞ্জাম নিয়ে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে। বসে কোথায়, না, নীরদার গা ঘেঁসে।

অথচ রঙামাসীকে একটু খাওয়াবার জন্যে কী সাধ্যসাধনা বড়দিদিমার! মণি কিছু খেলেই যেন কৃতার্থ হয়ে যান তিনি।

কেন এমন তারতম্য? মণির সঙ্গে টুনির এমন আকাশ-পাতাল তফাৎ কেন?···স্পষ্ট ভাষায় এতো কথা ভাবতে না পারলেও কুয়াসাচ্ছন্ন শীতের আকাশের মতো ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে টুনির অকালপক্ক মন নিরুপায় অভিমানের অভিযোগে।···

মহালক্ষ্মী যদি টুনির মা হতেন?—না বাবা! সেও অসম্ভব। মহালক্ষ্মীকে দেখলেই তার হৃৎকম্প হয়।

আজও—নিতান্তই প্রাণের দায়ে মান খুইয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে দুটি ভাত খেয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে চোরের মতো চুপি চুপি অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিল টুনি, মহালক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের আলোটা জেলে দিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—তোর মা কি করছে রে?

হঠাৎ আলোর ঝাপটা-খাওয়া চোখ দুটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে টুনি অস্ফুটকণ্ঠে উত্তর দেয়—মা নীচে।

—নীচে, তা আমিও জানি। করছে কি তাই বল তুই।

—মা? মা বিনোদের সঙ্গে গল্প করছে।

অস্ফুটতর স্বরে মা'র সম্বন্ধ সংবাদ দেয় টুনি।

মহালক্ষ্মী তীক্ষ্নস্বরে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করেন—কার সঙ্গে?

—বিনোদের সঙ্গে।

—বিনোদ? সে আবার কে?

—ঠাকুরের বন্ধু।

—ঠাকুরের বন্ধু? তার সঙ্গে গল্প করছে তরু?

—রোজই তো করে—সামান্য কিছু সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে টুনি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়—রোজ রোজ সন্ধ্যেবেলা আসে যে বিনোদ, যার সঙ্গে গল্প করতেই তো আসে। চা খায়, পান খায়, মাছ ভাজা খায়···

অসহ্য বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য রাগ করতে ভুলে যান মহালক্ষ্মী, তারপর গম্ভীরভাবে বলেন—আচ্ছা, যা দিকি তোর মাকে ডেকে আন্‌গে।

—মা আসবে না।

—আসবে না! কে বলেছে তোকে আসবে না?

মরীয়া অবস্থা ঘটলো না'কি টুনির? নয়তো মহালক্ষ্মীর সামনে এতোগুলো কথা বলবার সাহস তার হলো কি করে?

বোধ করি তার শিশুচক্ষেও বিসদৃশ এই ব্যাপারটা কাউকে বলবার জন্যেই প্রাণ যাচ্ছিল তার।

কিন্তু মহালক্ষ্মী এ কী অনাসৃষ্টি কথা শুনলেন! শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বললেও যে কিছুই বলা হয় না।

বিকেলের দিকে মহালক্ষ্মী নীচের তলায় নামেন না সত্যি, সংসার চালনার যা কিছু তদারকী তরুবালাই করে। কিন্তু সে তো বরাবরই করে। হঠাৎ এতো দিন পরে—মহালক্ষ্মী তাকিয়ে দেখেন না বলে—তেত্রিশ বছরের তরুবালা গল্প করতে বসবে বামুন ঠাকুরের বন্ধুর সঙ্গে?

এমন অজ্ঞান হয়ে যাবে সেই বেয়াড়া গল্পের নেশায় যে বামুন ঠাকুর সময় মতো রান্নার মালমশলা পাবে না—টুনি পাবে না সময়ে দুটি ভাত খেতে? লুচি রুটি বেলে দেওয়া আর পান সাজার কাজটা পড়বে নীরদার হাজাধরা হাতে?

সুধুই গল্প? একসঙ্গে বসে চা আর পান-দোক্তা খাবার সখ নেই তরুবালার? সঙ্গীটি যদি বামুন ঠাকুরের বন্ধু হয় তবুও?

এতো বড়ো পৃথিবীটায় একগাছা দড়ির এতো অভাব পড়লো তরুবালার?

৭

—তোমার পেটের মেয়ে তোমার শত্তুর, বুঝলে তরুদি—তরুর দোক্তার কৌটো থেকে এক টিপ দোক্তা তুলে নিতে নিতে এই মন্তব্যটি করে নীরদা।

কল্পিত মশক নিধনকল্পে নিজের বাহুমূলে নিজেই একটা চড় মেরে তরুবালা হাই তুলে বলে—কার কথা বলছিস্—টুনির?

—তা নয়তো তোমার ক'গণ্ডা মেয়ে আছে? কিন্তু রাগ ক'রো না দিদিমণি, মেয়েটির শিক্ষেদীক্ষে তেমন ভালো হচ্ছে না বাপু, সে তুমি যাই বলো।

তরুর কৌটার দোক্তা খেতে খেতে তরুরই মেয়ের নিন্দে করাটা আশ্চর্য্যের কথা, দাসী হয়ে এতো সাহস কি করে হলো নীরদার? মেয়ের ওপর তরুর দরদের অভাবটা চতুর নীরদার চোখে এড়ায়নি বলেই হয়তো এতো সাহস তার।

তরু তাচ্ছিল্যভরে বলে—ওর কথা আর বলিসনি, শিক্ষেদীক্ষে নিচ্ছে কে? একটা কথার বাধ্য? মেয়ে সকল সময় যেন "গোঁজ" হয়ে আছেন।

নীরদা এতো সহজে আলোচনার পরিসমাপ্তি করতে রাজী নয়। বলবার মতো—রসিয়ে রসিয়ে বলবার মতো—কথা রয়েছে যে তার। তাই অবাক হবার ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে—সন্ধ্যেবেলা মেয়ের কী তড়পানি, সে যদি দেখতে!

একসঙ্গে সবটা বলে ফেলতে রাজী নয় সে।

তরুবালাও একটু অবাক হয়, কারণ 'তড়পানি' নামক অবস্থার সঙ্গে টুনিকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। কপাল কুঁচকে বলে—কেন, হয়েছিল কি?

—সে ঘেন্নার কথা আর বলি কি তরুদি, সন্ধ্যেবেলা—তুমি তখন নীচে ছিলে, তোমার মেয়েকে ডেকে গিন্নীর কী জেরা! মেয়েও তেমনি চড়বড় করে মায়ের কুচ্ছো গাইলো। বাবা একেবারে ঘোর কলি! নইলে অতোটুকু মেয়ের পেটে এতো শয়তানি!

'গিন্নীর জেরা'—কথাটা শুনেই তরুবালা চট করে দমে যায়, উদ্বিগ্ন মুখে বলে—কেন, জেরা কিসের?

নীরদা মুচকি হেসে উত্তর দেয়—ওই তো বললাম—কুচ্ছো। তুমি নাকি বিনোদের সঙ্গে চা খাও, পান খাও, হেসে ঢলে ঢলে গল্প করো।···বামুন ঠাকুর না কি তেল-মসলা চেয়ে চেয়ে পায় না। তোমার মেয়ে নাকি ভাত খেতে এসে ভাত পায় না, তুমি কেবল চোখ রাঙাও, সে সব কতো ভনিতের কথা।

তরুবালা পাংশুমুখে বলে—এই সব বলেছে টুনি?

—না বললে আমি কি আর আকাশ থেকে কথা পাড়ছি তরুদি? আরো কতো কথা, সব কি আর মনে রাখতে পেরেছি ছাই! সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে শুনছিলাম বটে—মাঝখান থেকে আবার ঠাকুর ডাকলে;

তরুবালা উদ্বিগ্নস্বরে বলে—পিসিমা কি বললেন শুনে?

—বললেন না বেশী কিছু, রাশভারী মানুষ। তবে তোমার তলব হচ্ছিল শুনলাম তো। ডাক পড়েনি?

—কই না।

পান খাওয়া ভুলে তরুবালা পা ছড়িয়ে বসে থাকে গুম হয়ে। থাকে বটে, তবে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে নয়।···ছ' বছর আগের বৃন্দাবনের রাস্তায় পড়ে-থাকা বেচারী তরুবালা এখন আর নয় সে। চার বছর ধরে কলের জল খাচ্ছে সে, দেয়ালের গায়ে বোতাম টিপে আলো জ্বালছে।

—যাই বাবা শুয়ে পড়িগে—রাত কম হলো না তো। আবার সেই রাত পোয়ালেই কলুর ঘানিতে জুড়তে হবে।—আড়চোখে একবার তরুবালার দিকে তাকিয়ে হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় নীরদা।···আর সঙ্গে সঙ্গে তরুবালা বুনো ঘোড়ার মতো মাথা ঝাঁকিয়ে ওঠে—বেশ, কি আমার করবেন শুনি? না হয় তাড়িয়ে দেবেন, এই তো? বেশ, তাই দিন্। একমুঠো ভাত-কাপড় দিয়ে তো আর কিনে রাখেন নি? তার বদলে পুষিয়েও নিয়েছেন ঢের। সব কথা বলতে গেলে ঘরের খবর ফাঁস হয়ে যায় তাই কথাটি কইনে। আমি যাই মেয়ে তাই, অন্য কেউ হলে এতোদিন···বিনোদের সঙ্গে দুটো কথা কয়েছি তো কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি?

বিনোদ আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক, গ্রাম সম্পর্কে দেওর হয় তাই, নইলে কবে আর কার সঙ্গে গালগল্প করতে গিয়েছি?

—কি জানি দিদিমণি, আমরা ঝি-চাকর মনিষ্যি, তোমাদের ঘরের কথায় থাকা শোভা পায় না। নেহাৎ না কি তোমায় বড্ড ভালোবাসি তাই তোমার নামে এককথা শুনলে গায়ে লাগে।

কথার মারপ্যাচে যতটুকু তাতানো সম্ভব তরুকে, ততোটুকু তাতিয়ে দিয়ে আর এক টিপ দোক্তা মুখে দিয়ে শুতে চলে যায় নীরদা।···আর তরু শুতে এসে মেয়েকে নিয়ে পড়ে।···ঘুমন্ত বলে কিছুমাত্র দয়া দেখায় না, ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে জেরা করতে স্বুরু করে।

—বল্ হারামজাদী লক্ষ্মীছাড়ী, কি বলেছিস্ পিসিমার কাছে? বল্ বলছি, কেন বিনোদের নাম করেছিস্? গলা এইখানে খুন করে রেখে দেবো তোকে তা জানিস্?··· বল্ কি কি বলেছিস্?

দাঁতে দাঁতে চেপে এমন চাপা গর্জ্জন করে যে পাশের ঘর থেকেও শুনতে পাওয়া যায় না। টুনি যে কেঁদে হাট বাধিয়ে তাকে অপ্রস্তুতে ফেলবে না—এ বিশ্বাসটা আছে বলেই বোধ করি এতো সাহস তরুবালার।

কিন্তু টুনিকে শুধু ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে কতো আর আক্রোশ মেটাবে তরু? যে মেয়েকে মারতে মারতে যমের দরজা অবধি পাঠিয়ে দিলেও টুঁ শব্দ করে না, হাজারটা প্রশ্ন করে নিজের মাথা গরম করে ফেললেও একটি উত্তর দেয় না—তাকে সত্যিই গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলে তবেই না রাগ মেটে!

কাজেই শেষ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে হয় তরুকে।

অন্ধকার বলেই বোধ হয় নিঃশব্দে বসে বসে নিজের গায়ে হাত বুলোয় টুনি। মার খেয়ে গায়ে হাত বুলানোর মতো দীনতা দেখানো টুনির স্বভাবে সম্ভব নয়, নেহাৎ রাত্রির অন্ধকারের স্বুযোগ—তাই।···তা ছাড়া মারটা তবু সহনীয়, এ যে ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে রোগা হাড় ক'খানা স্থানভ্রষ্ট হবার দাখিল হয়েছে।···

ঘুম থেকে উঠেই নীরবে নিজস্ব খাসতালুকে গিয়ে অধিষ্ঠান হয় টুনি—রাস্তার দিকের বারান্দায়। গত রাত্রির কথাগুলো মনে পড়ছে···ঠিক অনুধাবন করবার শক্তি নেই তার, কেন তরুর এত আক্রোশ, এতো গায়ের জ্বালা।···

টুনির মা কি বিশ্রী, কি কুৎসিত!

এই বিশ্রী কুৎসিত মা'র হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না?···রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বারবার এই কথাটাই ভাবে টুনি। এতো বড়ো রাস্তা, এখানে নেমে পড়লে জায়গা হয় না তার? এতো লোকের ভীড়ে হারিয়ে গেলে তরুবালার সাধ্য আছে খুঁজে বার করবার?···দিন-রাত্তির, সকাল-সন্ধ্যা, দুপুর-বিকেল, কেবল যদি হাঁটা যায়? হেঁটে হেঁটে পৌছতে পারবে না এমন দেশে যেখানে টুনির বাবা আছে, আছে ভালো কাপড় আর গয়না-পরা স্বুন্দর মা?

বারান্দাটা একান্ত নিজস্ব সম্পত্তির মতো বলেই বোধকরি টুনির রুদ্ধ আবেগ সহসা ভাষায় মুক্তিলাভ করে—'আমি চলে যাবো, নিশ্চয় চলে যাবো।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে চারখানা হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। পিছনে মণি! জীবনে কোনো দিন এ বারান্দায় পদার্পণ করেনি সে।

খুব কাছে এসে মণি ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বলে—চলে যাবি? কোথায় চলে যাবি রে টুনি?

বলা বাহুল্য টুনির আর বাক্যস্ফূর্ত্তির শক্তি থাকে না।

দ্বিতীয়বার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে মণি—কি রে, কোথায় চলে যাবি?

প্রশ্নকর্ত্রী তরু হলে টুনিকে কেটে ফেললেও উত্তর আদায় করা যেতো না, কিন্তু প্রশ্নকর্ত্রী মণি—যার এক বিন্দু স্নেহদৃষ্টি টুনির পক্ষে স্বপ্নের কল্পনা, যে হেঁটে গেলে টুনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, যে কথা কইলে টুনি মুগ্ধ হয়ে শোনে, জীবনে প্রথম যে টুনিকে ডেকে স্বেচ্ছায় একটা কথা বললো।

দ্বিতীয় প্রশ্নের পর তাই চুপ করে থাকা সম্ভব হলো না টুনির পক্ষে। নিতান্ত অস্ফুট স্বরে বলে—রাস্তায়।

—রাস্তায়? সে কি রে! কেন?

কেন!

'কেন'—সে কথা কে বলবে? টুনি?

কিন্তু চলে যাওয়ার ওপর আর গুরুত্ব আরোপ করে না মণি। কথাটা নিতান্তই শিশুর খেয়াল ভেবে উড়িয়ে দিয়ে আবার প্রশ্ন করে—তুই সব সময় এখানে বসে থাকিস কেন রে?

—এমনি।

স্বরটা নিতান্তই কুণ্ঠিত, ভীত।

কি জানি হয়তো বা সব সময় এখানে বসে থাকাও টুনির পক্ষে অসঙ্গত। হয়তো বা মণির কাজলপরা কালো দুটি চোখে আগুন জ্বলে উঠবে এখুনি।···কিন্তু সে রকম কিছু হয় না, বরং মণির চোখে যেন একটু কোমল স্নেহের ছায়া।

—তরুদি তোকে সব সময় বকে—না রে?

বলা বাহুল্য টুনির মতো অকালবিজ্ঞ শিশুর পক্ষে এ ধরণের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তরুর ওপর মাতৃভক্তির প্রাবল্যে নয়, সহজাত সংস্কারের বশেই টুনি যেভাবে মাথা নাড়ে সেটা নিতান্তই নেতিব্যঞ্জক।

—বকে না?—মণি অনুচ্চস্বরে হেসে ওঠে—খুব আদর করে?…তাও না? তবে? লুকিয়ে লুকিয়ে সন্দেশ খাওয়ায়?

টুনির সঙ্গে এমন সহৃদয় আর সরস আলোচনা কে কবে করেছে?

কাজল না পরলেও—কাজলপরার মতো কালো চোখ ছুটি জলে ভরে আসবে, এটা আর বিচিত্র কি? নেহাৎই ধরা পড়ার ভয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে অনড় হয়ে বসে থাকে বেচারা।

—আমি জানি, লুকিয়ে লুকিয়ে তোকে খুব মারে হরুদি।—এবারের স্বরটা গম্ভীর, হয়তো বা বিষণ্ণও—কাল রাত্তিরে খুব মারছিল তো, মারছিল না?

অবশ্য এর উত্তর মণি নিজেও আশা করে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পথের উপর উদাস দৃষ্টি মেলে।…খানিকটা পরেই বোধ করি মহালক্ষ্মীর ডাক শোনা যায়…আর অপরাধীর ভঙ্গীতে স্বভাব-বহির্ভূত ত্রস্তপায়ে পালায় বারান্দা থেকে।

শুধু পালাবার আগে হাতের মুঠোয় রাখা রাংতামোড়া একখানা চকোলেট টুনির কোলের ওপর ফেলে দিয়ে যায়—এই নে খেয়ে ফেল্, দেখাসনি কাউকে।

কাউকে দেখাবে কি—সাহস করে নিজেই কি খোলাচোখে দেখতে পারবে টুনি—অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের এই দৃশ্যমান নমুনাটুকু?

৮

মণি সেরে ওঠার পর থেকেই দেশে ফিরে যাবার কথা উঠেছিল ছু'একবার। সরকার মশাইয়ের অনুরোধটাই প্রবল। চূড়ামণি যোগে গঙ্গাস্নান করতে এসে বিন্দুপিসি কোম্পানীও অনেক মায়াকান্না কেঁদে গেছেন।

মহালক্ষ্মী বিহনে যে ব্রজপুরী অন্ধকার, এ কি জানেন না মহালক্ষ্মী? বাইশ বছরের মণির বিবাহের প্রয়োজনীয়তাটাও বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন নি তাঁরা।

মহালক্ষ্মী হাসিমুখেই তাঁদের কথার উত্তর দিয়েছেন—বিয়ে দেবো বলেই তো আরো এখানে পড়ে থাকা ঠাকুরঝি, দেশে গিয়ে বসলে কি আর পাত্তর খোঁজা সহজ হবে?

সায় দেবার ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়লেও বিন্দুবালা যে যুক্তিটা মোটেই মেনে নেননি, তা মুখ দেখেই বোঝা গেল।

…হ্যাঃ, দেশে বাস করলে 'পাত্তর' খোঁজা যাবে না! তাহলে আর দেশে বাস করে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতো না, পঁচিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে গলায় গেঁথে মরতো।…আসল কথা তো আর তা নয় বাবা—

যাক্, বিন্দুবালাদের কথা মহালক্ষ্মী তেমন ধর্ত্তব্য মনে করেন না।

তবে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা তিনি সত্যিই করেন।…সম্প্রতি মহালক্ষ্মীর দূর সম্পর্কের এক কাকা পশ্চিম থেকে এসেছেন কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে—আর স্থিতিলাভ করেছেন এই পাড়াতেই।

প্রয়োজনের সময়ে প্রায় ভগবান-প্রদত্ত এই কাকাটিকে পেয়ে যেন বর্ত্তে যান মহালক্ষ্মী এবং এই ভালোমানুষ মানুষটিকে কর্ণধার করে 'সমাজ'-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেড়ান।

মণির বিয়ে তো যেমন-তেমন কথা নয়। পাত্রপক্ষের নাড়ীনক্ষত্র না জেনে মেয়েটিকে হস্তান্তর করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।…অবশ্য ব্যাপারটাকে তিনি যথাসম্ভব গোপন রেখেই চলেন, কাকা-খুড়ীর সঙ্গে কালীঘাটে যাচ্ছেন এই গোছের কথাবার্ত্তাই চালু রেখেছেন বাড়ীতে।

মণি একদিন ধরলো মাকে—আচ্ছা মা, তোমার আজকাল কালীভক্তি এতো প্রবল হয়ে উঠলো কেন বলো তো?

—কেন রে? মহালক্ষ্মী হেসে ফেলেন।

রুগ্ণা মণির কথাবার্ত্তায়, করুণ দৃষ্টিতে যে কেমন একটা অপরাধী ভাব ছিল, সেটা আজকাল আর ততো ধরা পড়ে না।…একমাত্র সন্তান মহালক্ষ্মীর, মোটাসোটা একটি বিষয়ের অধিকারিণী সে, তবু এত কুণ্ঠা তার কিসের?…দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিটাই কি একমাত্র কারণ? যাই হোক, আজ সে বেশ কিছুটা সপ্রতিভভাবেই মাকে আক্রমণ করে বসে—কেন কি আবার, দেখতে পাচ্ছি না? হরদমই খালি কালীঘাটে যাচ্ছো! মা কালী তোমাকে কোনো যখের ধনের সন্ধান দিয়েছেন না কি বলো তো?

মহালক্ষ্মী দুই মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে অল্প হেসে বলেন—যখের ধনের সন্ধান দেননি, যখের ধন গচ্ছিত রাখবার মতো ভালো আর একটি 'যখ' জোগাড় করে দিতে পারেন কি না—তাই দেখছি।

—বাবা! তোমার কথাটা রীতিমত হেঁয়ালি লাগছে যে!

—হেঁয়ালি নয়—মহালক্ষ্মী ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলেন—তোমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছি এক জায়গায়। ঠিকানাটা কালীঘাটেই বটে।

মণি রাঙা মুখ আরো রাঙা করে বলে—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে মা?

—কেন, পাগল কিসের?

—ওই সব যা তা করছো?

—'যা তা' মানে কি? তুমি কি ভেবেছো এই ভাবেই সারাজীবন কাটাবে? বিয়েটিয়ে দেবো না আমি?

—সেটা ভাবা কি আমার পক্ষে অন্যায়? দোহাই তোমার মা, ওসব পাগলামি ছাড়ো।

—ভালো বুঝে যে কাজ ধরেছি—সে কাজ স্বয়ং ভগবানের নিষেধেও ছাড়ি না আমি তা' জানো?

মহালক্ষ্মীর স্বর সুধু গম্ভীর নয়, অতিমাত্রায় দৃঢ়।

—কিন্তু মা, যা হয় না, হতে পারে না, হওয়া অসম্ভব—সেটা কি করে সম্ভব হতে পারে?

মণির স্বরেও যেন মা'র কণ্ঠের আভাস। শুধু গম্ভীর নয়, দৃঢ়ও।

—সম্ভব-অসম্ভব আমি বুঝবো।

কাটাছাঁটা এই মন্তব্যটি করে, একরাশ চিঠিপত্র হাতে করে চশমাটা নিয়ে বসেন মহালক্ষ্মী। মণি কিন্তু এতো সহজে থেমে যেতে রাজী হয় না। মিনিট কতক চুপচাপ থেকে বলে ওঠে—মা, তুমি ও সব ছেড়ে দাও।

—প্রত্যেক বিষয়ে তোমার অনুমতি নিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে কষ্টকর মণি।

মেয়ে-অন্ত প্রাণ মহালক্ষ্মীর। মেয়ের জন্যে মরতে পারেন, বাঁচতে পারেন, তবু সহ্য করতে পারেন না কথার সীমা-লঙ্ঘন—মহালক্ষ্মীর কাজের প্রতিবাদ! সহ্যের বাইরের জিনিস সেটা।

—তুমি বুঝতে পারছো না কেন মা?

—অনেক বুঝে সুঝেই কাজে নেমেছি আমি মণি, বৃথা প্রতিবাদ কোরো না।

—আচ্ছা বেশ—মণি যেন আকুল সমুদ্রে তৃণখণ্ড হাতড়ে বেড়ায়—আমার স্বাস্থ্যের কথাটাও ভাবো। সেটা তো লুকোনো চলবে না।

—তোমার স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট যে দিয়েছেন ডাক্তার চৌধুরী, সেটা তোমার অজানা নয় নিশ্চয়ই?

—আবার ভেঙে যেতেও তো পারে?

—মানুষের জীবনে কি না হতে পারে? এই মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারি আমি। কিন্তু সেই আশঙ্কায় হাতপা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে থাকবো?

—কিন্তু মা—

—কিন্তুটিন্তুগুলো অন্য সময়ের জন্যে তুলে রাখো মণি, এই চিঠিগুলো বিশেষ জরুরি, আজই উত্তর না দিলে নয়।

আর কি করবে মণি?

অনেক সাহস সঞ্চয় করে এতোগুলো কথা যে বলতে পেরেছে এই ঢের। অথচ বলবার কথা তো অজস্র রয়েছে। বিয়ে! মণির আবার বিয়ে কি?

সাত বছর আগে 'বিয়ে' নামক মধুর একটা কল্পনা ছিল বটে, কিন্তু সে কি এই মণি? তা ছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক লেশশূন্য—রোগভোগের এই দীর্ঘ কয়েকটা বছর যেন তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে সমস্ত সম্ভাবনা, সমস্ত ভবিষ্যৎ।··· তার জগৎটা নিতান্তই অবাস্তব।

কিন্তু মহালক্ষ্মী যদি একবার কিছু মনস্থ করে থাকেন, মণির কি সাধ্য তাকে রদ করবার!···এখন মহালক্ষ্মীর সুমতির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ভিন্ন আর কি করবার আছে মণির?

মণির ভাগ্যক্রমে মায়ের কাকাবুড়োটি আবার জুটলো কোথা থেকে বলো তো?···তাঁর ভরসাতেই শুধু নয়, প্ররোচনাতেও নিশ্চয়, মায়ের এই সব দুর্মতি।

ভগবান মহালক্ষ্মীকে সুমতি দাও।

৯

বিনোদ-ঘটিত কাহিনী শোনার পর থেকে বাধ্য হয়েই তরুর ওপর একটু খরদৃষ্টি রাখতে হয় মহালক্ষ্মীকে।··· যদিও কালীঘাটের ব্যাপার নিয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতে হয় তাঁকে, তবু তারই ফাঁকে নিতান্তই একদিন হাতেনাতে ধরা পড়তে হলো তরুকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণে ধরা পড়া একেবারে!

কিন্তু তরু কি ছাই জানতো আজকেই হঠাৎ বাইরের কাজগুলো এতো তাড়াতাড়ি সারা হয়ে যাবে মহালক্ষ্মীর!

বাইরে থেকে এলে বাইরের দিকের ঘরটায় চোখ পড়বে এটা এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।···অসম্ভব অসঙ্গত হচ্ছে ঘরের ভিতরের অভূতপূর্ব দৃশ্যটা।

বিনোদের সঙ্গে পাশাপাশি এক বেঞ্চিতে বসে এক কৌটো থেকে কাড়াকাড়ি করে পান খাচ্ছে তরু—এ দৃশ্যটা যে কতো কুৎসিত, সেটা বোধ করি চোখে না দেখা পর্য্যন্ত ধারণা ছিল না মহালক্ষ্মীর।

কানে শুনে অসহ্য হয়েছিল বটে, তবু তারও যেন একটা সীমা ছিল। দৃশ্যটা কল্পনা করে তবে রাগটা আনতে হতো মনে।

কিন্তু প্রত্যক্ষ এই দৃশ্যটা? চাবুকের মতো যেন শপাং করে মারলো মহালক্ষ্মীর মুখের ওপর। অসম্ভব! অসম্ভব! এ রকম অনাচার চলতে পারে না, চলা অসম্ভব!

—তরু!—

চাবুক-খাওয়া ব্যক্তির আর্ত্তনাদের মতোই উচ্চারিত হলো ডাকটা।

নেহাৎ বিভোর না থাকলে অবিশ্যি বাড়ীর সামনে গাড়ীটা থামার শব্দ কানে আসতো তরুর।···কিন্তু বিধি বাম!

এখন এই ডাকের উত্তরটা তো তরুকেই দিতে হবে। বিনোদটাই যে নিমেষের মধ্যে 'হাওয়া' হয়ে যাবে তার উপায় কোথা? দরজার সামনেই যে স্বয়ং মহালক্ষ্মী!

হাওয়া না হোক, বেঞ্চি থেকে তড়াক করে নেমে পড়ে বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে ইষ্টদেবতার নাম করতে থাকে, তাতে আর সন্দেহ কি।

মহালক্ষ্মী একবার তীব্রদৃষ্টিতে তরু এবং তরুর প্রিয় বন্ধুটিকে দেখে নিয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়েন। পাংশু মুখখানা নিয়ে তরু ক্রমান্বয়ে ভাবতে থাকে—এই মুখখানা সকলকে দেখাবে কি করে।

তবে নাকি কথায় আছে—"ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।" ধরা পড়ে যাওয়া খুনী আসামীর মতো মনোভাবটা খুব বেশীক্ষণ থাকে না।···আস্তে আস্তে ফণা ধরে ওঠে ভেতরে কালনাগিনী।

—ওঃ, কি, করবেন কি শুনি? ফাঁসি দেবেন? দিন। দিন না, বয়ে গেলো।···কিন্তু ফাঁসি দেবার আগে যেন আপন আপন ঘরের দিকে তাকান। তাড়িয়ে দেবেন? দিন, তরুরও আর ভালো লাগছে না।

কেবলমাত্র মহালক্ষ্মীর মনোরঞ্জন করা ছাড়া যেন দুনিয়ায় আর কোনো কাজ নেই তরুর!···নীতি, ধর্ম্ম, সুনাম! কেউ কি ভাত দেবে এক মুঠো? ওই অর্থহীন ফাঁকা কথাগুলোর মোহেই না এমন করে আষ্টেপৃষ্ঠে মহালক্ষ্মীর-কবলে পড়তে হয়েছে তাকে।

আর চক্ষুঃশূল ওই মেয়েটা! ওটাকে দেখলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। তরুর গত জন্মের মহাশত্রু ছিল বোধ করি ও।

বিনোদও সেই কথায় সায় দেয়।

মেয়েটার কথা ভাবতে না হলে তো দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারতো তরু।···আচ্ছা এখুনই বা পারবে না কেন? ওর ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তরুবালার তা'তে কিছু আসে না। টুনি কি তরুবালার স্বর্গে বাতি দেবে?

দরজা থেকে ফিরে না গিয়ে মহালক্ষ্মী যদি তখনই তরুর প্রাপ্য তিরস্কারের শোধ করে দিতেন কড়ায় গণ্ডায়, হয়তো অনেক কিছুই বদলে যেতে পারতো। কিন্তু মহালক্ষ্মী বাড়ী ঢুকে পড়ে নীরদাকে দিয়ে যতক্ষণে ডাকেন, ততক্ষণে নিজের চারিদিকে বর্ম্ম রচনা করে ফেলেছে তরু।

অতএব নিতান্ত সহজ ভঙ্গীতে—যেন কিছুই হয়নি এই-ভাবে—বলতে শোনা যায় তরুকে—পিসিমা, ডেকেছিলে না কি?

মহালক্ষ্মী হঠাৎ থতমত খেয়ে যান। না গিয়ে উপায় কি? তরুর এই বেপরোয়া সহজ ভাবটুকু আকস্মিক আক্রমণের মতো আঘাত করে মহালক্ষ্মীকে।

—ডাকছিলাম?···ও হ্যাঁ ডাকছিলাম। বলছি যে—

—কি গো, 'বলছি যে' বলে থামছো কেন? কি বলবে বলো। আমার আবার সুপুরি কাটতে রয়েছে একরাশ।

—সুপুরি!—এইবার যেন হঠাৎ ফেটে পড়েন মহালক্ষ্মী।—সুপুরি কাটতে হবে না তোমাকে। কোনো কিছু করবার দরকার নেই তোমার।···যাক্—আমি জানতে চাই ওই লোকটা কে।

—ও? আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোক ও।

—বটে? তাই না কি? তা হঠাৎ শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোকটিকে আবিষ্কার করলে কোথা থেকে?

—বামুন ঠাকুরের কাছে আসতো, আমি হঠাৎ দেখে ফেলে চিনতে পারি।···কেন, কি হয়েছে?

—কি হয়েছে! বলতে একটু লজ্জা হলো না? আশ্চর্য্য বটে!···বেশ, তোমায় বলে রাখি, শ্বশুরবাড়ীর দেশের লোকই হোক আর যাই হোক, আমার বাড়ীতে এ সব অভব্যপনা চলবে না। নিজেকে সামলে চলতে চেষ্টা কোরো।

মিনিটখানেক গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তরু হঠাৎ মুখ তুলে বলে—ও বলছে ক' দিন পরে দেশে যাবে, আমি একবার যাবো ওর সঙ্গে।

—কি? কি বললে?

—বলছি বোড়ালগাছায় যাবো একবার, অনেক দিন যাইনি।

মহালক্ষ্মী তীব্রদৃষ্টিতে একবার তরুবালার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন—যেতে পারো, তবে 'একবার' বলে কিছু কথা নেই, একেবারেই যাবে।

—বেশ, তাই-ই যাবো।

—যাবে তা জানতাম আমি।···কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়ে হয়ে এতো নীচ প্রবৃত্তি তোমার কি করে হোলো তাই ভাবছি।—ডুবে মরবার সখই যদি হয়েছিল—পানাপুকুর ছাড়া জল জুটলো না? ছিঃ ছিঃ!

উচিতমতো একটা উত্তর দেবার ইচ্ছে থাকলেও উপযুক্ত কথা আর জোগায় না তরুর।···উপায় থাকলে—এই দণ্ডেই এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো সে, কিন্তু বিনোদ বলে গেছে আসছে শনিবারের আগে আর আসতে পারবে না সে।··· অতএব এখনো এই পাঁচ-পাঁচটা দিন মহালক্ষ্মীর চোখের সামনে চরে বেড়াতে হবে তাকে।

১০

মহালক্ষ্মীর কাকা বিশ্বনাথবাবু লোকটি ভালোমানুষ গোছের হলেও করিৎকর্ম্মা সন্দেহ নেই, মহালক্ষ্মীর মনে লাগবার মতো পাত্রও সংগ্রহ করে আনেন তিনি।

বিয়ে হবে কিনা পরের কথা, বিয়ের কথা চালানো চলে এমন পাত্র খুঁজে বার করাই কি সোজা? আকাশের চাঁদ হলেই যেন ভাল হয় মহালক্ষ্মীর।

এখন সমস্যা 'কনে' দেখার।

আর তো গোপন রাখা চলবে না। কিন্তু গোপন করার আছেই বা কি? মহালক্ষ্মী নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করেন···একমাত্র মেয়ে তাঁর, স্বাস্থ্যহীনতার জন্যে যদি একটু দেরীই করে থাকেন বিয়ে দিতে, হয়েছে কি তাতে? এমনই বা কি দেরী? এই কলকাতা সহরে বাইশ-চব্বিশের কম বয়সী কনে পাচ্ছেই বা কে? হ্যাঁ, এতো দিন লুকোছাপা একটু করে এসেছেন বটে—তা' সে এমন কি আর অসঙ্গত হয়েছে? মেয়ের বিয়ের ব্যাপার, কোথা থেকে কখন ভাঙ্‌চি পড়ে কে জানে!

এইবার মহালক্ষ্মী সাহস করেই রণক্ষেত্রে নামবেন।···

মণিকে ভয়? মহালক্ষ্মী ভয় করবেন মণিকে?

কেন মহালক্ষ্মী কি পাগল? বলুক দিকিন মণি একটা কথা মহালক্ষ্মীর মুখের ওপর? বলবেই বা কি তাই শুনি? নেহাৎ নাকি জটিল ব্যাধির কবলে পড়ে গিয়েছিল তাই, নইলে কোন্ কালে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলে দেশের জ্ঞাতিগোত্র আত্মীয়বর্গের মুখ বন্ধ করে ছাড়তেন মহালক্ষ্মী।

যাক্, এতো দিনে ভগবান দিন দিয়েছেন।

মণিকে বার বার বিরক্ত করা চলবে না, এটা যেন আপনা থেকেই অনুমান করে বিশ্বনাথবাবু এসে বলেন—মা লক্ষ্মী, ওদের মেয়েপুরুষ সব একদিনেই আসার ব্যবস্থা করে এলাম। দু'-পাঁচবার আর কেন ঝামেলা করা! জনা পাঁচেক আসবে বোধ হয়, মস্ত বড়লোকের সঙ্গে কারবার করতে যাওয়া—বুঝে সুঝে আয়োজন-উদ্যোগ করে রেখো, তোমায় আর বেশী কি বলবো।···তবে মেয়েকে বেশী সাজিও না, বলেছে—সাদাসিধে দেখতে চায়।

মহালক্ষ্মী গম্ভীর হয়ে বলেন—ভদ্রলোকের সামনে বার করতে গেলে ন্যাকড়া পরিয়ে তো বার করা চলে না, বিশুকাকা!

বিশুকাকা মহা অপরাধীর ভঙ্গীতে বলেন—না না, সে কি কথা, যেটুকু যা দরকার তা' করতে হবে বৈকি, বেশী কিছু আড়ম্বর না হয়ে যায়। আর তাও বলি—এখনকার মেয়েরা ন্যাকড়া আর পরে কখন? বিয়ের কনে সেজেই তো থাকে হরঘড়ি।

সামান্য হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ করেন বিশ্বনাথবাবু।

মহালক্ষ্মী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলেন—সেদিন তুমি উপস্থিত থাকবে তো?

—আমি? আমি তো নিশ্চয়ই থাকবো, তোমার কাকী বলছিল সেও আসবে।

—কাকীমা?—মহালক্ষ্মী নিরুৎসাহভাবে বলেন—কাকীমা কি আসতে পারবেন? সংসারের কাজকর্ম ফেলে—একলা মানুষ···

—বিলক্ষণ! একদিন দু'ঘণ্টার জন্যে আসবে তাতে কি? কাজ তো রোজই আছে! সে ঠিক গুছিয়ে রেখে আসবে'খন।

ভালোমানুষ বিশ্বনাথবাবুর নজরেও পড়ে না মহালক্ষ্মীর নিরুত্তাপ ভাবটা। কাকীমার আগমন-সংবাদে মহালক্ষ্মী পুলকিত হয়ে উঠবেন—এইটাই ধারণা হয় তাঁর।

বলা বাহুল্য মহালক্ষ্মীর ধারণা আলাদা।

বিশ্বনাথবাবু যতোটা ভোঁতা, ততোটাই প্রখর বুদ্ধির অধিকারিণী তাঁর গৃহিণীটি। তাঁর উপস্থিতিটা তাই বিশেষ লোভনীয় মনে হয় না মহালক্ষ্মীর। এই তো এতো দিনের মধ্যে ভদ্রতার খাতিরেই কি কাকীকে কোনদিন নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করেছেন তিনি? দরকার পড়লে বরং নিজেই যান।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু আর আপত্তি করাও চলে না। যাক্ গে—ভয় আর কাউকে করবেন না মহালক্ষ্মী, যা থাকে কপালে।

তবে ভাবী কুটুম্বদের অনুরোধ না মেনে উপায় নেই। মণিকে সাজাবার অপূর্ব্ব যা সব পরিকল্পনা ছিল, তার কিছুটা খর্ব্ব করতেই হয়। অবশ্য বেশী কিছুই যায় আসে না তা'তে, মণির মতো রূপসী মেয়ে ক'টা আছে?

কিন্তু মহালক্ষ্মীর কপালে স্বস্তি নেই।

পরদিন সকালবেলা হঠাৎ দেশের বাড়ী থেকে সরকার মশাই এসে উপস্থিত। প্রথমটায় মহালক্ষ্মী সত্যিই খুসী হয়ে ওঠেন, কারণ বিপদে সম্পদে এই সরকার মশাইটি তাঁর বন্ধু। এই যে এতো দিন বিষয়সম্পত্তির দায় এড়িয়ে কলকাতায় এসে বসে আছেন, সে কার ভরসায়? আজ এই মণিকে দেখতে আসার দিন যে ভগবান-প্রেরিত হয়েই এসেছেন তিনি, এতে আর সন্দেহ কি।

দেখেই হেসে বলেন—আজ আর কিন্তু আপনার কাগজপত্র দেখছি না সরকার মশাই, যা এনেছেন সব থাক চাপাচুপি, এখন আজকের দায় উদ্ধারের পরামর্শ হোক।

—আজকের দায়?—অবাক হয়ে তাকান সরকার মশাই।

—বাঃ, আজ মণিকে দেখতে আসবে যে—মস্ত বড়লোক, কোথাকার যেন জমিদার, 'রাজা' খেতাব আছে নাকি!—খুব তাড়াতাড়ি বক্তব্যটা পেশ করেন মহালক্ষ্মী,—যেন বিস্ময় প্রকাশের ফাঁক দেবেন না সরকার মশাইকে।

তবু বিস্ময় প্রকাশ না করে ছাড়েন না ভদ্রলোক। প্রায় 'হাঁ' করে বলেন—মণিকে দেখতে আসবে!

—হ্যাঁ, সেই রকমই কথা হয়ে রয়েছে। বিশুকাকা ঘটকালি করেছেন, খুব ভালো ছেলে, চেহারা সুন্দর—

একটু বেশী ব্যস্তভাব প্রকাশ হয় মহালক্ষ্মীর কথায়, যেটা প্রায় তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

সরকার মশাইয়ের মুখ অন্ধকার দেখা, এবং গাম্ভীর্য্যটা ঢাকবার চেষ্টা না করেই বলেন—মণির বিয়ের কথাই আমি বলতে এসেছিলাম এবার—সেরেস্তার কাগজপত্র নিয়ে নয়,··· কিন্তু আপনি যে এভাবে এগিয়েছেন সেটা আন্দাজ করতে পারিনি।

মহালক্ষ্মী ঈষৎ দুর্ব্বলভাবে বলেন—আমার তো ওইটুকুই সম্বল সরকার মশাই, ওকেই যদি বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করে রেখে যেতে না পারি, আমার আর রইল কি তা' বলুন? বিয়ে দেবো না—এইটাই কি তবে চান আপনারা?

সরকার মশাই সেই একই ভাবে বলেন—আমরা যা চাই শুধু সেইটুকুই যদি ঘটে সংসারে, তবে তো আর কোনো ভাবনাই থাকে না মা, কিন্তু তা' তো হয় না।···হ্যাঁ বিয়ে দেওয়া দরকার বৈকি, বিয়ে তো দিতেই হবে, ভগবানের ইচ্ছেয় যখন সেরে উঠেছে—ভালো আছে।···তবে কথা হচ্ছে কি, একটু বিবেচনা করে কাজটা করা দরকার। রাজা-উজিরের ঘরে দেবার দরকার কি?

—তা'—দিলে, মানুষের মতন ঘরেই দিতে হবে বৈকি, সরকার মশাই।

—কী দরকার মা? বড়োমানুষের বড়ো ফৈজৎ বৈ তো নয়! কিন্তু আমি আজ এসেছিলাম সম্পূর্ণ আলাদা কথা বলতে, শুনে সন্তুষ্ট হবেন কি না জানি না, তবু···

—ভাবছেন কেন সরকার মশাই, কি বলবেন বলে ফেলুন।

মহালক্ষ্মীর স্বভাবগত দাম্ভিকতা—কেন কে জানে—এই বুড়ো ভদ্রলোকের সামনে কেমন যেন মিইয়ে যায়।

সরকার মশাই মিনিট খানেক নিজেরই কেড্‌সপরা শ্রীচরণযুগলের পানে তাকিয়ে থেকে সহসা মুখ তুলে বলেন—জ্যোতিঃপ্রকাশ এসেছে।

—কী? কী বললেন?

—জ্যোতিঃপ্রকাশ। রাশিয়া দেশে না কোথায় যেন গিয়েছিল—ফিরেছে।

মহালক্ষ্মী কঠিনভাবে বলেন—ফিরেছে ভালো কথা, কিন্তু তা'তে আমার কী?

—অবশ্য একেবারেই 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দেন—আলাদা কথা, কিন্তু না দিলেই বোধ হয় ভালো হ'তো।··· শুনলাম অনেক দেশবিদেশ ঘুরে অনেক কিছু শিখে বেশ 'একজন' হয়ে এসেছে এই ক' বছরে।

মহালক্ষ্মী তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করেন—তা' আপনি কি করতে বলেন? তার পায়ে ধরে মেয়ে গছাবার চেষ্টা করতে যাবো?

—এই দেখুন, আপনি আগেই রেগে যাচ্ছেন, ধৈর্য্য ধরে শুনুনই সবট।···জ্যোতিঃপ্রকাশ নিজেই গিয়েছিল আমার কাছে।

—কী? আমার বাড়ীতে? সে বাড়ীর চৌকাঠ আবার ডিঙিয়েছিল সে?

—না, আপনার বাড়ীতে নয়, এই গরীবের কুঁড়েতেই। হঠাৎ পরশু সন্ধ্যাবেলা এক মটর বাইক চেপে আমার দরজায় এসে হাজির। চেহারা যা হয়েছে—সাহেব হার মানে।

কঠিন একটু হাসির সঙ্গে মহালক্ষ্মী বলেন—আপনি বুঝি তার হয়ে ওকালতি করতেই আজ কষ্ট করে কলকাতায় এসেছেন, সরকার মশাই?

—না মা, আজ পর্য্যন্ত ওকালতি কারুর হয়ে করিনি, বাকী বয়সটা যেন করতেও না হয়। কারুর পয়সাও খাবো না, কারুর হয়ে অন্যায্য একটা কথা বলবোও না। তবে বিবেকের মুখ চাই। আমি বুঝি, ভুল মানুষেরই ধর্ম্ম, মানুষ যদি ভুল না করতো—ভগবান বলতেই বা বাধা কি ছিল তাকে? দোষে গুণে, ঠিকে ভুলেই মানুষ তৈরী, এতটুকু ছুতো পেলেই যদি ফেলে দিতে হয় তাকে—কাকে নিয়ে তবে সংসার করবেন মা? ঠগ্‌ বাছতে গাঁ ওজোড় হবে যে!

মহালক্ষ্মী তেমনি কঠিন মুখেই বলেন—গাঁ সুদ্ধু বাছতে চাইনে সরকার মশাই, তবে যে আমার ঘরের মট্‌কায় আগুন দেবে, তাকে বেছে বাদ দিতে হবে বৈকি।

—তবে আর কি বলবো মা, যা ভালো বিবেচনা করবেন তাই করবেন। আমি শুধু জানাতে এসেছিলাম।··· যাক্‌, সম্ভব যখন নয় তখন আর কি করা যাবে।··· আজই আমাকে ফিরতে হবে মা, চারটের গাড়ীতেই যাবো। বেশী রাত করে দরকার কি।

—চারটের গাড়ীতে? ঠিক সেই সময়েই যে দেখতে আসবে মণিকে!

—আমি আর থেকে কি করবো—ও সব রাজরাজড়াই কাণ্ড বুঝিও না ভালো।

—বুঝবার তো কিছু নেই সরকার মশাই, এ বাড়ী তো প্রমীলার রাজ্য, বাইরের পাঁচজনের সামনে আপনি একটু ঘোরাঘুরি করতেন—এই আর কি। এসে যখন পড়েছেন···

—মা, এ বুড়োহাবড়া গেঁয়োটাকে লোকের সামনে বার করেও বেশী কিছু মুখোজ্জ্বল হবে না আপনার। আর আপনার কাকাই তো রয়েছেন।

মহালক্ষ্মী ঈষৎ বিষণ্ণভাবে বলেন—আপনার ভরসাই বরাবর করি তা' তো আপনার অজানা নয়, সরকার মশাই! তবে বিশুকাকা এখানে রয়েছেন, দেখাশোনা

করেন—এই আর কি। যাক্‌, এখন বেলা হয়েছে, স্নানাহার করুন।

—এই যে যাই।···

'যাই' বলেও বৃদ্ধ বসেই থাকেন চুপচাপ।

মহালক্ষ্মী খানিকটা পরে আবার এসে অবাক হয়ে বলেন—এ কি, আপনি এখনো স্নান করতে যাননি?

—না মা, এই যে যাই।···বসে বসে ভাবছিলাম একটা কথা, জ্যোতিঃপ্রকাশের বিষয়টা একবার বিবেচনা করলে বোধ হয় ভালোই হ'তো। আর সে নিজেই যখন এতোদিন পরে এতো দেশদেশান্তর ঘুরে এসে একটা 'মান্যমান' লোক হয়েও যেচে খবর নিতে এসেছিল···

—বেহায়ারা অনেক কিছুই পারে সরকার মশাই।—

—তবে থাক মা ও সব কথা। কিন্তু আমার মনে হয়, নিজেই সে একদিন আসতে পারে এখানে।

—এতো সাহস তার হবে? বলছেন কি সরকার মশাই!

—কিছুই ভুল বলিনি মা। পৃথিবীটা যে কতো বড়ো, সে জ্ঞান তো আমাদের নেই, গণ্ডি কেটে বসে আছি—তাই সাহস শক্তি সবই অল্প। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে পৃথিবীখানার চেহারা কেমন তার কিছুটা জেনে এলেও সাহস বাড়ে বৈকি!

—কিন্তু আপনি জেনে রাখবেন সরকার মশাই, বিলেত কেন—বৈকুণ্ঠ ঘুরে এলেও আমি তাকে ক্ষমা করতে পারবো না।

—সেটা আগেই বুঝেছি মা। নিয়তি যাকে যেখানে নিয়ে যায়। তবু আমার ছোটো বুদ্ধিতে আবারও বলছি, ক্ষমা করতে পারলে ভালো হ'তো—মণিরও মঙ্গল হ'তো।

মঙ্গল করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই সরকার মশাই—নিয়তির কথাই যদি বলেন—তিনি আমাকে যে পথে চালাবেন সেই পথেই চলবো।

অন্ধকার মুখে উঠে যান মহালক্ষ্মী।

জ্যোতিঃপ্রকাশ!···

তার মুখ যেন জীবনে না দেখতে হয় মহালক্ষ্মীকে।

১১

রাত পোহালেই চলে যেতে হবে, তাই আজই সব গোছগাছ করে নিচ্ছিল তরুবালা। অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনাহীন আবেশের বশে যখন কিছু করতে বসে মানুষ, তখন যে তার চক্ষুলজ্জার বালাই মাত্র থাকে না, তা' তরুবালার ব্যবহার দেখলে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

সেদিন—তিরস্কৃত হবার পর—মহালক্ষ্মী আশা করেছিলেন সমঝে যাবে তরুবালা, সামলে নেবে নিজেকে।···কিন্তু তাঁর আশাকে ধিক্কার দিয়ে, আর সকলকে অবাক করে দিয়ে, রীতিমত তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছে সে যাবার আয়োজনে।

দু'দশ দিনের জন্যে যদি শ্বশুরবাড়ীর দেশে বেড়াতে যাবারই সাধ হয়ে থাকে তার—তো 'আচারের বোতলটা থেকে মা কালীর পটখানা পর্য্যন্ত নিয়ে যাবার কি দরকার'—এ কথা জিগ্যেস করতেই বা রুচি হবে কার?

মহালক্ষ্মী তো তার মুখ দেখাই ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়।

তলে তলে সে যে নিজের ব্যবহার্য্য জিনিস ছাড়াও নিজের হাতে তৈরী তুলোর হাঁস, আঁশের ছবি, আর কার্পেটের আসনখানা অবধি বাক্সজাত করছে—এটা অনুমান করেন মাত্র। নীরদা এক-আধবার সাহসে ভর করে এসেছিল বান্ধবীর অসাক্ষাতে তার সমালোচনা করতে, কিন্তু এক দাব্‌ড়ানিতে ঠাণ্ডা হয়ে ফিরে গেছে।

মনের মধ্যে যতো বিরক্তিই থাক্‌, দাসীর কাছে খেলো হ'তে পারেন না মহালক্ষ্মী।

একমাত্র আশ্রয়স্থল বারান্দাটা আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে টুনির। মণিকে দেখতে আসবে বলে শোভাবর্দ্ধনার্থে বারান্দায় স্থাপনা করা হয়েছে কয়েকটা ফুল গাছের টব। চাকর দুটোর অবিরত আনাগোনায় বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

তাই নীচের তলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল টুনি।

কয়েকদিন ধরে তরুবালা যে কোথায় যেন যাত্রার আয়োজন করছে—এটা মাতৃসম্বন্ধে অতি উদাসীন অন্যমনস্ক-প্রকৃতি টুনিরও চোখ এড়ায়নি।···কিন্তু কোথায় যেতে হবে—বার কতক সে প্রশ্ন করেও বিশেষ সদুত্তর পাওয়া যায়নি তরুবালার কাছ থেকে।

এ বাড়ী ছেড়ে আর কোথাও—নতুন কোথাও যেতে পাওয়া যাবে মনে করে যে রোমাঞ্চটুকু হবার কথা টুনির, সেটা ব্যাহত হচ্ছে তরুবালার কঠিন ঔদাসীন্যে। টুনিকে সে নিয়ে যাবে কি না সেটাও বোঝা যাচ্ছে না তার ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায়।···একলা তরুবালার মোটা মোটা থান আর খস্‌খসে সেমিজগুলোই শুধু ট্রাঙ্কে উঠবে? টুনির জামাটামাগুলো ছড়ানো থাকবে এখানে সেখানে?···মায়ের এ ধরণটা অপরিচিত।

লোক দেখিয়ে যত্ন করা, আর লোকের আড়ালে টিপে টিপে মারা, গালমন্দ করা—এটা তবু অভ্যস্ত; ওতে নতুন করে অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু মোটেই আমল দেবে না, কোথায় চলে যাবে—হয়তো নিয়েও যাবে না টুনিকে ,৮

আবার কি ধরণের শাস্তি?···একলা তরুবালা যাবেই বা কোথায়? এ জগতে যাবার জায়গা তাদের আর আছে না কি? বাড়ীর আর কেউ যে এক পা নড়বে কোনোখানে সে রকম লক্ষণ কই? বরং কিছু যেন উৎসবের আয়োজন চলছে মনে হয়···কিন্তু টুনি কি সর্ব্বত্রই অবান্তর?···

মানে কি এর?

তরুবালার সঙ্গে যেতে পাবে কি পাবে না, স্পষ্ট করে কেউ বলছে না কেন টুনিকে?

নীচের তলায় এসে শুকনো মুখে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। ভাঁড়ার ঘরের পাশে যে ঘরটায় থাকে তরুবালার আর টুনির বিষয়সম্পত্তি, দু' একবার ঢোকে সে ঘরে, কিন্তু মহাব্যস্ত তরুবালা যেন দেখতেও পায় না তাকে।

মা'র ব্যবহারে—দুঃখ নয়, আক্রোশে আর অপমানে—চোখ ফেটে জল আসে টুনির।···না, ভুল নেই—ওই যে আলনায় ঝোলানো রয়েছে টুনির ফ্রক আর ইজের, ছোটো বালিশটা চৌকার উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে—বড়ো বালিশটা সতরঞ্চির সঙ্গে জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে রাখা হয়েছে।···

এই মা—টুনির! এই রকম স্বার্থপর আর নিষ্ঠুর!

বাবার বদলে যদি মা মরে যেত টুনির, বেশ হ'তো,—খুব ভালো হ'তো। বাবা থাকলে এই রকম করে টুনিকে ফেলে রেখে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতো? কক্‌খনো না। বাবারা খুব ভালো হয়—খুব ভালো। কি করবে—মরে গেলে তো আর বেঁচে থাকতে পারে না মানুষ! তাই টুনিকে দেখতে পারে না। টুনি বড়ো হয়ে—অনেক বড়ো হয়ে—হিমালয় পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা করে করে মন্তর শিখতে পারবে না? ভীষণ জোরালো মন্তর—যাতে মরা মানুষ বাঁচানো যায়?

একগোছা রূপোর রেকাবি সাফ্ করে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওপরে যাবার মুখে নীরদা টুনিকে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুচকে হেসে বলে—মা তো কলা দেখিয়ে চললো—এখন?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে শুধু একবার তাকিয়ে দেখে টুনি।···

মরা মানুষ বাঁচানোর মন্তরের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা চাই। ভস্ম করে ফেলবার মন্তরও শিখতে হবে, না শিখলেই নয়। কট কট করে তাকানোমাত্রই যাতে আস্ত একটা মানুষ এক মিনিটে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

—তাকাচ্ছে দেখ না, যেন কালকেউটের চাউনি! বাবা, মেয়ে তো নয়—জাতসাপ!

এইটুকু বলেই আপাতত চলে যেতে হয় নীরদাকে, গিন্নী বসে আছেন রূপোর রেকাবির প্রতীক্ষায়।

ফ্রকের কোণটা তুলে চোখের জলটুকু মুছতে হলেও একটু নির্জ্জন ঠাঁইয়ের প্রয়োজন। চোখের জল পড়াটা কারুর দৃষ্টিগোচর হওয়াও যেমন লজ্জার ব্যাপার, মোছাটাও তাই। কিন্তু এতো বড়ো বাড়ীখানায় আজ এক তিল স্বস্তির জায়গা নেই। যেখানে যার না যাবার কথা সে সেখানে না-হক্ ঘুরছে। কারা যেন আসবে বাড়ীতে। আহারের আয়োজন যা বিরাট হচ্ছে তাতে মনে হয় খুব মান্যগণ্য লোক তারা সব।···মণিকে নাকি 'দেখতে' আসবে। 'দেখতে' আসার অর্থ কি? ডাক্তারেরা 'দেখতে' আসে বটে, কিন্তু সে তো অসুখ করলে। তেমন অসুখ কৈ রাঙামাসীর? দুপুরবেলা যা একটু মাথা ধরেছে বলে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিল।

···চমৎকার ঘরটা রাঙামাসীর, জানলা-দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে শন্‌শন্ করে পাখা ঘোরে, কী ঠাণ্ডা আর সুন্দর লাগে!

দুপুরবেলা—ভীষণ এই গরমের সময় এক দিনও যদি ও ঘরটায় শুতে পেতো টুনি! খাটের ওপর নয়, শুধু ঠাণ্ডা মেঝেটায়—একবারটির জন্যেও। তা' হবার জো নেই, টুনিকে শুতে হবে নীচের তলায় ভাঁড়ার ঘরের পাশে গরম ওই বিচ্ছিরি ঘরটায়। তরুবালার নাক ডাকার শব্দে···

এ কি, তরুবালাও যে চলে যাবে কাল সকালে! একলাই তাহলে শুতে হবে টুনিকে? কে জানে—ওই ডাইনী বুড়ি নীরদাটাই হয়তো শুতে আসবে কাছে।··· টুনির মা টুনিকে ফেলে চলে গেছে বলে কি আর রাঙাদিদিমা কিম্বা রাঙামাসী তাকে কাছে শুতে ডাকবেন?···

—'কক্‌খনো না'—সশব্দে উচ্চারণ করে ফেলে টুনি।··· কক্‌খনো শুতে দেবে না ডাইনী নীরদাটাকে···একলা শোবে টুনি, ভূতে খেয়ে ফেলুক তাকে—তাই ভালো।···সকালবেলা সবাই এসে দেখবে টুনির মাথার চুল আর রক্তমাখা হাড়গোড় পড়ে আছে। ভূতে খেয়ে ফেলেছে টুনিকে। ঠিক হয় তবে, ঠিক হয়। ভূতেরা মাথার চুল আর হাড়গোড় খেতে পারে না টুনি জানে।

নিজের সেই কাল্পনিক দুরবস্থার কথা স্মরণ করে হঠাৎ সমস্ত শরীরের মধ্যে ঝাঁকুনি দিয়ে গরম এক ঝলক চোখের জল চোখ উপচে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে টুনির।···

ভূতে খাবার কল্পনা বড় কষ্টকর। তার চেয়ে শুধু মরে যাওয়া যায় না?

হে ভগবান! টুনি কোনো মন্তর শিখতে চায় না—মরা মানুষ বাঁচানোর নয়, আস্ত মানুষ ভস্ম করার নয়—শুধু নিজে নিজে মরে যাওয়ার মন্তর শিখিয়ে দাও ওকে।··· এখুনি—তরুবালা ওকে ফেলে চলে যাবার আগে—নীরদার কাছে শোবার মতো দুর্গতি ঘটবার আগে—মরে যাক্ টুনি।—

কারুর একটুও কষ্ট হয় কিনা দেখবে সে।

আচ্ছা, মরে গেলে কি দেখতে পাওয়া যায়?…যায় যায়, স্বর্গ থেকে সব দেখা যায়। টুনি তো স্বর্গেই যাবে। যেখানে ওর বাবা আছে।…

ইচ্ছামৃত্যুর স্বপ্নে বিভোর বেচারা টুনি অন্যমনস্কভাবে বাড়ীর বাইরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

পথ।…

চিরদিন যে হাতছানি দেয় টুনিকে, অজ্ঞাত কোন রহস্য-লোকের বার্ত্তা বহন করে।…এই তো সোজা রাস্তা—দরজার সীমানাটা পার হয়ে দু'বার পা ফেললেই যার নাগাল পাওয়া যায়। এক মিনিটের মধ্যেই টুনি ওদের সঙ্গে সমান হয়ে যায়—রাস্তায় যারা ছুটোছুটি আনাগোনা করছে ব্যস্ত হয়ে, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে অলসভাবে।…

ইচ্ছে করলেই ওদের মতো হওয়া যায়। শুধু সাহস করে একবার বাড়ীর চৌকাঠ ছেড়ে রাস্তায় পা দেওয়ার ওয়াস্তা।… তরুবালার আর নীরদার এক্তারের বাইরে—সমস্ত সংসারের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে টুনি।

মরে যাওয়ার চাইতে খারাপ নয় কিছু—বরং ভালোই।

মরে গেলে তো টুনি কোন দিনই দেখতে পেতো না সোজা এই পথটা…মোড়ের মাথায় যেখানে বাঁক নিয়েছে—কি আছে তার ওদিকে।…দেখতে পেতো না—কাকে 'জগুবাবুর বাজার' বলে, কাকে বলে 'গড়ের মাঠ'। 'ইষ্টিশন' কি জিনিষ? সরকার মশাই যেখান থেকে আসেন মাঝে মাঝে। সব কি একবার দেখে নিতে ইচ্ছে হয় না?

কারুর সঙ্গে নয়—কারুর মুখ চেয়ে নয়—একলাই দেখবে টুনি কতো জিনিষ আছে বাড়ীর বাইরে, কতো লোক আছে পথে।…

টুনীর অভিভূত আত্মবিস্মৃত চিন্তাধারার উপর সশব্দে এসে ধাক্কা মারে চোখধাঁধানো চকচকে প্রকাণ্ড দু'খানা মোটরগাড়া।

যাদের আসার কথা শোনা যাচ্ছিল তারাই এলো তবে।… এরাই দেখবে রাঙামাসীকে।

পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়, নিতান্তই গ্রহবৈগুণ্যের বশে টুনির ভিতরকার যে শিশু-প্রকৃতি লুপ্ত হতে বসেছে—সে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে।… কারা নামছে রে বাবা! কী সাংঘাতিক মোটা! গাড়ী থেকে নামতেই পারছে না যে!…

কী অদ্ভুত! কী হাস্যকর!

হাতীর মতো মোটা মোটা ওই মানুষগুলোর কি রকম ছোট ছোট পা! হাঁটছে যেন 'থুপুস থুপুস' করে! রাম! রাম! সিঁড়ি দিয়ে উঠবে কি করে? ধরে ধরে নিয়ে যেতে হবে না কি?

কিন্তু কী গাদা গাদা গয়না!

চাপ চাপ মাংসের থাঁজে থাঁজে চেপে বসা সেই সব চুড়ি বালা ব্রেসলেট্ আর্মলেটের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে টুনি। কী এ? মানুষের হাত? এতো গয়না পরেছে কেন? কেন পরেছে এতো ভালো ভালো শাড়ী? এতো গয়না আর এতো ভালো শাড়ী পরেও এতো বিশ্রী কেন।

গলার আর গালের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া মুখগুলোর পানে তাকিয়ে দেখলে দু'বার দেখতে ইচ্ছে করে না। টুনির মতো ছোট্ট মেয়েরও নয়।

টুনি তো জানে না 'বড়লোকের গিন্নী' মানে কি!

নিজেকে যতোটা ইচ্ছে ততোটা প্রসারিত করতে না পারলে আবার মানসম্ভ্রম কোথায়? অর্থের সার্থকতা কিসে?

দ্বিতীয় গাড়ীখানি হ'তে যে ভদ্রলোক তিনজন নামলেন তাঁরাও কম যান না। রবারের বেলুনের মত ফুলে ওঠা পায়ে চেপে-বসা সিল্কের মোজা—সেও তাকিয়ে দেখবার মতো।

এঁদের আবির্ভাবটা এমন আকস্মিক এবং দৃশ্যটা এমন অদ্ভুতপূর্ব্ব যে, কচ্ছপপ্রকৃতি টুনিও নিজেকে গুটিয়ে নেবার সময় পায়নি, স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল।

ছোট ছোট দুখানি পায়ের ওপর ভারসাম্য রক্ষা করতে আড়ের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিনিট তিনেকে হাত চারেক ফুটপাথটুকু পার হয়ে আগে যিনি এগিয়ে এলেন, তিনি ভারী গলায় টুনিকেই প্রশ্ন করলেন—কি গো খুকি, তোমার নাম কি?

বলা বাহুল্য, টুনি নির্ব্বাক।

পরবর্ত্তিনী এসে গেছেন ততক্ষণে—টুনির দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন—ছোটবোন বোধ হয়?

—তাই মনে হচ্ছে। এ রকম মুখশ্রী যদি হয় তো মন্দ হবে না—কি বলিস বীণা?

—হ্যাঁ, মুখটা যেন কুঁদে কাটা। রংও দেখেছো? শাঁখের মতো সাদা। নেহাৎ রোগা তাই, নইলে খুব জেল্লা হ'তো।…চলো দেখিগে—আমাদের জন্যে যেটি তোলা আছে সেটি কেমন। ছোটবোনকে দেখে আর কি হাত পা বেরোবে!…

—এই মেয়েকে আমার খোকার বৌ করবো মাসীমা।

—গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।…নে চল্ বাপু, রঙ্গ রাখ। …কই গো খুকি চলো—তোমাকেই বুঝি দাঁড় করিয়ে রেখেছে? চাকরবাকর নেই না কি? সবই অনাসৃষ্টি! লোক সুবিধের হবে না বোধ হয়, আদবকায়দা জানে না। শুনলাম তো কোথাকার যেন জমিদার, তা' এই কি জমিদারবাড়ীর ছিরি?…

—মাসীর এক কথা! আরশোলা যেমন পাখী, বনগাঁয়ের যেমন শেয়াল রাজা—তেমনি জমিদার বোধ হয়।

কর্তারা তাড়া দেন—খাঃ, পথে দাঁড়িয়ে মন্তব্য প্রকাশ করবার বদ অভ্যাস আর ঘুচল না তোমাদের। চলো।

ছ'টি মানুষের সেই বিরাট বাহিনীকে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়বার জন্যে অনেক কসরৎ করতে হয়।...যন্ত্র-চালিতের মতো টুনিও এদের সঙ্গে এগোতে থাকে—উঠেও যায় ওপরে।

মিনিট কয়েক পরে বিশ্বনাথ-দম্পতিও এসে পড়েন।

অতঃপর 'কনে দেখা'র অষ্টাদশ পর্ব সমাধা হয় আস্তে আস্তে। কর্তারা আলাদা দেখেন, গিন্নীরা আলাদা দেখেন, কর্তারা গিন্নীরা একত্রে দেখেন...হাতের লেখা, সূচের কাজ, শিল্পকলার অপরাপর নমুন—সমস্ত কিছু দেখা হয়। সঙ্গীত-শাস্ত্রের চর্চা নেই শুনে কর্তারা পুলকিত এবং গৃহিণীরা মর্মাহত হন।...

—বৌমানুষের গান গাওয়ার রেওয়াজ অবিশ্যি আমাদের বাড়ী নেই, কিন্তু একেবারে জানবে না, সেটাও তো ঠিক নয়, আজকাল যখন ফ্যাশান হয়েছে।...কি বলিস বীণা?

—আমি তো তাই বলছি, এমন বৌ করা উচিত যে দরকার পড়লে পঞ্চাশ জনের রান্না রাঁধতে পারবে, দরকার পড়লে বরের বন্ধুদের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ডও করতে পারবে।

নমুনা শুনে রাগে এবং ঘামে লাল মণির ঠোঁটের কোণেও হাসি দেখা দেয়।

বিশ্বনাথ-গৃহিণী মধ্যস্থতা করে বলেন—তা' তোমরাই সব শিখিয়ে নেবে মা, তোমাদেরই হয়ে যাবে যখন, তখন তো আর কারুর কিছু বলার থাকবে না। এখন মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি না তাই বলো।

—তা' পছন্দ একরকম হয়েছে বৈকি, মেয়ে তো অপছন্দর নয়, তবে কথায় বলে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।...কি বলিস বীণা?

খোদ গৃহিণী মন্তব্যটি প্রকাশ করেন।

বোঝা গেল বীণাকে তিনি সঙ্গে এনেছেন টিপ্পনী কাটবার সুযোগ রাখতে।

তা' বীণাও কর্তব্যে অবহেলা করে না। উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করে বলে—সে তো নিশ্চয়। তা' ছাড়া এ তো আর হাঁড়ি-বাউরির ঘরের বিয়ে নয় যে পছন্দ হলো আর পাঁচ গণ্ডা টাকা পণ দিয়ে বৌ কিনে নিয়ে গেল। যেমন ঘর, তেমনি চাল চাই তো!

তৃতীয়টি খোদ গৃহিণীর জা—একটু যেন নীরব নীরব। এতক্ষণে একটি কথা বলেন তিনি—আপনার বড়োমেয়েটিও সুন্দর বটে, তবে ছোটমেয়েটির মুখ এক ধরণের হলেও কিন্তু আরো ভালো। ওইটুকু মেয়ে—যেন গড়ানো সরস্বতীখানি। বড্ডো রোগা তাই...কোথায় গেল মেয়েটি?

মহালক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে বলেন—আপনি ভুল করছেন...আমার এই একটিই মেয়ে, দু' বছরের মেয়ে কোলে নিয়ে এই অবস্থা।

নিজের বৈধব্যের বেশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন মহালক্ষ্মী অবস্থাটা বোঝাতে।

—আপনার মেয়ে নয় সেটি? ও মা, সে কি কথা!—বীণা কলকল করে ওঠে—সব্ব এক ছাঁচে গড়া মুখ দেখলাম যে? তবে কে হয় আপনার সেটি? নাতনীও তো নয়—একটিই যখন মেয়ে বলছেন!...ও মা, কই ডাকুন তো? আমার তো দেখেই মনে হলো এক মায়ের পেটের বোন।...আচ্ছা, ডাকুন না?

মহালক্ষ্মী নিরুৎসাহ-শীতল কণ্ঠে বলেন—ডাকাডাকির কি আছে, ঘুরছিল তো এইখানেই।...ও আমার ভাইঝির মেয়ে।

একটি কঠোর চোখরাঙানির সাহায্যে নিজেই যে টুনিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন নীচে, সেটা আর প্রকাশ করেন না মহালক্ষ্মী।

—ভাইঝির মেয়ে? ওঃ! এক ঝাড়ের বাঁশ, তাই! ...কিন্তু খুব একরকম দেখতে বাপু। ভাইঝি বুঝি এসেছেন আজ? কই, দেখলাম না তো?

—নীচের তলায় আছে, মুখচোরা মতো, কারুর সামনে বেরোতে চায় না। এখানেই থাকে, বিধবা—শ্বশুরকুলে কেউ নেই।

এক নিঃশ্বাসে সমস্ত পরিচয়টা দিয়ে ফেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মহালক্ষ্মী...যাক্ বাবা, আর কোনো প্রশ্ন উঠবে না আশা করা যায়। মানুষের কৌতূহলের কি সীমা নেই? কই, তাঁর তো অপরের কোনো কিছুতেই কৌতূহল হয় না!

এখানে একটু হিসাবের ভুল আছে মহালক্ষ্মীর।

যাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানটা বেশী প্রখর তাদের অপরের সম্বন্ধে কৌতূহল কম। বীণা কোম্পানীর অহঙ্কার হয়তো আছে, কিন্তু অহঙ্কার আর আত্মমর্য্যাদা এক জিনিষ নয়।

বীণার কৌতূহল পরিতৃপ্তির সুযোগার্থেই বোধ করি বিশ্বনাথ-গৃহিণী হঠাৎ বলে বসেন—তোমার ভাইঝি? কে, সেই তরুবালা? যে সেদিন কালীঘাটে গিয়েছিল?...তার আবার অতো সুন্দর মেয়ে আছে নাকি? কই দেখি মেয়েটিকে? কই, তরুও তো এলো না এদিকে?

বলা বাহুল্য তরুকে দেখার পর তরুর মেয়ের রূপের খ্যাতি বিশ্বাস করা কঠিন।

মহালক্ষ্মী বিরক্তিকঠিন মুখে সামনের দালানে উপবিষ্ট চাকরটাকে লক্ষ্য করে বলেন—এই, দেখ্ তো টুনি দিদিমণি

কোথায় আছে।···সে একটা ক্ষ্যাপাটে আধপাগলা মেয়ে—ওই রূপই আছে একটু, আর কিছুই নেই।···আপনাদের তো এবার একটু মিষ্টিমুখ করতে হয় দিদি? মণি এবার ও ঘরে গিয়ে বসতে পারে তো ভাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ যাক্, সেই অবধি ঘাড় গুঁজে বসে থাকা···

মহালক্ষ্মী একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—এঁদের প্রণাম করে ও ঘরে গিয়ে বসোগে মণি।

বাবাঃ! মণিও আর পারে না। তার নিরুপদ্রব আত্মকেন্দ্রিক জীবনে কখনো ভদ্রতারক্ষার বালাই ছিল না। এবা যাক্ না একবার—মাকে দেখে নেবে মণি।···সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া!

ছাব্বিশ জনের উপযুক্ত আহার্য্যের সামনে দু'জন মাত্র বসে যা খেলেন, তা' একজনেরও কম।···অমায়িক ভাষার ছদ্মবেশে অহঙ্কারের সঙ্গে জানালেন তাঁরা—অসময়ে কিছু খাওয়া তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ। ফল? হ্যাঁ খান বৈকি, তবে এই সন্ধ্যাকালে নয়। আর মিষ্টি? ডাক্তারের একেবারে নিষেধ। চা? সরবৎ? নিতান্তই যদি না ছাড়েন, ভর্ত্তি একটা গ্লাসে একবার চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখা ছাড়া উপায় কি?

নষ্ট? খাবার জিনিষ কি আর নষ্ট হয়? চাকরবাকরদের দিয়ে দিন না—সন্তুষ্ট হয়ে খাবে।

বড়লোক কুটুম্বকে যে খাবার জন্যে খাবার জিনিষ দেওয়া হয় না তা' মহালক্ষ্মীর অজানা নয়, কাজেই ক্ষুব্ধ হ'ন না তিনি। বরং গোলেমালে টুনির কথাটা চেপে গেল ভেবে খুসীই হ'ন।···

কিন্তু বিশুকাকীই যে আজ তাঁর মাথা খেতে এসেছেন এতোটা কে ভেবেছিল আগে? তিনি আগে কখনো এ বাড়ীতে আসেননি বলেই বোধ করি এক ফাঁকে উঠে পড়ে এঘর ওঘর দেখে বেড়ান। তরুকে দেখে আসতেও ছাড়েন না, এবং টুনিকেও ওপরে এনে ছাড়েন।

নানা গোলমালে টুনিও যেন বোকা হয়ে গেছে। হারিয়ে ফেলেছে স্বভাবসিদ্ধ একগুঁয়েমি।···কিন্তু, না হবে কেন? টুনিকে কে কবে আদর করে কাছে ডেকেছে? কে নাম জিগ্যেস করেছে? কে করেছে রূপের প্রশংসা?

হঠাৎ আজকের উৎসবের অবকাশে পুনর্জন্ম হলো না কি টুনির?···না কি টুনির মা টুনিকে ফেলে চলে যাবে জেনে ওরা মায়া করছে টুনিকে? এই রকম মায়াই করবে বরাবর?···নাঃ, যারা মায়া করছে তারা জানে না টুনি কী তুচ্ছ, কী বাজে।···টুনির যে বাবা নেই—নেই একটিও গয়না আর ভালো ভালো জামা। টুনির মা যে টুনিকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, বাড়ীর ঝি পর্য্যন্ত টুনিকে গালাগাল দেয়—এ সব কথা টের পেলে কি আর কেউ ছোঁবে টুনিকে?

এই তো একটু আগে বড়দিদিমার চোখে কী ভীষণ দৃষ্টি দেখেছে টুনি! বুকের ভেতর গিয়ে হাড় পর্য্যন্ত যেন কেটে দেয়—এমন ধারালো সেই দৃষ্টি। রাঙামাসীও তো তখন ওকে বললে—"তুই নীচে যা।"

অথচ আগুনের মতন রঙের ওই জামাটা আর লাল সিল্কের শাড়ীখানা পরে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাবে রাঙামাসীকে, তা' দেখবার জন্যে যে প্রাণ ছটফট্ করছিল টুনির।···পরা হয়ে গেলে একবারটি শুধু দেখেই তো চলে যেতো সে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলেও কি দোষ হ'তো?···

রাঙামাসী আবার একটা পাউডারের কৌটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে কিনা—মাখবি? এই নে, নীচে গিয়ে মাখ্‌গে যা।

ছি!···টুনি যেন পাউডারের লোভেই দাঁড়িয়ে ছিল!

নেবে বৈকি! দায় পড়েছে টুনির।···নীচে এসে সিঁড়ির তলায় বসে থাকবে চুপ করে, তাই ভালো।

কিন্তু এই বিশুকাকীমাটি তাকে টেনেটুনে বার করে ছাড়লেন।

টুনিকে দেখেই প্রস্থানোদ্যত দলের মধ্য থেকে বীণা আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে—ওই দেখ! আচ্ছা, বলো মাসী, একেবারে এক ছাঁচের মুখ নয়?···কি বললেন? আপনার ভাইঝির মেয়ে? এ রকম এক ধরণের চেহারা বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু।

'দেখতে পাওয়া যায় না'—সেটা প্রতিনিয়তই চোখে পড়ছে তো মহালক্ষ্মীর, কিন্তু উপায় কি? তরুর মেয়ের এতো রূপ থাকা যে উচিত নয়, শোভন নয়, সে কথা টুনির সৃষ্টিকর্ত্তা কেন বোঝেন নি?

কাজেই অবুঝ বিধাতার বুদ্ধির ত্রুটি ঢাকতে মহালক্ষ্মী শুধু একটু হাসেন।

হতচ্ছাড়া এই মেয়েটার ওপর রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে তাঁর। এমনিতে কোথায় কোন্ চুলোয় থাকে সারাদিন, চোখেও পড়ে না কারুর, আর আজ কীর্ত্তি দেখ! মণিকে দেখতে এসে তাকে 'থো' করে রেখে এটাকে নিয়ে এতো নাচানাচি কিসের রে বাপু?

বিশুকাকা যখনই গিন্নীকে আনবার প্রস্তাব করেছিলেন তখনই যে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গিয়েছিল মহালক্ষ্মীর—সে কি সাধে? ···যতো সব গেরো!

আমন্ত্রিতারা যাবার সময় আর একটি চাল চালেন,—অতি আপ্যায়িতের ভঙ্গীতে তরুবালাকে ডাকিয়ে দেখা করে যান। গৃহকর্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তারও একটা শ্রদ্ধা-সম্মান নেই কি?

বাড়ী খালি-হতেই মহালক্ষ্মী তলব করেন তরুবালাকে। রূঢ় কঠোর প্রশ্নে কৈফিয়ত চান—হতভাগা মেয়েটাকে পাঁচজনের সামনে এগিয়ে দেবার কারণ কি?

তরুবালার বাক্স বিছানা গোছানো হয়ে গেছে—আর সে ভয় করে না কারুর। কাজেই সে চোটপাট জবাব দেয়—মানুষ তো ছেকল দিয়ে বেঁধে রাখবার জিনিষ নয় যে বেঁধে না রাখা অন্যায় হয়েছে। মহালক্ষ্মী যদি হুকুম দিতেন তা' হলে না হয় তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখতো সে আজকের মতো।

উত্তর দেবার কিছু নেই, কাজেই মেয়েটাকে প্রায় ভস্মস্তূপে পরিণত করবার মতো দৃষ্টি হেনে মহালক্ষ্মী নিজের এলাকায় চলে যান।

টুনি প্রহার খায় তরুর কাছে—নীরদা চিপ্‌টেন কেটে কেটে কথা কয়—সমস্ত বাড়ীর আবহাওয়াটাই যেন বিষিয়ে ভারী হয়ে উঠেছে আজ!

মণির মরণ-বাঁচন অসুখের সময় যেমন হ'তো প্রায় তেমনি যেন।

রাত্রের পথ কি খুব বেশী ভয়ঙ্কর?

অনেক তো আলো জ্বলে।···আর অন্ধকার হলেই বা ভয় কি? ভূতে খেয়ে নেওয়াটাও যার কাছে বাঞ্ছনীয়, তার আবার অন্ধকার!

প্রবল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে মহালক্ষ্মী তো শয্যা নিয়েছেন। মণিও নিয়েছিল আগেই, এখন উঠে বসেছে। হঠাৎ চোখে পড়লো দালানের দেয়ালে ছোট্ট একটা ছায়া।···

অবশ্যই টুনি।···

অমন একলা ঘোরাঘুরি করছে কেন? ক্ষিদে পায়নি তো। আচ্ছা, বাড়ীতে যে এতো অজস্র খাবার এলো, টুনির হাতে কি কিছুই দেয়নি কেউ? তাই কি সম্ভব? অতোটুকু বাচ্চা!

কে জানে তাই হয়তো অন্ধকারে একলা—

মায়ের ক্রটিতেই বোধ করি লজ্জায় আকর্ণ লাল হয়ে ওঠে মণির।···এই তো দালানের জালের আলমারিতে কতো খাবার! মহালক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হয়।···তা' মণিই না হয় দিল।···

উঠে পড়ে দালানে বেরিয়ে এসে মণি মৃদুকণ্ঠেই প্রশ্ন করে—সন্দেশ খাবি টুনি?

টুনি চম্‌কে উঠে ঘাড় নাড়ে।

—রসগোল্লা?···তাও না? কেন, খাসনি তো কিছু? খেয়েছিলি? না···তবে? আচ্ছা, এই দেখ দরবেশ, রসোমালাই, পেস্তার বরফি, ছানার জিলিপি—কতো কি আরো সব রয়েছে—কোন্‌টা নিবি?

টুনি প্রবল মাথা নাড়ার সাহায্যে প্রত্যেকটা সম্বন্ধেই তীব্র আপত্তি জানায়।

ওঃ, মিষ্টি ভালবাসিস না বুঝি? আচ্ছা এই নিম্‌কি দুটো খা তবে?

কিন্তু টুনির কি আগাগোড়াই সৃষ্টিছাড়া?

রাঙামাসী! প্রায় তার আরাধ্যা দেবীর এমন অযাচিত স্নেহ উপেক্ষা করে অমন ছিটকে চলে গেল কেন?···গেল তো গেলই!···

দালান থেকে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে নীচের তলায়—শেষ পর্য্যন্ত সোজা রাজরাস্তায়!···যেখানে আছে অন্ধকারের নিদারুণ আতঙ্ক···আছে আলোর সারির উজ্জ্বল আশ্বাস।

··· ··· ··· ···

"—ছাই খাবার—বিচ্ছিরি খাবার—কে চায় খেতে? তাই জন্যে এসেছি নাকি আমি? শুধু তো তোমায় একবারটি দেখতে···"

রুদ্ধ স্বর হলেও শুনতে ভুল হয়নি মণির।

ঠিকই শুনেছে···একবার নয় বারবার—অজস্র বার শুনতে পাচ্ছে মণি ওই এক লাইন কথা ···শুনতে থাকে—কান থেকে মাথার মধ্যে···সমস্ত চেতনায়···সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শরীরের সমস্ত শিরায় উপশিরায়···প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে।···

জীবনভোর শুনতে থাকবে না কি—এই একটা শব্দ?

১২

এ পর্য্যন্ত জ্যোতিঃপ্রকাশের অভিনয়-অংশ ছিল নেপথ্যে। তাকে প্রথম দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্রেনে। কলিকাতাগামী একখানি ফার্স্টক্লাশ ট্রেনের কামরায় বসে, অপর সহযাত্রী জনৈক অবাঙালীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, একখানা বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল সে।

ভাটিয়া (খুব সম্ভব) ধনকুবেরটি দু'-একবার আলাপ জমাবার চেষ্টার পর, জ্যোতিঃপ্রকাশের দিক থেকে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করে নিতান্তই বিরসমুখে বসে আছেন।

কিন্তু ঠিক বইয়ের কাহিনীতে মন বসাবার মতো মনের অবস্থা আছে বলে বোধ হচ্ছে কি?···কলিকাতা যতোই নিকটবর্ত্তী হচ্ছে—মন ততোই বইয়ের কাহিনী থেকে দূরবর্ত্তী হয়ে চলেছে বোঝা যাচ্ছে। কারণ বইয়ের আগা থেকে গোড়া এবং গোড়া থেকে আগা অপঠিত পৃষ্ঠাগুলো অনবরত উল্টে গেলে খুব মনোযোগী পাঠক বলা চলে না নিশ্চয়ই!

কিন্তু কতোক্ষণই আর পাতা উল্টোনো যায়।

অগত্যা, সিগারেট।

অস্থিরতার অমোঘ ঔষধ।···একটির পর একটি সিগারেট···ধূম্রবলয় সৃষ্টি করতে করতে নিজেকে নিঃশেষ করে চলে···চলন্ত গাড়ীর উদ্দাম হাওয়ায় ভস্মাবশেষটুকুও রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায়, কিছুই আর চোখে পড়ে না।

গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে এসে ঢুকতেই চট করে উঠে পড়ে জ্যোতিঃপ্রকাশ, এক মিনিটও দেরী করে না। কুলি ডাকবার প্রয়োজন নেই, সঙ্গে মাত্র বিঘৎ দেড়েক মাপের একটা এ্যাটাচি-কেস্, আর সেই ইংরিজী নভেলখানা।

বইখানা পকেটে পুরে এ্যাটাচি-কেস্টা তুলে নিয়ে কামরার দরজায় হাত দিতে গিয়ে বোধ করি এতক্ষণে মনে পড়ে সহযাত্রীর প্রতি কিছু ভদ্রতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল। তাই ঈষৎ হেসে মাথাটা অল্প ঝুঁকিয়ে 'নমস্তে' বলে নেমে পড়ে।

ভাটিয়া ভদ্রলোক প্রত্যভিবাদনের অবসর পেলে কি করতেন জানি না, অবসর না পেয়ে অপ্রতিভ ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ভিড়ে মিশিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত তাকিয়ে থাকেন বলিষ্ঠ সুন্দর দীর্ঘায়ত দেহটির পানে।···তাঁর নিজের নামবার জন্যে নিজেকে ব্যস্ত হতে হবে না, ভৃত্য আছে পাশের গাড়ীতে।

বাইরে এসে জ্যোতিঃপ্রকাশ একখানা ট্যাক্সিতে উঠে বসে প্রথমে অভ্যস্ত নিয়মে বোধ হয় নিজের বাড়ীর ঠিকানাটাই বলেছিল, কিন্তু খানিকটা গিয়েই মত বদলালে···পকেট থেকে নোটবুক বার করে একটা ঠিকানা দেখে ড্রাইভারকে নির্দ্দেশ দিয়ে দিলে সেই পথের।

লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যেতো মুখে নিশ্চিন্ত শান্তির আভাস নেই—যেন কী এক দুঃসাহসিক অভিযানেই যাচ্ছে বা। ভয় আছে, উদ্বেগ আছে, আছে অস্থির চাঞ্চল্য।

কিন্তু কেন ?

নিজেকেই বারবার প্রশ্ন করেছে জ্যোতিঃপ্রকাশ। এতো ঝুঁকির মধ্যে যাবার দরকারটাই বা কি তার ?···মণি কোন-দিনই তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাবে না এটা তো নিশ্চিতই। তবে ? তবে কেন নিজেই সে যেচে যাচ্ছে অপরাধীর বেশে ?

বিবেক ?

অহরহ ওই বস্তুটাই কি কামড় দিয়েছে তাকে ?···যেটা বিবেকের নিতান্তই স্বভাবধর্ম।···নাকি আর কিছু ? এই সাত বছর ধরে তো পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি ঘুরে বেড়িয়েছে জ্যোতিঃপ্রকাশ। দেখেছে কতো অজস্র মুখ, কতো অপূর্ব্ব রূপ, তলিয়ে গিয়েছে কাজের সমুদ্রের অতল তলে···বাস্তব পৃথিবীর রূঢ় চেহারার সঙ্গে পরিচয় হতে হতে যৌবনবিবশ সুকুমার মনের উপর ধীরে ধীরে পড়েছে রুক্ষ কঠিন আবরণ।···অজানা পৃথিবীকে নতুন দেখার বিস্মিত কৌতূহলদৃষ্টি আর নেই, উদাসীন দুই চোখে অতি-পরিচয়ের নিষ্করুণ অবহেলা। তবু অশ্রুলাঞ্ছিত পাংশু একখানি কিশোর মুখ বারে বারে স্মৃতির দরজায় ঘা দিয়েছে কেন ?···নিঃশেষ হয়ে মুছে যায়নি কেন ?

দীর্ঘকালের পর দেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য আকর্ষণে যে টানছে সে কে ?

প্রেম ?

হয়তো তাই। কিম্বা দুই-ই।

কাব্য-উপন্যাসের মতো উদ্দাম উন্মাদ প্রেম না হোক—সকরুণ মমতা-মিশ্রিত এই যে ভাবটা, একেও প্রেমই বলা হয় বোধ হয়। আর ভালো করে ভেবে দেখলে—বিবেকই প্রেমের সত্যিকার আশ্রয়স্থল নয় কি ?

অবিশ্যি মণিকে না পেলে জ্যোতিঃপ্রকাশের জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে এমন কিছু নয়। বরং এতোদিন পরে এসে—মণির বর্ত্তমান সংবাদের চাইতে গৌরবময় বিবাহিত জীবনের সংবাদ পেলেই খুশী হ'তো সে। তবে তা' যখন নয় তখন কেনই বা উদাসীন অসাবধানতায় হারিয়ে ফেলবে মণিকে ? কেন কৈশোর-প্রেমের বিচারবুদ্ধিহীন অন্ধ আবেগের দায়িত্ব এড়িয়ে যাবে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পরিণত যৌবন ? তাই মণির জন্যে চেষ্টা করতে হবে শেষ পর্য্যন্ত।···

কিন্তু মহালক্ষ্মী ?

দাম্ভিক আত্মগর্ব্বী এই মহিলাটি সন্তানস্নেহের চাইতেও প্রাধান্য দেবেন হয়তো নিজের জেদকে, কাল্পনিক আত্ম-সম্মানকে।···প্রত্যেকের জীবনই যে ছাপার অক্ষরের মতো মাপা জায়গায় বাঁধা লাইনের নীচে দিয়ে চলতে পারে না, এ বোধ কি আছে তাঁর ?···

তা' সে বোধ ক'জনেরই বা আছে ? অপরের জীবনের অনিয়মকে নিজের অপমান বলে গায়ে মেখে ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জ্জন করাই তো মানুষের স্বধর্ম।

তবু—জ্যোতিঃপ্রকাশ নিজের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি করবে না।

"সৎকাজে নারায়ণ সহায়" কথাটা বর্ত্তমানকালে যে নেহাৎই অলীক প্রবাদ মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তা'তে আর সন্দেহ কি। তা' নয়তো এমন অদ্ভুত সময়ে মহালক্ষ্মীর দরবারে আবেদন নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে কেন জ্যোতিঃপ্রকাশ—যে সময়ে নিজের মাথার চুল নিজের হাতে ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মহালক্ষ্মীর।

নেহাৎ নাকি ধৈর্য্যচ্যুতিটা তাঁর একেবারে স্বভাববিরুদ্ধ, তাই বাইরে থেকে সাদা ধবধবে মুখখানা সিঁদুরের মতো রাঙা টক্‌টকে হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ছে না, কিন্তু তেমন অন্তরঙ্গ কেউ থাকলে হয়তো টের পেত যে,

ডাক ছেড়ে কাঁদবার বাসনা কতো দুর্দ্দাম হয়ে উঠেছে মহালক্ষ্মীর।

একফোঁট্টা টুনি পাকা খেলোয়াড়ের মতো এতো বড় একটা 'চাল্' দিয়ে গেল তাঁকে? মহালক্ষ্মীকে আর বুদ্ধি খাটাবার অবসরই দিল না?…উঃ, গতজন্মে মেয়েটা কী ঘোর শত্রুই ছিল তাঁর!

গোপনে গোপনে চেষ্টা-চরিত্র করে টুনির বোর্ডিংবাসের আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছেন, ঠিক সেই সময় কিনা হারিয়ে গিয়ে জব্দ করে গেল মহালক্ষ্মীকে? বারে বারেই টুনির কাছে তাঁর পরাজয়?

হৃদয়বৃত্তির বালাইহীন তরুবালা না হয় খস্‌খসে মোটা থানের আঁচল দিয়ে রগড়ে রগড়ে চোখদুটো একটু লাল করে ফেলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করছে না, কিন্তু মহালক্ষ্মীর তো দায়িত্ব আছে।

রোগা টিন্‌টিনে ছোট্ট একটা মেয়ে যদি ইচ্ছে করে এই রাক্ষসী নগরীর বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে যেতে চায়, তাকে খুঁজে বার করবে কে? অথচ সেই পণ্ডশ্রম করতেই হবে মহালক্ষ্মীকে, না করলেই নয়।

যতোই অবজ্ঞার বস্তু হোক—কুকুর-বেড়াল নয়, যে, হারিয়ে গেলে হারিয়েই গেল। হাত পা চোখ কান-ওয়ালা আস্ত একটা মানুষ যে! শাঁখের মতো সাদা পাতলা চামড়ার উপর থেকে দৃশ্যমান সূক্ষ্ম নীল শিরাগুলির মধ্য দিয়ে যে রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে—সে কি কুকুর-বেড়ালের রক্তের মতো মূল্যহীন, অবজ্ঞার?

তাই না এতো বিপদ মহালক্ষ্মীর?

আর ঠিক এই বিপদের সময়েই দরজায় এসে দাঁড়ালো জ্যোতিঃপ্রকাশ!

দুর্ভাগ্য কার?—জ্যোতিঃপ্রকাশের, না মহালক্ষ্মীর?

হারিয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে—খোঁজ পড়লো পরদিন সকালবেলা।

রাত্রের দিকে বিশেষ খেয়াল কারোরই হয়নি। 'অকূলে ভাসবার' রোমাঞ্চকর কল্পনায় বিভোর তরুবালা নিজের পাশের শূন্য স্থানটার দিকে একবার তাকিয়ে ভেবেছে—ভালোই হয়েছে যে, মেয়েটা বুঝে সুঝে আজ থেকেই ওপরে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে।…ভীষণ পাকা মেয়ে তো!… কিম্বা গিন্নীই হয়তো হুকুম করেছেন। যাক্, যা করেন ভগবান ভালোর জন্যেই।

খাবার সময়ে বামুনঠাকুর একবার মাত্র খোঁজ করেই নিশ্চিন্ত ছিল।…ক্ষুধার অভাবই নিশ্চয় টুনির রান্নাঘরে অনুপস্থিতির কারণ, এবং বাড়ীতে আজ আহার্য্যবস্তুর যে রকম প্রাচুর্য্য দেখা গিয়েছে, তা'তে অগ্নিমান্দ্যের কারণ সহজেই অনুমান করা চলে। কাজেই দু'বার ডাকবার দরকার বোধ করেনি সে।

আর কে খোঁজ করবে? নীরদা, না চাকরগুলো?

রাতারাতিই যদি বোর্ডিংএ পাঠানো চলতো তবেই হয়তো মহালক্ষ্মী নিতেন সন্ধান, অকারণে 'টুনি টুনি' করে ডেকে বেড়াবার সখ তাঁর নেই।

বাকী শুধু মণি,—শেষ অবধি যে দেখেছে টুনিকে। দেখেছে বটে—কিন্তু আর দেখবে না, এ কথা কি ভেবেছিল তখন? গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অন্ধকার আকাশের পানে বিনিদ্র নয়ন মেলে নিজের যে অজস্র সমস্যার কথা চিন্তা করেছে সে, তার মধ্যে কি টুনির স্থান ছিল?

মাঝরাত্রে উঠে তার খোঁজ করবার মতো বিশিষ্ট স্থান?

যাই হোক, ঘটনার চেহারাটা এই—

পোঁটলা-পুঁটলি বাক্স-বিছানা নিয়ে উতলা তরুবালা বিনোদের আশায় 'ঘর-বার' করতে করতে যখন বেলা প্রায় আটটার সময় সদ্য-আগত বামুনঠাকুরের মুখে বিশ্বাসহন্তা বিনোদের গত রাত্রে একা দেশে পালানোর সংবাদ শুনে 'পাথর' হয়ে বসে পড়েছে, তখন নীরদা এসে প্রশ্ন করলে—হ্যাঁগা দিদিমণি, তোমার মেয়েকে দেখছিনে কেন সকাল থেকে? গেল কোথায়?

তরুবালা মুখখানা যতটা সম্ভব বিকৃত করে উত্তর দিলে—যাবেন আর কোন্ চুলোয়, আছেন সেই গোঁসাঘরে বোধ হয়।

—না গো, মাধো যে বললে ওপরে নেই।

—নেই তো কি উড়ে গেল?

নীরদা দুই হাত উল্টে বললে—কি জানি বাবা, ওপর ছাদ পর্য্যন্ত তো দেখে এলো বললে।

তরুবালা বলে নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছে—এখন আবার এ কী জ্বালানে কথা! বিষতিক্তকণ্ঠে সে তাই যা উত্তর দেয় তার তাৎপর্য্য এই—'ভূতে খেয়ে গেছে' এটা বিশ্বাস করা যখন সম্ভব নয়, তখন ধরে নিতে হবে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে।

নীরদা গালে হাত দিয়ে বলে—হ্যাঁগা, গা-ঝাড়া দিয়ে বসলে চলবে? খোঁজ করতে হবে না? বাড়ীতে কিন্তু নেই বাপু, ঠাকুর তো বলছে কাল রাত থেকেই নাকি দেখতে পাচ্ছে না।

কথাটা তো ঠিকই বটে!

চট্ করে মনে পড়ে যায় তরুর, কাল রাত্রে টুনি তার কাছে শুতে আসেনি। সেটা পিসিমার নির্দ্দেশ মনে করেই আরো গ্রাহ্য করে সন্ধান করেনি তরুবালা। তাই তো—গেল কোথায় মেয়েটা!…

যেমন পোড়াকপাল তরুবালার, এতো ঝঞ্ঝাটের কিছুই পোহাতে হ'তো না, যদি হতভাগা বিনোদ এতোবড় শয়তানি না খেলতো তার সঙ্গে। এতোক্ষণে কোথায় দিব্যি ট্রেনে চড়ে বসেছে তরুবালা, তা' নয়, এখন ভাবতে বসো টুনি কোথায় গেল!

উঃ, মানুষ চেনা কী দায়! পথখরচার ছুতো করে ষোলো ষোলোটা টাকা নিয়ে গেছে হতভাগা!···নীরদার কাছে মুখ দেখাতে হবে মনে করেই যেন গঙ্গায় ডুবে মরতে ইচ্ছে করে তরুবালার।

নাঃ, যাবেই সে—একলাই যাবে। শ্বশুরবাড়ীর দেশে না হোক, যেখানে খুসী। মহালক্ষ্মীর তীব্র দৃষ্টির সামনে অহরহ নিজেকে গুটিয়ে গুটিয়ে আর থাকতে পারবে না চোরের মতো। যতো ঘেন্না তরুবালাকে!···সেই যে বলে না "দেবতার বেলায় লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা!"—এ হচ্ছে তাই।

যতোই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব হোক—বিরক্ত হয়েও উঠতেই হয় শেষ পর্য্যন্ত।

নীরদা পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মতো স্বরে আক্ষেপ-সূচক একটী শব্দ করে বলে—একেই তোমার মন-মেজাজ ভালো নেই, তার ওপর দেখ আবার কী বিপদ! কি জানি, যে-তোমার একরোখা মেয়ে, একলা বেড়াতে যাচ্ছো শুনে তেজ করে কোথাও চলে গেল না তো? অথচ তোমার সেই যাওয়া হ'লো না, কিছুই না···কী জোচ্চোর লোকটা তাই ভাবছি সেই থেকে। অ্যাঁ, মানুষকে আশা দিয়ে নৈরাশ করে শেষে টাকাগুলো নিয়ে ভেগে গেল?··· যতোই এখানে ক্ষীর-সর থাক্, তবু শ্বশুরের দেশ বলে কথা। দু' দিন দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই না হতভাগার এত খোসামুদি?···যাচ্ছো শুনে অবধি পিসি তো তোমার ওপর খড়্গহস্ত, আবার মেয়ে কি করে দেখ!···সাধে কি বলি তোমার পেটের মেয়েই তোমার পরম শত্তুর তরুদি!···

—বক্ বক্ করিসনে নীরদা, মাথা আমার জ্বলে যাচ্ছে!—বলে উঠে যায় তরুবালা, সারা বাড়ীটা দেখেও বেড়ায়!··· কিন্তু কোথায় টুনি? অবশেষে মহালক্ষ্মীরও টনক নড়ে!··· আরক্তমুখে তিনি চাকর ঠাকুর সকলকে নির্দ্দেশ দেন অনুসন্ধান করতে···মণি শুম্ভিত হয়ে বসে থাকে কাঠের পুতুলের মতো···রান্নাখাওয়ার মতো অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাজটাও মুলতুবী থাকে কিছুক্ষণের জন্য···চির-অবজ্ঞাত টুনি হঠাৎ কেমন যেন মূল্যবান হয়ে ওঠে!···

কিন্তু টুনির চিহ্ন নেই। হয়তো এই মূল্যটুকু বজায় রাখতে এ সংসারে আর কোনো দিন উঁকি মারবে না সে।

১৩

এমনি সঙ্কট-মুহূর্ত্তে দরজায় এসে দাঁড়ালো জ্যোতিঃপ্রকাশ! —অথবা, সঙ্কট নয়—জ্যোতিঃপ্রকাশের পক্ষে লগ্নটা শুভ।

সাধারণ সুস্থ সময়ে দোতলায় বসে খবর পেলে মহালক্ষ্মী তাকে বাড়ীর দরজার এদিকে মাথা গলাতে দিতেন কিনা সন্দেহ, ভৃত্যকে দিয়ে পত্রপাঠ বিদায় দিতেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ নিজেই তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় বাইরের দরজার সামনে···উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন বিশুকাকার, ছোকরা চাকর হীরালালকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে। মুখোমুখি হয়ে গেল তাঁর সঙ্গেই প্রথম।

প্রথমটা যেন চিনতেই পারছিলেন না মহালক্ষ্মী, চোখটা ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল।···কী আশ্চর্য্য সুন্দর চেহারা হয়েছে জ্যোতিঃপ্রকাশের! কী বলিষ্ঠ দীর্ঘায়ত দেহ! চোখের দৃষ্টিতে কী উজ্জ্বল বুদ্ধির দীপ্তি! কী অকুণ্ঠ সতেজ ভঙ্গী!···হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতোই যে।

শুধু আশ্চর্য্য সুন্দরই নয়—আশ্চর্য্য রকমের বেহায়াও। দিব্যি অনায়াসে এসে পায়ের ধূলো নিলে মহালক্ষ্মীর! আয়াস যেটুকু হ'লো সে শুধু বিদেশী সজ্জায় সজ্জিত দেহটাকে দেশী প্রথায় হেঁট করতে।

চমক ভাঙলো পায়ে হাত পড়তে। ঈষৎ পিছিয়ে গিয়ে নীরস গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন মহালক্ষ্মী—তুমি এখানে কি মনে করে?

গাড়ীতে আসতে আসতে নিজেকে যে বেশ একটু তালিম দিয়ে এসেছে জ্যোতিঃপ্রকাশ তা' বোঝা যাচ্ছে, কারণ তখনকার সেই উদ্বিগ্ন অস্থির ভাব আর নেই। থাকলেও অন্তত বাইরে থেকে প্রকাশ্য নয়।

পরিচিত ভঙ্গীতে হাতের টুপিটা দেয়ালের একটা হুকে আটকে রেখে, চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মৃদু হেসে উত্তর দেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ—অনেক কিছুই তো মনে করে এসেছি মাসীমা, এখন আপনি শুনতে চাইলে হয়!

—আমি শুনবো এই আশা করেই তবে এসেছো তুমি?

—তা' আশা নিয়েই তো জগৎ।

—কিন্তু তোমার কথা শোনবার মতো সময় আমার নেই, সেটা জেনে রাখাই ভালো বোধ হয়।

—কিন্তু বলতে যে আমাকে হবেই মাসীমা! 'শুনবো না' বলে তাড়ালে চলবে না, পরে না হয় বিবেচনা করে তাড়াবেন।

মহালক্ষ্মী নিষ্করুণ কঠিনমুখে বললেন—সহের যে একটা সীমা আছে, সেটা তুমি ভুলতে পারো জ্যোতিঃপ্রকাশ, আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।

—আমি ক্ষমা চেয়ে নেবোই প্রতিজ্ঞা করে এসেছি মাসীমা!

—ক্ষমা? আশ্চর্য্য! দেখছি—অনেক দেশ ঘুরে এসে তোমার আর কি বেড়েছে জানি না, দুঃসাহসটা যথেষ্ট বেড়েছে।···কিন্তু শুনে রাখো জ্যোতিঃপ্রকাশ—যদি জগতের সবাইকে ক্ষমা করতে পারি, তো পারি না আমার জীবনের শনিকে···তোমার গাড়ীটা এখনো বাইরে আছে বোধ হয়?

বিদায় করে দেবার এই পরিষ্কার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জ্যোতিঃপ্রকাশ জোর করে একটু হেসেই বলে—না মাসীমা, ছেড়ে দিয়েছি গাড়ীটাকে। এসেই চলে যাবো বলে তো আসিনি, মণির সঙ্গে যে একবার দেখা করতেই হবে।

—কি? কি বললে?—মহালক্ষ্মী ক্রুদ্ধকণ্ঠে চাপা গর্জন করে ওঠেন—কি বললে জ্যোতিঃপ্রকাশ? আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে লজ্জা হ'লো না তোমার?

—কিন্তু একটু ভালো করে ভেবে দেখুন মাসীমা, যে ভুল এখনো শোধরাবার বাইরে চলে যায়নি, সেটা শোধরাবার সুযোগ কেন দেবেন না? কেবলমাত্র আপনার একটু সম্মতির বদলে—

—'কেবলমাত্র আমার'—তাই বা তুমি নিশ্চিত ধরে নিচ্ছো কোন্ সাহসে বলতে পারো? মণি আর তোমার মুখ দেখবে?

হঠাৎ ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসির আভাস দেখা দেয় জ্যোতিঃপ্রকাশের, সেটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে দিতে বলে—যদি দেখে?

—না, দেখবে না, দেখতে পারে না, আমি দেখতে দেবো না—

বড়ো বেশী উত্তেজিত দেখায় মহালক্ষ্মীকে। তাঁর স্বভাবের ব্যাতক্রম এটা।

—দেবেন না—সেইটাই হয়তো প্রকৃত কথা, তবু আপনাকে আবারও অনুরোধ করছি মাসীমা—

মহালক্ষ্মীর পক্ষে আর ধৈর্য্যের বাঁধ রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। নাঃ, আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়। ভদ্রতার আবরণটুকু ফেলে দিয়ে "দূর হও" কথাটাই বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন, থামতে হোলো।—ঘটনাস্থলে বিশুকাকা এসে হাজির, পিছনে হীরালাল।

বিশুকাকা প্রথমটা ঢুকেই তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি আমলে না এনে 'হন্তদন্ত' অবস্থাতেই বলে ওঠেন—ব্যাপার কি লক্ষ্মী? মেয়েটা হারিয়ে গেল মানে কি? কি করে হারালো? কখন হারালো? গিছলো কোথায়? কার সঙ্গেই বা গিছলো?

মহালক্ষ্মী এতগুলি কথার একটিও উত্তর না দিয়ে জ্যোতিঃপ্রকাশকে উদ্দেশ করে গম্ভীর ভাবে বলেন—আচ্ছা, তুমি এখন এসো গিয়ে, ব্যস্ত রয়েছি।

বিশ্বনাথবাবুর যেন এতক্ষণে চৈতন্য হয়, সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার জ্যোতিঃপ্রকাশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে কণ্ঠস্বরকে খাদে নামিয়ে বলেন—ছেলেটি কে লক্ষ্মী? দেখিনি তো কোনো দিন?

—না, এ বাড়ীতে এর আগে আসেনি কোনো দিন—মহালক্ষ্মী নীরব নিস্পৃহকণ্ঠে উত্তর দেন,—ছিল না এ দেশে। ওঁর বন্ধুর ছেলে।

বিশ্বনাথ যেন মস্ত ভরসা পান, তাড়াতাড়ি বলেন—তাই নাকি! তা'হলে তো ভালোই হ'লো। থানায় ডায়েরি-টায়েরি করা হ্যাঙ্গেমে ব্যাপার, এ ছেলেটি তো··· বেশী ব্যস্ত আছো না কি বাবা?

জ্যোতিঃপ্রকাশ অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে স্মিতহাস্যের সঙ্গে বলে—মোটেই না। আনন্দের সঙ্গেই আপনার সাহায্য করতে পারি, কিন্তু ঘটনাটা কি? কারো ছেলেমেয়ে কিছু হারিয়ে গেছে মনে হচ্ছে—

—বিলক্ষণ, কারো কি? লক্ষ্মীর ভাইঝির মেয়ে! আহা, বেচারা বিধবার একমাত্র সন্তান!···কিন্তু গেল কি করে বল দিকি লক্ষ্মী? কোন্ রাস্তা বরাবর হারিয়েছে সেটা জানাতে হবে তো থানায়? গিয়েছিল কোথায়?

আঃ, জীবনে যদি আর বিশুকাকার মুখ দেখতে না হ'তো মহালক্ষ্মীকে! কুক্ষণে তিনি কলকাতায় এসে এঁর শরণ নিয়েছিলেন! শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে উপকারের চাইতে অপকারই বেশী হচ্ছে এঁদের কর্ত্তা-গিন্নীর দ্বারা।

তবু কথার উত্তর দিতেই হবে। সভ্যতা ভব্যতা সমাজ শৃঙ্খলা—এদের দাবী সর্ব্বাগ্রে, এদের নৈবেদ্য না যোগালেই নয়।···অতএব বলতেই হয়—যায়নি কোথাও বাড়ী থেকে, হঠাৎ সকালে উঠে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু থানায় ডায়েরি করা কি খুব বেশী শক্ত বিশুকাকা? তুমি পারবে না?

—সে কি কথা! পারবো না তা' তো বলছি না। এঁর যদি অসুবিধে হয় তো কাজ কি?···তবে—দু'-একজন বেশী লোক থাকলেই ভালো হ'তো ভেবে বলছিলাম। কলকাতার মতো দুর্দ্দান্ত সহর—বাচ্ছা একটা মেয়ে!···আচ্ছা, তা' হলে তো পালিয়েই গেছে মনে হচ্ছে। কেন বল তো? মায়ের কাছে গালমন্দ কিছু খায়নি তো? অভিমানে—

মহালক্ষ্মী রূঢ় কঠিন কণ্ঠে বলেন—মায়ের কাছে গালমন্দ না খেয়ে কে কবে মানুষ হয়েছে বিশুকাকা? তা বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছে ক'টা ছেলেমেয়ে?···মাথাটাই একটু কেমন কেমন মেয়েটার।

—আহা, অমন মেয়েটি! সরস্বতী প্রতিমাখানির মতো দেখতে। যা বলেছ ঠিক—মাথাটাই বোধ হয় একটু ইয়ে, নইলে—এই তো এতো আসি যাই, কই কখনো কথাবার্ত্তা বলতে শুনিনি। যাক্, পরিষ্কার করে সব ব'লে দাও দিকি লিখে নিই।

—বলবার কি আছে? তুমি তো দেখেছো—

—আহা তা' তো দেখেছি। তবু—বয়েস কতো, নাম কি, বাপের নাম, পালাবার কারণ—সব বিষয় না জানলে—

—তবে একটু বোসো তুমি, আবার মাথাটা কেমন করছে।—বলে জ্যোতিঃপ্রকাশের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে হঠাৎ পিছন ফিরে চলে যান মহালক্ষ্মী।

সে দৃষ্টি যেন জ্যোতিঃপ্রকাশের ধৃষ্টতা এবং নির্লজ্জতাকে চাবুক মেরে যায়।···জ্যোতিঃপ্রকাশ অবিশ্যি সত্যিই এতোটা নির্লজ্জ নয়, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিমাত্রেই চলে যেতো সে, কিন্তু বিশুকাকা এমন একটা অদ্ভুত আকস্মিক "ধুয়ো" নিয়ে এসে হাজির হলেন যে চট করে চলে যাওয়া চলে না।···তা' ছাড়া তিনি যে আবার জ্যোতিঃপ্রকাশকে মুরুব্বি ঠাওরে বসছিলেন।···কথার মাঝখানে যাবেই বা কি করে গট্ গট্ করে?

অবিশ্যি তেমন করে মহালক্ষ্মী যেতে পারেন, গেলেনও! আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই তাতে। মেয়েরা কে কবে আদব-কায়দার ধার ধারে?

বিশুকাকা দীনদুঃখী নয়, মহালক্ষ্মীর কাছে হাত পাততেও আসেন না, তবু মহালক্ষ্মীকে রীতিমতো ভয় করেন তিনি, অকারণেই করেন। কাজেই তাঁর অহেতুক মাথা ধরার সংবাদে বিব্রতভাবে বলেন—তবে না হয় একটু থাক্।··· ইয়ে—যতো দেরী হয়ে যাবে ততোই মুস্কিল কিনা—আচ্ছা, তুমি একটু না হয় সুস্থ হয়ে—

কিন্তু একটা হারানো শিশুকে খুঁজে বার করার মতো মারাত্মক প্রয়োজনের চাইতেও একজনের সৌখীন রোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দেওয়া যে নিতান্তই দৃষ্টিকটু, এটা অনুভব করে জ্যোতিঃপ্রকাশের সামনে বেচারা বুড়ো ভদ্রলোক কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তাই আর একবার পূর্ব্বকথারই পুনরাবৃত্তি করে কতকটা সহজ হতে চেষ্টা করেন —আহা, বিধবার একমাত্র সন্তান! আশ্চর্য্য! পালিয়ে গেল কি করে!

কৌতূহল হলেও—এ বাড়ীতে কোনো কিছুতে কৌতূহল প্রকাশ করা জ্যোতিঃপ্রকাশের পক্ষে শোভন হয় না নিশ্চয়ই, এবং এ রকম অবাঞ্ছিতের বেশে দাঁড়িয়ে না থেকে চলে যাওয়াই উচিত, তবু কেন প্রস্থানোদ্যত গতিকে আবার ফিরিয়ে নিতে ইতস্তত করে?

এ বাড়ীর মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা এখন যতো কঠিন, ভবিষ্যতে আর এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙানো তার চাইতেও কঠিন বলেই কি? একবার দেখা হয় না মণির সঙ্গে? এক মুহূর্ত্তের জন্যে? কথা কইবার সুযোগ না হোক—শুধু চোখোচোখি? একটি দৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়েই কি সংগ্রহ করা যায় না সমস্ত সংবাদ?

জ্যোতিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে মণি কি ভাব পোষণ করছে—সেটা কেবল মহালক্ষ্মীর কণ্ঠেই শুনে চলে যেতে হবে? এইটুকুই কি চেষ্টার শেষ জ্যোতিঃপ্রকাশের?

কী অদ্ভুত জেদী স্ত্রীলোক এই মহালক্ষ্মী! একটা আকস্মিক বিপদে যেটুকু ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটা মেয়েদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক, সেটুকুও নেই?···এই তো এখুনি—বিপদের মধ্যে দিয়েই সব সহজ হয়ে যেতো···জ্যোতিঃপ্রকাশ নিজের গাড়ীখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়তো রাস্তায়—থানায় থানায় খবর নিয়ে বেড়াতো—খবর দিতো খবরের কাগজের অফিসে অফিসে, রেডিও ষ্টেশনে, পুরস্কার ঘোষণা করতো মোটা টাকার,—চষে ফেলতো কলকাতা সহর।

ছোট্ট একটা হারিয়ে-যাওয়া মেয়েকে খোঁজার উপলক্ষ করে খুঁজে পেতো ও বাড়ীতে নিজের হারিয়ে যাওয়া স্থান···

কিছুই হবে না!

বিবরণটুকু দিয়ে চেষ্টার সুবিধাটুকু করে দিতেও নারাজ মহালক্ষ্মী, কারণ তাঁর নাকি "মাথা কেমন করছে—"! বিধবা ভাইঝির একমাত্র সম্বলটুকু 'খোওয়া' যেতে বসার দুঃখে 'মনকেমন' নয়···মূল্যবান 'মাথা', ধনী গৃহিণীদের যেটা রঙের তাস। অসুবিধাকর অবস্থায় পড়লেই যেটা তুরুপ করে জিতে যাওয়া চলে।

—আমি তাহলে যাই।—কুণ্ঠিতহাস্যে বিশ্বনাথ বাবুকে উদ্দেশ করে এইটুকুমাত্র বলে জ্যোতিঃপ্রকাশ এবার যথার্থই যাবার জন্য পা বাড়ায়।···

—এসো বাবা! দেখি—আমিই একা যা পারি—ব্যাপারটা কি, এ সব কাজে এক-আধটা সঙ্গী হলে সুবিধে হয়। বাড়ীতে তো থাকবার মধ্যে দুটো ভূতের মতন চাকর—

—কি বলবো বলুন, আমি যে এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

—বিলক্ষণ! সে কি কথা, তোমার কি দোষ? লক্ষ্মীরই যে এক একসময় কি খেয়াল চাপে—মানে আর কি ভাবনাচিন্তায় মনমেজাজ ঠিক থাকেও না সব সময়।···কি আর করবে তুমি, এসো তবে।—

এই ছেলেটির সামনেই যেন মহালক্ষ্মী মুখ খুলতে নারাজ এমনি একটা সন্দেহ উঁকি মারে বিশ্বনাথবাবুর মনে। কে জানে—দেখতে দেবকান্তি হলেই যে মানুষ দেবতুল্য হবে এমন কিছু কথা নেই, কেমন ছেলেটা কে জানে।···হয়তো

কোনো কারণে এর কাছ থেকে উপকার নিতে অনিচ্ছুক মহালক্ষ্মী। বলে ফেলে বোকামিই হয়েছে বিশ্বনাথবাবুর।

কিন্তু পথে বেরিয়েই কি সোজাসুজি চ'লে যাবে জ্যোতিঃপ্রকাশ? একবার—অভদ্রতা হলেও—একটিবার অন্তত চোখ তুলে দেখবে না দোতলার বারান্দার দিকে?··· কেউ সেখানে অপেক্ষা করছে কিনা দেখতে? দেখবে না—জ্যোতিঃপ্রকাশের জন্যে উদ্যত হয়ে আছে বজ্রগর্ভ দুটি চোখের অগ্নিদৃষ্টি, না সকরুণ মমতায় স্নিগ্ধ আনম্র দুটি আঁখিপল্লব?

একবার···দু'বার···তিনবার!

বারবার পায়চারি করতে হয় জ্যোতিঃপ্রকাশকে··· বিপরীত দিকের ফুটপাথে···অকারণে কিনতে হয় একটা পানের দোকানের বাজে মার্কা সিগারেটের প্যাকেট···আর শেষ মুহূর্ত্তে—হতাশ হয়ে ফিরে যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সার্থক হয়ে ওঠে সমস্ত চেষ্টা।···

না—অগ্নিবর্ষী নয়···মমতায় করুণ নয়···অপরাধে কুণ্ঠিতও নয়, আবেদন-ব্যাকুল ব্যগ্রবিস্ফারিত দুটি চোখ!···

কিন্তু চোখ কি কণ্ঠের চাইতে কম মুখর? ভাষার আহ্বানের চাইতে কম জোরালো কালো চোখের নিঃশব্দ আহ্বান? কেবলমাত্র আত্মসম্মান বাঁচাবার অজুহাতে অনায়াসে উপেক্ষা করা চলে এই আহ্বান?···

মহালক্ষ্মীর চেয়ে তো তবে জ্যোতিঃপ্রকাশকে কিছু বেশী বুদ্ধিমান বলা যায় না? তিনিও তো তাঁর নিজের হিসেবে আত্মসম্মান বজায় রাখতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন··· জলাঞ্জলি দিতে বসেছেন হৃদয়ধর্ম্মকে।···

ও-ফুটপাথ থেকে এদিকে আসতে আসতে হঠাৎ আনন্দে অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর।···আশ্চর্য্য, এটা এতোক্ষণ মনে পড়েনি?···এমন প্রকৃষ্ট একটা কারণ রয়েছে হাতে? টুপিটা যে এখনো ঝুলে মরছে মহালক্ষ্মীর দালানের দেয়ালে! মহালক্ষ্মী তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন বলে যে টুপিটা বিসর্জ্জন দিয়ে আসবে তার মানে কি? বরং সেই জন্যেই আরো নিয়ে আসা দরকার।···

অতএব গটগট করেই আবার ঢুকে পড়া যায় ও-বাড়ীতে, যে-বাড়ী বাইরের কপাট বন্ধ করে দিয়েও অন্তরের বাতায়ন খুলে ডাক দেয়।

কিন্তু এমন একটা নাটকীয় দৃশ্যের জন্য কি প্রস্তুত ছিল জ্যোতিঃপ্রকাশ, কপাট ঠেলবার সঙ্গে সঙ্গেই যেটা দৃষ্টিগোচর হলো?

"—তুমি চলে যাচ্ছো?···বারেবারেই দায়িত্ব এড়িয়ে পালাবে তুমি?···তা' হবে না, টুনিকে খুঁজে বার করতেই হবে তোমায়···সব দায়িত্ব তোমার···এ হারিয়ে গেলে আমি বাঁচবো না···ও বড়ো দুঃখী—বড়ো অভিমানী—"

ঝড়ে আছড়ানো লতার মতো প্রায় পায়ের ওপর যে এসে লুটিয়ে পড়ে, নিতান্তই তাকে কুড়িয়ে তুলতে হয় জ্যোতিঃপ্রকাশকে, কারণ দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা বা ক্ষমতা তার আর ছিল না।

মহালক্ষ্মী বোধ করি তখন "একটু সুস্থ হয়ে" বিশুকাকাকে বসিয়ে নির্জ্জনে গুছিয়ে-গাছিয়ে বিবরণী লেখাচ্ছেন টুনির··· নাম, ধাম, বয়স, পিতৃপরিচয়।

··· ··· ···

কিন্তু নিজের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে দিয়ে যে চলে যেতে চায়, কৃত্রিম পরিচয়ের বেড়াজালে ঘিরে আবার তাকে ধরে আনবে কে?···কোন্ সংবাদপত্র-পাঠক অসংখ্য-বিজ্ঞাপন-কণ্টকিত সংবাদপত্রের একটি পৃষ্ঠা থেকে গুটিকয়েক শব্দ আহরণ করে নিয়ে পথে পথে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেড়াবে?···কে কান দিয়ে শুনবে বেতার-ঘোষকের হৃদয়স্পর্শহীন নীরস কণ্ঠের একঘেয়ে ঘোষণা—"মেয়েটি লম্বায় সাড়ে তিন-ফিট···গায়ের রং ফরসা···মুখের গড়ন সুশ্রী··· মাতৃভাষা বাংলা···"?

নিষ্ফল আবেদন অবশেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে থামে।··· কিন্তু মাতৃহৃদয় কি কোনো দিন ক্লান্ত হয়? ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়?

তা' যায় না—দুটি ব্যাকুল চোখের সন্ধানীদৃষ্টি···পথেঘাটে ···হাটেবাজারে মেলার ভিড়ে···স্কুলের দরজায়···দশ বছর ধরে···দশ বছর পরেও—খুঁজে বেড়ায় সাত বছরের সেই মেয়েটাকে।

এই দীর্ঘ ব্যবধানে যে রূপান্তর ঘটছে, তার, আধময়লা নীল ছিটের সেই ফ্রকটা যে চিরদিন অবিকৃত থাকা সম্ভব নয়—এ খেয়ালও হয় না।···

শুধুই তো রূপান্তর নয়···টুনির মতো গৃহবঞ্চিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত শিশুদের যে ঘটে জন্মান্তর!···

সে জন্ম কারো হয়তো নামগোত্রহীন অন্ধকারের আড়ালে ···কারো বা নূতন পরিচয়ের গৌরবোজ্জ্বল মহিমায়।

কে বলতে পারবে কোথায় ছিল সেই জন্মাগার?

পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কে টুনিকে দিলো আশ্রয়? কে বাঁধলো আবার মিথ্যা পরিচয়ের নূতন ফাঁসে?

কে বলবে কবে কোন্ ফাঁকে মৃত্যু ঘটলো টুনির? কে খোঁজ রেখেছে—মহানগরীর ধূলিধূসর পথে লক্ষ পদচিহ্নের নীচে কখন্ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো ছোটছোট দু'খানি পায়ের চিহ্ন?···

টুনির কাহিনীকারক লেখনী পেলো ছুটি, বাঁচলো নিঃশ্বাস ফেলে।

১৪

যবনিকা উত্তোলন করলাম—মফস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরের নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি বালিক-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।...

শীতটা এবার পড়েছে যেন সংহারমূর্ত্তিতে। ইতর-ভদ্র সকলের মুখে এক কথা—এতোখানি বয়সে এতো শীত কখনো দেখিনি। বন্ধুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে—বাজার দরের মতো মুখরোচক প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তে আলোচনা চলছে শীতের অসহনীয়তা সম্বন্ধে।

এ রকম বড়োমানুষী কাণ্ড যে 'কোঁচার খুঁট আর শাড়ীর আঁচল গায়ে দেওয়া দেশে'র জন্যে নয়, সে কথা কে না বলবে! ...অবিশ্যি বাংলাদেশের বাইরে সবাই কি আর রাজা-মহারাজা?...দুর্দ্দান্ত 'পশ্চিমী শীত' সামলাতে কোঁচার খুঁটের মতো তুচ্ছ বস্তুও জোটে না, এমন দেশও বিরল নয়... 'কৌপীনবন্ত ভারত'!

তবু যে দেশে যা প্রবল তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার ব্যবস্থাও আছে সে দেশে। বাংলাদেশে কে কবে জ্বলন্ত আগুনের মালসা কোলে করে বেড়াতে পারবে? কাজে কাজেই--এই নিরুত্তাপ আকাশ, বিষাদাচ্ছন্ন মেঘলা দুপুর আর কুয়াশাচ্ছন্ন অকাল সন্ধ্যা—অতি উৎসাহী কর্মী ব্যক্তিকেও প্রায় জড়পদার্থে পরিণত করতে বসেছে।...

ভাগ্যবান সম্প্রদায়ের কাছে হয়তো শীতের দাঁতটা কিছু ভোঁতা। আরামের এবং আহার্য্যের উপকরণ-প্রাচুর্য্যে তাঁদের কাছে এই দুর্দ্দান্ত কালটাও সহনীয় তো বটেই, হয়তো বা লোভনীয়।

কিন্তু সংসারে দুর্ভাগা জীবের সংখ্যাই যে বেশী! দেশের বারো আনা অংশই তো জুড়ে বসে আছে এই 'ওঁচা'র দল। বাঘের দাঁতের চাইতে যে শীতের দাঁতটা কিছু কম ধারালো, এ বিশ্বাস এবারে আর তাদের নেই।

তবে 'ধনী এবং নির্ধন' এই উভয় সম্প্রদায় ছাড়াও আর একটি সম্প্রদায় আছে—শীত যাদের সহজে কাবু করতে পারে না। সেটি হচ্ছে—শিশু-সম্প্রদায়। এ হেন শীতেও তাদের শীতবস্ত্রের প্রাচুর্য্য দেখলেই মাথা গরম হয়ে ওঠে এবং 'ঠাণ্ডা লাগা'র বিভীষিকাকে তারা আমলও দেয় না। শীত বলে কোনো কিছুতে উৎসাহের অভাব দেখবে না তাদের।

এমনি একটি দল বিপুল উৎসাহে আজ জমা হয়েছিল তাদের স্কুল-গ্রাউণ্ডে।...

ক্ষুদ্রকায় বালিকা-বিদ্যালয়। অষ্টম শ্রেণীর উপর আর শ্রেণী নেই, তবু—সহরতলীর এই অঞ্চলটায় এর চাইতে ভালো স্কুলও তেমন নেই। বাড়ীটা নতুন, অবস্থা ভালো, 'দিদিমণি'রা শিক্ষিতা, সর্ব্বোপরি—পুরস্কারের বন্দোবস্তটা বেশ হৃদয়গ্রাহী।

আজ এই স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী উৎসব। ছোট মেয়েগুলির উৎসাহের আর অন্ত নেই। যার যা কৃতিত্ব, শুধু যে তারই পুরস্কার পাওয়া যাবে তা তো নয়—অনেক দিনের অনেক রিহার্শালের পর 'কৃষ্ণ-সুদামা' ও 'ধ্রুবের তপস্যা' অভিনয় হবে।...এ ছাড়া নাচগান, মুক অভিনয় ইত্যাদি কতো কি কাণ্ড!...

যার যার ভাগে অভিনয়ের অংশ রয়েছে তাদের যদিও আনন্দের চাইতে আতঙ্কই বেশী, তবু উৎসাহটা ষোল আনা। কেউ কেউ বাড়ী থেকে নিয়ে আসা সিল্ক বেনারসী সোনাদানা সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। কেউ বা সভার সৌষ্ঠববৃদ্ধির সহায়তা-কল্পে ফুলের তোড়া, ফুলদানী, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি দিদিমণিদের হাতের কাছে একটু-আধটু এগিয়ে দিয়ে ধন্য হচ্ছে।

সুধু হুল্লোড় করে বেড়াতে পটু এমন দলই অবশ্য বেশী। এর মধ্যে রেবা বলে একটি মেয়ে, 'কোনো দলেই নেই' এমন একটি মেয়েকে কোথা থেকে যেন আবিষ্কার করে টানতে টানতে নিয়ে এসে হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে—দেখেছিস ভাই মজা? লীলার পার্ট রয়েছে—অথচ বসে আছে চুপচাপ।... এই, তুই না ধ্রুব সাজবি?

লীলা তার কবলমুক্ত হবার মৃদু চেষ্টা করে বলে—সাজবো না কি বলেছি?...এখুনি তো হচ্ছে না?

—ও মা, তাই বলে হাঁড়িমুখ করে সিঁড়িতে বসে থাকবি?

আর একটি পরিহাসরসিকা কৃত্রিম গম্ভীরভাবে বলে—এই, ও বোধ হয় এখন থেকেই তপস্যা করছিল...তাই না লীলা?... 'পদ্মপলাশলোচন হরি'কে দেখতে টেখতে পেলি না কি?

—হ্যাঁ পেয়েছি। হ'লো তো?

—নাঃ, লীলার আজ দেখছি বেজায় রাগ! বাবা, তবু যদি না পাঁচ-পাঁচটা প্রাইজ পেতিস। আমার যদি তোর মতো হ'তো, উঃ! বাবা বলে দিয়েছিলেন—"যদি একটাও প্রাইজ পাস তো একটা ফাউণ্টেন পেন কিনে দেবো।" একটা—তাই হ'লো না ভাগ্যে। আমাদের মতো ঢেঁকির আর কি হবে?

লীলা হেসে ফেলে বলে—নিজেকে ঢেঁকি না বলে ভালো করে পড়লেই হয়।

—ঈস্, তা আর নয়?...দিনের মধ্যে বাইশ ঘণ্টা ধরে পড়লেও কিছু হবে না আমার—বুঝলি? মাথায় যে স্রেফ্ গোবর ভরা আছে। বাবা বলেন—

—তোর বাবা কি বলেন তাই শুনে শুনে কান পচে গেল।—বিরক্ত লীলা এই সভ্য মন্তব্যটি ব্যক্ত করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যায়।

—দেখেছিস ভাই কী অসভ্য?

লীলার ব্যবহারে আহত রেবা পার্শ্ববর্তিনীর কাছ থেকে সহানুভূতির আশায় প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়েই কথাটা বলে।

অনিলা মেয়েটি শুধু যে পরিহাসরসিকা তা' নয়—নিরপেক্ষ সমালোচকও। তাই তরুণীদের মতোই মুখ বঁকিয়ে বলে—শুধু অসভ্য? দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না মেয়ের!… পাঁচ-পাঁচটা প্রাইজ পেয়েছেন, দিদিমণিরা বেশী বেশী ভালোবাসেন, তার ওপর আবার 'সোন্দর'!

রেবা যদিও ইতিপূর্ব্বে বান্ধবার ব্যবহারে আহত হয়েই অনুযোগ তুলেছিল, তবু অনিলার কথায় বলে—আসলে কিন্তু অহঙ্কারও নেই ভাই, বরং সুখ্যাতি করলেই রেগে যায়। একটু যেন পাগল পাগল।

বোঝা গেল—নিতান্তই সে লীলার অন্ধ ভক্ত।

—হ্যাঁ, পাগল না আরো কিছু! পাগল হ'লে আর এতো ভালো করে পড়তে হয় না। লতিকা দিদিমণি তো বলছিলেন—ওর "আমি কি হতে চাই" এই রচনাটার জন্যে ফুল মার্কের চাইতেও নাকি বেশী নম্বর দেওয়া উচিত ছিল। কাগজে নাকি ছাপিয়ে দেওয়া যায়।…পাগলে বুঝি পারে? স্রেফ্ দেমাক!

—কিন্তু 'গুড্ কন্‌ডাক্টে'র প্রাইজটাও তো ওই পেলো?

—পাবে না কেন? ক্লাশে ভিজে বেড়াল সেজে বসে থাকতে পারলে সকলেই পেতে পারে।

—এই রে—অনিলা লীলাকে হিংসে করছে।—'সোনালী' বলে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে—অনিলা খালি লীলার নিন্দে করে। ও তো বাপু শান্তশিষ্ট আছেই। কই, এতো দিন ভর্ত্তি হয়েছে, কারুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

—কথাই কয় না, তা' ঝগড়া!

—বাঃ, কেন কথা কইবে না—রেবা বলে—এক-একদিন তো কতো গল্প করে। খুব গরীব বলেই তাই একটু গম্ভীর। দেখিস না—একটা জামা পরে রোজ আসে?

—তোর তো অনেক জামা আছে, একটা দিলেই পারিস।—বলে অনিলা মুখ বাঁকায়।

—ঈস্, দিলে নেবে কি না! একটা পেন্সিলই নেয় না।

সেদিন ছোট একটুখানি পেন্সিল দিয়ে কষ্ট করে লিখছিল বলে কতো সাধলাম আমার একটা পেন্সিল নিতে, কিছুতেই নিলো না।

—তবু সাধিস্ তো? বেহায়া!—বলে অনিলা যে ভাবে হাসে, তা'তে তাকে বারো বছরের না বলে বাইশ বছরের বললেও অবিশ্বাস হয় না। রেবা কিন্তু বাস্তবিকই ভালোবাসে লীলাকে। নিজে সে বড়লোকের মেয়ে এবং আদুরে মেয়েও, তবু গরীবের মেয়ে লীলার খোসামোদ করে মরা তার এক কাজ। অবিশ্যি বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে 'খোসামোদ' কথাটার মানে হয় না কিছু, কিন্তু লীলা যে বড়ো বেশী নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ আর গম্ভীর। হয়তো রেবাকে সেও ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসলেও নিজের স্বভাব তো বদলাতে পারে না। অতএব রেবার ভাগ্যেই নতিস্বীকার।

বালিকাসুলভ চাঞ্চল্যের অভাব থাকলেও অন্য অনেক গুণ যে আছে লীলার, এ কথা কে অস্বীকার করবে? লেখাপড়া, সেলাই, ছবি আঁকা, রান্না ইত্যাদি সব কিছুতেই প্রথম হয়ে এবং সেই সঙ্গে সৎ স্বভাবটা যোগ করে পাঁচ পাঁচটা পুরস্কার অর্জ্জন করেও অভিনয়নৈপুণ্যের গুণে আরো গোটা তিনেক পুরস্কার ভবিষ্যতের খাতায় জমা রইলো তার।

গুণগ্রাহীরা আকৃষ্ট এবং ঈর্ষাপরায়ণারা ঈর্ষায় কাতর হবে, এ আর বিচিত্র কি? তাই অনিলার দল পাশ কাটিয়ে বেড়ালেও অভিনয়ের শেষে লালার ভাগ্যে অভিনন্দন জুটলো কম নয়।

যারা সত্যি হিংসে করে না, তারা বারবার বলতে লাগলো—তোর ওপর কিন্তু খুব হিংসে লীলা। কেউ কেউ প্রশংসার পাশে এ কথাটিও যোগ করতে ছাড়লো না—লীলার মতো এতো বেশী রূপ থাকলে অভিনয় ভালো না হলেও চলে।

বাস্তবিকই মেয়েটি যে উপযুক্ত বয়সে নিখুঁৎ সুন্দরীর পর্য্যায়ে পড়বে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আদর, সম্ভ্রম, প্রশংসা আর অভিনন্দনের ভারে ভারাক্রান্ত মুখচোরা মেয়েটা যে কি অবস্থায় স্কুলের গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, তা' সেই জানে। এখন একটু একলা হতে পারলেই বাঁচে সে।

নিতান্ত গরীবের ঘরের মেয়ে, আদরের আতিশয্যও এমন কিছু নেই বাড়ীতে। অবহেলা বরং সহনীয়—পরিচিত বস্তু, কিন্তু সম্মান যে বড়ো বেশী অপরিচিত, তাই ধাতস্থ হয় না সহজে।

স্কুল থেকে বাড়ী বেশী দূর নয়, একলাই যাওয়া-আসা করে লীলা।

তবে আজ তো দিব্যি রাত হয়ে গেছে, একটু ইতস্তত করে বেচারা। আজকের দিনে কতো মেয়ের বাড়ী থেকে মা, কাকীমা, দিদি, বৌদি ইত্যাদি এসেছেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত মেয়েদের তো কথাই নেই—বাবা কাকা দাদারাও আছেন সঙ্গে, তাঁদের সঙ্গেই চলে যাবে মেয়েরা।

ঝি চাকরও আসে কতো মেয়ের। স্কুলের সম্পত্তি তো একটিমাত্র ঝি, কতোই আর করবে সে। লীলার বাড়ী থেকে আসবার মতো কে বা আছে? বুড়ো ঠাকুমা আর রুগ্‌ণা বিধবা মা। কাকীমা জ্যেঠিমা আছেন তিন-চারজন, কিন্তু তাঁরা তো আলাদা। উঠোনের ওপর প্রকাণ্ড যে প্রাচীরটা খাড়া হয়ে আছে, তা'তে দরজা একটা থাকলেও খোলা হয় কদাচিৎ।

আর খোলা হ'লেই বা কি, লীলাকে তো বড্ডোই ভালোবাসেন তাঁরা! জ্যেঠিমার আর ছোটকাকীমার মেয়েরা এই স্কুলেই কি পড়তো না আগে? লীলা যেই ভর্ত্তি হ'লো, সেই তাঁরা মেয়েদের স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন। ছোটকাকীমা মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন সেখানের স্কুলে পড়তে, জ্যেঠিমার মেয়েরা সেই অবধি তো ছেড়েই দিলো পড়া, বাড়ীতেই বসে আছে চব্বিশ ঘণ্টা।

জ্যেঠিমা অবশ্য বলেন—"বড়ো হয়েছে—আর পড়ে কি হবে? সংসারের কাজকর্ম্ম শিখুক",—কিন্তু লীলার বিশ্বাস হয় না সে কথা।

এতো দিন 'বড়ো' হলো না, হঠাৎ লীলা স্কুলের দরজায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো হয়ে গেল তারা? সংসারের কাজ না শিখলেই চললো না আর? তবু তো তারা লীলাদের মতো গরীব নয়। জ্যেঠামশাই, ন'কাকা, ছোট-কাকা, সকলেই কলকাতার অফিসে চাকরী করেন। সকাল-বেলাই তাড়াতাড়ি ভাতটাত খেয়ে ছাতা আর পানের ডিবে নিয়ে ছুটছুট। আসবেন সেই সন্ধ্যা হ'লে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা মাইনে পান তাঁরা, নইলে রোজ রোজ এতো কষ্ট করতেন কখনো?

লীলাদের বাড়ীতে কে আছে অফিস যেতে? কেউ না। টাকা তবে আসবে কোথা থেকে? নেহাৎ নাকি ঠাকুমা শরৎশশী দেবীর নামে কোথা থেকে যেন সুদের টাকা আসে, তাই কোন রকমে চলে যাচ্ছে তাদের তিনজনের। আশ্চর্য্য! লীলার বাবা ছিলেন না কি এঁদেরই ভাই। একদম নিজের ভাই। ঠাকুমারই ছেলে নাকি এঁরা। কিন্তু মজা এই—সকলেই আছেন, দিব্যি বেঁচে আছেন। মাঝখান থেকে লীলার বাবাটিই স্বর্গে গিয়ে বসে আছেন।

লীলার ভাগ্য চিরদিনই একরকম! চিরদিন সে একা।

আচ্ছা, লীলাই কি কারুর সঙ্গ চায়? জ্যেঠামশাইয়ের বাড়ীতে যে থাকতে হয় না তাকে, এটা তো সে রীতিমত সৌভাগ্যই ভাবে। বাইশটা লোকের গজগজানি শুনে থাকতে হ'লে হয়তো টি'কতেই পারতো না। তাদের এই ছোট্ট সংসারই ভালো।

সুধু আর একটি লোক বেশী থাকলেই খুব বেশী ভালো হ'তো। ছাতা আর পানের ডিবে নিয়ে অফিস যাবার মতো একজন। যাঁর থাকার জন্যে লীলার মা'র হাতে থাকতো ঝকঝকে সোনার চুড়ি, আর চওড়া পাড়ের ভালো ভালো শাড়ী পরলে দোষ হ'তো না।

আর লীলার? লীলারও হ'তো বৈকি কিছু। অন্তত স্কুলে গিয়ে রেবার আর বাসন্তীর, মল্লিকার আর উমার বাবার আদরের গল্প শুনতে শুনতে কান পচে যেতো না। বলবার মতো বিষয় তারও কিছু থাকতো।

তা' হবার নয়। জন্মলগ্নের ক্রূর পরিহাসে লীলার জীবন সুধুই অগৌরবের, সুধুই অবহেলার।

আজ তাই সম্মান আর আদরের ভার তাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করে তুলেছিল। অনভ্যস্ত ভার বহন করা কঠিন বৈকি!

পথটা অন্ধকার হোক, ভীতিকর হোক, তবু সহনীয়।··· এসে হাঁফ ফেলা যায়।

না, রেবা দেখছি তাকে ছাড়বে না। বুকের উপর জড়ো করা রাশীকৃত পুরস্কারের বোঝা নিয়ে ও যখন অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে, পিছন থেকে রেবা বলে ওঠে—ও মা! কী সাংঘাতিক মেয়ে রে তুই লীলা? এইখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস? আমি খুঁজে খুঁজে মরছি তোকে।

—কেন, খুঁজছিস কেন?

—বাবা গাড়ী নিয়ে আমাকে নিতে এসেছেন, বাবাকে বললাম—"আমার একটি ভীষণ বন্ধুকে তার বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে—"। ও হরি, বন্ধুর আর দেখা পাই না! এদিকে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

লীলা প্রায় পা বাড়িয়ে বলে—এইটুকু রাস্তা আবার গাড়ীতে যাবো কি। রোজ গাড়ীতে যাই?

—বাঃ রোজ বুঝি রাত্তির হয়? আর এতো জিনিসপত্তর নিয়ে···ও কি, তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিস যে? আমি বুঝি তোর প্রাইজগুলো কেড়ে নেব?

—নিলেও ক্ষেতি নেই—লীলা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে—আমার তো বাড়ী নিয়ে যাওয়াও যা, রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাওয়াও তাই, কেই বা দেখছে?

—কেন ভাই—রেবা কোমল সহানুভূতির সুরে বলে—তোর মা দেখবেন না?

—মা'র তো আজ দশ দিন জ্বর, আজ খুব বেশী জ্বর দেখে এসেছি।

—আহা!—

রেবার সহানুভূতির স্বর লীলার হৃদয় স্পর্শ করে কি না কে জানে, কিন্তু আঘাত করে আত্মসম্মানে। তাই আবহাওয়াটা বদলে ফেলতে হঠাৎ হেসে উঠে বলে—তার চেয়ে এক কাজ কর বরং, এগুলো তুই নিয়ে যা, বাড়ীতে সকলে খুসী হবেন, তোরও ভাগ্যে দু'চারটে ফাউনণ্টেনপেন জুটে যাবে।

—ইস, তাই না। নাম লেখা নেই যেন।

—নামের টিকিটগুলো ছিঁড়ে ফেল্।

—হুঁঃ। আমি এই প্রাইজগুলো পেয়েছি, চোখে দেখলেও বিশ্বাস করবে না কেউ। না রে লীলা, সত্যি, তুই-ই আয় না ভাই আমাদের বাড়ী, মা কতো খুসী হবেন।

—আমাকে দেখে খুসী হবার মতো কি আছে?

—বাব্বা, নেই আবার! যতো রূপ ততো গুণ। আমি গল্প করি ব'লে দাদা তোর নাম রেখেছে—'রেবার সর্ব্বগুণ-সম্পন্না বান্ধবী'। দেখিয়ে দিতাম একবার।

—থাক্ আর দেখাতে হবে না। তুই যা, তোর বাবা আবার দেরী দেখে রাগ করবেন।

—বাবা? আমার ওপর রাগ করবেন? তাহলেই হয়েছে! দাদার আর তা' হলে এতো হিংসে হ'তো না আমার ওপর। মা পর্য্যন্ত বলেন—'আদর দিয়ে মেয়েটার মাথা খেলে তুমি'। ···বাঃ রে, চলেই যাচ্ছিস তা'হলে? বেশ ভাই বেশ, দেখে নিলাম। এতো সাধছি, একবার গেলে বুঝি ক্ষয়ে যেতিস?

—শুনলি তো মা'র জ্বর দেখে এসেছি—

—ওঃ! মাপ কর ভাই আমাকে। আচ্ছা, আর একদিন যাবি তো?

—আচ্ছা।

—বেশ। কথা দিলি কিন্তু মনে থাকে! বই হাতে প্রতিজ্ঞা করলি, জানিস তো?

এ কথার আর উত্তর পাওয়া যায় না। সহরতলীর রাস্তার অকিঞ্চিৎকর মিটমিটে আলোয় পথের উপর দেখা যায় লীলার দীর্ঘ ঋজু দেহের দীর্ঘতর ছায়া।··

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রেবা···এতো প্রচণ্ড শীতে ছিটের ফ্রকের ওপর সামান্য একটা সোয়েটার আর খোলা পায়ে চটি পরে কি করে কাটায় লীলা? আর সেমিজ, সোয়েটার, ওভারকোট, মোজা, জুতো—সব কিছু পরেও শীতে কাঁপছে রেবা।

মেয়েকে একলা ফিরতে দেখে রবীনবাবু বলেন—কি হ'লো? বন্ধু কই?

—এলো না, একলাই হেঁটে চলে গেলো।

—কেন? ভালো করে বলোনি বুঝি?

—বলবো না কেন, বাঃ! কতো বললাম। বললাম—তুমি দাঁড়িয়ে আছো—কিছুতেই শুনলো না, চলে গেল।

মেয়ের হতাশ মুখ দেখে রবীনবাবু সান্ত্বনার সুরে বলেন—মেয়েটি বোধ হয় একটু অহঙ্কারী, তাই না? বেশী নাই বা মিশলে?

—না বাবা না, অহঙ্কারী কেন হবে? বড্ডো গরীব কিনা তাই—

—বেশ কথা! গরীব হ'লে বুঝি ভদ্রতা সৌজন্য এ সব শিখতে হয় না?

মুহূর্ত্তে গলার স্বর করুণ করে রেবা বলে—ওর মা'র যে খুব জ্বর বাবা, কে দেখবে বলো? আহা, বেচারার তো বাবা নেই! ভাই বোন কিচ্ছুই নেই।

—তাই বুঝি? আহা! আচ্ছা, আর একদিন নেমন্তন্ন করে এনো তোমার বাড়ীতে, কি বলো?

—নেমন্তন্ন? তা' হ'লেই হয়েছে। কারুর থেকে কিছু খায় কিনা! একটু আমসত্ত্ব কি আচার খাবার জন্যে কতো সাধি, তাই খায় না।

—তা' বেশ ভালো বন্ধু জুটেছে তোমার! এখন চলো দেখি, যথেষ্ট ঠাণ্ডা লেগে গেছে—বাড়ী গিয়ে 'ফুটবাথ' নিতে হবে, বুঝলে?

—বাবা!

—কি রে?

—লীলা মোটে একটা সোয়েটার পরে আসে, মোজা নেই, কিছু না।···

মেয়ের ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রবাবুকে বিচলিত করে কিনা কে জানে, মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—আমাদের দেশে কতো ছেলেমেয়ের 'মোটে একটা সোয়েটার'ও জোটে না রেবা!

—আমাদের তো অনেক আছে—তাদের সব দিলে হয় না বাবা?

—কতো দেবে? তোমার তো মোটে চার-পাঁচটা জামা?—ঈষৎ হাসেন রবীনবাবু।

মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে গাড়ীর মধ্যে গুটিয়ে-সুটিয়ে বসে রেবা।

জ্বর বেশী হলেও সুকৃতি দেবী বিছানা ছেড়ে জানালায় এসে বসেছেন। রাত হয়ে গেলো তবু মেয়েটা এলো না, ভাবনা হয় বৈকি। এগারো বারো বছর বয়েস হ'লো, নেহাৎ ছেলেমানুষ তো নেই আর। একলা আস যায়!···

শুধু বয়েস বলেই নয়—রূপটাও যেন অন্যায় রকমের বেশী। সুকৃতির ঘরে এতো রূপ কেন?···বিয়ের বাজারে হয়তো এ বস্তুর অতিরিক্ত মূল্যই আছে, রাজার ঘরে পড়বার মতো মেয়ে! কিন্তু রাজবাড়ির দরজা পর্য্যন্ত পৌছে দিতে হ'লে আরো যে জিনিসটার দরকার, সুকৃতির তা, কই?···

কতো মেয়ে গেলো এই পথ দিয়ে হাসগল্পে পথ মুখরিত করে।···লীলা কই? আজকে অন্তত কাউকে পাঠাতে পারলে হ'তো।···না, ওই যে কড়া নাড়ার শব্দ হ'লো। শরৎশশী দেবীই দেবেন দরজা খুলে। বুড়ো হলেও, চিররুগ্ণ পুত্রবধূর চাইতে তিনি কর্ম্মঠ।

হ্যাঁ. এসেছে!

শরৎশশীর সভ্য সম্ভাষণ শোনা যাচ্ছে—এতো দেরী কেন লা? আমি ভেবে মরছি—গোরায় ধরে নিয়ে গেলো বুঝি বা।

—আঃ অসভ্য!

—সত্যি কথা বললেই 'অসভ্য'! পারবি লো পারবি—গোরার মুণ্ডু ঘোরাতে পারবি আর দু'দিন পরে।

ঘরে এসে পুরস্কারলব্ধ বস্তুগুলো চৌকীর এক ধারে ফেলে লীলা মা'র কপালে হাত দিয়ে দেখে বলে—জ্বর কমেনি?

—একটু কমলো বোধ হয় এতক্ষণে। তোর এতো দেরী কেন রে?

—থিয়েটার ছিল কিনা।

—অন্য মেয়েরা এসে গেল যে?

—সকলের তো পার্ট ছিল না।

—তা' কই কিছু প্রাইজ পেলি না?

—পেয়েছি।

—ও মা, কই দেখি? বলছিস না যে?

—এই তো বললাম। ওই রয়েছে দেখো না।...

—ও মা, অনেকগুলো পেয়েছিস যে? ভালো হয়েছে। তুলে রাখ যত্ন করে।...আর ঠাকুমার কাছে গিয়ে খাবার খাবি, বুঝলি?

ভালো করে লেপ মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়েন সুকৃতি দেবী। ওইটুকুর বেশী শক্তি নেই তাঁর। এসে গেছে লীলা, নিশ্চিন্ত হয়ে শোওয়া যায় এবার।

এর পর শরৎশশীই দেখবেন। চারখানি শুকনো রুটি ও সামান্য নতুন খেজুরেগুড় নিয়ে বসেই আছেন তিনি নিশ্চয়।

সত্যিই ছিলেন তিনি তাই।

খেতে দিয়ে বলেন—রাত হয়ে গেছে, ভাত আর কখন খাবি? খেয়ে নিবি একেবারে?

—ভাত? আর পারবো না ঠাকুরমা।

—তা' পারবি কেন? দিন দিন হাওয়ায় উড়বি। ওলো, শুধু রূপ থাকলেই হয় না, গায়ে একটু মাস থাকা দরকার।

—কই তোমার তো নেই ঠাকুমা?

—আ গেল যা! আমার সঙ্গে তুলনা? তোর মতো বয়সে এই রকম ছিলাম?

—কি জানি, ছিলে বোধ হয়।

—শোনো কথা মেয়ের। যাক গে বাপু, ভাত দুটি খেয়ে নে।

—পারছি না ঠাকুমা!

—তবে যা। ভাতটা ফেলা যাবে আর কি!

'ফেলা যাওয়া'র অর্থটা অবশ্য বেশী মারাত্মক নয়। সকালের রাঁধা দুটি ভাত পড়ে আছে হাঁড়িতে, তাই দিয়ে কাজ চালাবার কথা।

রোজই তাই চলে। বাড়ীর দুটি বিশিষ্ট ব্যক্তিই যখন রাত্রে অন্নবঞ্চিত, সামান্য একটা ক্ষুদে মেয়ের মুকএঠো চাল আবার রাঁধবে কে? রাঁধতে তো সেই শরৎশশী! সুকৃতি আর ক'দিন হাঁড়ির ভার নিতে পারেন? একটা মেয়ের ভার বুড়ো শাশুড়ীর গলায় চাপিয়ে দিয়ে দিব্যি বারো মাস বিছানাতেই পড়ে থাকেন। শরৎশশীরই যতো জ্বালা! নেহাৎ বড়বৌ, ন'বৌ, ছোটবৌ, কেউই আমল দেয় না, তাই মেজবৌয়ের কাছে পড়ে থাকা। তা ছাড়া—আজন্ম রুগ্ণ যে! সবাই ফেলতে পারে, শরৎশশী তো ফেলতে পারেন না। তবে গলার কাঁটা ওই মেয়েটা। নেহাৎ বিধবার একফোঁটা অবলম্বন, তাই না সয়ে উপায় নেই।

খেয়ে এসে লীলা দেখলো মা ঘুমে অচেতন। এই সময় জ্বরটা কমে—ডাকলে আর সাড়া মেলে না, এতো অবসন্ন। রোজই লীলা ঘরে এসে হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে মা'র চোখ থেকে আড়াল করে লেখাপড়া করে, হয়তো বা স্কুলের সেলাই বোনার কাজও কিছু করে, তারপর ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলে আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ে নিজের নির্দিষ্ট বিছানাটায়।

তবে সজাগ থাকতে হয়—কখন সুকৃতি দেবী ডাকেন কে জানে। ছেলেমানুষ লীলা, তবু অভ্যস্ত হয়ে গেছে সে এই দায়িত্ব পালনে।

আজ আর লেখাপড়া কিছুই নেই। ভালোও লাগছে না গত বছরের বাতিল বই টেনে বার করে পুরণো পড়া পড়তে। তবে কি করবে লীলা? আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে নিজের অনাড়ম্বর বিছানাটায়? একটি মাত্র বালিশ, লেপের অভাব পূরণ করেছে সুকৃতি দেবীর অনেক দিনের অনেক কষ্টে তৈরি বড়ো একখানা কাঁথা।

কিন্তু শীতকালটা কি বিশ্রী। বিছানায় যেন কে জল ঢেলে রেখেছে, এতো অদ্ভুত ঠাণ্ডা।...

বারো মাস যদি জ্বরে না ভুগতেন সুকৃতি দেবী, ছোটখুড়ীর মতো নিটোল শরীরটি হ'তো তাঁর, হয়তো তাঁরই বিছানার একপাশে একটু জায়গা হ'তো লীলার—অন্তত শীতকালটাও।...

নোনাধরা বালিভাঙা দেয়ালগুলো যেন বেশী করে জোগান দিচ্ছে শীতের। শুকনো খটখটে ভালো একটা বাড়ীও কি থাকতে পারতো না লীলাদের?

আলোটার শিখা বাড়িয়ে দিয়ে জানলার ওপর তুলে দিয়ে প্রাইজের জিনিষগুলো বিছানায় ছড়িয়ে দিলে সে। এতক্ষণ পরে জিনিষগুলো চোখ মেলে দেখবার সুযোগ

হ'লো।···অবিশ্যি দেখবার জন্যে ব্যাকুলতা কিছু নেই, একটু অনাগ্রহ কৌতূহল মাত্র।···

কি হবে এ সব নিয়ে? চকচকে মলাটের চমৎকার এই বইগুলো রাখবে কোথায় সাজিয়ে?···ভেলভেটে মোড়া সেলাইয়ের বাক্সটা নিয়ে কী সেলাই করবে? রঙ আর তুলি নিয়ে ধুয়ে জল খাবে, না দেয়ালে পোঁচড়া দেবে? রান্না শেখবার এই বইখানা নিয়ে কোন্ রান্নাটা পরীক্ষা করতে যাবে শরৎশশীর রান্নাঘরে?—তেল হলুদ, আর লঙ্কা সরষেই যেখানে যথেষ্ট উপকরণ।···পুরণো একটা বার্লির কৌটোয় কোথায় যেন লুকানো থাকে একটু ঘী, দশমীর দিন বার করেন শরৎশশী। সেইখানে যাবে লীলা—মাংস পোলাও, চপ কাটলেট রান্নার রিহার্শাল দিতে?···হ্যাঁ, কাজে যদি লাগে তো লাগবে এই পশমগুলো।···

অসম্ভব শীত পড়েছে—কতো কষ্ট পাচ্ছেন সুকৃতি দেবী শীতের কাঁপুনির সঙ্গে জ্বরের কাঁপুনির যোগাযোগে।···খুব তাড়াতাড়ি হাত চালালে ছোটখাটো একটা সোয়েটারের মতো বুনে দেওয়া যেতে পারে এই বছরেই।

আজকেই আরম্ভ করবে না কি? নাঃ থাক্। কাল থেকে যা হয় হবে।

আজ না হয় সুধুই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাববে লীলা। অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের দাঁতখিঁচুনিটা চোখে পড়বে না—চোখে পড়বে না বিছানার মালিন্য।

"লীলা যদি রেবা হতো"—একথা সুধু কল্পনা করতে দোষ কি? কেউ তো শুনতে পাবে না যে হেসে উঠবে লীলার ধৃষ্টতায়?

উঁচু উঁচু দাঁতওয়ালা মুখ আর গোবরভরা মাথা নিয়ে রেবা কেমন অক্লেশে গাড়ী চড়ে বেড়ায়, ভালো ভালো পোষাক পরে, আর বাবা মার আদরে খান্‌খান্ হয়! আশ্চর্য্য!

হিম-কন্‌কনে বিছানায় শুয়ে আধময়লা কাঁথা মুড়ি দিয়ে হী হা করতে করতে লীলা যদি মনে মনে একবার নিজেকে তার জায়গায় দেখেই—কী এসে যাবে কার?

ভাববার কি শেষ আছে? ছোট্ট লীলার মনে কতো অজস্র চিন্তা—অনন্ত প্রশ্ন! এ প্রশ্নের উত্তর কার আছে? যে অসংখ্য লোক ভিড় করে আছে লীলার অস্ফুট চেতনার নিভৃত গুহায়, তাদের মধ্যেই বা এমন কে আছে যে উত্তর জোগাতে পারে?

বিস্মৃত স্মৃতির রোমন্থনেও কিছুমাত্র তৃপ্তি নেই! বিধাতার অগাধ নিষ্ঠুরতার সাক্ষ্য দিতেই হয়তো সারা জীবনটা কেটে যাবে লীলার।

১৫

কয়েকটা দিন পরে—

স্কুল খোলার প্রথম দিনেই রেবা আবার পাকড়ায় লীলাকে, বলে—আজ কিন্তু ভাই তোকে যেতেই হবে আমাদের বাড়ী।

—আমি গেলে তোর কি লাভ হবে?

—লাভ কি আবার, মা যে অনেক করে বললেন যেতে।

—তোর মা তো আমাকে চেনেনই না।

—না দেখলে চিনবেন কি করে শুনি? খুব তো বুদ্ধি তোর? না ভাই—না—যেতেই হবে। বাবাঃ, কী মান মেয়ের! আমায় যদি কেউ তোর মতো সাধতো, দু' বেলা যেতাম তাদের বাড়ী।

লীলা ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বলে—বেশ তো বলছিস? ইস্কুল থেকে যেতে দেরী হবে, মা ভাববেন না বুঝি?

—আচ্ছা, তোর মাকে বলে যাই তবে।

কতো আর নিজেকে সামলায় লীলা? রেবাদের বাড়ীটা দেখবার একটা উগ্র কৌতূহল কি তারই নেই? শুধু নিজের শ্রীহীন সাজসজ্জার কথা স্মরণ করলেই সমস্ত উগ্রতা স্তিমিত হয়ে আসে।

আবার—রেবা তার মাকে বলতে যাবে—এ কথা শুনেও যে শরীর ঝিমিয়ে আসে।···বাইরের লোককে বসানো চলে এমন একটা ঘরই কি আছে?

রেবা অতি সপ্রতিভ, কুণ্ঠা-লজ্জার বালাইমাত্র নেই তার। তাই লীলাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সুকৃতি দেবীকে 'মাসীমা' 'মাসীমা' করে হৈ হৈ রব তুলে দেয়।

—বেশ মাসীমা, বেশ! সন্দেশ খাওয়ালেন না আমাদের, লীলা ফাষ্ট হলো? সুকৃতি দেবী ম্লান হেসে বলেন—আমার কি এতো ভাগ্য হবে মা? নইলে খাওয়াবার তো কথা।

—ও সব ভাগ্য-টাগ্য জানি না মাসীমা, একদিন এসে খুব করে খেয়ে যাবো। আজ কিন্তু মাসীমা, লীলাকে একবার আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই?

—তোমাদের বাড়ী?—সুকৃতি দেবী ঈষৎ সন্দিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকান লীলার দিকে—লীলা যেতে চেয়েছে বুঝি?

—লীলা চাইবে যেতে? তা হলেই হয়েছে। মেয়েটিকে বুঝি চেনেন না মাসীমা? সাধতে সাধতে প্রাণ গেল আমার।

সুকৃতি দেবী সুসজ্জিতা রেবার পাশে লীলাকে দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন মনে মনে। তুলনার কারণ ঘটলেই দৈন্যটা বড়ো বেশী চোখে পড়ে। নইলে—লীলার কাছে ওই 'কেলে দাঁড়কাক'? তবু সৌন্দর্য্য যতো বড়ো ঐশ্বর্য্যই হোক, সজ্জা কিছু চাই বৈকি। হয়তো এতো সুন্দর না হলেই ভালো হতো লীলার।

বাইরে হেসে বলেন—বন্ধুকে এতো সাধ্য-সাধনা কেন ?

—বাঃ, ফার্স্ট হওয়া মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে হয় না লোকের ? মা কতো বলে দিয়েছেন—

সত্যি বলতে কি, রেবার কথার মধ্যে ভেজাল আছে কিছুটা। অনবরত বন্ধুর রূপগুণের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত করেই মা'র কাছ থেকে আমন্ত্রণটা আদায় করেছে সে।...রবীনবাবুর সে দিনের কথাটাও তো রয়েছে হাতের পাঁচ।

'না' বলাটা ভালো দেখায় না বলেই, 'আচ্ছা', তা যাক না' বলতে বাধ্য হতে হয়।

'আর পায় কে রেবাকে ?

যে ভাবে আবার টানতে টানতে নিয়ে যায় লীলাকে, তা'তে সন্দেহ হয় চোর ধরে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি বা

বড়োলোক বলেই যে রেবাদের বাড়ীটা 'আহা মরি' কিছু তা অবশ্য নয়, তবে জায়গাটা শহর নয়—শহরতলী, তাই একটু চোখ পড়ে। এদিকে এটিই বেশ সৌখীন সভ্য বাড়ী।...

কাছাকাছি রেবার বাবার কোথায় যেন ষ্টীল ট্রাঙ্ক তৈরির কারখানা আছে, তাই এদিকে থাকা।

দরজার গোড়ায় এসেই একটু থমকে দাঁড়ায় লীলা।

—কই চল্ ? দাঁড়ালি যে ?—রেবা তাড়া দেয়।

—যাচ্ছি তো।..."বীণা ভবন"! তোদের বাড়ীটারও বুঝি নাম আছে ?

—বাড়ীর নাম আর মা'র নাম একই। মা'র নামেই করা। তোর মা'র নাম কি ভাই ?

—ধ্যেৎ, মা'র নাম করতে আছে নাকি ? আচ্ছা বোকা তো তুই !

—ও মা ! তাই বুঝি ? আমি যে করলাম !

—আর করিস না।

—আচ্ছা। কিন্তু দাদাটা কী দুষ্টু, জানিস লীলা? মাকে রাগাবার জন্যে যখন তখন শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী বলে ডাকে।

—ঘ্যাঃ, কী অসভ্য !

তা সত্যি, অসভ্য একটু বলতেই হয় রেবার দাদা জয়ন্তকে। লীলা না হয় বালিকাই, তুমিও তো বাপু এমন কিছু প্রবীণ ব্যক্তি নও ? অতএব—বোনের বন্ধুকে অতো বেশী বেশী করে দেখবার দরকার কি ? লীলার আড়ালে নেপথ্যে রেবাকে—'আহা, এই তোমার অপরূপ বান্ধবী ?'—বলে ভেংচি কাটলেও তুমি যে একটি অপরূপ বস্তুই দেখলে, তা' তো চোখ-মুখের ভাব দেখেই মালুম হচ্ছে!

তবে ? অসভ্য বলাই উচিত নয় কি জয়ন্তকে ?

না, হাসবার কিছু নেই। নেহাৎ একাল বলেই তাই—নইলে সাহিত্য-জগতে বারো বছরের নায়িকার দৃষ্টান্ত এমন কিছু বিরল নয়, এবং সেটা নিতান্ত মধ্যযুগীয় ব্যাপারও নয়, প্রায় এ যুগেরই কোণঘেঁসা। আজো সেই সব আঠারো বছরের নায়ক আর বারো বছরের নায়িকারা 'অমর' হয়ে বসে আছে। 'অলীক' 'অসম্ভব' বলে উড়িয়ে দিচ্ছে না কেউ। হয়তো একালের 'দ্বাদশী'-রাও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলেই, এখুনি নায়িকার মর্য্যাদা পেতে পারে। কাটা চুল আর খাটো ফ্রকের দাওয়াই দিয়ে কিছুটা দাবিয়ে রাখা হয় মাত্র।

দাদার কাজের প্রত্যুত্তরস্বরূপ রেবাও অলক্ষ্যে একটি ভেংচি সহযোগে বলে—তোমার চাইতে একশো গুণ ফরসা, বুঝলে ?

—বলতে তো পয়সা লাগে না।—বলে জয়ন্ত তখনকার মতো কেটে পড়ে।...

ধনী-গৃহিণীর উপযুক্ত বিরাট দেহখানি একখানি বিরাট 'খোল'ওয়ালা বেতের চেয়ারে ঠেসে ঠুসে ভরে দিয়ে বীণাপাণি দেবী বসে বসে উল বুনছিলেন, পর্দা ঠেলে রেবা ঢুকলো লীলার হাত ধরে।

—মা, লীলা এসেছে।

—এসেছে ? ও! এসো খুকী এসো।

'খুকী' কিন্তু আর দ্বিতীয় পা অগ্রসর হয় না, রেবার হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রেবার মা'র দিকে।...

—কই রে রেবা, আয় ? দাঁড়িয়ে পড়লি যে ?

—এই যে—আয় না লীলা ?...দূর, কী অদ্ভুত মেয়ে রে তুই! এতো ভয় কিসের ?

—ভয় আবার কি ?—আত্মমর্য্যাদা ফিরে পায় লীলা। রেবার মা'র মেদবহুল দেহের চাপ চাপ মাংসের খাঁজে খাঁজে বসে যাওয়া গাদা গাদা সোনার গয়নাগুলো দেখে ভয় পাচ্ছে লীলা ? তাই ভাবছে নাকি রেবা ? ইস্!

গম্ভীর ভাবেই এগিয়ে বীণাপাণির সামনাসামনি একখানি চেয়ারে গিয়ে বসে সে।

—তোমারই নাম লীলা ? এবারে সবতাতে ফার্স্ট হয়েছে তুমি ?

এটা অবশ্য উত্তর দেবার মতো প্রশ্ন নয়, কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে নীরব থাকতে হয় লীলাকে।

—তোমাদের বাড়ীটা কোথায় ?

—ইষ্টিশানের কাছে।

—ও। আচ্ছা, তুমি আগে কোনো দিন রেবার সঙ্গে এসেছো এ বাড়ীতে ? ভ্রূ কুঞ্চিত করেন বীণাপাণি দেবী।

লীলা উত্তর দেবার আগেই রেবা উত্তর দিয়ে ওঠে—জন্মেও না। এই বলে কতো ব'লে ব'লে—

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছি তোমাকে।—বীণাপাণি চোখ থেকে চশমাটা খুলে খালি চোখেই দেখে নেন একবার।···হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমায় দেখেছি আমি—

—বারোয়ারীতলায় দেখেছেন হয় তো।—তেমনি গম্ভীরভাবেই উত্তর দেয় লীলা।

—বারোয়ারীতলায়?—বীণাপাণি চশমাটা আবার চোখে লাগান—বারোয়ারীতলায় আমি আবার গেলাম কই? সেই ষ' ষষ্টমীর অঞ্জলি দিতে একবার ···নাঃ, তোমায় আমি নিশ্চয়ই অন্য কোথাও দেখেছি।···কা'দের বাড়ীর মেয়ে তুমি বল তো?

রেবা বন্ধুর জন্য মা'র দিক থেকে এ ধরণের অভ্যর্থনাটা আশা করেনি বোধ হয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে—মজুমদারদের। ···তোরা মজুমদার তো, না রে?

লীলা মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—মজুমদার? কোন্ মজুমদার? তোমার বাবার নাম কি?

লীলা মাথা নীচু করে অস্ফুটকণ্ঠে যা বলে তার অর্থ বোধ করি—'বাবা অনেক দিন আগেই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন'।

—মারা গিয়েছেন? আহা! তোমার খুব ছেলেবেলায় বুঝি? কিন্তু নামটা কি ছিল বল তো?

—ঈশ্বর শচীন্দ্রনাথ মজুমদার—হঠাৎ মুখ তুলে উত্তর দেয় লীলা।

শচীন্দ্রনাথ?—বীণাপাণি ভ্রূ কুঁচকে বলেন—কই বুঝতে পারলাম না। কোথায় বললে? ষ্টেশনের দিকে বাড়ী তোমাদের? কি জানি, আমরা তো এই চার বছর হয়ে গেল এ বাড়ী করেছি, কই শুনিনি। আচ্ছা, আগে কি কলকাতায় থাকতে?

না। বরাবর এখানেই আছি আমরা।

রেবা এবার চটে ওঠে।···

মা'র কি যতো ফ্যাসাদ! কোথায় লীলার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবেন, আদর করবেন, ভালো ভালো খাবার খেতে দেবেন, তা নয়—কোথায় যেন কবে দেখেছেন তাই নিয়ে সাতসতেরো কথা! দেখেছেন তো হয়েছে কি?··· নেমন্তন্নবাড়ীতে···বারোয়ারীতলায়···সিনেমায় থিয়েটারে··· মেলার বাজারে···ট্রেনে···কতো লোককেই তো দেখে মানুষ! তাই দেখেছেন হয়তো।

তাই চটে উঠে বলে—তুমি খালি বসে বসে ওই ভাবো। ···লীলা, চল্ আমরা ছাতে যাই। ছাত থেকে কেমন গঙ্গা দেখা যায়, দেখবি চল্।

—ও মা, তুই রেগে যাচ্ছিস কেন রেবু? ইস্কুল থেকে এলি হাত-মুখ ধো, খাওয়া দাওয়া কর, বন্ধুকে খাওয়া, তবে তো? তা নয়, এই কনকনে শীতে বলে কি না 'ছাতে চল্'। শোনো মেয়ের কথা!

—তা কি করবো? তোমার যেমন কাণ্ড!

বীণাপাণি এবার বিস্মৃত স্মৃতি হাতড়ানো স্থগিত রেখে ডাকাডাকি করেন ঝিকে আর ঠাকুরকে।···দু'জনের সাহায্যে তবে খাবার জোটে রেবার, তার সঙ্গে অবশ্য অতিথিরও।

খাবার ব্যবস্থা প্রচুরই ছিল।

রেবার নিত্যবরাদ্দের উপরও আজকের মাত্রাটা চড়া। কিন্তু সামান্যই খায় লীলা। শেষ পর্য্যন্ত রেবাই বারকতক অনুরোধান্তে নিজেই দু'জনের খাবার শেষ করে আনে।

-বেশ বেশ, খেলি না তো? কী ফ্যাশান বাবা! আমার অতো ফ্যাশান-ট্যাশান নেই, দেখছিস্ তো—তোর গুলো সুদ্ধু খেয়ে মেরে দিলাম।

লীলা হাসে আস্তে আস্তে।

বীণাপাণি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকে জোর করে স্বাভাবিকত্বের কোঠায় এনে এটা ওটা প্রশ্ন করেন।···মেয়েলী কৌতূহলের চিরাচরিত প্রশ্ন।···"বাড়ীতে আর কে আছে···ক'টি ভাইবোন···জ্যেঠি খুড়ী আলাদা কেন···ঠাকুমা এখনো খাটতে পারেন, না মাকেই সংসারের সব খাটুনি খাটতে হয়···মায়ের বারো মাস যদি রোগ, তো কি করে চলে লীলার" ইত্যাদি। নিতান্ত সভ্যতা-বিগর্হিত বলেই বোধ করি উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির অভাবে আর্থিক সুরাহা বিষয়ক প্রশ্নটা আর করেন না।

অতঃপর একটি অদ্ভুত প্রশ্ন তিনি করেন।···নিজের হাতের বোনা কাঁটা-গোঁজা অসমাপ্ত কোট-সোয়েটারটা দু'হাতে তুলে ধরে বললেন—অচ্ছা, এটা তোমার গায়ে হবে কিনা বল তো? হয়ে যাবে বোধ হয়, অ্যাঁ?

—আমার গায়ে?—লীলা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। আগে অবশ্য ধরেছিলাম রেবার জন্যে, তা' তোমার আর ওর গায়ের মাপ একই দেখছি, এটা তোমাকে দেবো।

—কেন, ওর জিনিষটা আমাকে দিতে যাবেন কেন?

বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা বিরক্তি মেশানো থাকে লীলার প্রশ্নে। খাপোকা এ রকম প্রস্তাবে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে বেচারা।

রেবা কিন্তু মায়ের এই সহৃদয় বাসনার পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে।···আহা, সত্যি তার নিজেরই এই ধরণের একটা ইচ্ছে ছিল, সাহস করে বলতে পারেনি মাকে।

মায়ের ইচ্ছে প্রকাশিত হবার পর তাই হৃষ্টচিত্তে বলে ওঠে—দিলেই বা রে ? মা তো রাতদিনই বুনছেন, আমারটা এর পর করে দেবেন'খন।

লীলা আরক্ত মুখে বলে—সুধু সুধু আমাকেই বা দেবেন কেন ?

বীণাপাণি অমায়িক হাস্যে বলেন—তুমি ফার্ষ্ট হয়েছো, তাই না হয় প্রাইজ হিসাবে দিলাম। রেবার তো তাড়া নেই কিছু, গাদা-গাদাই তো রয়েছে ; সখ করে ধরেছিলাম বৈ তো নয়!

—রেবার তো আবো অনেক বন্ধু আছে, তাদের কাউকে দেবেন।—বলে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লীলা।

বীণাপাণি এতটুকু মেয়ের ঔদ্ধত্য দেখে রুষ্ট হন যতোটা, অবাক হন তার চেয়ে বেশী। তিনি মান খুইয়ে এতোটা সরলভাবে বললেন, তার এই উত্তর!...তবু যদি না গায়ে একটা ঘাড়ছেঁড়া সুতির সোয়েটার থাকতো! পায়ে তো একজোড়া মোজা পর্য্যন্ত জোটেনি, হাঁসের মতো সাদা পা দু'খানা 'ঠ্যাঙ্ ঠ্যাঙ্' করছে এই শীতে। তেজ দেখো! ভালোর কাল নেই!

তবে হ্যাঁ, তাঁর তো একটা প্রেষ্টিজ আছে, তাই অপমানটা গায়ে না মেখে মুচকে হেসে বলেন—তা, উপহার নেওয়াটা কি দোষের ?

—যদি উপহার দিতে চান, গল্পের বইটই দিতে পারেন—এর চাইতে বেশী আর কিছু বলবার ক্ষমতা লীলার থাকে না, এই শীতেও কান মাথা গরম হয়ে ওঠে।...

নেহাৎ বোকা হ'লেও রেবা বুঝতে পারে ঘটনাপ্রবাহটা যে খাতে প্রবাহিত হচ্ছে সেটা বেশ মোলায়েম নয়, তাই তাড়াতাড়ি বলে—তাই ভালো মা, কি বলো?...আমিই মাকে বলেছিলাম রে দু'জনে বেশ একরকম পরবো। মা তো অনেককেই বুনে বুনে দেন ভাই।...তোর যদি বই ভালো লাগে তো...দেখি বাবা এলেন কিনা, গাড়ীটা তোলবার আগে তোকে পৌঁছে দিতে বলি। এখন বান্ধবীটিকে মানে মানে বাড়ী পাঠাতে পারলেই বাঁচে সে।

গাড়ীর নাম শুনেও লীলা নিরুপায় হয়ে চুপ করে থাকে, কারণ যতোই তেজী অথবা জেদী হোক সে, পৌষের এই কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এতোটা অজানা পথ পাড়ি দিয়ে একলা বাড়ী ফেরবার কথা কল্পনাও করা যায় না।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, রবীনবাবু ফিরলেন।

রেবা তাড়াতাড়ি লীলাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, পাছে গাড়ীটা উঠে পড়ে গ্যারেজে।

রবীনবাবু মেয়ের অনুরোধে ড্রাইভার মুস্তাক আলিকে একটু অপেক্ষা করতে নির্দ্দেশ দিয়ে সস্নেহ প্রশ্ন করেন—মেয়েটি কে রেবা? তোর বন্ধু বুঝি ?

বাবাকে দেখে রেবার স্তিমিত উৎসাহ একটু প্রদীপ্ত হয়ে উঠে—ওই তো লীলা। সেই যে বলেছিলে একদিন—

—বেশ, বেশ, তা' এখুনি চলে যেতে দিচ্ছো যে? বন্ধুকে খাওয়াও টাওয়াও ?

—দিয়েছিলাম, ও খায় না...ওর মা'র অসুখ কিনা বাবা, তাই আর আটকে রাখবো না।...আয় লীলা... ড্রাইভারকে বাড়ী চিনিয়ে দিতে পারবি তো ?

লীলা একবার শঙ্কিতদৃষ্টিতে মুস্তাক আলির শ্মশ্রুশোভিত মুখ ও খাকি পোষাকসম্বলিত চেহারার পানে চেয়ে একরকম জোর করেই ঘাড় কাৎ করে।...

'খেলো' হওয়া চলবে না কিছুতেই।

রবীনবাবু বোধ করি ব্যাপারটা আন্দাজ করেন। অথবা—লোকটা নতুন বলেই কিছু ভাবেন কিনা কে জানে, ডাক দেন জয়ন্তকে।...

—ডাকছেন বাবা ?—জয়ন্ত এসে দাঁড়ায়।

—হ্যাঁ। ব্যস্ত আছো না কি ?

—না তো।

—আচ্ছা, তা' হলে রেবার বন্ধুটিকে একটু পৌঁছে দিয়ে এসো তো।...কোন্ দিকে যেন বাড়ীটা, রেবা ?

—ষ্টেশনের কাছে।

—ওঃ, তা' হলে তো ভালোই।

'ভালো'টা কার কে বলবে ?

হয়তো লীলার পক্ষে কিছুই ভালো নয়...রেবার সংস্রবে আসা থেকে সুরু করে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যা কিছু ঘটছে সবই অনিষ্টকর তার জীবনে।

চমকাবেন না।...ঘটনা বলতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ একটি তরুণ যদি কৌতূহলী দৃষ্টিতে বারকয়েক তাকিয়েই থাকে এমন একটি মেয়ের দিকে, যে এখনো একটুকরো "কাটাকাপড়ে"র গণ্ডীতে আবদ্ধ—তখনও একখানি শাড়ীর বিস্তীর্ণতায় লীলায়িত হয়ে ওঠেনি—কিই বা আছে তাতে উল্লেখ করার মতো ?...

...নামবার সময় যদি সেই সদ্য কৈশোরে অবতীর্ণ মেয়েটির কুণ্ঠিত সলাজ দৃষ্টি একবার কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে,—তাতেই বা বলবার মতো কি আছে ?

মানুষের তৈরী ঘটনা নয়। বিধাতার ঘটানো এই ঘটনাগুলোই হয়তো তেমন সুবিধের নয়।

মর্ত্ত্যলোকে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানটা রয়েছে—রুক্ষ প্রান্তরের মতো নির্ল্লজ্জ উন্মুক্ততায়, অমর্ত্ত্য-লোক থেকে সেটা কি আজ পর্য্যন্ত কোনো দিন চোখে

পড়লো না ভদ্রলোকের? তাই বারে বারেই হিসেবের ভুল করে বসেন?

১৬

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে রবীনবাবু অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলেন—ও তোমার একটা উদ্ভট কল্পনা!

বীণাপাণি অবিশ্বাসে দমেন না। সতেজ এবং সবেগ উক্তি করেন—উহুঁ, কক্ষনো নয়। আমি যা বলছি তাই ঠিক।...উঃ, এমন পোড়া মন, যতোক্ষণ সামনে থাকলো কিছুতে মনে পড়লো না ছাই!...যেই চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন শক্ খেলাম।...নাঃ, আর আমার সন্দেহ নেই, এ মেয়ে সেই মেয়ে না হয়ে যায় না...

রবীনবাবু আর এক চুমুক শেষ করে পূর্ব্ববৎ অবিশ্বাসের সুর বজায় রেখেই বলেন—তুমি যদি এমন জোর করে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাও। কোন্-কালে কা'দের বাড়ীতে কা'কে দেখেছো তা'র ঠিক নেই, এখনো অমনি মনে করে রেখে দিয়েছো তাকে?

বীণাপাণি গম্ভীরভাবে বলেন—দেখেছো মেয়েটাকে?

—দেখলাম তো—খাসা সুন্দর মেয়েটি।

—সুধু 'খাসা' নয়, রীতিমতো সুন্দরী হবে সময়ে।

—বেশ তো, তাই যদি হয়, তার সঙ্গে তোমার ধারণার সংস্রব কি?

—সংস্রব এই—ও রকম মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না, বুঝলে? না না, কোনো সন্দেহ নেই, এই মেয়েকেই দেখেছিলাম আমি কলকাতায়, বড়ো-মাসীমার ছেলের জন্যে 'কনে' দেখতে গিয়ে।

—বড়োমাসীমার ছেলে? বিজয় নাকি? সে তো অনেক দিনের কথা?

—হ্যাঁ। বিজয়ের জন্যে। পাঁচ ছ' বছর আবার এমন কি অনেক দিন? দিব্যি মনে রয়েছে—বাড়ী ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি মেয়েটা দরজায় দাঁড়িয়ে।...কেমন যেন একটু বোকাটে মতো।...কথার উত্তরই দিতে চায় না।

—ব্যস্। কথা পর্য্যন্ত শোনোনি, আর নিঃসন্দেহ হচ্ছো—

—দেখো তা' হলে পষ্ট কথাই খুলে বলি—যে মেয়েকে দেখতে যাওয়া হয়েছিল সেও খুব সুন্দরী, কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে না, এই ছোটো মেয়েটার সঙ্গে যেন এক ছাঁচের চেহারা। তাইতেই তো সন্দেহ হলো বড়োমাসীর, ভেঙে দিলেন বিয়ে।

রবীনবাবু ঈষৎ বিরক্তভাবে বলেন—তোমাদের সব উল্টোপাল্টা মেয়েলী মেয়েলী কথা বোঝা দায়। বাড়ীর দুটো মেয়ে যদি একরকম দেখতে হয়, সন্দেহের কি আছে? দুই বোন হয়তো—

বীণাপাণি ভরাট মুখের চাপ চাপ মাংসের খাঁজে খাঁজে একটা রহস্যময় হাসির আভাস ফুটিয়ে তোলবার হাস্যকর প্রচেষ্টায় আরো গোলালো হয়ে ওঠেন...ছোটো চোখ আরো ছোটো দেখায়, বলেন—সেই তো মজা! বোন হ'লে তো কথাই ছিল না। দেখতে অমনি একরকম, আর—গিন্নী, অর্থাৎ কনের মা বলেন কিনা—"ও আমার ভাইঝির মেয়ে।"

রবীনবাবু বলেন—এতেও তোমার বক্তব্য বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হচ্ছে কই?

—কেন হবে না? খুবই হচ্ছে। কান দিয়ে না শুনলে? ব্যাপারটা আর কি—বীণাপাণি আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেন স্বামীর কাছে, ফিস্ ফিস্ করে বলেন—কনের মা—অর্থাৎ গিন্নীটি শুনলাম অল্পবয়সে একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা। এমনও তো হতে পারে—

—আঃ ছি ছি! তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনলে—

কথা শেষ না করেই রাগ করে উঠে যান রবীনবাবু।

কিন্তু উঠে গেলেই কি ছাড়বেন বীণাপাণি?...সুধু আলোচনাটা অসমাপ্ত রইল বলেই নয়, স্বামী যে তাঁকে 'ছিছি'কার দিয়ে চলে যাবেন এ তো বরদাস্ত করা চলে না।...কাজেই গুরুভার দেহকে টেনে তোলবার গুরুপরিশ্রম স্বীকার করে তাঁকেও যেতে হয় পিছন পিছন।

—বলি খুব বাহাদুরি দেখিয়ে চলে এলে? আমি যেন কি না কি অসম্ভব কথা বলেছি। কেন, এ রকম ঘটনা ঘটে না সংসারে?...মন্দ তো মানুষেই হয়, নাকি বনের বাঘভালুকে হয়?

রবীনবাবু নিরুপায়ভাবে হেসে ফেলেন—বাস্তবিক তোমার যুক্তিটা অকাট্য। তুমি যে কেন উকিল হওনি তাই ভাবি। বেশ, মানলাম সংসারে অহরহই ঘটছে ওই সব। কিন্তু সে মেয়েটা খামোকা এখানে আসবে কোথা থেকে তার একটা যুক্তি দাও।

—আহা, তবে আর বলছি কি! আমরাও মেয়ে দেখে এলাম আর পরদিনই শুনলাম—ছোট সেই মেয়েটা নাকি হারিয়ে গেছে! শোনোদিকিনি কথা? এ একেবারে পুকুরচুরি নয়? আসল কথা—দেখলে ওকে না সরালে বড়োটার বিয়ে হবে না, সকলের চোখে ধুলো দেওয়া সোজা নয়, তাই কোনোখানে সরিয়ে ফেলে রব তুললে 'হারিয়ে গেছে'।

রবীনবাবু বেশ গম্ভীরভাবেই বলেন—উকিল যদি না-ই হ'লে, ঔপন্যাসিক হ'লেও পারতে কিন্তু।

—তোমার আর কি? আছে তো ওই বচন! আমি যা যা বললাম তা'তে অসম্ভবের কিছু আছে?

—কিছু না। তবে ও নিয়ে মাথা ঘামাবারই বা এতো কি দরকার?

—বাঃ! যদি তাই হয়, ওর সঙ্গে আমার মেয়ে মিশবে?

—গায়ে ফোস্কা পড়বে বলে আশঙ্কা হয়?

—হাড়জ্বালানো কথা বোলো না। এ বিষয়ে রীতিমতো তদারক করবো আমি, বুঝলে?

রবীনবাবু এবার সত্যকার গম্ভীর হয়ে বলেন—দেখো, আর যা করো তা' করো, ওইটি করতে যেও না।

—কেন, ভয়টা কি শুনি?

—লাভও তো কিছু নেই।

—আচ্ছা, আমার লাভ-লোকসান আমি বুঝবো। লাভ নেই বলে লোকের দোষ দেখে বলবো না? চোখ বুজে থাকবো? তখন তো মেয়েটাকে দেখে এতো পছন্দ হয়েছিল যে হাসতে হাসতে বড়োমাসীমাকে বলেছিলাম—'একে আমার খোকার বৌ করবো।' এখন বলবো তাই?

—না বলবার কারণও তো কিছু দেখি না। বৌ করবার মতো মেয়ে। অবশ্য যাকে চোখে দেখলাম তার কথাই বলছি।

—তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারি।

এবার রাগ করে নিজেই উঠে যান বীণাপাণি।

হয়তো—নিজের আবিষ্কারে এতো বেশী নিশ্চিত হতেন না বীণাপাণি, যদি না লীলার ঔদ্ধত্যে রীতিমতো আহত হতেন।…শুধু চেহারায় নয় চোখের দৃষ্টিতেও যে মিল রয়েছে অবিকল।…না না, কোনো ভুল নেই। শিষ্টতার আবরণ সত্ত্বেও এই রকম গর্ব্বিত উদ্ধত দৃষ্টি দেখেছিলেন তাঁরা সেই 'কনে'র চোখেও। যেন 'তোমাদের পছন্দ হোক না হোক কিছু যায় আসে না আমার'—এই ভাব।…বাড়ী ফিরে মাসী-বোনঝিতে সে আলোচনাও হয়েছিল কিনা।…এতো বিশদ মনে থাকবার কারণও তো তাই, তা' নইলে বিজয়ের জন্যে 'কনে' দেখতে তো তাঁরা বাঙলাদেশের বড়ো বেশী ঘর বাকী রাখেন নি।

বীণাপাণির কপালের গ্রহ, রাত্রে আহারের সময় আবার কিনা সেই লীলার প্রসঙ্গ!…এবারে অভিযোগ তাঁর ওপর। হাতবোনা জামা উপহার দেবার প্রস্তাবটা নাকি তাঁর অত্যন্ত অসঙ্গত হয়েছে, ভদ্রলোকের মেয়ে মাত্রেই ওতে অপমান বোধ করতো। টাকা থাকলেই যে গরীবের ওপর চাল ফলাতে হবে, বা মুরুব্বিয়ানা দেখাতে হবে, তার কোনো মানে নেই ..ইত্যাদি ইত্যাদি।…

অভিযোগকারী আর কেউ নয়—শ্রীমান জয়ন্ত!

হবে না কেন? ওই যে একটু রূপ দেখেছেন! বীণাপাণির আর বুঝতে বাকী নেই কিছু। নারীজন্ম না হ'লে উকীল ব্যারিষ্টার হতে পারতেন তিনি, বরাবর এ কথা নিজেই ঘোষণা করেন বীণাপাণি।

কর্ত্তার যেমন বুদ্ধি! তাই ওই মেয়েটাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার হুকুম দিলেন কা'কে? না, খোকাকে। এই বুদ্ধির বড়াই নিয়ে বীণাপাণিকে হেনস্তা করেন রবীনবাবু!…

যাকগে—ছেলের কাছে পরাস্ত হবার পাত্রী বীণাপাণি নন। 'লম্বা লম্বা' কথাকে চ্যাপ্টা করে দেবার ষ্টক তাঁর নিজের যথেষ্ট আছে। স্বামীপুত্তুর কাউকেই রেয়াৎ করেন না তিনি দরকার পড়লে।

১৭

তর্কের খাতিরে বীণাপাণি সেদিন বলেছিলেন—'পাঁচটা ছ'টা বছর—এতো কি বেশী সময়?'

কথাটা হয়তো অযৌক্তিকও নয়—অন্তত বীণাপাণির ক্ষেত্রে তো বটেই!…কিন্তু সকলের সময়ের হিসাব কি একই নিয়ম মেনে চলে? কেবলমাত্র দিন রাত্রি, ঘণ্টা মিনিটের মাপকাঠিতেই পরিমাণ করা যায়?

যে ভাগ্যবন্তের জীবনরথচক্র অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে নির্দ্দিষ্ট মসৃণ পথে—'সময়' তাদের গলা টিপে ধরবার সুযোগ পাচ্ছে কোথায়? তাদের কাছে একটা বৎসরের অর্থ 'একটা'ই বৎসর, তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের বিরাট একটা সমষ্টি নয়!

যে বেচারাদের চলতে হয় এবড়ো-খেবড়ো আঁকা-বাঁকা পথে নিতান্ত ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে—তারাই জানে বৎসর কতো দীর্ঘ…আরো কতো দীর্ঘ 'পাঁচটা ছ'টা বৎসর'।

তাই ইতিহাসের উপাদান—ঘণ্টা নয়, ঘটনা। তাই ইতিহাসকারের লেখনী অনায়াস অবহেলায় বিশ-পঁচিশটা বছর অতিক্রম করে যেতে পারে একটি মুহূর্ত্তে—যদি সেটা হয় সংঘাত-সংগ্রামহীন শান্তির দিন।…

সে দিনের হিসাব কেবলমাত্র সাল-তারিখের হিসাব… তার জন্যে একটা ছত্রই হয়তো যথেষ্ট। আবার হয়তো—একটি দিনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে কেটে যায় কতো অজস্র দিন।

জীবনেতিহাসের লিখনভঙ্গীও কি তাই নয়?

বীণাপাণির নিটোল পরিতৃপ্ত জীবনের পাঁচ বছরের সঙ্গে তুলনা চলবে দুঃখিনী সুকৃতির বৈচিত্র্যহীন অচল অনড় পাঁচটি বছরের? তুলনা চলবে লীলার সঙ্গে রেবার—যার কাছে সাত থেকে বারো বছরে আসার অর্থ বার কয়েক জামা-জুতোর মাপ বদলানো মাত্র?

লীলার সঙ্গে রেবার সখিত্ব তাই কবির ভাষায় বলা চলে—'ভেঙে ভেঙে যায় মুছে মুছে যায় বারে বারে'। লীলার গাম্ভীর্য্যের বেড়া আর বীণাপাণির নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে করে কতোই আর অগ্রসর হতে পারে বেচারা? জয়ন্তর মতো স্বাধীন তো নয় সে! অতো চৌকসও নয়!

নইলে সুকৃতি দেবীর ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাধি যখন লীলাকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করিয়েছে—আর বিরহাকুলা রেবা সখী-সন্দর্শনের অভাবে নিতান্তই ম্রিয়মাণ, তখন কিনা জয়ন্ত কোন্ ফাঁকে আস-যাওয়া করে করে সে বাড়ীতে রীতিমত একটি কায়েমী আসন করে নিয়েছে!

কে জানতো—সুকৃতির জন্য ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, অযাচিত উপহারের ছুতোয় পথ্য জোগানো—জয়ন্তর 'ডিউটি'র মধ্যে পড়ে গেছে ইত্যবসরে?

উপযাচক হয়ে নিজেই একদিন জয়ন্ত বোনকে সংবাদটা দিলে—যদি বান্ধবীর রুগ্‌ণা জননীকে দেখতে যাবার ইচ্ছে থাকে রেবার, তো চলুক জয়ন্তর সঙ্গে। গাড়ী নিয়ে ঐ দিকেই যাচ্ছে সে।

—মাকে কিন্তু যেন বলে দিও না দাদা!—রেবা চুপি চুপি বলে—মা শুনলে বকুনি লাগাবেন।

—মাকে? পাগল হয়েছিস? আমি তো প্রায়ই যাই, বলি নাকি?

—তুমি প্রায়ই যাও? কোথায় দাদা?

—ওদের বাড়ী—দোষস্খালনের সুরেই কতকটা, জয়ন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করে কথাটা—বাড়ীতে ছেলে বলতে তো কেউ নেই, তিনটিই মেয়েমানুষ। আত্মীয়রা দেখে না—এদিকে অতোবড়ো একটা রুগী! কে একটু ওষুধ এনে দেয় তার ঠিক নেই।

—তুমি এনে দাও দাদা?—আনন্দমিশ্রিত বিস্ময়ে দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রেবার।

—মাঝে মাঝে ওদিকে গেলে দিই বইকি। বুড়ি কতো খুসী হয়।...বুড়ি—তোর বন্ধুর ঠাকুরমা রে!

—ওঃ। আহা দাদা, তুমি খুব ভালো সত্যি। আমার যে কতদিন থেকে একবার যেতে ইচ্ছে করে।...বেচারা লীলা ফার্ষ্ট হলো—অথচ নতুন ক্লাশে পড়তেই পেলো না! এই তো হাফ্ইয়ারলি এসে গেল প্রায়। আর কবেই বা আসবে!

রেবা ছেলেমানুষ, লীলার সঙ্গে একবয়েসী হলেও, স্বভাব-ধর্ম্মে অনেকটাই ছেলেমানুষ,—তবু লীলাদের বাড়ী এসে একটা জিনিষ আবিষ্কার করলো সে।

লীলার যেন কোথায় একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। বাইরের দৃশ্যেও অবশ্য বিরাট একটা পরিবর্ত্তন রয়েছে—ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরায়। নিতান্তই অভাবে পড়ে—নিজের বধূজীবনের স্মৃতি এক-আধখানা তোলাশাড়ী বাক্স থেকে বার করে দিয়েছিলেন সুকৃতি দেবী লীলাকে।...অনভ্যস্ত আগোছালো ভঙ্গীতে পরা শাড়ীতে হয়তো অপূর্ব্ব একটা শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিল তাকে, তবু তা' ছাড়াও আর একটু কিছু।

লীলার চোখে-মুখে এ ঔজ্জ্বল্য এলো কোথা থেকে? জননীর রোগশয্যাপাশে যেটা প্রায় বেমানান! লীলার গাম্ভীর্যের বেড়াটা কি একটু আলগা হয়ে যায়নি?...দূরত্বের যে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ছিল ওর মনের মধ্যে, সেটা যেন চিড় খেয়েছে।...এ লীলার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও অসম্ভব নয় হয়তো।

...আর দাদা?...দাদাটা দিব্যি 'মাসীমা' 'ঠাকুমা' ইত্যাদি পাতিয়ে ওস্তাদি করছে। কাণ্ডটা দেখো! সত্যি বলতে কি, একটু যেন ঈর্ষাই হয়ে পড়লো তার। যতোই বোকা আর যতো ভালমানুষ হোক, তবু মেয়েমানুষ! ও-বস্তুটার হাত এড়াবে কেমন করে?

কিন্তু ঈর্ষা না করেই বা উপায় কি?

দাদা তার পড়া বলে দিচ্ছে, কি অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছে—এ কল্পনা করতে পারে রেবা?...সেই দাদা কিনা লীলার স্কুল ছাড়ার ক্ষতি পূরণ করছে পড়িয়ে পড়িয়ে!...প্রাণখোলা প্রীতির সঙ্গে এ খবর সহ্য করা কঠিন বৈকি।

যাই হোক্, লীলাই তাকে অভ্যর্থনা করলো অন্তরঙ্গ সৌহার্দ্দ্যে।

তুই এসেছিস ভাই?...কতোদিন বলি তোর দাদাকে—

—দাদা রোজ আসে, না রে?

লীলা ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বলে—রোজ নয়। ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে তোর দাদার চেনা আছে কিনা, ভিজিট দিতে হয় না আমাদের। তাই—খবর টবর দিতে—

—ও মা, অতো ভয়ে ভয়ে বলছিস কেন ভাই? আমি তো আর কিছু বলবো না! মা না জানালেই হলো।...মানে, ইয়ে—দাদার এ বছর পরীক্ষা কিনা!

লীলার মুখ হঠাৎ একটু কঠিন দেখায়, বলে—পরীক্ষা বলে নয়, আমরা গরীব বলে। আমি জানি সে কথা, অনেকবার বারণও করেছি তোর দাদাকে। না শুনলে কি করবো?

—মা'র কথা ছেড়ে দে। মাকে লুকিয়ে কতো কাজ করি আমরা। বাবাই বলে সব কথা বলেন না!

—খুব রাগী, না রে?

—হুঁ। তোর মা কিন্তু মোটেই রাগী নয়, না?

—অসুখ তো!—লীলা গম্ভীরভাবে এই নৈর্ব্যক্তিক উত্তরটি দেয়।

—আমার মা তো অসুখ করলেই আরো বেশী রাগী হয়ে যান।...দাদা কোথায় গেল?

—থর্মোমিটারটা হঠাৎ ভেঙে গেছলো কাল, তাই একটা এনে দেবেন বলে—

—ও মা! দেরী করে যদি? দেরী করলেই কিন্তু মা'র কাছে বকুনি।

—শুধু বকুনি? প্রহার তো নয়?

—প্রহার! ইস্! সে বলতে পারিস দাদার কাছে। একটু কিছু করলেই ব্যস—বিনুনিতে টান।

স্কুলের কতো গল্প করবে বলে এসেছিল রেবা, কই—কিছুই তো হলো না?

রেবার দাদা এমন কী মূল্যবান হয়ে উঠলো হঠাৎ যে তাকে কেন্দ্র করে দুই সখীর বিরহান্তিক মিলনক্ষণটুকু নর্ম্মরিত হয়ে ওঠে? হয়তো অজ্ঞাতসারেই।

রেবার সহজাত 'মনরাখা' স্বভাব, হয়তো টের পেয়েছিল এ আলোচনা লীলার কাছে লোভনীয়।

আর লীলা?

তার নীরস শ্রীহান দিনগুলি হঠাৎ এমন মনোরম হয়ে উঠেছে কেন সেটা না বুঝেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—এলিয়ে দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিকে।···বিবেচনাহীন অন্ধ এই হৃদয়াবেগ কি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া লীলার?

জয়ন্ত ভেবেছিল সারাপথ বুঝি মুখর হয়ে উঠবে রেবা—সখীর আলোচনায়। কিন্তু তার অনুমান ব্যর্থ করে দিয়ে সারাপথ মুখ দিয়ে একটু 'টু' শব্দ পর্য্যন্ত করলো না রেবা।

মায়ের কাছেও টুঁ শব্দ করবে না জানা কথা। নিজেও জয়ন্ত নিজেকে খুব চালাক আর সাবধানীই ভেবে এসেছে এতদিন, কিন্তু মা'র কাছে সে যে এখনো কতো শিশু তা' ধরা পড়লো একদিন।

বীণাপাণি শুধু ছেলের গতিবিধির খোঁজ নিয়েই ক্ষান্ত হননি, লীলার ইতিবৃত্তও সংগ্রহ করেছেন ইতিমধ্যে। নিতান্ত একটা বালিকার ইতিবৃত্তই বা কি, এইটাই হয়তো ভাবা স্বাভাবিক—কিন্তু লীলার যে আগাগোড়াই অস্বাভাবিক। গ্রস্তোদিত সূর্য্যের মতো তার জীবন কুৎসিত কলঙ্কের গ্লানিতে মলিন, মৃত্যুবিবর্ণ।···

ভাগ্যবিধাতার এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে মাথা হেঁট করে অন্ধকারের অতল গহ্বরেই কি মিলিয়ে যাবে লীলা? না রাহুমুক্ত সূর্য্যের মতো নিজের মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে কোনোদিন?

বীণাপাণির মহামুস্কিল! দরকারমতো সময়ে যে স্বামীটিকে পাবেন তার জো নেই। সদাই কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য কাজকারবারের উন্নতি হওয়া ভালো বৈকি, কিন্তু তা' বলে সংসারটাকেও তো ভাসিয়ে দেওয়া চলে না!

স্ত্রীর সঙ্গে একটা পরামর্শ করবার সময় থাকবে না—এই বা কেমন কথা? এই যে বীণাপাণি ছেলের সমস্যা নিয়ে হাঁপিয়ে মরছেন—তার কি কিছু বিহিত করা দরকার নয়?

অবশ্য যতো কর্ম্মব্যস্ত স্বামীই হোন, সমাজব্যবস্থার সভ্য এবং ভদ্র নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট খানিকটা সময় স্ত্রীর করলে না পড়ে উপায় নেই তাঁর, কিন্তু সেখানেও আছে এক প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক।

ঘুম!

ঘুম, না যম! সাময়িকভাবে হলেও তার ব্যবহারটা প্রায় যমের মতোই নিষ্ঠুর আর অমোঘ নয় কি? কেমন অনায়াসে মানুষকে চলতি জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়ে! কিছুক্ষণের জন্যে বটে, কিন্তু সেই 'কিছুক্ষণ' টুকুই যে স্ত্রী বেচারাদের একমাত্র 'পরম ক্ষণ'।

অতএব তেমন দরকার পড়লে ঠ্যালা মেরে মেরেও নিদ্রাভিভূত স্বামীকে ঘুমের বাড়ী থেকে ফিরিয়ে আনা ভিন্ন উপায় কি?

রবীনবাবু বারকয়েক ঠ্যালা খাওয়ার পর নিতান্তই হতাশ হয়ে উঠে বসে প্রশ্ন করেন—কি বললে? জয়ন্ত রেবার সেই বন্ধুর বাড়ী প্রায়ই যায়?

বীণাপাণি স্বামীদেবতার উপবিষ্টমূর্ত্তি দর্শনে কিঞ্চিৎ প্রীত হয়ে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলেন—তবে আর বলছি কি? আজ বলে নয়—সেই গোড়া থেকেই যাওয়া-আসা বজায় রেখেছে। সে তো হয়েও গেল প্রায় আট-দশ মাস।

রবীনবাবু এবার যেন ঈষৎ সচেতন হন:

—হঠাৎ ওদের বাড়ী যাওয়া আসার দরকার কি পড়লো?

—দরকার বললেই দরকার। ওদের বাড়ীতে না'কি বেটাছেলে বলতে কেউ নেই, এমন অবস্থা নয় যে চাকর-বাকর রাখে, এদিকে মা-টা বারোমেসে রুগী। তাই উনি বাবু পরোপকারী মহাপুরুষ, তাদের দেখাশোনা করেন, ডাক্তার বদ্যি ডেকে দেন—এই সব।

রবীনবাবু আশ্বস্তচিত্তে বলেন—ওঃ তাই! তা' ছেলেটার যদি প্রাণে একটু মায়া মমতা থাকে, সে তো' ভালো কথা। আজকালের ছেলেদের তো ও বালাই থাকে না।

—তুমি বেশী বোকো না। মায়া-মমতা! হুঁঃ! বলি—তোমার আমার অসুখ করলে একটু কাছে এসে বসতে দেখেছ কোনোদিন? লোক বুঝে মায়া-মমতা! নিজের পেটের ছেলে হ'লেও বলি—ওই ছুঁড়ির রূপ দেখেই তোমার ছেলের পরোপকার-প্রবৃত্তি উথলে উঠেছে।

—আঃ, কী যে বলো!—রবীনবাবু মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন—মুখের কোনো আটক নেই তোমার। বাচ্ছা একটা মেয়ে, আর এদিকে খোকা! ভারী বয়স হয়েছে ওর, তাই—

—দেখো, তুমিও বেশী বোকা সেজো না। আঠারো-উনিশ বছর বয়েস একবারে খোকার বয়েস, না?···আর মেয়েমানুষের বারো-তেরো কিছুই নয়, কেমন? আমায় বিয়ে করে এনেছিলে কতো বড়োটি?

—জানি না। সরো, ঘুম পাচ্ছে ভীষণ।

—তা' পাবে বৈকি। আমি কথা কইতে এলেই তোমার ভীষণ ঘুম পায়। কিন্তু আমি বলছি এ সব ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া নেহাৎ বোকামি।···রেবা একদিন একটু পড়া জানতে চাইলে—বাবুর সময় হয় না, আর সেই মেয়েটাকে রোজ নিয়ম করে পড়াতে খুব সময় হচ্ছে। এর মানে কি?

রবীনবাবু আর একবার ঈষৎ চকিত হয়ে বলেন—এতো কথা তোমায় বললে কে?

—নিজেই স্বীকার করেছেন বাপধন! আমার জেরার মুখে ও তো কোন্ ছার, ওর বাপ পারুক দিকি দাঁড়াতে?

—আহা সে তো পরীক্ষিত সত্য। সে তো স্রোতের মুখে তৃণখণ্ড মাত্র। যাক্‌গে—বেশী মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিও না হয়।

—দেখো, তুমি আর বেশী 'ইনোসেন্ট' সেজো না। শুনলে গা জ্বলে যায় আমার। আমার নিষেধে তো সবই হবে! কথায় বলে "সমুদ্রে বালির বাঁধ"। বরং তোমারই উচিত একটু দাবড়ানি দেওয়া।

—আমি ও সব বলতে পারবো না।—বলে গুছিয়ে শুয়ে পড়েন রবীনবাবু।

—তা' পারবে কেন?—বীণাপাণি মুখখানি যতোটা সম্ভব কুশ্রী করে বলেন—যতো দায় আমার! বেশ, তাই ভালো, যা পারি আমিই করবো। তখন কিন্তু আমার কাজের সমালোচনা করতে এসো না।

—বাঃ, তুমি যদি সেই গরীব বেচারাদের বাড়ী গিয়ে কিছু বলে আসো—তা' হলে?

—আমি অমন যার তার বাড়ী যাই না, বুঝলে? বাড়ী বসেই সবাইকে 'টিট্' করতে পারি।

—'তা তো পারোই। সে কথা আমাকে আর নতুন করে কি বুঝোবে? তবে—কথা হচ্ছিল—মেয়েটি তো বেশ সুন্দরী, আমাদের স্বজাতিও বোধ হয়, বৌ করলেই বা মন্দ কি?

—আহা, কি কথাই বললেন! জাতকুলের ঠিক হলো না, বৌ করবো! কলকাতায় বড়মাসীকে চিঠি লিখে সন্ধান নিচ্ছি আমি সমস্ত। যদি তেমন দরকার পড়ে, ওদের বাড়ী যেতেই পেছপা হবো না কি?

—আচ্ছা বটে! খামোকা কী এক অদ্ভুত সন্দেহ পুষে বসে আছো!

—ওগো মশাই, বীণাপাণি অতো ভূত নয়। কিছু কিছু খবর পেয়েছি আমি। 'খোকার মা' আগে নাকি ওই মেয়েটার কাকার বাড়ী কাজ করতো। চুপি চুপি বলেছে আমায়, ও মেয়ে কুড়োনো মেয়ে।···বাড়ীর মেজ-বৌটা বুঝি বাঁজা ছিল, তার ওপর বিধবা হয়ে কেঁদে কেটে বেড়াতো—একদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে কি ক'রে যেন মেয়েটাকে পায়। শোকাতাপা বলে কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু ছাওর ভাসুর সেই থেকে আলাদা করে দিয়েছে বৌটাকে।···বছর ছ' সাত আগের কথা এ সব।

—আলাদা করবার কারণ? সমাজ রসাতলে যাচ্ছিল?

—তোমার তো সকলকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। সত্যিই তো, সমাজ বলে কিছু নেই না কি? পথের একটা মেয়ে—কি জাত কি গোত্তর, ভদ্দর ঘরের কি খারাপ ঘরের—হিসেব আছে কিছু? জাতজন্মের ঠিক থাকলে কি আর অমন বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরেই বেড়ায় পথে পথে?

—অতএব তাকে পথেই বার করে দাও, কেমন?···ওই মেয়েকেই আমি খোকার বৌ করবো।—বলে আলোচনার ওপর যবনিকা টেনে দেবার ভঙ্গীতে পিছন ফিরে শোন রবীনবাবু।

আর বীণাপাণি?

'আহতা ফণিনী'—না কি-একটা কথা আছে যেন?

ফণিনীর মতোই মনে মনে ফুঁসতে থাকেন তিনি।

বটে! আচ্ছা! স্বামী পুত্তুর দু'জনকেই দেখে নেবেন তিনি।···অথবা তাদের দেখিয়ে দেবেন নিজের ক্যাপাসিটি।

'খোকার বৌ করবেন'! ঈস্! বৌ করবার কত্তা তুমি! বরং ছেলের বিয়ে না হয় তাও ভালো, তবু পথে-কুড়োনো মেয়ে? গলায় দড়ি।

১৮

মিট্‌মিটে হ্যারিকেনের আলোয় বইয়ের অক্ষর দেখা বিদ্যুদালোকে অভ্যস্ত চোখের পক্ষে যথেষ্টই কষ্টকর—কাজেই মাথাটাকে আলোর আরো কাছাকাছি হেঁট করতে হয় জয়ন্তকে।···কিন্তু মুস্কিল এই, আরো একটা মাথা সেই কর্মেই নিযুক্ত।

অতএব?

ঠুকে যাওয়া ছাড়া উপায় কি?···বারেবারেই ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। তিনবারের বার অপর মাথার অধিকারিণী

অপ্রতিভ হবার পরিবর্তে হঠাৎ মুখ তুলে একটু হেসে বলে ওঠে—শিঙ বার না করে ছাড়বেন না বুঝি?

উত্তরে জয়ন্তও হাসবে বৈকি। না হেসে থাকা যায়?

···মন্দ কি? শিঙ বেরোলে কেমন দেখতে লাগে দেখা যেতো।

—বেরোলে আপনারই বেরোবে।

ঈস্! কেন শুনি?

···কারণ আপনিই ইচ্ছে করে ঠুকছেন।

—ইচ্ছে করে? তার মানে? এ যে অন্যায় দোষারোপ। ইচ্ছে করে মানুষে মাথা ঠোকে?

—মানুষে ঠোকে কিনা জানি না, আপনি তো ঠুকছেন দেখছি।

—বেশ, তার মানে আমি মানুষ নই, কেমন?

···বাঃ, আমি বুঝি তাই বলছি!···আচ্ছা, এখানটা আর একটু বুঝিয়ে দিন।

···থাক্ গে, আজ আর পড়ে না।

লীলা আর একবার অনুচ্চস্বরে হেসে ওঠে—রোজই তো "থাক্‌গে"! কষ্ট করে তবে আর আসেন কেন রোজ রোজ?

—আসি কেন?—জয়ন্ত এক মিনিট চুপ করে থেকে বলে ওঠে—আসতে ভালো লাগে যে! না এসে থাকতেই পারি না!···শুনে রাগ করলে?

—কেন? রাগ করবো কেন?

—লীলা!

হঠাৎ আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে লীলার। কতোবারই তো ডাকে জয়ন্ত, কিন্তু এমন অদ্ভুত গভীর স্বরে তো নয়!···আজ কেন?

—লীলা!

—কি বলছেন?

—লীলা, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে।

কেমন একটা অসহায় অবোধ-দৃষ্টিতে তাকায় লীলা। বোধ হয় আর একবার কেঁপে ওঠে। বালিকাচিত্তে সদ্যোজাত কৈশোরের অনুভূতি কি এমনি অস্বস্তিকর?···প্রায় আতঙ্কের মতো?

—লীলা, বড়ো হ'লে আমি তোমাকেই—

··· ··· ···

ও কি, ঘরের মধ্যে বাজ পড়লো না কি?

—খোকা!

—মা! তুমি?

—হ্যাঁ আমি। অমন বোকার মতো তাকাচ্ছো কেন? চিনতে পারছো না? যাও—বাইরে গাড়ী রয়েছে, বোসো গিয়ে।···কী, বসে রইলে যে চুপ করে? যাও।

—যাচ্ছি, তুমিও যাবে তো?

অনেক কষ্টে এইটুকুই সুধু বলতে পারে জয়ন্ত।··· মায়ের ভয়ে একেবারে 'জুজু' ছেলে অবিশ্যি নয় সে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা যে নিতান্তই বিভ্রমকর।···বীণাপাণি যে হঠাৎ নিজে এসে হানা দেবেন, এ আবার কবে ভেবে রেখেছিল বেচারা?···মা'র আদেশ পালনার্থ চলে যেতে পারলে অবিশ্যি খুবই ভালো হতো, মা'র চোখের সামনে থেকে কেটে পড়লেই বাঁচা যায়, কিন্তু এদিকে যে আর একটা সমস্যা।

তুলনা করা ভালো দেখায় না—কিন্তু বাঘিনীর মুখে হরিণশিশুর মতো, বীণাপাণির খর্পরে বেচারা লীলাকে ফেলে রেখেই বা যায় কি করে প্রাণ ধরে? তা' ছাড়া বীণাপাণির তো রাগলে জ্ঞান থাকে না। হয়তো সুকৃতি দেবীকেই বা কি না-জানি বলে বসেন! গরীব হ'লেও যে সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌ তিনি—এ কথা কি বীণাপাণি মানবেন? বীণাপাণির অভিধানে তো গরীব মানেই ছোটলোক।

এটুকু বুঝতে বাকী নেই জয়ন্তর—বীণাপাণি যেভাবে সাঁজোয়া গাড়ী চড়ে আগাগোড়া ভঙ্গীতে রুদ্রমূর্তিতে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা'তে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙানো জয়ন্তর এই শেষ!···তবে? পরিণামটা না দেখেই চলে যাবে?

অতএব উঠবার আগে লীলার পাঠ্যপুস্তক আর খাতা পেন্সিলগুলো নিয়ে হেঁটমুণ্ডে এমনভাবে গোছাতে সুরু করে দেয়, যেন তারই ভারী দরকারী জিনিষ এ সব।

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে একবার সে দিকে তাকিয়ে বীণাপাণি রুক্ষ-কণ্ঠের স্বরে লীলাকে প্রশ্ন করেন—তোমার মা কোথায়?

বীণাপাণির বিপুল দেহভার এবং আন্দোলিত বৃক্ষকাণ্ডের মতো 'বাহুলতা'র আন্দোলন দেখেও আজ আর হাসি আসে না লীলার, শুষ্কস্বরে বলে—মা'র অসুখ।

—অসুখ তা' জানি, আছেন তো কোনোখানে? না কি হাঁসপাতালে গেছেন?

—মা!···

জয়ন্তর কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর। না, এদের উপর মায়ের এই ইচ্ছাকৃত অপমান চুপ করে সহ্য করা উচিত নয়।

বীণাপাণি অবশ্য গ্রাহ্য মাত্র করেন না জয়ন্তর প্রতিবাদ, একটু উঁকি মেরে পাশের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ান।

—এই যে, আপনারই বুঝি অসুখ?

সুকৃতি দেবীর উত্থানশক্তি থাকলে এতোক্ষণ ওঘরে যেতেন সন্দেহ নেই, নিতান্ত অপারগ বলেই কাণ খাড়া করে পাশের ঘরের ঘটনাটা অনুধাবন করবার চেষ্টা করছিলেন। খোদ বীণাপাণিকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করেন।

—থাক্ থাক্, উঠতে আর আপনাকে হবে না।···তা' বারো মাসই যে ভোগেন, রোগটা আপনার কি?

সুকৃতি ক্ষীণস্বরে যা বলেন তার মর্ম্মার্থ বোধ করি রোগ একটা নয়, নানাবিধ। তবে বীণাপাণি যে মর্ম্মগ্রহণ করতে খুব বেশী আগ্রহান্বিত তা' মনে হয় না।

সুকৃতি যখন অনেক চেষ্টায় স্বর উঁচু করে লীলাকে ডাক দেন বীণাপাণিকে বসবার যোগ্য একটা আসন দিতে, তখন গম্ভীরভাবে বলেন—থাক্ থাক্, বসতে আমি আসিনি আপনার বাড়ী, নিতান্ত বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে। কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি—রোগে না হয় শরীরেই ঘুণ ধরে, বুদ্ধিতেও কি ঘুণ ধরেছে আপনার?

সুকৃতি দেবী শঙ্কিত দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকেন।

—অবুঝের মতো তাকিয়ে আছেন এই আশ্চর্য্য! বলি ভাই, এটা তো বিলেত নয়, আমরাও মেমসাহেব নই।

আক্রমণকারিণী যে জয়ন্তর মা, সেটা অবশ্য সুকৃতি দেবীর বুঝতে বাকী ছিল না. কিন্তু দেরী হচ্ছিল তাঁর আক্রমণের কারণটা বুঝতে।...তাঁর নিরুত্তর অবস্থার দিকে তাকিয়ে বীণাপাণিই আবার কথার 'খেই' ধরেন—এই যে আমার ছেলেটির সঙ্গে আপনার মেয়েটির এতো মেলামেশার ঘটা, এটা কি খুব ভালো' হচ্ছে ভাই? মনে কিছু করবেন না—আপনার আস্কারা না থাকলে—

—আপনার ছেলের গুণের শেষ নেই দিদি, গরীবের ওপর দয়া করে আসে যায়, কতো উপকার করে, মুখে আর কি বলবো দিদি! এমন ছেলে হয় না।

—ও সব ছেঁদো কথা শুনতে আমি আসিনি। সুধুই আপনার ওপর দয়া করা হ'লে, কতো উপকার করতো—

—সে আমি মা, আমার আর জানতে বাকী নেই। কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলের জাতকুল খেয়ে উপকারের শোধ দেবেন না—এইটুকু বলতেই আসা আমার।

—আপনার কথা বুঝতে পারছি না দিদি।

—বুঝতে কেন পারবেন না, মনে মনে খুব বুঝছেন, বেশী বুঝিয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে আর চাইছিলাম না, কিন্তু—

কথা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে শরৎশশীর কণ্ঠ শোনা যায়—

—এটি কে বৌমা? কার সঙ্গে কথা বলছো?

—মা এসেছেন?...সুকৃতি যেন অকূলে কূল পান—ইনি আমাদের জয়ন্তর মা,...দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—তা' আমার এমন ভাগ্য—

শরৎশশী হরিনামের মালাটা ঝোলায় পুরে আর একটু এগিয়ে এসে বলেন—এসেছো মা? তা' বেশ করেছো, কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন? ওলো ও লীলা, একটা তোদের চেয়ার মেয়ার এনে দে না!

বীণাপাণির দেহভঙ্গিমা দেখে মাদুর সতরঞ্চির কথা বলতে আর সাহস পান না।

—থাক্ থাক্, আমি এখুনি যাবো—

—ও মা, সে কি কথা, পায়ের ধুলো যখন দিয়েছো—একটু বসতে হবে বৈকি। এই তো বাড়ীর দশা আমার, বৌটি ওই রুগণ, দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, তোমার ছেলেটি বাছা বড়ো ভালো, গুণের তুলনা হয় না।

—তাই বুঝি নাতজামাই করবার ইচ্ছে হয়েছে?—তীব্র আর কুটিল একটা হাসির সঙ্গে বিষাক্ত স্বর সম্বলিত এই কথাটি উচ্চারণ করেন বীণাপাণি।

শরৎশশী কি বোঝেন কে জানে! বীণাপাণির আবির্ভাবটাকে কি আশাপ্রদ মনে করেন? তাই হাসির আভাসমাখা সুরে বলেন—আমাদের কি আর এতো ভাগ্য হবে মা?

—হবে না কেন?...বীণাপাণির মুখে সেই কঠোর কুটিল হাসি—বামুনের ঘরের ছেলে, বামুনের ঘরের মেয়ে, 'বে থা' হতে আর বাধা কি? তবে আপনার নাতনীর ঠিকুজিকুষ্ঠিখানা একবার দিতে পারবেন কি?

শয্যাগত মনুষটার চাইতে দাঁড়ানো মানুষটাকে বেছে নেন বীণাপাণি অস্ত্রনিক্ষেপের ক্ষেত্র হিসেবে। বয়সের ব্যবধানটাকে অবশ্য গ্রাহ্য করেন না।...গরীব, তা'তে বিধবা, তার আবার মানমর্য্যাদা!

শরৎশশী আচমকা 'ঠিকুজিকুষ্ঠি'র প্রস্তাবে থতমত খেয়ে বলেন—ঠিকুজি? তা' বিয়ে দিতে গেলে এস সব তো চাই।

—হ্যাঁ তাই তো বলছি, তা' দেবেন কোথা থেকে? আচায্যি পুরুত ডেকে তৈরী করিয়ে বোধ হয়?

—মা!...সুকৃতি দেবী দুর্ব্বল হ'লেও দৃঢ়স্বরে বলেন—ওঁকে বলুন মেয়ে আমার নেহাৎ নাবালিকা, এখুনি বিয়ের কথা কি?

—আপনার বৌ বোধ হয় ভেবেছেন ছেলের সঙ্গে ওঁর ওই পথেকুড়োনো মেয়েটির বিয়ে দেবার চেষ্টাতেই বাড়ী বয়ে এসেছি আমি। তা' যদি ভেবে থাকেন—

—দয়া করে চুপ করবেন আপনি?—আর্ত্তস্বরের মতো শোনায় সুকৃতির আবেদন।

বীণাপাণির পিছনে যে দু'টি ছায়া দেখা যাচ্ছে, সেই কিশোর দু'খানি মুখে দু'জোড়া অবাক-ব্যাকুল দৃষ্টি কল্পনা করে মরীয়া হয়ে ওঠেন সুকৃতি দেবী।

কিন্তু বীণাপাণি সত্যি কিছু আর বেড়াতে আসেননি, তাই এইটুকুতেই থেমে যাবেন।

—চুপ করবো বৈকি, বলবারই বা দরকার কি ছিল আমার? রাস্তা থেকে হাড়ি-বাগ্দীর মেয়ে কুড়িয়ে এনেই পুষুক না কেউ, আমার কি? কিন্তু আমার ছেলেটিকে তো বিলিয়ে দিতে পারি না ভাই? যে মেয়ের জন্মের ঠিক নেই, তাকে বৌ করে ঘরে তোলবার প্রবৃত্তি অন্তত আমার নেই।

মেয়ের রূপ দেখিয়ে ঢের পাত্তর জোটাতে পারবেন, গরীবের সবেধন নীলমণিটুকুর লোভ ছাড়ুন। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম বলে কিছু কি নেই?

মা!—জয়ন্তর তীব্র ডাক শোনা যায়—কী বকছো—পাগলের মতো!

—তা' আমাকে পাগল বলবি বইকি? মনে জেনো খোকা, তোমার মা না জেনে শুনে কাউকে এক কথা বলতে যায় না।···এই তো সামনেই রয়েছেন দু'জন; বলুন দিকিন কেউ, ওই মেয়ে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া কি না?···কি গো বাছা, তুমিই নিজে বলো না? নেহাৎ অজ্ঞানের বয়েসে তো আর আসোনি?···তোমার সেই মা না দিদিমা, ভগবান জানেন, মনে পড়ে না তাঁর কথা? প্রথম দিন দেখেই এক নজরে চিনেছি আমি। ভাবলাম, মরুকগে—আমার কি? ও মা, আমার ঘরেই সিঁদকাটার চেষ্টা!···বলি আপনিও তো আছেন একজন বুড়োমানুষ, হরিনামের মালা হাতে' বলুন দিকি সাত্যি-মিথ্যে। এ মেয়ে আপনার বৌয়ের পেটের মেয়ে, কি পথে-কুড়োনো মেয়ে?

শরৎশশী ইতস্তত করে বলেন—তা' মানুষের কি পালিত ছেলেমেয়ে থাকে না মা? তা'তে এতো দোষেরই বা কি আছে?

বীণাপাণি কথায় হারবেন এটা আশা করা যায় না, তাই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেন—থাকার দোষ নেই মা, নির্দ্দোষ ভদ্রঘরে চালাবার চেষ্টা করাই দোষ।

সুকৃতি দেবী কাতরভাবে বলেন—মা, ওঁকে বলে দিন্ আমরা কাউকে কোথাও চালাতে চাই না, উনি ওঁর ছেলে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যেতে পারেন। আমরা গরীব, একপাশে পড়ে আছি—

—মা!—জয়ন্ত দ্রুতকম্পিত স্বরে বলে—তুমি বাড়ী যাবে না? আমি গাড়ী নিয়ে চলে যাচ্ছি—

এই অস্বস্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে তার পক্ষে।

কিন্তু বীণাপাণি আজ স্থির করে এসেছেন ছেলের মন থেকে যাতে এ মোহটুকু একেবারেই মুছে যায়। উল্টে নিজেই তিনি দোষী সেজে বাড়ী ফিরবেন না কি? তা' হলে তো সহানুভূতিতে গলে গিয়ে ছেলে এই দিকে বেশী করে 'ঢল' নামাবে।···না, মায়া দয়া চক্ষুলজ্জা কিছু নয়। অন্তত নিজের মানটা রক্ষা করতেও। তাঁর এই অভিযানটা যে নিতান্তই এক মহাপাপের বিরুদ্ধে সেটা প্রমাণ করতে না পারলে? তাই কণ্ঠস্বরে আত্মীয়তার দরদ মাখিয়ে শরৎশশীর দিকে ফিরে বলেন—আপনি তো বামুনের ঘরের বিধবা, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলে আছে তো কিছু? ঘরে থাকলে ও মেয়ের হাতে কি জল খেতে হবে না আপনাকে?···এই যে লীলা—না কি, তুমি বাছা একটু ওদিকে যাও দিকিন, 'হাঁ' করে সব শোনবার দরকার নেই।···ও মা, এ মেয়ে যে নড়ে না দেখি।···মরুকগে—বছর ছ'সাত আগের কথা বলছি, আমার মাসতুতো ভাইয়ের 'সম্বন্ধ' হয়েছিল এক জায়গায়। বলেছিল তো কোথাকার যেন জমিদার, তা তেমন জমিদারী আমার মাসী সাতবার কিনতে পারেন। সে যাক্—'কনে' দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি আপনাদের এই লীলাকে।···বলি শুনুন তবে—সেখানে গিয়ে এক কীর্ত্তি!···কর্ত্তা নেই, শুধু গিন্নী আর সেই মেয়ে—যাকে দেখতে গিয়েছিলুম আমরা। বললে—'ওই একমাত্র মেয়ে, দু'বছরের বিয়ে বিধবা'···ও মা, বললে বিশ্বাস করবেন না সেই মেয়ে, আর এই আপনাদের লীলা—তখন বোধ হয় বছর সাতেকের হবে—দুটিতে যেন এক ছাঁচে গড়া।···অবাক হচ্ছেন বুঝি? এই মেয়ে যে সেইখানেই ছিল গো। এটি না কি তাঁর ভাইঝির মেয়ে! হ'লেই হ'লো? সে ভাইঝিকে যদি দেখতেন—যেন কালো-কুমড়ো। এককলমে লিখে দিতে পারি এ মেয়ে তার গর্ভে হ'তেই পারে না।

শরৎশশী অস্ফুটকণ্ঠে বলেন—তা' কালো মানুষের কি আর সুন্দর ছেলেমেয়ে হয় না বাছা?

—'হয় না' কি আর? হয়।···কিন্তু আর একজনের ছাঁচে হবে কেন গা? জমিদার-গিন্নীটির কাছে দু'টি মেয়েকে বসিয়ে দিলে কারুর আর কিছু বুঝতে বাকী থাকে না।···

বীণাপাণি চোখে মুখে একটা গোপন রহস্যের আভাস ফুটিয়ে তুলে একটা কুৎসিত ফিস্‌ফিস্ স্বরে বলেন—বড়ো-ঘরের বড়োকীর্ত্তি আর কি! অল্পবয়সে বিধবা তো?···তা' হলেই বুঝুন! কী আর করেন—এ মেয়েটাকে ভাইঝির মেয়ে বলে চালিয়ে আসছিলেন।···বাবা—সকলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। আমাদের দেখেই সন্দেহ হ'লো—কথার ছলে জেরা করে দেখলাম এর কথা বলতে একেবারে নারাজ।···সামনে আসতেই দেয় না! আচ্ছা বাপু, ভেতরে পাপ না থাকলে—

—মা, ওঁকে বলুন, উনি যা জানেন তা' শোনবার আমাদের দরকার নেই—কাতর অথচ দৃঢ়স্বরে বলে ওঠেন সুকৃতি দেবী—লীলা আমার মেয়ে, আর কোনো কথা নয়।···

উত্তেজনায় উঠে বসেন সুকৃতি দেবী।

কিন্তু শরৎশশীর কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে।···রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েটাকে এনে মাথায় করে নাচা প্রথম দিকে নিজেরই তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। ছেলে হ'লেও কথা ছিল, একটা মেয়ে! তবু কেবলমাত্র সদ্য-বিধবা বধূর সান্ত্বনার্থেই সয়ে নিয়েছিলেন সেই অসামাজিক কাণ্ড!···ওই মেয়েটার জন্যেই আরো দুই ছেলে তো তাঁর পরই হয়ে গেল। তথাপি

নেহাৎ দূরছাই করতে পারতেন না—প্রধানত বিধবা বৌয়ের মুখ চেয়ে, দ্বিতীয়ত মেয়েটার অসামান্য সৌন্দর্য্য।···রূপ জিনিষটা এমনই মারাত্মক!

আজ এখন বীণাপাণির মুখে এই সব গূঢ়রহস্যের কথা শুনে হঠাৎ যেন নিজেদের দিকটা কেমন দুর্ব্বল ঠেকে, তাই সুকৃতির মতো বীণাপাণির মুখ বন্ধ করে দেবার দৃঢ়তা খুঁজে পান না। বরং পুত্রবধূর উপর একটা অভিযোগের ভাব আমদানী করে বলেন—শোনবার দরকার একেবারেই নেই, তাই বা কেন বলছো বৌমা? ইনি যখন সব জেনে খোঁজ নিয়ে আমাদের হিত করতেই বলতে এসেছেন, তখন শুনতে দোষ কি?···সত্যিই তো, মেয়ে জিনিষ—একদিন-না-একদিন বিয়ের চেষ্টাও করতে হবে তো? তখন?

—তখনকার কথা ভাববার শক্তি আমার নেই মা, লীলার বিয়ে দেখবার আশাও নেই, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

সুকৃতির কথার উত্তরে শরৎশশীর অসন্তোষ বাড়ে বৈ কমে না, এবং কণ্ঠস্বরে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেন না, বলেন—খুব কথাই তো বললে বাছা—তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—আর আমার আস্ত দিন তোলা আছে, কেমন?···তা' অবিশ্যি তাই থাকবে, ঘোর কলির দাপট চলছে বৈ তো নয়!···তোমার ওই 'সখের কাজল' গলায় গেঁথে মরবো বুড়ো বয়সে—এই আর কি!

—আমি মরলে ওকে তাড়িয়ে দেবেন—বলে ধপাস্ করে আবার শুয়ে পড়েন সুকৃতি দেবী। নিতান্ত উত্তেজিত ভাবেই পড়েন।

লীলা জয়ন্ত অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কুৎসিত আলোচনাগুলো শুনছে মনে করে যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে তাঁর।···ধূমকেতুর মতো কোথা থেকে এসে উদয় হলেন এই গর্ব্বিতা স্ত্রীলোকটি।

আজ পর্য্যন্ত লীলার সামনে কোনোদিন কি উচ্চারিত হয়েছে লীলা কুড়োনো মেয়ে, লীলার জন্ম-ইতিহাস রহস্যে আবৃত?

—তাড়িয়ে দেওয়ার কথা তো হচ্ছে না বৌমা, অবুঝের মতো রাগ করছো কেন? বিয়ে তো একদিন দিতে হবে? কুল শীল, গণ গোত্র, সব না জেনে কে বিয়ে দেবে?···তবে হ্যাঁ, প্রমাণ চাই বৈকি।

বীণাপাণি গর্ব্বিতভাবে বলেন—প্রমাণ চান সবই দেখাতে পারি। তলে তলে নাড়ীনক্ষত্র সব কিছুর খবর নিয়েছি আমি···আমরা তো তখন সেই সন্দেহে মেয়ে যথেষ্ট পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে ভেঙে দিলাম, তারপরেই কাণাঘুসো শুনলাম—সেই দিনই না কি ছোটো মেয়েটা 'হারিয়ে গেছে'। পথ নয়, ঘাট নয়, ঘর থেকে।···জলজ্যান্ত একটা মেয়ে ঘর থেকে হারিয়ে গেল? এ কি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো?···তা' নয়, বুঝলে—এটাকে আর পুষে রাখলে আসল মেয়েটার বিয়ে দেওয়া দায় হবে, তাই দিলে কোনোখানে পাচার করে। সে আজ ছ'বছরের কথা। এখন আপনারা হিসেব করুন কবে পেয়েছেন ওকে?···

হিসেব করা আছে শরৎশশীর, ছেলে মারা যাওয়ার মাস দুই পরের কথা। না, সন্দেহের কিছু নেই।···তাই ব্যগ্রভাবে বলেন—হ্যাঁ, তা' সেই রকমই।···তা' হ্যাঁ গো মা, তাদের নাম ঠিকানা কিছু জানো না?

—নাম টাম অতো জানি না, 'ভবানীপুর পদ্মপুকুর' এই ঠিকানা ছিল। দেশ হচ্ছে কাটোয়ার কাছে, না নদে জেলার কোথায় যেন এখন শুনলাম—মেয়েটার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে, মা মাগী কাশীবাস করছে।···করবেই তো, ও সব চরিত্রের মেয়েমানুষের শেষগতি কাশী ভিন্ন আর কি? সেই যে কথায় বলে—"তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন"—

সুকৃতি দেবী হতাশ হয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরান।

বীণাপাণি এইবার সাফল্যগর্ব্বে উদ্ভাসিত মুখে ছেলের সন্ধানে এদিকে মুখ ফেরান···কিন্তু কোথায় জয়ন্ত? নিঃশব্দে কখন বেরিয়ে গেছে কে জানে!

আর লীলা?

একদা—দোতলা একখানা বাড়ীর রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে বছর সাতেকের একটা মেয়ে যেমন করে নিরুপায় আক্রোশে পরণের জামাটা দাঁতে চিবিয়ে শতছিদ্র করে ফেলতো, তেমনি নিষ্ঠুর দংশনে জর্জ্জরিত করে ফেলেছে লীলা পরণের শাড়ীখানার মোচড়ানো আঁচলটা।

সুকৃতির ছেলেবেলাকার গোলাপী মাদ্রাজী শাড়ী।

সে মেয়েটা যেমন করে লোহার রেলিঙে 'ঠাঁই ঠাঁই' করে মাথা ঠুকে দেখতো কতোটা লাগা সহ্য করতে পারে সে, তেমনি করে লীলাও হয়তো এখুনি নিজের মাথাটাকে পরীক্ষা করতে বসবে···জানালার লোহার গরাদের ওপর।

বাড়ী এসে বীণাপাণি প্রথমটা ছেলের ঘরে উঁকি মেরে দেখলেন ঘরে উপস্থিত আছে কি না। না দেখে কিছুটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মেয়েকে ডেকে প্রশ্ন করেন—তোর দাদা বাড়ী আসেনি?

রেবা বেণী দুলিয়ে গাল ফুলিয়ে বলে—দাদা? এই তো এলো একটু আগে। আমি ডাকলাম তো, কথাই কওয়া হ'লো না বাবুর।···হাঁড়ির মতন মুখ করে ছাতে চলে গেল।···একজামিনের রেজাল্ট বেরিয়েছে নিশ্চয়। হুঁঃ বাবা' খবর বেরোবার আগেই বাবু গ্র্যাজুয়েট হচ্ছিলেন যে, এখন?

—থাম্, মেলা বক্‌বক্ করিসনে—বলে বীণাপাণি নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েন।

যথেষ্ট পরিশ্রম করা হয়েছে বাবা। যাক্, তবু একটা কাজের মতো কাজ হ'লো। উঃ, কম খেটেছেন এর জন্তে? মাসীমাকে চিঠি লিখে—তাঁকে দিয়ে তাঁর সেই কে যেন সাতসম্পর্কের ভাসুর না দ্যাওর বিশ্বনাথবাবু, তাঁর কাছে খবর নিয়ে এ সব তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। বিশ্বনাথের গিন্নী নিজেই তো সেই তখন আঁচে ইঙ্গিতে জানিয়েছিল, অনেকদিনের কথা হ'লেও বীণাপাণির কি না মনে আছে? হুঁঃ, এ আর রবীনবাবুর মাথা নয় যে কালকের কথা আজকে ভুলে যাবেন।···বীণাপাণির দিদির বিয়েয় যে পদ্য ছাপা হয়েছিল, এখনো সে পদ্য গড়গড় করে মুখস্থ বলতে পারেন বীণাপাণি।···

ছেলেটা ছাতে ঘু'র বেড়াতে লাগলো? বিকেলবেলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একছাট্, সর্দ্দিকাসি না হয়।···ডেকে পাঠাবেন নাকি?···থাকৃগে আর খানিক। মাথার রক্তটা গরম হয়ে উঠেছে, খোলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হোক একটু।···ছুঁড়ির মুখটা চোখে লেগে থাকবার মতনই সত্যি, তাতে আর সন্দেহ নেই।···বাপধনের চোখে নেশার ঘোর লেগেছিল, মুছতে একটু কষ্ট হবে। রবীনবাবু ছেলেকে যতোই ছেলেমানুষ ভাবুন, সংসারের নাড়ীনক্ষত্র জেনে জেনে পাকা বীণাপাণি তা' ভাবেন না। আঠারো-উনিশ বছর বয়েসটা সোজা নয়। সবচেয়ে ভয়ের বয়েসই তো এই···হিতাহিত জ্ঞান থাকে কম, হৃদয়াবেগটা থাকে প্রবল।

যাক, তার জন্তে বেশী ভাবনার কিছু নেই বীণাপাণির। অনেক রকমই দেখেছেন তিনি এ পর্য্যন্ত। পুরুষ মানুষের এ বয়সের ভালোবাসা জলের দাগ।—প্রতিকূল হাওয়ায় শুকিয়ে যেতে দেরী লাগে না···আচ্ছা কোন্ বয়েসের ভালোবাসাই বা পাথরে খোদাই করা? যতো প্রবল প্রেমই হোক, হতাশ প্রেমে কে কবে বিবাগী হয়েছে? চাকরী ছেড়েছে? নিদেন একটু রোগাও হয়েছে?···দিব্যি বিয়ে-থাওয়া করে ঘর-সংসার করে।

বড়োজোর—কেনো সূত্রে পূর্ব্ব-প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে দু'একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া কথা, চেষ্টাকৃত একটু ভাবুকতা।···খুব বেশী হ'লো তো—তার মেয়ে-ছেলেকে টফি চকোলেট খাওয়ানো—কি দামী গোছের খেলনা উপহার দেওয়া···ব্যস্!

যথেষ্ট! যথেষ্ট!

অতএব—ছেলের জন্য ভাববার কিছু নেই।

সংসারের রীতিনীতি দেখতে দেখতে হাড়হদ্দ হয়ে গেল বীণাপাণির।

২০

মিটমিটে লণ্ঠনের আলোটা তেলের অভাবে এই খানিক আগে নিভে গেল।···অন্ধকার—পাথরের মতো ভারি অন্ধকার—যেন চারিদিক থেকে চেপে ধরতে আসছে লীলাকে।···কিন্তু উঠে আবার তেল ভরে আলোটা জ্বালবে, এ কথা মনে করতেও রাজী নয় সে।···

হোক অন্ধকার। দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থেকে এই অসহনীয় অন্ধকারটাকে সয়ে নেবে লীলা।···ক্ষীণ একটু শিখামাত্র। কতোই বা আলো হ'তো তা'তে?

কিন্তু আজকের অন্ধকারটা কী জমাট, কী গাঢ়! আকাশেও আলোর আভাসমাত্র নেই। তিথিটা যাই হোক, কালো শ্লেট-পাথরের মতো জমাট মেঘ তার রাজ্যবিস্তার করে রেখেছে সারাটা আকাশ জুড়ে। দুই চোখ পরিষ্কার খোলা রেখেও কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে শুধু।

অন্ধকারটা তো নিঃশব্দ নয়, অস্বস্তিকর কতগুলো শব্দের সমষ্টি যেন। অনেক সময় লক্ষ্য করেছে লীলা, বিশ্রী এই শব্দগুলো যেন গুঁড়ি মেরে বসে থাকে কোথায়, যতোক্ষণ আলো জ্বলতে থাকে। আলো নিভলেই গুটি গুটি চলে আসবে এই ঘরে।···কতো শব্দ!

হাঁপানি রোগী সুকৃতি দেবীর অসমছন্দ নিঃশ্বাসের কেমন যেন একটা আতঙ্কের শব্দ···দন্তহীনা শরৎশশীর পলাতক দন্তরুচির শূন্যঘর দিয়ে বেরিয়ে আসা বিপথগামী নিঃশ্বাসের অস্বস্তিকর শব্দ···উঠানের প্রকাণ্ড কাঁঠালগাছটার চিরবাসিন্দা ঝিঁঝিঁ পোকাগুলোর বিশ্রামহীন একটানা শব্দ···অদূরবর্ত্তী রেল ষ্টেশন থেকে ভেসে আসা 'সিটি' আর 'ঘণ্টি'র শব্দ···তার সঙ্গে লীলার নিজের ভয়কাতর হৃৎপিণ্ডের উত্তেজিত 'ধুক্ ধুক্' শব্দ—সব মিলিয়ে অন্ধকারটাকে যেন জীবন্ত করে তোলে।

বাক্চতুর মানুষের পৃথিবী থেকে আলাদা আর একটা যে শব্দময় জগৎ আছে, সকলের কাছে কি ধরা পড়ে সেটা?···অজ্ঞাত এই জগৎটার দুর্ব্বোধ্য ভাষা বোঝবার চেষ্টা করে কেউ?

বোধকরি—শিশুর সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে কিছুটা ধরা পড়ে। তাই শিশুরা শব্দের রূপ দেখতে পায়, স্পর্শ পায় অন্ধকারের।···আর—অনুভূতির ধার অধিকতর তীক্ষ্ণ—টুনির মত অবজ্ঞাত শিশুর···লীলার মতো গোত্রহীন অসম্মানিত জীবের।···বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখতে পারে বলেই ভিতরের জগৎটা বিস্তৃত হয়ে ওঠে তাদের।

অনেকক্ষণ এই শব্দ-স্পর্শময় অন্ধকারটাকে অনুভব করতে করতে হঠাৎ একসময়ে সাহস সঞ্চয় করে উঠে পড়ে লীলা।···

ভীরু ব্যক্তি যদি হঠাৎ নিজের ভিতর থেকে সাহস সঞ্চয় করে নেয়—সেটা মারাত্মক। এমন অবস্থায় যে লোক একটা আরশোলা মারতে দ্বিধা করে, সে হয়তো একটা জলজ্যান্ত লোকের মাথায় লাঠি বসিয়ে দিতে দ্বিধা করে না।…কাজেই—বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বালতে পারছিল না বলেই যে লীলা সরাসরি ঘর ছেড়ে উঠোনে এবং উঠোনের ও-প্রান্তে রাস্তার দরজা খুলে এসে দাঁড়াতে পারবে না, তার কোনো মানে নেই।

যে কাঁঠালগাছটার দিকে রাত্রের অন্ধকারে তাকাতে ইচ্ছে করতো না, তার তলা দিয়েই পার হয়ে গেল অনায়াসে। দরজার একটা কপাট খুলে ধরে বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখলো লীলা। ঘরের মতো নীরন্ধ্র অন্ধকার নয়… মিউনিসিপ্যালিটির অকিঞ্চিৎকর আলোগুলো পথের একটা ইসারা দিচ্ছে।…

পথ।…যে পথ আজীবন দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করেছে লীলাকে।…লীলাকে? না—অপরের দেওয়া এই "লীলা"র খোলসটার মধ্যে এতোদিন যে ঘুমিয়েছিল—সেই "টুনি"কে? …কঠিন সংসারের রূঢ় আঘাতে খোলসটা গেল টুকরো টুকরো হয়ে…আবার চেনা যাচ্ছে টুনিকে।…পথ তাকে হাতছানি দিচ্ছে। এই পথ তাকে রক্ষা করবে অসম্মান থেকে, বাঁচাবে অপমানাহত মুখখানাকে অপমানকারীর দৃষ্টির সামনে দেখিয়ে বেড়াবার লজ্জা থেকে।

অনিশ্চয়তার এমন ভয়ঙ্কর মাধুর্য্য আর কোথায় আছে—পথের মতো? পথের মতো এমন চিরনিশ্চিত আশ্রয়ই বা আর কি আছে?

লীলা কি নামবে এই পথে?

সাত বছরের টুনির পক্ষে নামাটা যতো সহজ ছিল, তের বছরের লীলার পক্ষে কি ততো সহজ?…টুনি কি ভেবেছিল পথে নামলে কি খাবে, কি পরবে, কোথায় শোবে রাত্রি-বেলা?…টুনিকে কি ভাবতে হয়েছিল—উত্থানশক্তিহীন রুগ্‌ণা মাকে ওষুধ ঢেলে দেবে কে? রাত্রে জেগে উঠে ক্ষীণকণ্ঠে একটু জল চাইলে কে দেবে জল?…মা? 'মা' কে? সুকৃতি দেবী লীলার মা?…'লীলা' নামধারী খোলসটার মা বটে।

কিন্তু টুনির মা কে?

পিতৃবঞ্চিতা টুনি আশৈশব পিতৃমূর্তিরই স্বপ্ন দেখে এসেছে, কই মায়ের কথা তো ভেবে দেখেনি কোনো দিন। যতোই অরুচিকর হোক তবু তরুবালা ভিন্ন আর কেউ—আর কেউ হওয়া সম্ভব, সে কথা ভাববে কোন্ সাহসে? কিন্তু তরুবালাও তো সত্যি 'মা' নয় তার।

তবে কে? কে টুনির মা?

মহালক্ষ্মী?…না না না। সারা মন আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠছে যে।…মহালক্ষ্মী শুধু মণির মা।…আর—মণি? মণি কে? মণিকে মনে পড়লেই সমস্ত মন তার পায়ে আছড়ে পড়তে চায় কেন? মাসী ব'লে? তরুবালা যদি টুনির মা নয়, তবে মণিই বা মাসী হবে কোন্ সুবাদে? …সেখানেও কি তবে কেউ তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল? নিতান্ত অনিচ্ছায়, নিতান্তই দায়ে পড়ে? তাই অ-তো অবজ্ঞা? তাই অতো অসহিষ্ণুতা?

মণি, মহালক্ষ্মী, তরুবালা—টুনির সঙ্গে কেউ জন্মসূত্রের বন্ধনে বাঁধা নয়?…টুনির মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই,—আকাশ থেকে পড়েছে টুনি?…

টুনির বিধাতা এমন নির্দ্দয় রহস্যপ্রিয় কেন? কেন টুনির পরিচয় এমন অন্ধকারে ঢাকা?

বেশ, নাই থাকুক পরিচয়, তা'তে কার কি ক্ষতি? বার বার তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেবার কি দরকার? এতো বড় পৃথিবীতে এতো কোটি লোকের মধ্যে—একজনের জন্যেও মাথা ঘামাতে ছাড়বে না লোকে? অবহেলা করবে, অবজ্ঞা করবে, কিন্তু অগ্রাহ্য করবে না? পারবে না অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে? অনেক পরিশ্রমে অনেক চেষ্টায় সংগ্রহ করে আনবে তার ত্রুটির দলিল?

টুনিকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে এসেও তাই নিস্তার নেই,—লীলার ছদ্মবেশ ধরেও না। পিছনে এসেও তাড়া করছে টুনি! তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় এই প্রাচীরের আবেষ্টন থেকে…এখনি যেন সেই আধময়লা ফ্রকপরা সাত বছরের টুনিটা লীলার দ্বিধা দেখে হাততালি দিয়ে হেসে উঠবে, বলবে—'এতো ভাবনা, এতো ভয় তোমার ওই একফালি কাঠের গণ্ডি ডিঙোতে?'

কি করবে লীলা?

হায়! সুকৃতিকে একটু জল গড়িয়ে দেবার, এক দাগ ওষুধ ঢেলে দেবার মতোও যদি থাকতো কেউ!…

আস্তে আস্তে কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই।…কিন্তু ওষুধ? ওষুধই বা আর পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? জয়ন্ত তো শুধু বিনা পয়সায় ডাক্তার ডেকে এনেই ক্ষান্ত হয় না, ওষুধের দাম নিতেও রাজী হয় না যে।

জয়ন্তর কথা মনে পড়তেই সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটা আবার একবার মনে পড়ে গেল। যেন লীলার সমস্ত চৈতন্যকে নাড়া দিয়ে কে বলে উঠলো—'তুমি আর জয়ন্ত, অনেক… অনেক তফাৎ, বুঝলে?'

তবে?…আবার কি কপাটটা খুলে দেখবে?…এতো মারাত্মক যন্ত্রণার মধ্যেও ভিতরে ভিতরে একটা শান্তির হাওয়া বইছিল না? বুকের ওপর চাপানো একটা পাথর আচমকা নেমে গেলে যেমন হালকা ঠেকে, তেমনি হালকা ঠেকছিল না?

টুনি আকাশ থেকে পড়ুক, তবু তরুবালা তার মা নয়।

কী সুন্দর শাস্তি!

নীরদার গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে যতো ইচ্ছে পানদোক্তা খাক্ তরুবালা, টুনির আর আপত্তি করবার কিছু থাকবে না। ভাবতে গেলে রোমাঞ্চ হয় না?···কিন্তু না, সেই হালকা হাওয়াটা মন থেকে চলে যাচ্ছে যেন।···জয়ন্ত তাকে কী ভাববে? কী ভাবছে? নীরদার চাইতে উঁচুদরের কিছু? তরুবালার চাইতে আলাদা? নাঃ। তবে কেন লীলাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না টুনির মতো? সুধু এই কপাটটার শাসনে?

—লীলা, লীলা, অ লীলা, ও মা এ কী সর্ব্বনেশে মেয়ে গো! রাতদুপুরে গেল কোথায়?—শরৎশশীর সন্তঘুমভাঙা, ভাঙা-ভাঙা গলার আওয়াজ যেন অন্ধকারকে চিরে চিরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।···

কপাটটা বন্ধ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালো লীলা।

কী বলছেন শরৎশশী? এ সব কী কথা?

—ওমা আমি কী করবো গো! মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে যে! সেই ছোঁড়ার সঙ্গে পালালো না কি?···এদিকে যে তোর মা'র শ্বাস উঠেছে।···বৌমা, অ বৌমা, অমনধারা করছো কেন বাছা?···কি করবো, ও-বাড়ীর বৌমাদের ডাকবো? বলাইকে? নন্দকে?···এই যে—কোথায় ছিলি হারামজাদী? মা যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে 'ওকম্ম' হয়ে গেল!···হা আমার কপাল! মরণের ঘুম ঘুমিয়েছিলাম আমি! তুই কোথায় গিয়েছিলি তাই শুনি? রীতি-চরিত্তির আর ভালো হবে কোথা থেকে? 'আমড়া গাছে কি ন্যাংড়া ফলবে'?···নে—পাখাখানা নিয়ে জোরে জোরে বাতাস কর্ দিকিন, আমি ছুটে ও-বাড়ী গিয়ে বলাইকে নন্দকে ডেকে আনি!···সঙের মতন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে?···মা যে শেষ হয়ে গেল, দেখতে পাচ্ছো না ঢেঁকি?···হুঃ, বৌমা আমার আখেরের আশায় বনের পাখী ধরে পুষতে গিয়েছিলেন! এই যে—এই তার পরিণাম! 'মা' বলে ডেকেছিলি, মুখে এক গণ্ডুষ গঙ্গাজল দে ছুঁড়ি!···ও মা, এ কী সর্ব্বনেশে জেদী মেয়ে গো! সেই দাঁড়িয়ে রইলো হাঁ করে?···বৌমা, অ বৌমা···যাঃ! আমি কি করবো গো! মাঝরাত্তিরে এ কী ঘোর বিপদে ফেললে মধুসূদন!···ওরে অ বলাই, অ নন্দ, মেজবৌমা যে হয়ে গেল!···আমার লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌমা রে···বড়ো দুঃখু পেয়ে গেলি মা আমার···আমাদের মায়া কাটিয়ে কোথায় গেলি মা রে!

বাঙালীর সংসারের চিরন্তনী সুর! আজন্মের শিক্ষায় বারবার অভ্যাসে এ সুর মুখস্থ হয়ে গেছে শরৎশশীর, ছন্দপতন হয় না।

কয়েকটা দিন পরের কথা—

ডাঁটিভাঙা একখানা চশমা নাকে লাগিয়ে শরৎশশী দালানে বসে তিল বাছছিলেন। সুকৃতির শ্রাদ্ধের তিল।··· 'ষোড়শ' না হোক, 'তিলকাঞ্চন'ও তো হবে! শরৎশশী যদি চিরদিন বেঁচে থাকেন, 'তিল বাছতে পারবো না' বলে আদিখ্যেতা করলে চলবে কেন? পেটের ছেলের বেলাতে পারলেন—এ তো ছেলের বৌ!···তবে চোখটা আজকাল বড়ো খারাপ হয়ে গেছে, বেশী নিরীক্ষণ করে কিছু দেখতে গেলেই জল পড়ে।

চশমাটা খুলে আঁচল দিয়ে জলটা মুছতে গিয়েই অবাক হয়ে তাকালেন—উঠোনের খোলা দরজাটা দিয়ে যা চোখে পড়লো, সেটা অপ্রত্যাশিত।···

আর্শির মতো চকচকে প্রকাণ্ড একখানা মটরগাড়ী শরৎশশীর দরজায় এসে থামলো। তার থেকে নেমে এলেন সাহেবী পোষাক পরা এক ভদ্রলোক, প্রায় সাহেবের মতোই চেহারা। আর পিছনে একটি বৌ।···

কুমোরের হাতে গড়া সরস্বতী প্রতিমা নাকি! সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের ঝলমলানি না থাক, অবস্থাপন্ন বলে চিনতে ভুল হয় না।···ভুল বাড়ীতে ঢুকেছে বোধ হয়! শরৎশশীর দরজায় এতো বড় গাড়ী দাঁড়ানোর কারণ নেই।···শরৎশশীর উঠোনে সহসা লক্ষ্মী-নারায়ণের আবির্ভাব ঘটবে কেন?

—তুমিই জিগ্যেস করো না—ভদ্রলোকটি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন কথাটা।

—আমি নয়, আমি পারবো না, তুমি—স্ত্রী উত্তর দিল।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারদিকে অতো চেয়ে চেয়ে দেখবার কি আছে রে বাপু? অচেনা বাড়া, সে তো দেখেই বুঝতে পারছিস।···

শরৎশশী চশমাটা আবার নাকে লাগিয়ে উঠোনে নেমে এসে প্রশ্ন করেন—কে বাছা তোমরা? কোথা থেকে আসছো?

—আমরা?···আমরা—ইয়ে—কলকাতা থেকে আসছি।

—কলকাতা থেকে? দেখেই বুঝেছি। তা, কার বাড়ী খুঁজছো বল তো?

ভদ্রলোক বিব্রতভাবে একবার স্ত্রীর দিকে তাকান···ঠিক কিভাবে কথাটা পাড়বেন।

কিন্তু মেয়েরা চিরদিনই আদবকায়দার ধার কম ধারে, তাই বৌটিই হঠাৎ এগিয়ে এসে দ্রুত উচ্চারণে বলে—কারুর বাড়ী খুঁজছি না আমরা···একটি মেয়েকে খুঁজছি। হারিয়ে-যাওয়া মেয়ে, ছ' বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল।—সবাই বললে এই বাড়ীতে আছে। খুব ফর্সা—রোগা—ঠিক আমার মতন দেখতে—

শরৎশশী কপালে একটা চাপড় মেরে বলে ওঠেন—আ আমার কপাল! সেই মেয়েকে খুঁজতে এসেছ এতদিন পরে? সে মেয়ে কে হয় তোমাদের?

—আমাদের মেয়ে! আমাদের একটিমাত্র মেয়ে! কোথায় গেল সে?—দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে দামী শাড়ী সুদ্ধই রোয়াকের ধারে বসে পড়ে সে।

—তোমাদের মেয়ে?—শরৎশশী সন্দিগ্ধভাবে বলেন—তা' এতোকাল কী ঘুমোচ্ছিলে বাছা? ছ' বছর ধরে এইখানেই তো ছিল।

—ছিল? এইখানেই ছিল? ছ' বছর ধরে এইখানেই ছিল? কি নাম বলেছিল? এখন কোথায় গেল?

—আঃ মণি! অতো অধীর হচ্ছো কেন? সবটা শোনো এঁর কাছে।···হ্যাঁ, কী হ'লো মেয়েটির?—ভদ্রলোক বলেন।

—আর কি হ'লো বাবা! বনের পাখী আবার বনেই পালালো। এই আজ আট দিন হ'লো। আহা বাবা, ক'দিন আগেও যদি আসতে—

—পালিয়ে গেল? আবার পালিয়ে গেল? কেন পালালো? কে কী বলেছিল তাকে?—নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ তীব্র স্বর আর্তনাদের মতো শোনায়।

—মণি!—ভদ্রলোকের গম্ভীর স্বর উচ্চারিত হয় ঈষৎ তিরস্কারের সুরে।

শরৎশশী হতাশ সুরে বলেন—কে আর কী বলবে মা! আদর করেই তো রেখেছিলাম।···সেই তখন—আমার জোয়ান ছেলে গেল মারা, নিঃসন্তান বিধবা বৌ পাগলের মতো বেড়ায়। নিজে বুক বেঁধে সঙ্গে করে ঠাকুর দেবতা গুরু গঙ্গা করে বেড়াচ্ছি, সেই সময় বারুণীর যোগে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে গঙ্গার ঘাটে পেলাম মেয়েটাকে।···ইঁটখোলার নৌকোয় চড়ে নাকি এসেছে কোথা থেকে।···বৌমা ছাড়লো না—আমিও মানা করতে পারলাম না। নিয়ে এলো। তারপর, এই ছ'বছর পেটের মেয়ের বাড়া করে মানুষ করলে—

—শেষ পর্যন্ত কী হ'লো তাই বলুন না মা!

—হ'লো আর কি! এই আটদিন হ'লো আমার সেই বৌ গেল মারা,—সেই রাত্তিরে গোলেমালে মেয়েটা কোথায় যে পালিয়ে গেল মা, আর কেউ দেখতে পেলো না।···একবাড়ী লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে যে গেল!

—আর খুঁজে পেলেন না?···মণি! ও কি হচ্ছে? শুয়ে পড়ছো কেন? উঠে পড়ো। ওই জন্যেই তোমাকে আনতে ভয় করে আমার।···হ্যাঁ দেখুন, বারো তেরো বছরের একটি মেয়ে—এতোটুকু সহর থেকে হারিয়ে গেল, কেউ সন্ধান দিতে পারলো না?

শরৎশশী আর একবার কপালে আঘাত করেন—কেই বা সন্ধান করছে বাবা? কার গরজ? আমি তো এই বুড়োহাবড়া, যার জিনিষ সে তো চলে গেল! আর মেয়েটাও ছিল কেমন যেন ছেমো ছেমো—একবগ্‌গা মতো। মাথা কুটে মরে গিয়েও একদিনের তরে তার মুখ থেকে একটা কথা কি বার করতে পেরেছি যে—কোথা থেকে এসেছে—কেন এসেছে—নাম কি? ···মা বাপ আছে কি না বলতে সুধু জোরে জোরে মাথা নেড়েছে। আমরা বলি কেউ কোথাও নেই বুঝি।···আহা, এমন মা বাপ থাকতে! অভাগ্যির কপাল ছুঁড়ির!

ভদ্রলোকটি ঈষৎ আশ্বাসের সুরে বলেন—মণি, এমনও তো হ'তে পারে—এ অন্য মেয়ে!···বিশ্বনাথবাবু কোথায় কি বাজে খবর শুনে···কতো মেয়ে ছেলেই হারাচ্ছে প্রতিদিন—

—না বাছা, সেই মেয়েই নিশ্চয় তোমাদের—শরৎশশী নিজস্ব বুদ্ধির বশেই কথায় জোর দিয়ে বলেন—হুবহু এই এঁর মতোই দেখতে—তাই চেয়ে দেখছি—অবিকল একরকম! কতো লোকে কতো কথাই বললে!···আহা, বেচারা লজ্জায় ঘেন্নায় মরমে মরেই আরো এ কাজ করলো। বড়ো শান্ত ছিল মেয়েটা।···তোমাদের কাছ থেকে পালিয়েছিল কেন বলো তো বাবা? একমাত্র সন্তান তোমাদের—

—ওই যা বললেন আপনি—ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলেন—মাথাটারই গোলমাল ছিল একটু।···উঃ, এই এতোদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, অথচ এতো কাছে ছিল! আশ্চর্য্য! ঈশ্বরের নিয়মের বাইরে যাবার হুকুম তো কারুর নেই!···কিন্তু কোনো সূত্রে কোনো সন্ধানই পাননি?

—না বাবা, আমি মেয়েমানুষ, তাতে আবার এই শোকে তাপে জরজর—

বোঝা গেল সন্ধান করবার প্রয়োজনও অনুভব করেনি কেউ।

—কোনো চিহ্ন নেই তার? জামা-জুতো? ফটো? যে জামাটা পরে এসেছিল?

শরৎশশী বৌটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহ আক্ষেপের সুরে বলেন—সবই আমার বৌমার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে গেছে বাছা।···কী আর বলবো—তোমাদের কপাল!···জামা-জুতো এদিক-ওদিক কোনোখানে আছে হয়তো—ফটো-মটো কে কবে তুলেছে বলো? গরীব মানুষ আমরা—

—থাক্ থাক্, কী লাভ ও সবে?···ফটো থাকলে অবিশ্যি সুবিধে হতো—যাক, তা' যখন নেই।···আর বসে থেকে দরকার কি মণি? চলো—আঃ, কী, হচ্ছে কী? এ রকম করলে—

—আহা মরে যাই, কিছু বোলো না বাবা, মায়ের প্রাণ! ···ওঠো মা, ওঠো ধুলো থেকে।—এ যেন সেই "কূলে এসে তরী ডোবা"।···ছি ছি, সেই হতভাগীর কপালটাও দেখো—এমন রাজার মত বাপ, লক্ষ্মীপ্রতিমার মতন মা, ভাগ্যে নেই!

! নিয়তি!

দ্বিতীয় পর্য্যায়

জীবন কি সত্যই রথের সঙ্গে তুলনীয়? জীবনরহস্যের মূলসূত্র ভেদ করতে মানুষের কৌতূহল যেমন অসীম, জিজ্ঞাসাও তেমনি অনন্ত। কে বলবে জীবনের যথার্থ সংজ্ঞা কী?…কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত, আলঙ্কারিক—নানা জনের নানা দৃষ্টিভঙ্গী—নানা মত। তাই—জীবনকে নদীর সঙ্গে তুলনা করলেও যেমন আমরা ঘাড় কাৎ করে সায় দিই, তেমনি আবার নৌকোর সঙ্গে তুলনা করলেও আপত্তি জানাই না।

জীবন রথ, কি জীবনটাই পথ, কে বলবে জোর করে?

তবু এই তুলনাটাই আমরা পছন্দ করি, ভারী যেন মানানসই। রথের সঙ্গে মানুষের জীবনের যেন প্রকৃতিগত মিল রয়েছে একটা।

রথ!—ছোট-বড়ো, জমকালো, সাদাসিধে—নানা ধরণের, নানা আকৃতির। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ ধরে লক্ষ্যে পৌছনই তার একমাত্র কাজ। ভাগ্যক্রমে কারো পথ প্রশস্ত মসৃণ রৌদ্রালোকে উজ্জ্বল, কারো বা সঙ্কীর্ণ সর্পিল অন্ধকারাচ্ছন্ন।

দৈবাৎ এমন এক-আধটি জীবনের আবির্ভাব ঘটে—পথ যারা নিজেরা সৃষ্টি করে। নির্দ্দিষ্ট বাঁধাপথ তাদের জন্য নয়। কিন্তু সে নিতান্তই দৈবাৎ। তাই তাদের আমরা দূর থেকে পূজো করি, বলি 'দেবতা'।

সাধারণ যারা, তাদের প্রথম দল চলে নিশ্চিন্তে নিঃশব্দে। ছোট-বড়ো যাই হোক, একের সঙ্গে অপরের বস্তুগত পার্থক্য বিশেষ কিছু নেই। জীবনটা যেন এদের কাছে জন্ম আর মৃত্যুর বেষ্টনীতে আবদ্ধ সাদা একখানা পর্দা মাত্র। সমস্যা নেই, সংগ্রাম নেই। এরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে খায়, ঘুমায়, খেলা করে, সৃষ্টিরক্ষার অংশীদার হয়।…রোগ-শোক, আনন্দ-উৎসব, দারিদ্র্য-প্রাচুর্য্য—সব কিছুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে পরিণতির পথে। পৃথিবীর শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়েছে এরা। ভাগ্যের কাছে কোনো প্রশ্ন নেই এদের।

অপর দল সম্পূর্ণ উল্টো! এদের চাকা কখনো সঙ্কীর্ণ আর বাঁকাচোরা পথের কোণায় কোণায় ধাক্কা খেয়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে, কখনো কাদায় বসে গিয়ে অচল হয়ে থেমে পড়ে। এরাই জগতে আনে অশান্তির অভিশাপ, ঘটায় বিশৃঙ্খলা। কাউকে সুখী করবার ক্ষমতাও যেমন নেই, তেমনি নেই নিজে সুখী হবার।…কেউ অসম্ভবের আশায় ছটফট্ করে, কেউ অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর হয়ে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে।… নিশ্চিন্ত সুখ বলে কিছু নেই এদের। ভাগ্যকে অবিরত প্রশ্ন করে চলেছে এরা। খেয়ালের বশে জটিল পথ আরো জটিল করে তোলাই এদের কাজ।

নইলে মণি কেন দীর্ঘ এক যুগ ধরে অনবরত হারানো টুনিকে খুঁজে বেড়াবে? ক্লান্তিহীন শ্রান্তিহীন এই অনুসন্ধানের সাধনা যদি তুচ্ছ একটা পলাতক শিশুর উদ্দেশ্যে না হয়ে আধ্যাত্মিক খাতে প্রবাহিত হতো, তাহ'লে বোধ করি এতো-দিনে ভগবান পেতো মণি।…

কিন্তু সে কথা কে বোঝাবে মণিকে? কে ফেরাতে পারবে ওকে ওর এই উৎকট সাধনার পথ থেকে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর বোঝাবার চেষ্টা করে না।…অপরিণত বুদ্ধির ক্ষণিক অসাবধানতার খেসারত যোগাচ্ছে পরিণত জীবনের সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে।…

অনেক দিন—অনেক সময় বার বার এই কথাটাই ভেবেছে সে। কিন্তু অসাবধানতাটা কি কেবলমাত্র জ্যোতিঃপ্রকাশের? বিশ বছর আগের সেই অভিশপ্ত ক্ষণটাকে কি সে বিশ হাজার বার যাচাই করেনি মনে মনে?…

সুদূর প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বক্ষণে, বিচ্ছেদবেদনার আশঙ্কায় কাতর জ্যোতিঃপ্রকাশের কম্পিত হৃদয়ের কাছে নিজেকে অমন নিঃশেষে সমর্পণ করতে এলো কেন মণি?…নিজের আকুলতার তীব্রতা বোঝাতে?…অনেকটা দুঃখ বোঝাবার জন্যে অনেকটা মূল্য দিতে?…

মণি অবুঝ?…কিন্তু জ্যোতিঃপ্রকাশই বা খুব বেশী বুদ্ধিমান হবে কিসের জোরে? মণি বালিকা?…জ্যোতিঃপ্রকাশই বা তখন কতো বিজ্ঞ বিচক্ষণ ছিল?

অপরাধের ওজন কসবে কে?…নিজের মনের বিচার আর বিশ্লেষণ দিয়ে যাই স্থির করুক, তবু নিজেকেই দণ্ড দিতে চেয়েছে জ্যোতিঃপ্রকাশ, অপরাধীর নম্রতা নিয়ে দাঁড়িয়েছে মণির সামনে, তাই মণির এই যুক্তিহীন খেয়ালের বাহক সে।

—"টুনিকে খুঁজে বার করতেই হবে"—মণির এই ইচ্ছার বেগে এক যুগ ধরে চালিত হচ্ছে জ্যোতিঃপ্রকাশ।…কোন্ ফাঁকে কর্ত্তব্য পরিণত হয়েছে অভ্যাসে, অভ্যাস দাঁড়িয়েছে স্বভাবে।…

হতাশ হয়েছে, হাল ছেড়ে দিয়েছে, তবু দিনের পর দিন মণিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, স্কুলের গেটে, খেলার মাঠে, সিনেমায়, সার্কাসে, মেলায়, যাত্রায়, অনাথাশ্রমে, হাঁসপাতালে।…

কোথায় নয়? হারানো একটা মেয়েকে হঠাৎ দেখতে পাবার সম্ভাবনা কোথায় নেই?

অদেখা টুনিকে খুঁজে বার করতে হ'লে মণিকে নিয়ে বেড়ান ছাড়া উপায় কি? জ্যোতিঃপ্রকাশের নাগালের মধ্যে বসে থাকলেই কি চিনতে পারবে জ্যোতিঃপ্রকাশ? একখানা ফটোই কি আছে টুনির?

মহালক্ষ্মীর হাতের পুতুল মণি, বিনিদ্র রাত্রে, নির্জ্জন অবসরে লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু টুনির উপস্থিতির সমস্যাই ভেবেছে, অনুপস্থিতির সমস্যাটা তো ভেবে দেখেনি কোনোদিন।

তা ভাবলেই বা করতো কি? ফটো তুলিয়ে রাখতো টুনির? নামপরিচয়ের মোহরাঙ্কিত পদক ঝুলিয়ে দিতো টুনির গলায়।···

মণি!—যে মণি দু'শোটা শাড়ীজামার স্তূপের ওপর বসে নিরুপায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দু'টোমাত্র রং-জ্বলা ফ্রক পরে কী ভাবে দিন কাটছে টুনির।···টুনি কোনোদিন একফোঁটা দুধ খেতে পেতো কি না, মণির জানা ছিল কি? টুনির খাওয়া হয়েছে কি না, এই সাধারণ প্রশ্নটুকুও করবার সাহস কোনোদিন হয়েছিল মণির? নিজে হাতে করে কখনো কিছু খেতে দিয়েছিল মণি টুনিকে?···

কি যেন দিয়েছিল না একদিন? তুচ্ছ বস্তু মাত্র। রুপোলী রাঙতায় মোড়া একখানা চকোলেট! আশ্চর্য্য, সেই চকোলেটখানা খায়নি টুনি! কী ভেবেছিল? খাবার জিনিষ কি না বুঝতে পারেনি? তা নয়তো—কাগজের ওপর কাগজ মুড়ে মুড়ে অতো যত্নে ছাদের সিঁড়ির জাফ্‌রিতে তুলে রেখে দিয়েছিল কেন?···

···পদ্মপুকুরের সেই ভাড়াটে বাড়ীটার সিঁড়িতে।

যে বাড়ীর বাতাসে হয়তো আজও ভেসে বেড়াচ্ছে অবহেলিতা টুনির দীর্ঘশ্বাস।···টুনির স্মৃতির আভাস হারিয়ে যাবার ভয়ে যে বাড়ীখানা ছাড়তে পারেনি মণি, জ্যোতিঃপ্রকাশের কাছে আবদার করে কিনিয়েছে। তীর্থ-দর্শনের মতো যখন-তখন যে বাড়ীটা দেখতে যায় মণি এখনো।

কবে যেন একদিন সিঁড়ির ঝুল ঝাড়তে গিয়ে জিনিষটা আবিষ্কার করেছিল একটা চাকর।···এইটুকু সঞ্চয় মণির।···

···অথচ মণি এখনো ভালো ভালো শাড়ী জামা পরছে। ভালো জিনিষই খাচ্ছে।

তবু জ্যোতিঃপ্রকাশ বলবে—'মণি পাগল,' 'মণি কাণ্ডজ্ঞান-হীন,' 'মণি অধীর'!

মণি অধীর? দীর্ঘ সাত-সাতটা বছর অতো ধৈর্য্য ধরে ছিল কি করে তবে?···বিদ্রোহ করেনি—পাগল হয়নি, একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি তো।···কিন্তু কেন মহালক্ষ্মীর বিদ্বেষ-দৃষ্টির সামনে থেকে তাকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি? কেন তরুবালার রুক্ষকর্কশ হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকের ভেতর আশ্রয় দেয়নি? কেন চীৎকার করে সারা জগৎকে শোনাতে পারেনি···'টুনি আমার! টুনি আমার! টুনিকে হতশ্রদ্ধা করবার অধিকার তোমাদের নেই।'

জ্যোতিঃপ্রকাশ এসে ঘরে ঢুকলো। পিছন দিকে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে হতাশ-বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—আবার তুমি একলা একলা বিড় বিড় করে কথা বলছো? সেদিন প্রতিজ্ঞা করলে না আমার কাছে—আর বলবে না?

মণি অসহায় দৃষ্টি মেলে—বলে—কই, বলিনি তো কথা?

—আর এই যে শুনলাম আমি?

—বলেছি? আচ্ছা আর বলবো না।···চা খেয়েছো?

—চা? তবু ভালো যে এই তুচ্ছ কথাটাও মনে পড়লো।

—রাগ করেছো?

—রাগ? তোমার ওপর রাগ করলে তো—ওই আকাশের মেঘখানার ওপরও রাগ করতে হয়।···রাগ নয়—কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবে? এখনো কি আশা রাখো তুমি?

—আশা রাখবো না? রাখতে বারণ করছো?

—বারণ আমি করছি না মণি, কিন্তু তুমি বুদ্ধিটাকে একটু পরিষ্কার করে বুঝে দেখ না। যদি পাবার হ'তো তা'হলে চুঁচুড়োতে সেই বুড়ির বাড়ীতেই কি পেতাম না আমরা? কয়েকটা দিনের জন্যে চিরদিনের মতো হারাতাম আবার?

মণি চুপ করে যায় বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়, আবার একটু পরেই চোখ তুলে বলে—আচ্ছা, পালিয়ে যে গেল, কোথায় গেল? পথে কতো বিপদ—

—হয়তো ভগবান আবার জুটিয়ে দিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়।···এবার তাকে ভুলতে চেষ্টা করো মণি। এ খোঁজার পালা শেষ হোক। শেষ পর্য্যন্ত কি পাগল হয়ে যাবে?

—ভুলতে বলছো? খোঁজার পালা শেষ করে দেবো?—মণি কিছুক্ষণ যেন অপেক্ষা করে জ্যোতিঃপ্রকাশের উত্তরের আশায়, তারপর আনমনে বলে—তারপর, তারপর কি করবো?

—কি আবার করবে?···জ্যোতিঃপ্রকাশ জোর দিয়ে বলে—সাধারণ মানুষেরা যা করে। হাসবে, গল্প করবে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশবে, ঘরসংসার করবে—এই। কতো লোকের তো প্রথম সন্তান মারাও যায় মণি!

স্বামীর ব্যাকুলতা মণির হৃদয় স্পর্শ করে না কি?

হয়তো করে। কিন্তু টুনিকে ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরসংসার করতে হবে? প্রতিনিয়ত বিঁধবে না অপরাধ-বোধের সুতীক্ষ্ণ কাঁটা? তাই সে বলে—মারা গেলে তো সান্ত্বনা থাকে ভগবান নিয়েছেন।

জ্যোতিঃপ্রকাশ ওর পিঠের ওপর হাত রেখে সস্নেহে বলে—তাই মনে করে মনকে সান্ত্বনা দাও মণি! মনে করো ভগবানই নিয়েছেন তাকে—

—ও কথা বোলো না। আছে, নিশ্চয় আছে সে।

—থাকুক। তোমার আমার হয়ে নেই।

—তবে আমাদের কী থাকবে?—গলার স্বর ভেঙে আসে মণির।

—আমাদের? ভগবান আবার দেবেন মণি। তুমি সহজ সুস্থভাবে—

—আবার দেবেন ভগবান?—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে মণি।—আবার দেবেন? কক্‌খনো নয়। কেন দেবেন? নিতে লজ্জা করবে না? না না, ও সব কথা বলবে না তুমি আমাকে। আর কেউ আমাকে 'মা' বলতে পাবে না—পাবে না কোলে উঠতে। চাই না আমি, চাই না বলছি।

—আচ্ছা আচ্ছা, চেয়ো না!—জ্যোতিঃপ্রকাশ উঠে পাখাটা খুলে দেয়।

—তুমি রাগ করছো? আর টুনিকে খুঁজবে না তুমি? তাহ'লে কি হবে? আমি একলা কোথায় যাবো? কি করে খুঁজে পাবো?…

হঠাৎ স্বামীর কোলের কাছে আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে মণি।…মাথার ওপর হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে জ্যোতিঃপ্রকাশ।

আগে এই কান্নাটা ছিল না। ব্যাকুলতা ছিল, অবুঝপনা ছিল, জেদও ছিল। তবু কান্না? এই একটা জিনিষ যা কোনোক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না।…শরৎশশীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে ফিরে আসা পর্য্যন্ত হয়েছে এইটা।

পরদিন—

একটু স্বাভাবিক অবস্থায় এটা ওটা আলোচনার মধ্যে জ্যোতিঃপ্রকাশ প্রশ্ন করলো—কিছুদিন কোনোখানে বেড়াতে যাবে মণি?

—বেড়াতে?—মণি চকিত হয়ে বলে—কোথায়? কোনো খবর পেয়েছো বুঝি?

—না না, সে সব কিছু নয়—সুধু বেড়াতে।

—সুধু বেড়াতে? কোথায়?

জ্যোতিঃপ্রকাশ হাসবার মতো করে বলে—যেখানে তোমার খুসী।

—আমার আবার খুসী-অখুসী!—মণি অপরাধী মুখে বলে—বরং একলাই তুমি দিনকতক কোথাও যাও।

—তার মানে? তুমি একলা এখানে থাকবে?

—কি আর হয়েছে! ঝি চাকরেরা তো রয়েছে—

জ্যোতিঃপ্রকাশ কৃত্রিম গম্ভীরস্বরে বলে—বেশ তাই ভালো! তাই যাবো। তোমার যখন তাই ইচ্ছে।

—ওমা ও কি! আমার ইচ্ছে—সে কথা বললাম কখন?

—বললে না—বোঝা গেল তো? আমি চোখছাড়া হ'লেই বাঁচো—'ঝি-চাকরেরা থাকলেই যথেষ্ট স্বচ্ছন্দে চলে যায়—এই ভাবছো বৈ তো নয়?

মণির চোখের কোণ জলে ভারী হয়ে আসে, বলে—ও কি কথা! আমাকে এই রকম ভাবো তুমি? আমি তো সুধু তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার খেয়ালে চলে চলে তোমার কতো কষ্ট।

জ্যোতিঃপ্রকাশ হেসে ওঠে—তুমি আজকাল যে রকম আমার 'ভালো' আর 'কষ্ট' বুঝতে শিখেছো, তাতে সন্দেহ হচ্ছে—বোধ করি প্রায় মানুষ হয়ে এসেছো।

—বুঝি না কী? বুঝি সবই—মণি অসহায় দৃষ্টি তুলে বলে—সুধু বুঝতে পারি না সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবো কি করে? কি করে তবে প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার?

জ্যোতিঃপ্রকাশ বোধ হয় কিছুটা ভুল বোঝে, তাই ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে বলে—'পাপ' আর 'প্রায়শ্চিত্ত' এই সব বিশ্রী বিশ্রী কথা বোলো না আমার সামনে। পাপ তোমার, আমার, না সমাজের?

—তা' আমরা যখন সমাজের ভেতর থাকতে চাই—আমাদেরও অংশ নেই কি?—মণি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বার-দুই সারা ঘরটা ঘুরে এসে বলে—আমি কোনোদিন ওর গায়ে হাত দিইনি, জানো? ঝি-চাকরের ছেলেমেয়েকেও তো লোকে 'আয়' বলে কাছে ডাকে। তবে? কেন? কেন তাকে একদিনও…অথচ সে যাবার সময় বলে গেল—

কি বলে গিয়েছিল সে কথা জ্যোতিঃপ্রকাশ সহস্রবার শুনেছে। জানে—সে কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উথলে উঠবে মণির চোখে, তাই তাড়াতাড়ি বলে—এই পাপের কথা বলছো? তা সেও তো সমাজের ভয়ে বাধ্য হয়ে—

মণি আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠে—সমাজের ভয়ে আবার কি? সমাজ মানে কি? ভয় ছিল সম্মানের। পাছে সম্মানহানি হয়।…এই তো? কবিরা মিছামিছি বলেন—"সমুদ্রের পার আছে তল আছে তার, অতল অপার মাতৃস্নেহ-পারাবার"—সব বাজে। একমাত্র নিজের ওপরই মানুষের অতল অপার মমতা।

—বেশ, তাই যদি মনুষ্যধর্ম্ম হয়—দুঃখ করে লাভ কি? মানুষ ভিন্ন আর তো কিছু নই আমরা?

—তাই ভেবে ভুলেই যাবো তবে?

জ্যোতিঃপ্রকাশ আবার হাসবার চেষ্টা করে—তাই ভেবে ভুলতে হবে, এটা একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল কথা নয়। ভোলার চেষ্টা করা উচিত, তাই। ব্যর্থ চেষ্টার একটা শেষ থাকা উচিত, তাই।

মণি কিছুক্ষণ ম্লানমুখে বসে থাকে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে—আচ্ছা, এবার থেকে তোমার কথাই শুনবো। আর জ্বালাতন করবো না তোমায়।

মণি চলে গেলেও জ্যোতিঃপ্রকাশ ব্যস্ত হয়ে ভোলাতে যায় না। জানে—খানিক পরে আবার ঘুরে আসবে, যেন অকস্মাৎ একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে এইভাবে উত্তেজিত চাপা গলায় বলবে—আচ্ছা, ও যে যাবার সময় ও কথা বলে গেল তার মানে কি? ও কি কিছু জানতো? ও কি কিছু বুঝতে পেরেছিল? ও কি আমাকে সন্দেহ…

জ্যোতিঃপ্রকাশকে বোঝাতে হবে—টুনির বয়েসটা যা ছিল তা'তে বোঝবার জানবার বা সন্দেহ করবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—বলতে হবে অনেক কথা! কিন্তু মণিকে কি বোঝাতে পারবে—কেন টুনি মণিকে দেখলেই অমন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকতো, দীন ভক্ত যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দিরের দরজায়, অসহায় অবোধ দৃষ্টি মেলে?

দিনের পর দিন এই নাটকের পুনরভিনয়।…এইভাবে কাটছে জ্যোতিঃপ্রকাশের বারো-বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবন।

মহালক্ষ্মীর অভিশাপ লাগলো না কি?

নিতান্ত মুখচোরা মণিকেও নিজের ইচ্ছার জোর খাটাতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে, অন্যত্র বিবাহ দেবার আশায় হতাশ হয়ে, ক্রুদ্ধ অপমানাহত চিত্তে একমাত্র সন্তানের মমতা ত্যাগ করে তিনি যখন বিবাহের আগের রাত্রে কাশীবাসের সংকল্প নিয়ে চিরদিনের জন্য দেশ ছেড়েছিলেন, তখন কি তাদের দাম্পত্য-জীবনের উদ্দেশে এই ক্রূর অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন?

তাই একদিনের জন্য সুখী হতে পারলো না মণি, সুখী হতে দিল না জ্যোতিঃপ্রকাশকে।…কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে এদেশ থেকে ওদেশে—এখান থেকে ওখানে।

জ্যোতিঃপ্রকাশ যদি মণির এই পাগলামির প্রশ্রয় না দিতো—সেইটাই কি ঠিক হ'তো? যদি তিরস্কার করতো? যদি শাসন করতো?…শুধরে যেতো মণি, না কি একেবারেই পাগল হয়ে যেতো?…বুঝতে পারে না জ্যোতিঃপ্রকাশ।…ওকে অনেক কাজ চাপিয়ে দিলে ভালো হ'তো কি? হয়তো কর্ম্মহীন দায়িত্বহীন এই অলস দীর্ঘ দিনগুলো কাটাবার আর কোনো অবলম্বন খুঁজে পায় না বলেই অতীত শোককে 'জিইয়ে' রেখেই মনের বিলাস চরিতার্থ করে।…টুনিকে লালনপালন করবার ক্ষুধা মেটাচ্ছে টুনির স্মৃতিকে লালন করে।…

দরিদ্রের সংসারে পড়লেই হয়তো ভালো হ'তো মণির। সহজ আর সুস্থ হয়ে সংসারই করতো তাহ'লে।…দারিদ্র্যের যাঁতায় পেষাই হয়ে মনের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোই তো আস্তে আস্তে ভোঁতা হয়ে যায়, শোকের তীব্রতাও যায়।

শোককে পুষে রাখা প্রায় 'হাতি পোষা'র মত ব্যাপার নয় কি? তার জন্যেও তো চাই ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, অবস্থার আনুকূল্য।…কিন্তু সে দিক দিয়েই বা করবে কি জ্যোতিঃপ্রকাশ? ইচ্ছে করে তো গরীব হয়ে যেতে পারে না? চাকর-বামুনগুলোকে বিদেয় করে মণির ঘাড়ে কাজ চাপিয়ে দিতে পারে না তো?

মণি আর তার মাঝখানে যে অদৃশ্য প্রাচীর অচল অনড় হয়ে বসে আছে, সেই টুনির ওপরই সমস্ত রাগটা পড়ে শেষ পর্য্যন্ত।…অযত্নে অবহেলায় মরে যেতেও তো পারতো টুনি, অতি শৈশবে।…শিশুমৃত্যুর হার যে দেশে সবচেয়ে বেশী, সে দেশে এতো অযত্নে টিঁকে থাকবার কি দরকার ছিল তার?

রাগ ধরে শরৎশশীর ওপর। যে মেয়ে হারিয়ে গেছে, যার সন্ধান দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত—মণির সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাবার দরকার কি ছিল শরৎশশীর?…সামান্য একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেও মানুষ চেপেই যায় সেটা, সে বুদ্ধিটুকুও নেই। মাঝখানে একটু আশার আলোক পেয়েই না—আরও অধীর হয়ে উঠছে মণি।

বনান্তরালে বিলীন আলেয়া মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে বলেই তো আলেয়ার পিছনে ছুটতে থাকে মানুষ।

২

—দেখো শুনছো, আমাকে একটা রান্না শেখবার বই এনে দেবে?

জটিল সমস্যাপূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদের একখানা বইয়ের মধ্যে নিমজ্জিত জ্যোতিঃপ্রকাশ হঠাৎ আদরিণী প্রিয়ার এ হেন আবদারে চমকে উঠে এমন অবাক হয়ে তাকায় যে, মণির আর অপ্রতিভ না হয়ে উপায় থাকে না। তবে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে সে, বোধ করি জোর করেই করে।

—কি গো, অমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছো কেন? তেলেগুভাষা শুনলে নাকি?

—মনে হচ্ছে প্রায় তাই। কি বললে যেন?

—ভালো দেখে রান্নার বই একটা কিনে দাও না আমায়। সত্যি-সত্যি যাতে রান্না শেখা যায়।

জ্যোতিঃপ্রকাশ হাতের বইখানা মুড়ে অল্প হেসে বলে—কেন বলো তো? তোমার বামুনঠাকুর হঠাৎ জবাব দিল নাকি?

—তা' কেন? এমনি বুঝি রাঁধতে ইচ্ছে করে না মানুষের?

জ্যোতিঃপ্রকাশ মনে মনে একবার বলে—'মানুষের তো অনেক ইচ্ছেই করে, কিন্তু মনুষ্যজনোচিত সাধারণ ইচ্ছের প্রকাশ তো কখনো দেখিনি তোমার মধ্যে'—কিন্তু মুখে বলে

উল্টো কথা। হাসতে হাসতে বলে—মানুষের না করুক, মেয়েমানুষের নিশ্চয়ই করে।···বলো তো এখুনি যাই বইয়ের দোকানে, কপাল ফেরে আমার।

—এখুনি যেতে হবে তা' বলছি না কি? তুমি আমায় কি ভাবো বলো তো?

—তোমাকে? একটি শিশুর বেশী কিছু ভাবি না। হয়তো আজ না এনে কাল আনলে পাতাও খোলা হবে না সে বইয়ের।

—কক্‌খনো নয়, দেখো কী চমৎকার সব খাবার করে খাওয়াবো তোমাকে। লাল বাড়ীর ওই নতুন ভাড়াটেদের একটি বৌ বই দেখে দেখে নাকি মাংস রান্নাই শিখেছে দশ-বারো রকম—

—বলো কি! ভয় লাগাচ্ছো যে। বাঘ-ভালুকের মাংসও চালান নাকি ভদ্রমহিলা?

—আহা, তোমার যেমন অপূর্ব্ব কথা! দশ-বারো রকম প্রণালী, বুঝলে? সুধুই কি মাংস? বিস্কুট, কেক্‌—কতো কি শিখেছে। বাজারের জিনিষ মোটেই কেনে না ওরা। তাই ভাবছি—

—আর ভাবনা-চিন্তা নয়—জ্যোতিঃপ্রকাশ দাঁড়িয়ে উঠে বিপুল উৎসাহ প্রকাশ করে বলে—এই চললাম আমি। যতো রকমের কাণ্ডকারখানার প্রণালী আছে, সব এনে হাজির করছি। ব্যস্‌, কাল থেকে বাজারের জিনিষের ছায়াটি মাড়াবো না কিন্তু।

—আহা রোসো, আগে শিখিই ছাই। সত্যি, শুনে কাল এতো লজ্জা করলো—কিছুই তো রাঁধতে জানি না আমি। অথচ এতো বয়েস হ'লো আমার।

—হ'লো নাকি?—জ্যোতিঃপ্রকাশ একটু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে—আমার তো ধারণা এখনো বাল্যকাল কাটেনি তোমার।

—তা' একরকম সত্যি। কিছুই তো কাজকর্ম্ম শিখিনি—মণি প্রায় হতাশ সুরে বলে—ইচ্ছে তো করে, কিন্তু শিখেই বা কি হবে? কে খাবে? ওদের বৌ কতো রকম নাকি আচার তৈরী করে। তা' বোতলে তুলে রাখতে 'তর' সয় না, ছেলেমেয়েরা চুরি করে খেয়ে শেষ করে দেয়। খুব দুষ্টু ছেলেমেয়ে কিনা।

—তা' বলে বাপু চোর ছেলেমেয়ে আমার পছন্দ নয়।—জ্যোতিঃপ্রকাশ চেষ্টাকৃত উৎসাহকে বজায় রাখবার চেষ্টায় সত্যিই উঠে পড়ে।—রান্না শেখার মতলবটি ছেড়ো না কিন্তু। চললাম বইয়ের চেষ্টায়।

অতঃপর দিনকয়েক চলে—'সৌখীন রন্ধন-প্রণালী'র মুণ্ডপাত।

নানাবিধ মালমশলা থেকে সুরু করে, তোলা উনুন, নতুন বাসনের সেট্‌ পর্য্যন্ত এসে হাজির হতে থাকে। মহোৎসাহে চলে এক্সপেরিমেণ্টের পালা।

কিন্তু ক'দিন থাকবে সে উৎসাহ? ক'দিন টিঁকিয়ে রাখা যাবে তাকে কৃত্রিম অভিনয়ের ব্যর্থ চেষ্টায়? বনেদটাই যার নিতান্তই চেষ্টাকৃত!

ফিকে হয়ে আসে মণির উৎসাহের জৌলুস, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে জ্যোতিঃপ্রকাশের রসনা।

এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল আর যাই হোক, খাদ্যযোগ্য তো হয় না বড়ো একটা।

তবু অভ্যাসের বশেই জ্যোতিঃপ্রকাশ আজও সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফিরে বলে—কই তোমার ছানার জিলিপি! বার করো? রীতিমত খিদে পেয়ে গেছে।

—খিদে পেয়েছে? ঠাকুরকে বলবো খেতে দিতে?

—হরি হরি! ঠাকুর কেন? ছানার জিলিপি?

—সে আর করলাম না।—ক্লান্ত সুর বেজে ওঠে মণির কণ্ঠে।

—করলে না মানে? 'ছানাগুলো' হঠাৎ 'বয়স্থ' হয়ে উঠলো নাকি? জিলিপির প্যাঁচে পড়তে রাজী হ'লো না?

—আহা, তোমার যতো অদ্ভুত কথা! ছানাটা ডালনা করতে দিয়ে দিলাম।···কি হবে করে? বুঝতেই পারি—ভালোও লাগে না তোমার। তার চেয়ে বরং—

—কি হ'লো? থেমে গেলে যে?

—থাক্‌, কাল বলবো।

—আবার কাল কেন? যা বলবে নির্ভয়েই বলো হে মহারাণী!

বারকতক ইতস্তত করার পর মণি যে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাতে হাসবে কি কাঁদবে ভেবেই পায় না জ্যোতিঃপ্রকাশ।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে মণি!

কেন, আপত্তির কি আছে? মানুষ করে না? তা' ছাড়া—মণি তো আর ছেলেমানুষটি নেই, মণির বয়সের মেয়েমানুষরা কতো তীর্থধর্ম্ম পুজোআর্চ্চা করছে।

অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অতএব এলো শ্বেত পাথরের গোপালমূর্ত্তি।···জড়ো হতে থাকে তাঁর রাজসিক সাজসজ্জা—খাট-পালঙ্ক, সিল্কের বালিশ, সাটিনের গদি, লেসের মশারি।···স্যাকরার আনাগোনা বাড়ে। রুপোর গেলাস পড়ে থাকে অনাদরে, গড়ানো হয় সোনার গেলাস। সোনার গেলাস নইলে জল খাবেন না—গোপালের আবদার।···রোজ রোজ একরকম চূড়া নূপুর পরে থাকতে লজ্জা করে না গোপালের? কেন, গোপালের যশোদা মা কি দুঃখী কাঙাল? অতএব চূড়ো

বাণীর দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণ হতে থাকে। ভোগের প্রসাদ খেয়ে উঠতে পারে না বাড়ীর লোকে, পাড়ার ছেলেদের ডাক দিতে হয়।···

এতোদিনে বুঝি মন বসলো মণির।···সুখী হলো এতোদিনে।

জ্যোতিঃপ্রকাশের সুখ দুঃখ? সে বোধ, বোধ করি, আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই তার। মণির ইচ্ছার বাহক আর সুখের সংগ্রাহক ছাড়া নিজস্ব কোনো সত্তা আছে কি না তাও আর মনে পড়ে না জ্যোতিঃপ্রকাশের। 'গোপাল' নিয়েই যদি মণির চোখের জল শুকোয়, মুখের হাসি ফোটে, গোরুর পাল জুটিয়ে আনতেও আপত্তি নেই তার।

ভয়ানক রকমের খুশী করে দেবে বলে—স্যাকরাকে অর্ডার দিয়ে গোপালের মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একজোড়া রুপোর গোরু গড়িয়ে এনে পকেটে লুকিয়ে রেখে উৎফুল্লভাবে ঘরে ঢোকে জ্যোতিঃপ্রকাশ।

জানলার ধারে চুপ করে বসে আছে মণি, এলোচুল—এলোমেলো শাড়ী। বিকেলের প্রসাধন বাকী আছে বোঝা যাচ্ছে।

উৎসাহ কিছুটা স্তিমিত হ'লো।

—এ সময় এ রকম বসে যে? তোমার গোপালের 'শেতল' দেওয়া হয়ে গেছে?

—'শেতল'? হয়েছে বোধ হয়। ঠাকুরকে বলেছি—কাচা কাপড় পরে 'শেতল'টা দিয়ে দিতে।

নিতান্ত শ্রান্ত কণ্ঠ।

—শরীর ভালো নেই বুঝি?—জ্যোতিঃপ্রকাশের স্বরে উদ্বেগ!

—শরীর? ওঃ! ভালো আছে তো।

—তবে? এমন বসে আছো যে?

—এমনি।

—বাঃ, আমি তোমার গোপালের "শ্যামলী" "ধবলী" নিয়ে এলাম!

অনেক কৌতুক আর কৌতূহলের বিনিময়ে বার করবে পকেট থেকে—সে সংকল্পটা বজায় থাকে না।

—"শ্যামলী" "ধবলী" কি জিনিস?

—এই যে দেখো না।

পকেট থেকে বার করে দেয় জ্যোতিঃপ্রকাশ।

গতকাল হ'লেও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো না কি মণি? উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছেলেমানুষের মতো হৈ হৈ করে উঠতো না?

কিন্তু 'আজ' 'কাল' নয়।

—বেশ গড়েছে তো! কবে গড়তে দিলে?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসে—এ দুটো ঠাকুরঘরে রেখে এসো না গো—আর দেখো তো বামুনঠাকুর কতোদূর কি করতে পেরেছে। ফলটলগুলো কাটতে পারলো না হয়তো!

নিঃশব্দে চলে যায় জ্যোতিঃপ্রকাশ।

জানে—এর পর থেকে বামুনঠাকুর যা করতে পারবে তার বেশী কিছু আর জুটবে না গোপালের।···মণির খেলা ফুরিয়েছে।

সৃষ্টিছাড়া ক্লান্তি আর অবসাদের ভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাটাবে দু'চার দিন নিঃশব্দে, তারপরে হয়তো হঠাৎ একদিন এসে উত্তেজিতভাবে বলবে···"দেখো শুনছো—ও-বাড়ীর বৌটা বলছিল কি যেন একটা সিনেমায় ছোট্ট একটা মেয়ে 'প্লে' করেছে, ঠিক নাকি আমার মতন দেখতে"···হয়তো বলবে—"দেখো—ঝি বলছিল ওদের বাড়ীর কাছে কারা নাকি একটা মেয়ে কুড়িয়ে পেয়েছে···ফরসা রং, কোঁকড়ানো চুল"···

জ্যোতিঃপ্রকাশ গম্ভীরভাবে প্রথমে সুধু প্রশ্ন করবে—'কতো বয়েস সেই মেয়ের?'···অতঃপর—উত্তর শোনার পর আর একটি বিনীত প্রশ্নে জানতে চাইবে, সাত আর বারোয় যোগ করলে যোগফল সাতই থাকে কিনা—

তখন সুরু হবে কান্নার পালা।

একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে জ্যোতিঃপ্রকাশের। এই এক যুগ ধরে কতো বস্তুকেই ধরতে গেল মণি!

সেলাই-বোনা, রেশম-পশম, জরি-শল্মা, চরকা, রং-তুলি—শিল্প-কল্পবৃক্ষের অজস্র শাখার নানা শাখা, ভেঙে ভেঙে দেখেছে—যদি মন বসে।

হায়, কোথায় সেই মন! যে মন সুস্থির হয়ে বসবে জ্যোতিঃপ্রকাশের নাগালের মধ্যে!

মাষ্টার ধরে আনলো জ্যোতিঃপ্রকাশ, মণির অসমাপ্ত শিক্ষার জের টেনে স্বল্প বিদ্যার স্বল্পতা দূর করতে।···বই এলো রাশীকৃত, পড়ার ঘর সাজানো হ'লো সৌখীন কায়দায়, রীতিমতো তোড়জোড়।

মাষ্টার এসে কিছুদিন বিনা খরচায় 'ফ্যানে'র হাওয়া খেতে লাগলেন, আর বিনা পরিশ্রমে মাইনে। শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে, বোধ করি নিতান্তই চক্ষুলজ্জার দায়ে নিজে থেকেই বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

তারের বাজনা দু'টো তাকিয়ার মতো ওয়াড় গায়ে চাপিয়ে ঝুলে মরছে দেওয়ালের গায়ে, হাতই পড়লো না তা'তে।

এ সব অবিশ্যি আগের দিকের কথা!

শেষ পর্য্যন্ত ধরেছিল ভগবানকে, তাও খোপে টি'কলো কই? এবারে তবে করবে কি মণি?

৩

পৃথিবীটা যে একটা গ্রহমাত্র, সৌরজগতের বিশাল প্রান্তরের এক প্রান্তে নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির মধ্যে নিতান্তই অভ্যাসের বশে অনন্তকাল ধরে নিজের খোঁটায় পাক খেয়ে মরছে—এ তথ্যটা বালকেরও অজানা নয়। পৃথিবীর গায়ে যে আমরা টিঁকে আছি সেটাও নিতান্তই 'মাধ্যাকর্ষণ' নামক প্রাকৃতিক আইনের বলে, এটুকুই বা শিখতে বাকী আছে কার?

তবু আমরা বলি—"জননী বসুন্ধরা"···বলি—"মা বসুমতীর কোল"।···অথচ আমাদেরই হিসাবে নিরাশ্রিতের সংখ্যাও বড়ো কম নয়। বরং মা বসুমতীর কোল'ই যার একমাত্র ভরসা, তাকেই আমরা বলি 'নিরাশ্রয়'। মানুষের হাতে গড়া চারখানা ইঁট-কাঠের দেওয়ালকেই পাকা আশ্রয় বলে ধর্তব্য করি আমরা।

অতএব সেই 'পাকা-আশ্রয়' ছেড়ে যে ব্যক্তি হৃদয়াবেগের বশে 'মা বসুমতীর কোলে' ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে—আর যাই হোক—'বুদ্ধিমান' বলা চলে না।

কিন্তু 'বুদ্ধিমান' নয় এমন লোকের সংখ্যাও তো কম নেই পৃথিবীতে?···দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানটা যাদের কমে আসে হৃদয়াবেগের তাড়নায়?

আমাদের লীলাকে ফেলবো কোন্ দলে?

আর যাই হোক তার বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না নিশ্চয়ই?···সুকৃতি দেবীর কাছে যে প্রাণের আশ্রয়টুকু ছিল সেটুকু খসে পড়তেই লীলা অমন চোখকান বুঁজে বিনা বিচারে 'মা বসুমতীর কোলে' ঝাঁপ দিল কেন? তবু তো ইঁট-কাঠের দেওয়ালে ঘেরা বাস্তব আশ্রয়টুকুও ছিল!···নিজে হ'তে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে না গেলে শরৎশশী কিছু আর তাড়িয়ে দিতেন না!

কিন্তু লীলা কি ঠিক সজ্ঞানে গিয়েছিল? যাকে সাধারণ চল্‌তি ভাষায় পালিয়ে যাওয়া বলে?

গভীর আর ভয়ঙ্কর সেই রাত্রে···বাড়ীতে অনেক লোকের ভিড়, অনেক কোলাহল···সমস্ত ইন্দ্রিয়ে মোচড় দেওয়া শরৎশশীর তীক্ষ্ম কান্নার সুর···সুকৃতির কতো গুণ ছিল তার প্রত্যেকটির হিসাব দাখিল করে করে সুকৃতির বড়োজায়ের একঘেয়ে বিলাপধ্বনি—সব কিছু মিলিয়ে বুদ্ধি-চৈতন্য সব অবশ করে দিচ্ছিল না কি লীলার?···আর দুরন্ত বেগে আকর্ষণ করছিল না কি আরো ভয়ঙ্কর অন্ধকার পথ?

আপাদমস্তক আবৃত সুকৃতি দেবীর নিষ্ঠুর কঠিন বোবা দেহটা অনবরত ধাক্কা মারছিল না তাকে সেই ভয়ঙ্কর পথের দিকে? আকস্মিক সেই ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পথে পড়াকে কি আর পালিয়ে যাওয়া বলে?

চৈতন্য যখন হ'লো তখন আর ফেরবার উপায় নেই।

বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ার অপরাধে চেকারের জেরায় উত্ত্যক্ত হয়ে যখন ট্রেনের জানালা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার, তখন এক ভদ্রলোক বোধ করি নেহাৎই দয়াপরবশ হয়ে খেসারৎটা মিটিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন —আমার সঙ্গে নবদ্বীপে যাবে খুকি?

বলা বাহুল্য, নামটা এক-আধবার কানে শোনা ছাড়া 'নবদ্বীপ' সম্বন্ধে 'খুকি'র কোনো ধারণাই ছিল না, তবু কৃতজ্ঞতার বশেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। 'কলকাতামুখী' অস্পষ্ট ইচ্ছেটাকে দমন করেই নাড়ে।

আশ্রয়ের আশাতেই কি? বোধ হয় নয়।

ঘটনাস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছু—বেশী কিছু ভাববার ক্ষমতা ছিল না বলেই এই সম্মতি।

নবদ্বীপ যখন পৌঁছলো তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীরের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

ভদ্রলোক অবশ্য ট্রেনে আহার্যবস্তু নিয়ে দু'একবার অনুরোধ-উপরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় লীলার ঘাড়নাড়াটা 'নেতি'বাচকই হয়েছে ক্রমাগত। অসঙ্কোচে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছে হাত পেতে খাবার নেবে—সে বয়স পার হয়ে গেছে। আর সে স্বভাবই কি ছিল কোনোদিন?

—তুমি একটু দাঁড়াও তো খুকি, আমি আসছি—বলে ভদ্রলোক বাইরের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে ভিতরে ঢুকে যান।···বোধ হয় লীলাকে বাড়ীর মধ্যে ঢোকাবার উপযুক্ত জমিটা প্রস্তুত করতে।

মিনিট দুই-তিন পরেই একটি বিধবা মহিলা চিম্‌নির গায়ে ভুষো পড়া একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে করে বেরিয়ে এসে খন্‌খনে গলায় বলে ওঠেন—কই রে সুরেন, সে মেয়ে কই?···ও মা, এই বুঝি? ও মা, এ যে দিব্যি মেয়ে···এসো গো মেয়ে, নাম কি তোমার?

একবারের প্রশ্নে উত্তর দেবার মতো সপ্রতিভ মেয়ে লীলা কোনো কালেই নয়, আর এটা তো অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

—চলো বাপু চলো। সুরেন বললে এতোখানি পথ না কি জলস্পর্শ করোনি। হাত মুখ ধুয়ে খাবে চলো কিছু।··· কই সুরেন, কোথায় গেলি?

থরথর করে লীলার হাত ধরে টেনে নিয়ে যান তিনি।

ছিটকে চলে যাবার দুরন্ত ইচ্ছাকে দমন করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে থাকতে হবে সে কথা ভাবতেই পারে না লীলা।

কী বিশ্রী খন্‌খনে কথা! প্রায় বেটাছেলের মতো ন্যাড়া মাথা, গলায় আবার শরৎশশীর হরিনামের মালার মতো দেখতে ছোট ছোট কাঠের গুলির মালা!

'আবাপুরুব'-জাতীয় মহিলাটি চলতে চলতে সামান্য একটু গলা খাটো করে বলেন—হ্যাঁরে সুরেন, বললি যে পনেরো ষোল বয়েস—তা কই, দেখে তো মনে হয় না।

সুরেন বোধ করি নেপথ্যেই বলতে চান—তবে শুনতে বাধা হয় না—আঃ থামো না দিদি, ও সব কথা পরে হবে'খন! এখন খেতে টেতে দাও।

—দিচ্ছি রে দিচ্ছি, বাবুর আর তর সইছে না! তা তোর সেই বন্ধু কি বলেছে—আচ্ছা আচ্ছা থাক্ বাপু, সব কথা পরে হবে।···চলো গো—কই নাম তো বললে না?

যন্ত্রচালিতের মতো 'কর্ত্রীধারিণী'র নির্দ্দেশে লীলা হাত মুখ ধোয়, কিছু খায়ও।

কিন্তু এঁর কথাবার্তার কোনো মর্ম্মগ্রহণ করতে পারে না। কথার ধরণ শুনে মনে হয়—লীলা যেন সুরেন নামক ব্যক্তিটির পরিচিত। কোনো কারণে বেড়'তে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে এখানে।···কিম্বা কোনো উদ্দেশ্যে।···কি সেই কারণ? কি বা সেই উদ্দেশ্য?···হওয়া সম্ভব? জীবনেও তো কখনো লীলা এই সুরেনবাবুকে দেখেনি, তিনিই বা তাঁর দিদির কাছে ও রকম বাজে কথা বলবেন কেন?

দিদিটি তবে খুব রাগী নিশ্চয়! হঠাৎ লীলাকে দেখে চটে উঠবেন ভেবেই—

. এই দিদির কাছে থাকতে হবে লীলাকে?

রহস্যটা আরো ঘোরালো লাগে।—

এক ফাঁকে দিদির অসাক্ষাতে সুরেনবাবু এসে চুপি চুপি বলে যান, দিদির অথবা পাড়াপড়শীদের কৌতূহল চরিতার্থ করতে লীলাকে নাকি বলতে হবে—বর্দ্ধমানে থাকতো লীলা, মা নেই, সম্প্রতি বাবাও মারা গেছেন। সুরেনবাবু তার দাদার বন্ধু, অনেকবার সে দেখেছে সুরেনবাবুকে। পনেরো বছর বয়েস লীলার।

সুরেনবাবুর এই চুপি চুপি কথাটাই কেমন বিশ্রী লাগে।—তার উপর আবার সাজানো-গোছানো বাজে গল্প শেখানো।

লীলার পরিচয় জানতে কৌতূহল প্রকাশ না করার জন্যে সুরেনবাবুর উপর যেটুকু কৃতজ্ঞ হতে পারতো লীলা, সেটুকু উপে যায়।

কি ভাবছে এরা? কি করবে লীলাকে নিয়ে? লীলার বয়েসটা বছর দুই বাড়িয়ে দিয়ে কী লাভ এদের?

পরের দিন থেকে সুরেনবাবুকে আর দেখা গেল না। দিদিটির কথায় মনে হ'লো ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে কলকাতায় গেছেন।

কলকাতা! কলকাতা!···লীলা কেন এই অচেনা অজানা লোকটার সঙ্গে এখানে চলে এলো বোকার মতো! কেন হেঁটে হেঁটেই চলে গেল না কলকাতায়! আশ্চর্য্য! লীলা এতো বোকা কেন?···

এ বাড়ীটা কী বিশ্রী! কথাগুলো কী যাচ্ছেতাই! পাড়ার লোকগুলোর কী অসঙ্গত কৌতূহল।

আর লীলা যেন কী এক দ্রষ্টব্যবস্তু! দেশসুদ্ধ লোকের তাকে না দেখলে চলছে না।

দিদির নাম মানদা। সকালবেলা প্রত্যহ তাঁর গঙ্গাস্নানে যাওয়া চাই। পৃথিবী উল্টে গেলেও নড়চড় হবে না।··· তা' রোজই তিনি একবার করে লীলাকে সাধেন তাঁর সঙ্গে যেতে। এড়িয়ে যায় লীলা।

বাবাঃ! দু দণ্ড একা থাকতে পেলেই বাঁচে সে। অবশ্য নিজের মন নিয়ে চুপচাপ একা থাকার মতো বিলাসিতা জোটে না ভাগ্যে। নিতান্তই যখন যেতে রাজী হয় না লীলা, তখন কিছু না কিছু কাজ একটা মানদা চাপিয়ে যান তার ঘাড়ে। চালের কাঁকর বাছ, শাকের পোকা বাছ—এ সব কাজ তো ফুরোয় না সংসারে। তার ওপর আছে মানদার দোক্তার রসদ—এক ডাবর পান সাজা।

হাঁপিয়ে উঠেছে লীলা। কোথায় সেই সুরেনবাবু? তাঁর সঙ্গে কী শত্রুতা ছিল লীলার?

আচ্ছা, এই অন্ধকার ভবিষ্যৎ আর আতঙ্কময় পরিস্থিতির মধ্যে চিরদিন কাটাতে হবে লীলাকে, কে বলেছে এ কথা?

লীলার 'পথ' তো নিঃশেষ হয়ে যায়নি? রাত্রি তো চিরদিনই অন্ধকার।···সাহস নেই সেই অন্ধকারের পথে পাড়ি দিতে? ক্রমশই কি ভীরু হয়ে পড়ছে লীলা?

৪

আজও মানদা নিত্যকার মতো ঘটি গামছা হাতে করে এসে হাঁক দেন—কিগো লীলাবতী, যাবে আমার সঙ্গে? যাবে না?···কি জানি বাবা, এ আবার কী বনের জানোয়ার পুষে রেখে গেল সুরেন! মানুষের সমাজে মিশবে না! ও মা!··· আমার একজন বন্ধু একবার দেখতে চেয়েছিল···তা আর হ'লো না। দেখি যদি সেই আসে—

লীলা হঠাৎ সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলে—কেন, দেখবেন কেন? মানুষকে আবার দেখবার কি আছে?

—ও মা, এ দেখছি বুলি কাটছে!···মানুষকে মানুষ দেখে না? তবে আর আমার ভাই দেখে শুনে নিয়ে এলো কেন তোমায়?···রূপ দেখেই হয়ে গেছে ভাইয়ের আমার, মানুষ কি জন্তু তাহ দেখ, আগে! এদিকে বাপু ন্যাকা-বোকাও মনে হয় না!···ও মা!—একি দুগ্‌গা যে! মেঘ না চাইতেই জল। এখুনি তোমার নাম করছিলাম।

—কেন, অপরাধ?—বলতে বলতে একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

লীলা ত্রস্তনেত্রে একবার 'দুর্গা'-নামধারিণীকে দেখে নেয়।
…নতুন কিছু নয়—সেই আধময়লা থান, ন্যাড়া মাথা, গলায় কণ্ঠি, হাতে ঘটি গামছা।…

মানদা সহাস্যে বলেন—অপরাধ তোমার নয় গো, আমারই। এই যে—এইটি! এতোক্ষণ খোসামোদ করছিলাম তোমার বাড়ী নিয়ে যাবো বলে।…বললে মনে করবে নিন্দে করছি ভাই একেবারে যেন বুনো ঘোড়া।…ঘরের বৌ এই রকম হলেই হয়েছে আর কি!

—ঘরের বৌ হ'লে পরে ঢিট করতে কতোক্ষণ?—দুর্গাদেবী সহাস্যে বলে ওঠেন—তুই না পারিস আমিই ঢিট করে দিয়ে যাবো।…হ্যাঁ লা, তা' এই মেয়ে নাকি? এ যে নেহাৎ বাচ্চা!

—ওগো, ওই দেখতেই বাচ্চা! 'মেঘে মেঘে বেলা গেছে।' তবে অবিশ্যি সুরেনের সঙ্গে কি আর সাজন্তর বয়েস? তা' সুরেনের যে একেবারে মায়া উথলে উঠলো! …'আহা, মা-বাপ মরা, ভাই-ভাজ ভালো নয়'…কিছু নয়, ওই কটা রঙটুকু দেখেই—নইলে আমার ভাসুরপো'র মেয়েও কিছু আর ফেল্না নয়। রঙটাই যা একটু ইয়ে—তা' নয় তো সে মেয়ের কী গুণ, কী গতর! বৌয়ের মতন বৌ হ'তো। এ হবে সুরেনের নাতনির সখ মেটানো—

—মরণ আর কি! পুরুষজাতটার কথা আর বলিসনে আমার কাছে। ঘেন্না ধরে গেছে। কচিতেই ওদের লোভ বেশী। টাটকা ফল কিনা।…যাক্, তোর হ'লো ভালো। ঝিনুক বাটী গড়িয়ে রাখিস ভাজের জন্যে।…

—বকো না ভাই, রঙ্গ রাখো। মরছি আমি আপন জ্বালায়। এখনো আশ্বিন কার্ত্তিক দু' মাস। অঘ্রাণের তেসরা 'দিন' করেছে—

—হ্যাঁ লা, তা' বিয়ের আগেই মেয়েকে বরের ঘর করতে পাঠিয়েছে, কেমনধারা লোক তারা?…

একটিপ দোক্তা নিয়ে মুখে পুরে উঠোনের ধারে পিক্ ফেলেন দুর্গা দেবী।

—আর বোলো না। ভাত-কাপড় দিতে পারছিল না বোধ হয়।…নইলে একটা মানুষের বাড়ী একবস্ত্রে পাঠায় মেয়েটাকে? সুরেন কাপড় কিনে আনলো তবে দ্বিতীয় বস্তর হ'লো।

—অবাক করলে!…তা' তোর ভাইকে তাহ'লে সব খরচ করতে হবে?

—তা' নয় আবার!

স্তম্ভিত দুই চোখ মেলে এঁদের মুখপানে চেয়ে থাকে লীলা। সে কি বজ্রাহত হয়ে গেছে? সে কি অহল্যার মতো পাষাণে পরিণত হয়ে গেলো?…রহস্যের আর কিছুই তো অবশিষ্ট নেই!

আরো ভাববার কী আছে? কিছু নয়, কিছু নয়!

পথ লীলাকে আবার টানছে—দুনিবার বেগে টানছে।…না, পালাতেই হবে। যেমন করে হোক।…সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আতঙ্ক কমে যায়।

দুর্গা এগিয়ে এসে মুচকে হেসে বলেন—সুরেন বুঝি তোমাদের বাড়ী খুব যাওয়া-আসা করতো?

—কক্‌খনো নয়—আরক্তমুখে উত্তর দেয় লীলা—কক্‌খনো দেখিনি আমি ওঁকে!

—তবু ভালো। আমি বলি বুঝি—তা' তোমার ভাই-ভাজ বুঝি খুব দজ্জাল?

—ভাই-টাই কেউ নেই আমার—লীলা হঠাৎ মরীয়া হয়ে দ্রুত উচ্চারণে বলে যায়—কে চেনে সুরেনবাবুকে? জন্মেও দেখিনি কোনোদিন। রেলগাড়ীতে তো সুধু দেখলাম।

—রেলগাড়ীতে?—মানদা দুই চোখ কপালে তুলে বলেন—কেন? সুরেন তোমার দাদার বাড়ী থেকে আনেনি?

—বললামই তো দাদা-টাদা কেউ নেই, আমার কেউ কোথাও নেই।

—অবাক করলে যে!—হ্যাঁ দুগ্‌গা, এ ছুঁড়ি বলে কী? …হ্যাঁ গা, তা' তোমার ঘরবাড়ী একটা কিছু ছিল তো? না কি ভুঁইফোঁড়?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভুঁইফোঁড়…লীলা শাড়ীর আঁচলটা সজোরে আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে—আমার ঘর নেই বাড়ী নেই, মা বাপ কিছু নেই, কোনোদিনও ছিল না কিছু। হ'লো তো?

—বাবা! এ যে জাতকেউটে!…ও মানি, এটিকে আবার দুধকলা দিয়ে পুষে মরছিস কেন?…বলি হ্যাঁ গা, কি যেন নাম তোমার, জাত জানো তো? নাকি তাও ছিল না কোনোদিন?

হঠাৎ দুই বান্ধবী ঠেলাঠেলি করে হেসে ওঠেন।

লীলা একবার এঁদের মুখের দিকে জ্বলন্তদৃষ্টি হেনে পিছন ফিরে সামনেই যে ঘরখানা পায় তার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

—গতিক সুবিধের নয়—দুর্গাবতী ন্যাড়া মাথা নেড়ে নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন—তোর ভাইটি কিছু কায়দা খেলেছে। কে জানে কী জাত। রূপখানা দেখলে তো বামুনের ঘরের মেয়ে বলে মনে হয়। তাঁতির ভোগে লাগিয়ে সইলে হয়।

'তাঁতি' শব্দের উল্লেখে মানদা নীরস স্বরে বলেন—বামুনের মেয়ে কি চামারের মেয়ে, তাই বা কে জানে! রূপ থাকলেই বামুন হয়, আর তাঁতি তেলির ঘরে সব শ্যাওড়া-গাছের পেত্নী জন্মায়, এমন তো কিছু লেখাপড়া নেই ভাই? কে জানে কোন্ চুলো থেকে এনেছে!—আমায় তো বোকা বুঝিয়ে গেল—'মা বাপ নেই—সে সব জিগ্যেস ক'রো না খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, মনে দুঃখু পাবে'—সরল মনে তাই বিশ্বাস

করেছি। এখন দেখছি গলদ আছে।...জাতের ঠিক নেই—জন্মেরই কি ঠিক আছে?...মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার।...বৌ মরার পর কতো আদিখ্যেতাই করলো সুরেন—'বিয়ে করবো না, মঠের সন্নিসী হবো'—হ্যানো ত্যানো। এখন আবার এমন ক্ষ্যাপা ক্ষেপেচে যে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল তুলে এনে...গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! গঙ্গায় জল নেই?

ঘটি গামছা বাগিয়ে নিয়ে যে রকম বেগে বেরিয়ে যান মানদা, তা'তে মনে হয় নিজেই বুঝি গঙ্গায় ডুবে মরতে চললেন তিনি।

দুর্গাও অগত্যা পিছন পিছন অগ্রসর হন।

এখন কি করবে লীলা? মানদা ফিরে আসবার আগেই চলে যাবে? না কি অপেক্ষা করবে রাত্রির অন্ধকারের জন্যে? ...এই প্রচণ্ড দিনের আলোয় কোথায় যাবে সে? ষ্টেশনে? চিনতে পারবে পথ? বিনা টিকিটে যাবার সাহস আর হয় না।...

কিন্তু রাত্রির অপেক্ষা করতেও সাহস হচ্ছে না যে। তবু তো এখন মানদা রয়েছে অনুপস্থিত, সদর দরজায় নেই তালা লাগানো। কিন্তু রাত্রে যে মানদা থাকবে সজাগ প্রহরীর মতো। সারারাতই তো ওঠে আর পান খায়।...

যদি ধরে ফেলে মানদা? যদি রাস্তায় কেউ ধরে? সুরেনের চাইতেও খারাপ লোক? সংসারের অন্ধকার দিকটার সঙ্গে যে বড়ো তাড়াতাড়ি পরিচয় হয়ে যাচ্ছে লীলার, বালিকার অনভিজ্ঞতা রইল কই? লীলার পক্ষে, লীলার মতো বয়সের মেয়ের পক্ষে যে বাইরের জগৎটা আর নিরাপদ নয়, এটা বুঝে ফেলতে আর বাকী নেই তার।

কিন্তু ঘরই বা নিরাপদ কই? সুরেনবাবুর মতো অমন সভ্য-শান্ত চেহারার ভদ্রলোকও যদি...

না না, পালাতেই হবে লীলাকে—যেমন করেই হোক।

কলকাতা! কলকাতায় না গিয়ে উপায় নেই তার।...কলকাতায় গিয়ে খুঁজে বার করতে হবে মণিকে—মহালক্ষ্মীকে।...খুঁজে বার করে স্পষ্ট প্রশ্ন করতে হবে—টুনি কে? তার মা কই? বাপ কই?—যাদের অভাবে অপমানের আর শেষ নেই টুনির, টুনিকে নিঃশেষে মুছে দিয়ে এসে 'লীলা' হয়েও না।

নাম!—কয়েকটা অক্ষরের সমষ্টি দিয়ে গাঁথা নাম একটা দিতে যে-কেউ পারে, পারে না পরিচয় দিতে।

কোথায় সেই পরিচয়? কে রেখেছে লুকিয়ে অজানা অন্ধকারের গুহায়? কি অধিকার আছে তাদের, টুনিকে এই অসম্মানের পাঁকে পুঁতে রাখতে? বঞ্চিত করে রাখতে পৃথিবীর আলো-বাতাস, স্বাভাবিক নিঃশ্বাসটুকু থেকে পর্য্যন্ত?

টুনির মুখে কি মাখানো আছে সেই রিক্ততার ছায়া? নইলে কেন এতো সহজে আবিষ্কার করে ফেলছে লোকে? টুনির মা বাপ না থাকাটা টুনিরই অপরাধ?

কতো লোকেরই তো মা বাপ থাকে না, কেউ তো ধিক্কার দেয় না তাদের?

আচ্ছা, এই যে এতো লোক চলেছে পথে, ভিড় করেছে হাটে বাজারে ষ্টেশনে, পৃথিবীতে এতো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক—সকলেরই পরিচয় আছে? পিতৃ-পরিচয়?...দিনের আলোর মতো পরিষ্কার? টুনির মতো অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয় না কাউকে?

৫

চুরি করা পাপ—এ কথা কি জানে না লীলা? তবু বার বার কেন মনে পড়ছে ভাঁড়ার ঘরে একটা মাটির ঘটের মধ্যে খুচরো পয়সা লুকিয়ে রাখে মানদা।...গঙ্গাস্নানের পর পাড়াবেড়ানো সেরে বাড়ী ফিরতে যে মানদার ঘণ্টা তিনেক লেগে যায়, ক' দিন ধরে দেখছে বলেই কি সাহস বেড়ে গেল তার?

কিন্তু কতোই বা পয়সা?...ঘটটা নেড়েচেড়ে উপুড় করে ফেলেও একটা আধুলি আর তিনটে আনি ছাড়া কিছুই তো মিললো না। এই ক'টা পয়সা? এই বিশাল জগতে পাড়ি দেবে লীলা, চুরিকরা এই পয়সা ক'টার ভেলায় চড়ে?

এই ক'টা পয়সা দিয়ে কি রেলের টিকিট কেনা যায়? কলকাতায় যাবার টিকিট?...বিনা টিকিটে সাহস করে রেলে উঠে পড়বার সাহস আর নেই লীলার।

তবে কি করবে? এই ক'টা পয়সা দিয়ে যতোটুকু যাওয়া যায়? কলকাতার দিকে যতোটুকু এগোনো সম্ভব?...

কিন্তু—চুরি?

হায়! একটিও যে পয়সা নেই লীলার! যদি গয়নাও থাকতো কিছু? থাকবার মধ্যে হাতে একগাছা করে সবুজ কাঁচের চুড়ি, আর কানে দুটো নকল পাথরের দুল—কবে যেন শরৎশশী 'ষাঁড়েশ্বরের মেলা' থেকে এনে দিয়েছিলেন আদর করে।

শরৎশশীর উপর খুব বেশী আকর্ষণ না থাকলেও হঠাৎ তাঁর এই সামান্যতম স্নেহের নিদর্শনটুকু দেখে কান্না উথলে ওঠে লীলার।...

তবু এইটিই থাক্। চুরির ভারটা কিছু হলকা হোক।

শুনেছিলাম—ন' আনা না কত দাম ছিল তার ...কানের দুল দুটো খুলে ঘটের মধ্যে রেখে দিয়ে পয়সা ক' আনা বার করে নিতে বিবেকের দংশনটা কিছু কম তীক্ষ্ণ হয়।

এখন শুধু বেরিয়ে পড়া—যা থাকে কপালে! হে ভগবান! একবারের জন্য দয়া করো লীলাকে, রাস্তায় যেন দেখা হয়ে না যায় মানদার সঙ্গে!···গঙ্গার রাস্তার উল্টো দিকটা ধরে গেলেও কি দেখা হয়ে যাবে?

ঈশ্বরের ক্ষীণতম অনুগ্রহ—দেখা হয় না। ষ্টেশনে এসে পৌঁছে যায় একসময়।

কিন্তু, মানুষের মতো এমন লোভী আর হিংস্র জাত আর কি জগতে আছে? স্বজাতির মাংসে লোভ-লোলুপ শ্যেনদৃষ্টি হানে এমন হিংস্র জানোয়ার সুন্দরবনের জঙ্গলেই কি খুঁজে পাওয়া যাবে?

আধময়লা সেমিজ আর কোরা একখানা শাড়ী পরণে, পাতলা একহারা ছোট একটা মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো যদি ঘুরেই বেড়ায় ষ্টেশনের ভিড়ের মধ্যে, কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় জগতের? মনুষ্য-সমাজের নিয়ম নীতি শৃঙ্খলার এতো কি ব্যাঘাত ঘটে তা'তে?

কেন মানুষ কৌতূহল প্রশ্নে জর্জ্জরিত করবে তাকে? কেন চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিতে চাইবে তাকে তীক্ষ্ণ নখের পেষণে?

মানুষের ছদ্মবেশে হিংস্র যে-সব জানোয়ারের দল অবাধে বিচরণ করে বেড়ায় মানুষের সমাজে, লোভ আর ক্ষুধার দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে উড়ে যায় তাদের ছদ্মবেশ, তাই লীলাকে আমরা বারে বারে দেখতে পাই—অস্বাভাবিক নতুন নতুন পরিবেশের মধ্যে···

দেখতে পাই—কি যেন একটা ষ্টেশনের ধারে টিনের শেড-দেওয়া এক পানের দোকানে জড়সড় হয়ে বসে পান সাজছে লীলা, পরণে ময়লা ডুরেশাড়ী, জামা সেমিজের বালাই-মাত্র নেই।

দোকানের মালিক বসে বসে পা দোলায়, শিস্ দেয়, বিড়ি খায়, আর নিত্যপরিচিত খদ্দেরদের সঙ্গে স্থূল রসিকতা করে। রসিকতার বিষয়বস্তুটা অনেক সময় তাম্বুলকারিণী।···মুখ আর তোলে না লীলা, ঘাড়টাকে নীচু করতে করতে প্রায় পানের ডাবরের সঙ্গে ঠেকিয়ে ফেলে যথেচ্ছ চুণ লাগায় পানের গায়ে।···

সেই লীলাকেই হঠাৎ একদিন দেখলাম—ঢালাই পেতলের ভারী সেই ডাবরটা ছুঁড়ে মেরে মালিকের কপাল ফাটিয়ে দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে···

দেখি—কোথায় যেন মফঃস্বলের একটা স্কুল-বোর্ডিংএ সেকেণ্ড মাষ্টারের কোয়ার্টারের কুয়োর জল তুলছে···ছাড়া কাপড় কাচছে···চায়ের বাসন ধুচ্ছে।···কাঁচা-পাকা-চুল প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়ের মেয়ের মতো।

নিশ্চিন্তেই থাকবার কথা—তবু একদিন সকাল থেকে আর দেখতে পাওয়া গেল না লীলাকে···ঘূর্ণি ঝড়ে কোথায় আবার নিয়ে গিয়ে ফেললো তাকে কে জানে!···

ঠিক সেই দিনই আবার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ক্লাশে আসেন মাষ্টারমশাই—অসাবধানে নাকি রাত্রে কখন শেয়ালে আঁচড়ে দিয়েছে।

···পড়াতে পড়াতে ঝি'টার আক্কেলের নিন্দে করেন। বরাবর থাকবে বলে নাকি নতুন শাড়ী সেমিজ কিনে দিয়েছিলেন তাকে,' অসময়ে চলে গেল নেমকহারামি করে! মানুষ চেনবার জো নেই জগতে!

আবার দেখলাম—তারকেশ্বরের মন্দিরে ফুল-জল তোলবার চাকরী পেয়েছে লীলা···দিন দু'বেলা ঝোড়া ভর্ত্তি করে বেলপাতা কুড়োয়···ফল পৈতে বাছে তার থেকে।

পাণ্ডার বাড়ীতে থাকে—সমাগত যাত্রীদের ফাইফরমাস খাটে, আর সুখ-সুবিধের তত্ত্বাবধান করে।···

কদন্ন! তবু দু'বেলা জুটছিল।···লীলার কুগ্রহ সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেললো তাকে।···

পাণ্ডা বলে বেড়ালো, তার অনেক টাকা নাকি চুরি করে পালিয়েছে মেয়েটা!···কে জানে, হবেও বা!···লীলাকে দেখলে এখন কিছুই আর অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

বহুদিনের তৈলহীন রুক্ষ চুল, একহাঁটু ধুলো, ময়লা কাপড়, রোদেপোড়া তামাটে রং।···মুখে-চোখে কেমন একটা রুক্ষ হিংস্র ভাব।···চুরি কেন, দরকার হ'লে বোধ করি খুনও করতে পারে লোককে।

আবার দেখলাম—মাহেশে রথের মেলায় 'পদ্ম' মুড়িউলির ডিরেক্‌শনে অনভ্যস্ত হাতে ফুলুরী আর পাঁপর ভাজছে লীলা, আর খিঁচুনি খাচ্ছে পদ্মর···

কতো রকমই দেখলাম!—

তবু—পাতলা একহারা সেই মেয়েটাকে তার বিধাতা-পুরুষ বোধ করি গড়েছিলেন এক টুকরো ইস্পাত দিয়ে—বাংলাদেশের গ'লেপড়া বেলেমাটিতে নয়। তাই বারে বারে সে নিজেকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের মসৃণ রাস্তা থেকে।··· বারে বারে ছিটকে পালিয়েছে মাংসাশী জানোয়ারের কঠিন থাবার ভিতর থেকে—অশ্রুজল আর কপালে করাঘাতের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেনি বিলুপ্তির হাতে।

তাই আবার তাকে একদিন দেখতে পাই গৃহস্থঘরের নিরাপদ নীড়ে!

পথ আর ঘর। অবিরাম টানা-পোড়েন চলছে। অবশেষে জুটেছে এই আশ্রয়।

নিরাপদ বটে, তবে বড়ো দুঃখের—বড়ো অমর্য্যাদার। পূর্ব্বপ্রচলিত ক্রীতদাসীর জীবনের সঙ্গে প্রভেদটা খুবই কম। ...বাড়ীর গিন্নী সন্তোষিণী পাঁচজনের কাছে বড়োমুখ করে বলে বেড়ান বটে—"মাহেশে রথ দেখতে গিয়ে মেয়েটাকে একরকম কুড়িয়েই পেয়েছি, তা' এমন মায়ায় জড়িয়ে পড়লাম —আর ছাড়তেও পারিনে। নইলে আজকালকার দিনে একটা মানুষকে ভাত-কাপড় দিয়ে পোষা—সোজা তো নয়..."

সত্যের খাতিরে বলতেই হয়, সন্তোষিণীর এতটা উদারতার কারণ অবিমিশ্র 'মায়া'ই নয়। 'পোষা'র ব্যাপারটা তিনি পুষিয়েই নেন দস্তুরমতো। 'ছেলের ঝি' বল্‌লে শুন্‌তে খারাপ লাগে আর মাইনে দিতে হয় বলেই—'ছেলের ঝি' বলেন না লীলাকে।

অগাধ অপোগণ্ডের মালিক সন্তোষিণী এরকম বেওয়ারিশ একটা মেয়েকে পেয়ে লুফেই নিয়েছিলেন।...তা' নয়তো গুটি আষ্টেক দশ সন্তানের ওপর আরো একটা মেয়েকে নিছক মায়ায় পড়ে পুষবেন এটা'ই বা আশা করা যায় কি করে?

তা'সত্ত্বেও—লাঞ্ছনার সেই একমুঠো অন্নও তিলে তিলে ভরিয়ে তোলে পাতলা একহারা দেহকে। বিধাতার সৃষ্ট-সৌন্দর্য্য, সময়ের সম্পদে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।...

তাকিয়ে দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়।...সন্তোষিণীর মতো চক্ষুলজ্জার-বালাইহীন বাস্তববাদী ভদ্রমহিলারও মাঝে মাঝে যেন কেমন লজ্জা করে—দুধে ধোওয়া চাঁপার কলির মতো সেই আঙুলগুলি দিয়ে ঘর মোছাতে, উঠোন ঝাঁট দেওয়াতে, ছেলেদের কাঁথাকানি কাচাতে।...

তা' হোক, লজ্জাকে দমন করার মতো জোর তাঁর আছে।

গৃহস্থালীর কঠিন পেষণ আর সন্তোষিণীর কড়া শাসনের নীচে দিন কাটতে থাকে লীলার।...দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

তা' নেহাৎ গতানুগতিক সংসারেও এক আধ দিন আলোড়ন ওঠে বৈকি।...জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের মতো বিধি-নির্দ্দিষ্ট কারণ ছাড়া—মাঝে মাঝে তুচ্ছ কারণেও হয়।... হয়তো বিশিষ্ট কোনো অতিথির আগমন সম্ভাবনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে বাড়ীর প্রত্যেকটি প্রাণী, মুখর হয়ে ওঠে সকলে—আলোচনায়, জল্পনা-কল্পনায়।

সকালবেলা তাই লীলাকে ডেকে সন্তোষিণী নির্দ্দেশ দিলেন—দেখো বাপু, আজ আর যেন কুড়েমি করে সন্ধ্যে অবধি ঘরদোর নোংরা করে রেখো না। সকাল সকাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, আর, নিজেও একটু সভ্যভব্য হয়ে থাকবে। বিকেলের গাড়ীতে আমার এক ভাগ্নী আসবে।...তাকাচ্ছিস কেন হাঁ করে? সে এই আমাদের মতন গেরস্থালী নয়। একটা ইস্কুলের 'মেয়ে হেড্‌মাষ্টার'।

লীলার পক্ষে বোঝা সহজ হবে বলেই বোধ করি তিনি এই পরিভাষাটি ব্যবহার করেন।

লীলা একটু চমকে উঠে বলে—স্কুলের হেড্ মিষ্ট্রেস্? নাম কি?

—নম? নাম তো বিভা, সকলে নাকি মিসেস্ রায় বলে। ডাকবে না? বেটাছেলের মতন বিদ্যেসাধ্যি তো! এই তো এই—আমাদের কালনায় আসছে ইস্কুলের প্রাইজ বিলোতে। এরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসছে।...তাই বলছি তা'র সামনে একটু সভ্যভব্য হয়ে থাকবি দু'দিন।

লীলা আর কিছু বলে না, কিন্তু তার মনেও আলোড়ন ওঠে বৈকি।...'সভ্যভব্য'! লীলার কী আছে যে সে সভ্যভব্য হবে? আর উদয়াস্ত যা অভদ্র খাটুনি, কখন করবে ভদ্রতা! সন্তোষিণী তো বলে খালাস।...তবু সারাদিনের পরিশ্রমের মধ্যেও বার বার মনে পড়তে থাকে লীলার, আজ এমন একজনকে দেখতে পাওয়া যাবে যার সঙ্গে বাইরের জগতের যোগ আছে। যোগ আছে—স্কুলের—স্বপ্ন আর স্বর্গ দিয়ে গড়া যে জগৎ।

সন্তোষিণীর নির্দ্দেশমতো সব কাজ সেরে সত্যিই একটু সভ্যভব্য হয়ে বসে থাকে লীলা...দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করে কি যেন সৌভাগ্যের।

কিন্তু কেন? কেউ তো লীলাকে আশ্বাস দেয়নি যে, মুক্তির দূত আসছে লীলার! তবে? কিসের এই প্রতীক্ষা?

পুরস্কার-বিতরণী সভা থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর মামারবাড়ীর উপযুক্ত আহার-অভ্যর্থনা পেয়ে গুছিয়ে বসে বিভাবতী একসময় লীলার অসাক্ষাতে প্রশ্ন করেন সন্তোষিণীকে—এ মেয়েটি কে মামী?

—ও মা, ওই তো লীলা। সেই যে বলেছিলাম সেবারে —মাহেশে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—

—কুড়িয়ে?—বিভাবতী একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বলেন —এই মেয়েকে কুড়িয়ে পেয়েছিলে তুমি?...পরিচয় পাওনি কিছু?

—কোথায়? মেরে কেটে ফেললেও তো একটা কথা বলে না! একটু যেন কেমন কেমন।

—কেন? বেশ তো খাটতে দেখছি।

সন্তোষিণী অসন্তোষের সুরে বলেন—হ্যা, ওই লোক-দেখ্‌তা। নইলে কাজে মন মাথা কিছুই নেই।

বিভাবতী আর একবার রান্নাঘরে অবস্থিত লীলার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বলেন—তা বয়েস তো হয়েছে নেহাৎ কম নয়, তোমাদেরই তো বিয়ে-টিয়ে দিতে হবে?

—বিয়ে ?···সন্তোষিণী বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে বলেন—জাতগোত্তর কুলশীল কিছুর ঠিক নেই, কে বিয়ে করবে ? লক্ষবার জিগ্যেস করেও কোনো কথা বার করতে পারিনি —এমন জেদী।···আমিও তেমনি, এই যে আমার কাছে আজ তিন বছর আছে, ভাতের হাঁড়িতে হাত দিতে দিয়েছি কোনোদিন ?

বিভাবতী হেসে ফেলে বলেন—ভাগ্যিস। তোমার জাতধর্ম কুলশীলটা তা' হলে খোওয়া যায়নি—কি বলো ?··· কিন্তু ওর তা'হলে পরিণামটা কি ? এই তোমার সংসারে দাস্যবৃত্তি ?

সমবয়সী মামীকে কেয়ার ক'রে কথা বলেন না বিভাবতী। তা' ছাড়া—লোকের মন রেখে, ন্যায় অন্যায়ের মাথায় কিল মেরে পাঁচজনের সঙ্গে মানিয়ে সংসার করতে তো কখনো হয়নি তাঁকে ?

সন্তোষিণীও তাই এহেন অপমানের কথাটা গায়ে মেখে ভারীমুখে বলেন—তা' রাজছত্তর আর জোটাবো কোথা থেকে বলো ? পরে তো 'আহা' করতেই পারে, ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে হ'লে—

বিভাবতী আর একবার হেসে উঠে বলেন—রাতদিনের ঝি রাখতে হ'লে যে আবার তার উপর মাইনেও দিতে হয় মামী।

সন্তোষিণীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে, কড়া একটা কিছু বলতে যায়, কিন্তু মনের ঝাল মেটাবার প্রতিবন্ধক হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই দেখা দেন সতীশবাবু।

—এই যে বিভা, ফিরেছিস ? তা' কি হ'লো টলো ?

—হ'লো সেই একঘেয়েমি।···যাকগে—তোমাকে একটা কথা বলছি মামা, তোমাদের ওই মেয়েটাকে আমায় দেবে ?

—আমাদের মেয়ে ?—সতীশবাবু চমকে ওঠেন।

—তোমাদের ওই পালিতা কন্যাটিকে।···কলকাতায় নিয়ে যাবো আমি ওকে। দাও না !

আচমকা মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লে আর কতো বেশী কাতর হয় লোকে ?···লীলাবিহীন সংসারের কল্পনা করে চক্ষে সরষে ফুল দেখেন সতীশবাবু।

—তুমি ?—তুমিই বা ওকে নিয়ে গিয়ে কি করবে ?

—ভালোই করবো ওর। জানো তো—ছোটোখাটো একটা অনাথ-আশ্রম গোছের খুলেছি আমি, কর্ম্মীর একান্ত অভাব। তাই ভাবছি—শিশুবিভাগের একটা চার্জ্জ ওকে দিয়ে—

সন্তোষিণী এতোক্ষণে মনের ঝাল মেটাবার সুবিধে পান, বিদ্রূপব্যঞ্জক স্বরে বলেন—সেই যে কথা আছে না—"আহা, কেন পাখীটাকে মেরে জীবহত্যে করছিস, আমায় দে। আমি পুড়িয়ে খাই"—বিভার কথাটা তাই হ'লো।···

আমাদের সংসারে দাস্যবৃত্তি করছে লীলা, সেটা দোষ হ'লো—আর রাস্তায় কুড়োনো হাড়ি-বাগ্দীর ছেলেমেয়ের কন্না করা খুব গৌরবের, কেমন ?

—তলিয়ে ভেবে দেখো—গৌরবের বৈকি।···ওকে আমি নিয়েই যাবো।···

সতীশবাবু মাথা চুলকে বলেন—এতোদিন রয়েছে মেয়েটা, মায়া পড়ে গেছে—

বিভাবতী সহাস্যে বলে ওঠেন—পড়লেই বা। নিজের মেয়েকে তো শ্বশুরবাড়ীও পাঠায় লোকে ?

সন্তোষিণী আর বিদুষী ভাগ্নীর মর্য্যাদা রেখে উঠতে পারেন না, রূঢ়স্বরে বলে ওঠেন—তা' জগতে এতো লোক থাকতে হঠাৎ ওর ওপরেই বা মায়া উথলে উঠলো কেন তাও তো বুঝছি না।···নিয়ে যাবো বললেই যাওয়া হয় ?···আমার চলবে না।

কথায় হেরে কাজ হারাবেন তেমন ধাতুতে গড়া মেয়ে বিভাবতী নন, মুখের হাসি ঘোচে না তাঁর, বলেন—ধরো, তুমি ওকে কুড়িয়ে পাওনি—কি করে চলতো ?

—ধরা অতো সোজা নয়। আমি ছাড়বো না—ব্যস্।

—আহা চটছো কেন মামী ? এ বয়সের একটা মেয়েকে রাখার দায়িত্বও তো আছে ? বিয়ে-টিয়েও দিতে পারবে না যখন ? আমার কাছে নিরাপদে থাকবে।···মামা, তুমি অমত কোরো না।

—ওঁর মতামতে কি এসে যায় ?—সন্তোষিণী রাগ করে দুম্ দুম্ করে উঠে যান—আমার চলবে না, ব্যস্। তিন বছর ধরে পুষলাম আমি, হুট্ বলতেই 'নিয়ে যাবো'—আহ্লাদ !

কিন্তু সন্তোষিণীর অহঙ্কার থাকে না।···শান্ত সহিষ্ণু মেয়েটা যে হঠাৎ এতো বড়ো সাহসী হয়ে উঠবে কে জানতো ? লীলা সোজা এসে স্পষ্ট গলায় বললে কিনা—মাসীমা, আমি কলকাতায় যাবো।

'আমায় যেতে দিন' নয়, 'আমি যাবো' !

পৃষ্ঠবল পেলে পায়ের কাদাও মাথায় ওঠে, অ্যাঁ !

—যাবি মানে ? ঝঙ্কারের সঙ্গে উত্তর দেন সন্তোষিণী—ভারী যে সাহস বেড়েছে দেখছি ? এ'কেই বলে ঘোর কলি ! কৃতজ্ঞতার বালাই নেই ? চক্ষুলজ্জার গন্ধ নেই ? অ্যাঁ ?··· বলি, আমি কুড়িয়ে এনে ঘরে ঠাঁই না দিলে কী দুর্দ্দশা হতো এতোদিনে তা' জানিস ?

—জানি বৈকি মাসীমা—লীলা কম্পিত কণ্ঠে বলে—আপনার দয়া ভুলবো না কোনোদিন। কিন্তু কলকাতায় আমায় যেতেই হবে মাসীমা ! অনুমতি দিন।

—অনুমতি ? মরে যাই রে—জুতো মেরে গরু দান !··· বিভা এসে আমার উপকারটা করলে ভালো।···বেশ, যাবে

যাও, সত্যি কিছু আর তোমার বিহনে সংসার অচল হয়ে যাবে না আমার। কিন্তু ধন্যি নির্মায়িক মেয়ে বটে, এই যে ছেলেমেয়েগুলো ছোট ভাই-বোনের মতো···তা' একবার মন কেমনও করছে না গো? ছিঃ ছিঃ!

লীলা শূন্যদৃষ্টিতে একবার উঠানে কলহনিরত সন্তোষিণীর ছোট ছেলেমেয়ে তিনটির পানে তাকায়···মনকেমন? করা উচিত ছিল বুঝি?···কিন্তু কই এদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক কি একতিলও ছিল লীলার? লীলার ডিউটি ছিল এদের পরিচর্য্যা করা, এদের ডিউটি ছিল লীলাকে উত্যক্ত করা, আর তো কিছুই মনে পড়ে না।

না না, এ জগতে লীলার কারোর উপর মায়া নেই, মমতা নেই।···লীলার উপর কে কবে ও-জিনিষটার অপব্যবহার করেছে?

৭

আবার—দিন কাটে নতুন এক আশ্রয়ে।···আশ্রয়ের মতো আশ্রয়। এতোদিনে বুঝি কূল পেলো স্রোতে ভাসা নাবিকহীন নৌকোখানা।

এখানে পেয়েছে লীলা ভদ্র আর মার্জ্জিত জীবনের আস্বাদ, পেয়েছে শিক্ষা আর শিক্ষিত মানুষের সংস্পর্শ। লীলার পরিচয় জানবার জন্যে অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে উত্যক্ত করতে আসে না কেউ, জানতে না পারার কৌতুকে গায়ে ধূলো দেবার প্রবৃত্তিও নেই কারো। বিভাবতী তাকে আশ্রয় দিয়েছেন—এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

এই নিশ্চিন্ত শান্তির হাওয়ায় কাটলো বছর দুই।···অবশ্য কাজও দিয়েছেন তাকে বিভাবতী—'অনাথ-ভবন'-এর শিশুদের পরিচর্য্যা।···লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে এই ভার।

বিকেলবেলা ছায়া পড়েছে মাঠে, লীলার হাতে একটা অসমাপ্ত ব্লাউস আর সেলাইয়ের সরঞ্জাম। কিন্তু কাজ বিশেষ এগোচ্ছে না। হাস্যোজ্জ্বল দুই চোখ মেলে দেখছে ছেলেদের ছুটোছুটি খেলা।

—লীলাদি—আমি শুনবো গল্প—একটা মেয়ে ছুটে এলো কাছে।

—আমি—আমিও।

—কোন্ গল্পটা লীলাদি?

—আঃ চুপ করনা তোরা, বিক্রমাদিত্যের গল্প বলবেন লীলাদি।···হ্যাঁ লীলাদি, তাই না?

—বত্রিশ-পুতুলের গল্পটাও লীলাদি—

—না না, বক রাক্ষসের—

—ধেৎ, তোদের কথা মোটেই শুনবেন না লীলাদি, যা ইচ্ছে হবে তাই বলবেন শুধু।···

—বাঃ কাল যে বলেছিলেন নলরাজার গল্প বলবেন।

লীলাকে ঘিরে ছোট ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ লাগিয়েছে।

একদিন দুটো গল্প বলে খাল কেটে কুমীর এনেছে লীলা, কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছে।

অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধানের ভার লীলার ঘাড়ে। বেলামাসীমা আছেন খাওয়া-দাওয়ার তদারকী করতে। তাঁর কড়া শাসনে কারুর সাধ্য নেই তরকারির আলু একখানা বেশী খেয়ে ফেলে, কি রুটিতে একটু চিনি খায়।

পরের দাতব্যে যাদের খাওয়া-পরা, তাদের জন্যে এটুকু কড়াকড়ি না করলে চলবে কেন? তিরিশ দিনের খাদ্য-বরাদ্দ তিন দিনে উঠিয়ে দিলে বাকী সাতাশ দিন খাবে কি কচুপোড়া!

বেলামাসীকে পেয়ে পর্য্যন্ত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন বিভাবতী, ছোটো জিনিষের দিকে আর নজর দিতে হয় না ···আর আছেন শোভনাদি। গুটি পঁয়ত্রিশ নানা বয়সের শিশু ও বালকবালিকার নিরক্ষরতা ঘোচাবার গুরুদায়িত্ব তাঁর।

অবিশ্যি আলাদা আলাদা করে আর খাটেন না তিনি, রোজ সকাল সন্ধ্যা এক গামলা বিদ্যে গুলে নিয়ে ঝিনুক ঝিনুক ঢেলে দেন প্রত্যেকের গলায়।

লীলার ডিউটি এদের সভ্যতা-ভব্যতা, রীতিনীতি, আদবকায়দা শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়। কে সকালে দাঁত না মেজে খেয়েছে, কে স্নানের বেলায় ফাঁকি দিয়েছে, কে দু'দিন ব্যবহারেই জামা-কাপড় ধোবারবাড়ী পাঠাবার উপযুক্ত করে তুলেছে, এ সব খোঁজ রাখতে হয় লীলাকে।

তবু লীলাকে সত্যিই ভালোবাসে এই অনাথ শিশুর দল। ···বেলামাসীর মতো লীলার পিছনে বক দেখায় না, শোভনাদির মতো আড়ালে ভেঙ্‌চি কাটেনা।

লীলাদির কাছে যতো আবদার এদের।

আবার নতুন এই এক উপদ্রব হ'লো—গল্প শোনা। পাগল করে তুলছে লীলাকে। লীলা হাতের সেলাইটা গুছিয়ে পাট করতে করতে বলে—বেশ, আজকে শুধু আমি গল্প বলছি, কাল থেকে তোমাদের ভাগ। এক একদিন এক একজনে গল্প শোনাবে।···

—ওমা, লীলাদি কী মজার কথা বলে—হি-হি-হি—রোগা কালো একটা মেয়ে হেসে লুটোপুটি খায়—আমরা কিসের গল্প বলবো? আমরা কি গল্প জানি?

—কেন জানবি না?···হঠাৎ কেমন যেন কঠিন দেখায় লীলার মুখ—তোদের নিজেদের কথাই তো বলতে পারিস? সেও একরকম গল্প।

—নিজেদের কথা?···নিজেদের কথা কী লীলাদি?—একটা ছোট্ট ছেলে বলে—গল্প তো বইতে থাকে।···

—কেন, শুধু বইতে থাকবে কেন? নিজের কিছু কথা মনে পড়ে না তোর? কোথায় ছিলি আগে? তোর মা কই? বাপ কই? এখানে কে আসতে বললে তোকে?

—মা বাপ?···ছেলেটা হেসে ওঠে—তারা তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে।···মা বাপ থাকলে বুঝি এখানে আসে কেউ?

—আসে না?

—বা রে, আসবে কেন? তাদের তো তা'হলে ঘরবাড়ী সব থাকে। যাদের কিছু নেই তারাই আসে অনাথ-আশ্রমে।

'মুংলি' নামের একটা বছর-আষ্টেকের মেয়ে ক'দিন হ'লো ভর্ত্তি হয়েছে, সে এগিয়ে এসে বলে—ধেৎ, কিছু জানিস না তুই, আমার তো মা বাপ আছে, তবে কেন এলাম?

—মা বাপ আছে?···লীলার প্রশ্নটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর—মা বাপ আছে তোর? তবে এলি কেন?

মুংলি গম্ভীর ভাবে বলে—মা বাপ যে আমাদের খেতে দিতে পারে না লীলাদি! বাবা খোঁড়া, শুধু তো বসেই থাকে। মা বাবুদের বাড়ী বাসন মেজে ষোলোটা তো মোটে টাকা পায়। তিনজনে কি খাবো? এতো টাকা চালের দাম!···

বলে ফেলেই মেয়েটা ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চায়, তারপরই হঠাৎ উত্তেজিত চাপা গলায় বলে—লীলাদি লীলাদি, বড়দিদিমণিকে যেন বলে দিও না। বিধুকাকা আমাকে ভর্ত্তি করবার সময় খাতায় লিখে দিয়েছে কিনা' কেউ কোথাও নেই আমার।

লীলা ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে—কেন লিখেছে?

মুংলি করুণ ভাবে বলে—তা নইলে যে এখানে নেবে না লীলাদি। বিধুকাকা বলে দিয়েছে—"না খেয়ে কি মরবি? কাউকে যেন বলে ফেলিসনে মা বাপ আছে।" আমি ভুলে গেছি লীলাদি।

—তোর মন কেমন করে না মা বাপের জন্যে?

মেয়েটা মুখের একটা কুৎসিৎ ভঙ্গী করে বলে—দায় পড়েছে! খেতে দিতে পারে না, আবার মন কেমন! মা শুধু চব্বিশঘণ্টা গাল দেয়—বাবা বসে বসে খালি একপায়ে লাথি মারে। বাবা মরে গেলেই বাঁচি আমি।

··· ··· ···

হঠাৎ যেন দিনের আলোটা ঝাপসা ঠেকে লীলার।

এরাই সঙ্গী লীলার।

বিভাবতীর গড়া অনাথ-আশ্রমের 'পকেট সংস্করণ'টি ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে দানশীল ব্যক্তিবর্গের অকুণ্ঠ দানে —ভরাট হয়ে উঠেছে গোত্রপরিচয়হীন মানবকগোষ্ঠীর আধিক্যে।

অতএব—নিজস্ব একখানা বাড়ী না হ'লে আর চলছে না 'অনাথ-ভবন'-এর। উৎসাহী কর্ম্মী বিভাবতী এই বাবদ বেশ মোটা রকমের একটা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন জনৈক ধনী পৃষ্ঠপোষকের কাছ থেকে।···কেবলমাত্র মোটা রকমের একটা বার্ষিক চাঁদা দিয়ে আর পার পাচ্ছেন না তিনি। ব্যাঙ্কের খাতায় বড়ো একটা 'খাবল' বসাতে হবে! বাড়ীর ভাবনায় আহার-নিদ্রা নেই বিভাবতীর।

অযাচিত দানের উপর আবার চাওয়াটা লজ্জার সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা সেবা-প্রতিষ্ঠান চালাতে হ'লে চক্ষুলজ্জার বালাই রাখা চলে না সেটা বিভাবতী জানেন।

লীলা একদিন কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করেছিল—আচ্ছা বিভাদি, মিষ্টার মুখার্জ্জি আবার অতো টাকা দিতে রাজী হলেন? রাগ করবেন না?

—রাগ মানে?—বিভাবতী উল্টে প্রশ্ন করেছিলেন—আমি তো কেড়ে আনবো না!

—তা নয় অবশ্য, তবে সেদিন অতো খরচা করে সবাইকে নতুন পোষাক আর কম্বল দিলেন—

—দেবেন তার আর বাহাদুরি কি!···অগাধ পয়সা, ছেলেমেয়ে কিছু নেই, এ সব লোকও যদি টাকা পুঁজি করে রাখে, তা'হলে দেশ বাঁচবে কি করে?···বরং সত্যিই এ সব লোকের কাছ থেকে কেড়ে আনা উচিত।···অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এঁর সম্বন্ধে কিছু বলছি না, নানাদিকে যথেষ্ট দান আছে ভদ্রলোকের।

লীলার ইচ্ছে হয় আরো বিশদ করে মিষ্টার মুখার্জ্জির আলোচনাটা চলুক। ভারী ভালো লাগে ভদ্রলোককে।··· অবশ্য কথা কইবার সুযোগ হয়নি, যা কিছু কথা বিভাদিই বলেন। তবু ভারী ভালো লাগে।···

কিন্তু বিভাবতী চলে যান নিজের কাজে।

আজ বিভাবতী এসে লীলাকে খবর দিলেন—দেখো লীলা, মিষ্টার মুখার্জ্জি ফোন করেছেন, আজ বিকেলের দিকে আসবেন এখানে—

—মিষ্টার মুখার্জ্জি!—আকস্মিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লীলার মুখ—আসবেন···আসবেন? কেন?

বিভাবতী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে এই উজ্জ্বল মুখের পানে তাকান ···কেন? মিষ্টার মুখার্জ্জির নামে এমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার হেতু কি?···ক'বারই বা দেখেছে তাঁকে লীলা?···কথাও তো কয়নি কোনদিন।···প্রাকৃতিক ধর্ম্মে আকর্ষিত হবে এমন

তরুণবয়স্কও নন ভদ্রলোক।...কথা মিষ্ট, ব্যবহার ভদ্র, দানে অকুণ্ঠ—সবই সত্য, কিন্তু লীলা আর কতটুকু পরিচয় পেলো তাঁর?

অনাথ ছেলেদের জামাকাপড় দিতে এসেছিলেন একবার, আর বার্ষিক চাঁদাটা দিতে একবার, আর কই?

যাই হোক, সন্দেহটা দূর করে তিনি সহজভাবেই বলেন —উনি প্রস্তাব করছিলেন ওঁর নিজেরই একখানা বাড়ী আশ্রমকে দান করবার ইচ্ছে রয়েছে ওঁর, বা ওঁর স্ত্রীরও বলা যায়। সেই বিষয়ে আলোচনা করতে...যাই হোক, আশ্রমের ছেলেমেয়েদের সেই নতুন পোষাকগুলো পরিয়ে রাখবে, বুঝলে? উনি যেগুলো দিয়ে গেছেন সেদিনে।...আর দেখো—

বিভাবতীর ইতস্তত: ভাব দেখে লীলা আশ্চর্য্য হয়—আর কি বিভাদি?

—মানে—ভাবছিলাম—ইয়ে—ওঁর কাছে আমরা প্রার্থী হিসেবেই দাঁড়াচ্ছি, তবু সাধারণ ভদ্রতার হিসেবে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করলে কেমন হয় তাই ভাবছি।

এ রকম পরামর্শ অনেক বিষয়েই আজকাল নেন বিভাবতী লীলার কাছে।

—ভাবছেন কেন বিভাদি? ভাববার আবার আছে কি? খুবই তো ভালো হয়। আমি নিজের হাতে কিছু তৈরী করবো বিভাদি?

বিভাবতী এবারে একটু নীরস স্বরে বলেন—কেন? তুমি আবার কি তৈরী করবে? দ্বারিকের দোকানের মিষ্টি টিষ্টি আনাবার ব্যবস্থা করে রাখতে হয় তা'হলে।...আর চা কিম্বা সরবৎ।

—দ্বারিকের দোকান? ওঃ। লীলা ঈষৎ দমে গিয়ে বলে—আচ্ছা বিভাদি, আস্ত একখানা বাড়ী দিয়ে দেবেন উনি? অদ্ভুত ভালো লোক, না?

—দেবেন তার আর আশ্চর্য্য কি? সমস্ত প্রতিষ্ঠানই বড়লোকের সাহায্যে চলে, বুঝলে?...ওঁকে বুঝি তোমার খুব ভালো লাগে?—চশমার ভিতর থেকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন বিভাবতী।... কথার সুরটা খুব সরল কি?

লীলা থতমত খেয়ে বলে—ভালো লোককে ভালো লাগবে না?

সে তো নিশ্চয়ই। তবে এলে পরে বেশী কথাবার্ত্তা বলবার চেষ্টা ক'রো না, বুঝলে? তিনি আবার গম্ভীর লোক।...আর ওই যা বললাম—ছেলেমেয়েদের নতুন জামাগুলো পরিয়ে দেবে।...

অন্য ব্যবস্থা করতে চলে যান বিভাবতী।

...

তাঁর গমনপথের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে লীলা।

স্নেহশীলা বিভাদি হঠাৎ এমন বিরক্ত হয়ে উঠলেন কেন লীলার ওপর?...মিষ্টার মুখার্জ্জিকে লীলার ভালো লাগে শুনে? ভালো লাগাটা দোষ? হয়তো তাই। নইলে বিভাদি—

কিন্তু সত্যি, ভালোই বা লাগে কেন? আরো তো দু'চার জন পৃষ্ঠপোষক আছে এই 'অনাথ-ভবন'এর। ভালো করে কোনদিন দেখেওনি তাঁদের লীলা।...

কিন্তু মিষ্টার মুখার্জ্জি?...তাঁকে দেখলেই কাছে যেতে ইচ্ছে হয় কেন? কেন এই অহেতুক আকর্ষণ? জন্মান্তরের সম্বন্ধসূত্র?...আচ্ছা, উনি ওঁর নিজের একটা বাড়ীই দিয়ে দেবেন বলেছেন? থাকবেন কোথায়?...আরো অনেক বাড়ী আছে? কিন্তু যদি সেই বাড়ীতেই থাকেন?...

বুকটা থর থর ক'রে ওঠে লীলার। যদি তেমন কিছু হওয়া সম্ভব হতো?...প্রত্যেক দিন দেখতে পেতো তাঁকে লীলা।...

দূর, লীলা কি বোকা! দান করলে আবার সেখানে থাকে না কি কেউ?

আচ্ছা, কোনো সূত্রেই কি ওঁর খুব কাছাকাছি থাকা যায় না? ধরো, লীলা যদি ওঁর অফিসে চাকরী করে?...কতো মেয়েই তো করে।...আহা, কতোই বা বিদ্যে লীলার!...এক যদি ওঁর ছোটো ছেলেমেয়ে থাকতো —লীলার বিদ্যায় পড়ানো চলে এমন ছোটো।...তা লীলার ভাগ্যে ছেলেমেয়ে কিছুই নেই ওঁর!...

তা ছাড়া, লীলাকে বিভাদি ছাড়লে তো! আশ্রমের ছেলেমেয়েদের কে দেখে তার ঠিক নেই। আরো লোক রাখবার কথা হচ্ছে।...তবু তো লীলার পর শোভনাদি এসেছেন, এসেছেন বেলামাসীমা।

অশন, বসন, শাসন—এক-একজনের ডিউটি। কলের মতো কাজ চলে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, শৃঙ্খলা—বিভাবতীর একমাত্র সাধনা।

বিভাদির হঠাৎ ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কেমন যেন অবাক অন্যমনস্ক হয়ে যায় লীলা।

কী আশ্চর্য্য! এই কি লীলার জীবন? 'অনাথ-ভবন'-এর শিশুদের 'লীলাদি', এই শেষ পরিচয়? এইখানেই চিরদিন থাকতে হবে নাকি তাকে? ঘড়ির কাঁটার মতো—সময়ের সঙ্গে পা ফেলে যন্ত্রের মতো এগিয়ে চলবে শুধু?...জীবনটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাবে বার্দ্ধক্যের পথে—বিভাদির মতো? বেলামাসীর মতো?...আশ্রমের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না জীবনের?... লীলাকে কেউ ভালবাসবে না?...লীলার জন্যে কেউ ভাববে

না? গৌরবোজ্জ্বল কোনো পর্য্যায় উদ্ঘাটিত হবে না তার জীবন-উপন্যাসের?···পথের কুকুরের মতো বিতাড়িত হ'তে হ'তে সুধু একটা প্রাচীরঘেরা আশ্রয়ে মাথা গুঁজে থাকা মাত্র? এই যথেষ্ট? এর বেশী নয়? আর কিছু চাইবার নেই লীলার?

বিভাবতী তাকে অনেক দিয়েছেন সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।···উদ্ধার করে এনেছেন অন্ধকার পাতালপুরী থেকে, শিক্ষার সুযোগ দিয়েছেন, দিয়েছেন স্নেহমমতা। সকলের বাড়া দিয়েছেন—নিরাপদ আশ্রয়। এখানে নিজের জন্যে নিজেকে সশঙ্কিত হয়ে কাটাতে হয় না।···

তবু হঠাৎ একটা অন্ধবিদ্বেষ গর্জ্জে ওঠে বিভাদির বিরুদ্ধে।···

উদ্ধার করেছেন? কোথায়?···এই-ই বা কি? এও তো এক আলোক-রেখাহীন পাতালপুরী! লীলা কি টের পায় লীলা কলকাতায় রয়েছে? যে কলকাতা অহরহ অদৃশ্য আকর্ষণে টেনেছে লীলাকে, এই দীর্ঘ দুটি বৎসরের মধ্যে তার স্পর্শ কবে পেলো লীলা?···

সন্তোষিণীর সঙ্গে কতোটুকুই বা প্রভেদ বিভাবতীর? কিছু না! কিছু না! সন্তোষিণী নিজের সন্তানগুলির পরিচর্য্যা করিয়ে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন, বিভাবতীর দাবী আরো বিস্তৃত, আরো সর্ব্বগ্রাসী।

স্বার্থ! স্বার্থ! সকলেই সমান স্বার্থপর। কেউ বা নিরাবরণ, কেউ বা কিছুটা মার্জ্জিত।···

স্নেহ-মমতা? সে কি "লীলা" ব'লে?···না 'অনাথ' ব'লে? রাশি রাশি যে ছেলেমেয়েগুলোকে পালন করেছেন বিভাবতী, তাদেরই মতো লীলাও একজন। আবার কি? যেটুকু শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন, সে কেবল নিজের কাজ চালাবার সুবিধের জন্যে, আর কিছু নয়।

যে বিভাদির জন্যে মরতে পারে বাঁচতে পারে লীলা, তাঁর উপর হঠাৎ এ কী অদ্ভুত বিরাগ লীলার? বিভাবতীর দৃষ্টিতেও সে কি সন্ধান পেয়েছে স্বার্থের আর শাসনের?··· তাই অবাক হয়ে ভাবছে—এমন নিশ্চিন্ত শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে কি করে সে, অন্ধের মতো সুধু বিভাদির অনুসরণ ক'রে। কলকাতার জন্যে যে ব্যাকুল আবেগ ছিল অস্থিতে মজ্জায়, সে কি স্তিমিত হয়ে গেল? বিভার পালিত এই অনাথ শিশুগুলোর তত্ত্বাবধান করবার জন্যেই কি অমন মরীয়া হয়ে চলে এসেছিল লীলা, সন্তোষিণীর ভ্রূকুটির ভয় এড়িয়ে?···

লীলার ভাগ্যদেবতার রহস্যপ্রিয়তা কি কমে না?

কী অদ্ভুত! কী নিষ্করুণ যোগাযোগ! লীলার জন্যেই তোলা ছিল এই কাজ? নামহীন গোত্রপরিচয়হীন মাতৃপরিত্যক্ত এই শিশুদের পরিচর্য্যা? এই তবে তার জীবনের চরম পরিণতি?···কোনোদিনই তা'হলে খুঁজে বার করবে না মণিকে, মহালক্ষ্মীকে? তার জীবনের চরম প্রশ্ন উত্থাপিত করবে না তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?···

৮

লীলার জীবনটা কি সিনেমার ছবি? না হ'লে নিরপেক্ষ দর্শকের মতো নিজেই দেখতে পায় কেন?

বিস্মৃত স্মৃতির অস্ফুট চৈতন্যের দরজায় ঘা দিলে পর্দার ওপর যে ছবি ফুটে ওঠে, সে এক বনেদী জমিদারদের পুরাণো বাড়ী।···কতো ঘর, কতো সিঁড়ি, বিরাট ঠাকুরবাড়ী, নাট-মন্দির, গোয়াল, ঢেঁকিশালা—কুয়াশার মতো আবছা—লীলার জন্মরহস্যের মতো অস্পষ্ট।

সেই বাড়ী। প্রকাণ্ড রান্নাঘর—রাক্ষসের মতো উনুন জ্বলছে দুটো।···খুন্তি নাড়ার শব্দ, রান্নার ছ্যাঁক ছেঁ'ক শব্দ, মসলা পেষার ঘস্‌ঘস্ শব্দ, তার সঙ্গে মিশেছে একটা মেয়ের একঘেয়ে কান্নার গুন্‌গুন্ শব্দ।···

শাঁখের মতো সাদা সরু লিক্‌লিকে হাত-পাওয়ালা সেই মেয়েটা দুলে দুলে সুধু কেঁদেই চলেছে সর্ব্ববিধ খাদ্যবস্তুর আবেদন জানিয়ে। 'দাও' 'দাও' 'দাও'!—পাবার আশা আছে কি না সে বোধমাত্র নেই, চাওয়াটাই তার কাছে একমাত্র সত্য। কিন্তু কী চাইবে? আহার্য্যবস্তু ছাড়া প্রার্থনা করবার আর কিছু নেই তার চিন্তাজগতে।

সেই মেয়েটাকে মনে পড়ে লীলার। কী নাম ওর?··· টুনি? লীলার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য একটা সম্বন্ধ রয়েছে না?···

সেই বাড়ীর আরো একটা ছবি বিদ্যুৎ-চমকের মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।···ছবির মতোই সাজানো ঘরে উঁচু পালঙ্কের উপর রোগশয্যাশায়িনী এক রাজকন্যা···তাকে একটিবার উঁকি মেরে দেখবার জন্যে কী উগ্র আকাঙ্ক্ষা সেই রোগা হ্যাংলা মেয়েটার! সহস্র নিষেধেও আটকানো যায় না তাকে। কে সে? কে? কী সম্বন্ধ তার সেই অবহেলিত মেয়েটার সঙ্গে?

কতো ছবি···কতো লোক!···

এরা কে?···বিশুকাকা? নীরদা? তরুবালা? বামুন-ঠাকুর? বিনোদ?···সব্বাই রয়েছে ভিড় ক'রে।

লীলার স্মৃতির ভাঁড়ারে কি মজবুত একটা তালা লাগানো ছিল? তাই এককণাও হারায়নি। সুধু নিজেই সে হারিয়ে গেছে সকলের স্মৃতির সীমানা থেকে? টুনিকেই যারা ভুলে

গেছে লীলাকে চিনতে দায় পড়েছে তাদের! টুনির পরিচয় নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে হেসেই উড়িয়ে দেবে হয়তো।

আচ্ছা, দাঁড়াবেই বা কোথায়?

কলকাতার এই অজস্র পথঘাটের গোলকধাঁধা থেকে কে খুঁজে বার করবে সে বাড়ী?…পরিচিত সেই ঘর বারান্দা সিঁড়ি ছাদ—চোখের সামনে সব ভাসলেও ঠিকানাটা যে অজ্ঞান অন্ধকারে ঢাকা।…'পদ্মপুকুর'—এই একটিমাত্র শব্দ আছে চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে।…কিন্তু কোথায় সেই 'পদ্মপুকুর'? কলকাতায় তো আবার দুটো-তিনটে-'পদ্মপুকুর' রয়েছে দেখা যাচ্ছে।…

কী করবে তবে লীলা? প্রত্যেকটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে ঢুকে অনুসন্ধান করবে? প্রশ্ন করবে প্রত্যেকটি পথিককে?—কিন্তু কেন?…আর একবার অবহেলার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে?…আশ মেটেনি লীলার?…

আরো তো অনেক লোক এলো গেলো তার জীবনে… কে কী দিলো?

একমাত্র সুকৃতি দেবী!…

কিছু সঞ্চয় রয়ে গেছে সেইখানে। কিন্তু লীলার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যকে জড়িয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে সুধু রোগভোগই করলেন তিনি, শেষ পর্য্যন্ত মরেই গেলেন।

জয়ন্ত?…

না না, তার ওপরও আছে একটা বোবা বিদ্বেষ।… জয়ন্তই যেন লীলার জীবনের শনি! অথচ—জয়ন্তরই যেন সামর্থ্য ছিল লীলাকে দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধার করতে।

কেউ না, কেউ না। লীলার জন্যে একফোঁটাও দরদ নেই কারুর। সে জন্মদুঃখী।

তবে কেন লীলা নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারে না? কেন এই বিশ বছর ধরে অবিরত বোকার মতো ভেবে এসেছে—দুঃখদুর্দ্দশাগুলো সাময়িক একটা অবস্থা মাত্র?… কোথায় যেন অপেক্ষা করছে তার সত্যকার জীবন—চিরনিঃসঙ্গ লীলার জন্যে যেখানে আছে অন্তরের সঙ্গ!…আছে—সুখে ঝলমল, আগ্রহে ব্যাকুল, স্নেহে স্নিগ্ধ ঘর!…আছে যুদ্ধ-অবসানের নিশ্চিন্ত শান্তি!…'আশ্রয়' নয়—প্রশ্রয়। 'দয়া' নয়—দাবী। যেখানে লীলার মা আছে, বাবা আছে, আছে পরিচয়।

সত্যকার সেই জীবনটা কি তবে নিতান্তই মিথ্যা? মিথ্যা সেই ধারণাটা—লীলার দুর্ভিক্ষপীড়িত হৃদয়ের কল্পিত খোরাক মাত্র? আলেয়ার মতো দূরে সরতে সরতে একদিন মিলিয়ে যাবে ছায়ার মতো?

আর লীলা?—দিনের পর দিন দিনরাত্রিগুলোকে নিয়ে 'জাবর কাটবে' বিভাবতীর দেওয়া 'খোলবিচালিতে'?

—লীলা!

বিভাবতীর ক্রুদ্ধস্বরে বিদ্যুতের মতো চমকে ওঠে লীলা, বজ্রাহতের মতো আড়ষ্ট হয়ে যায়।

—কি বলছেন বিভাদি?

—ব্যাপার কি লীলা? বলেছিলাম না—'ভবনে'র ছেলেমেয়েদের নতুন পোষাকগুলো পরিয়ে রাখবে?… দিব্যি সব ময়লা জামাটামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে…এদিকে মিষ্টার মুখার্জ্জি এসে পড়েছেন! দেখলে—ভাববেন কি?

—এসে পড়েছেন? এঁ্যা!

অজ্ঞাতসারে নিজের বেশভূষার প্রতিও দৃষ্টি পড়ে যায় লীলার।…তার বেশভূষাই বা এমন কি ভালো? তাকেই বা ভাববেন কি? চকচকে সুট্‌পরা ঝকঝকে ভদ্রলোকটি!

বলা বাহুল্য এটুকু চোখ এড়ালো না বিভাবতীর, এবং জ্বলেই উঠলেন তা'তে।

—তোমার সাজসজ্জা খারাপ হোক, তা'তে এসে যাচ্ছে না কিছু, বুঝলে? ছেলেদেরকে উনি নতুন পোষাকগুলো দিয়ে গেলেন—অথচ—

হঠাৎ লীলা এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠলো কি করে? কি করে সঞ্চয় করলো বিভাবতীর কথাকে ব্যঙ্গ করবার মতো দুঃসাহস?

—দিয়েছেন বলেই যে আসামীর মতো সকলকে একরকম পোষাক পরিয়ে কলের পুতুলের মতো সেলাম করাতে হবে তার কি মানে আছে বিভাদি? পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে সেইটে জানাতে?

অসহ্য বিস্ময়ে কয়েক সেকেণ্ড নিশ্চল তাকিয়ে থেকে বিভাবতী ভীষণ স্বরে বলেন—কি বললে?

—কিছুই না। সুধু বলছি—আমাদের মতো দুঃখী অনাথরা যে দয়ার দানকে অগ্রাহ্য করে ফেলে দেয় না, সে কি উনি জানেন না?

—বটে? তোমার যে বেশ 'কথা' হয়েছে দেখছি—বিভাবতী ক্রুদ্ধ-গম্ভীর স্বরে বলেন—হুঁ! আগেই এটা সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। তোমার মতো মেয়েদের মতিগতি ভালো না থাকাই স্বাভাবিক।…কিন্তু একটা কথা মনে রেখো লীলা, মিষ্টার মুখার্জ্জির মতো লোক তোমার মতো মেয়ের দিকে তাকিয়েও দেখেন না।…

—কি? কি বললেন?

একি! কেউটে সাপের মতো ফণা তুলে উঠলো যে লীলা!—কি বললেন শুনি? কি বলতে চান আমায়?

—বললে কিছুই চাই না, সুধু নিজের ওজন রেখে কথা বললে, এইটেই চাই। বুঝেছো?

—বুঝেছি, বুঝেছি—হঠাৎ যেন পাগল হয়ে ওঠে লীলা —বুঝেছি আপনাদেরই স্থধু ওজনের সীমারেখা না থাকলেও চলে। যা খুশী বলতে পারেন।

বিভাবতী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর এক মিনিট তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলেন—আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে কথা হবে। তোমার সঙ্গেও যে একদিন হিসেব-নিকেশের দিন আসবে সেটা কাল পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনি!

কি হ'লো?

বিভাবতীর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই অমন স্তিমিত হয়ে গেলো কেন লীলা? নিজের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় লজ্জিত হচ্ছে, না অবাক হচ্ছে?···বিভাবতী যে তার জীবনদাত্রী এ কথা সহসা বিস্মৃত হ'লো কেন লীলা?

কিন্তু—মিষ্টার মুখার্জ্জির সম্বন্ধে অমন বাঁকা সুরে কথা বললেন কেন বিভাবতী?···ওঁকে দেখলে ভালো লাগে সে কথা অস্বীকার করাই উচিত ছিল বুঝি? সেইটেই সভ্যতা?

কিন্তু কেন যে ভালো লাগে সে কথা নিজেই যে বুঝতে পারছে না লীলা। এতো কাণ্ডের পরও ইচ্ছে করছে একবারটি উঁকি মেরে দেখে আসতে।

কী সুন্দর সৌম্য চেহারা! কী কমনীয় মুখশ্রী! কী চমৎকার স্নেহভরা দৃষ্টি!···কালো কালো বিশ্রী চেহারার ওই ছেলেমেয়েগুলোকে বিনা দ্বিধায় টেনে নিয়ে আদর করলেন সেদিন।···লীলা যদি এখনো ছোটো থাকতো, টুনির মতো ছোটো, তা'হলে হয়তো লীলাকেও ওই রকম সস্নেহমমতায় কাছে টেনে—

কী আশ্চর্য্য! অমন ভালো লোকের ছেলেমেয়ে নেই! থাকলে কতো সুখী হ'তো তারা!

হায় হায়! কী বোকামীই করলো! যদি বিভাবতীর নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করতো, তা'হলে এতোক্ষণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারতো।···সস্মিত প্রশংসার দৃষ্টিতে হয়তো লক্ষ্য করতেন তাকে মিষ্টার মুখার্জ্জি—সেদিন যেমন তাকাচ্ছিলেন কয়েকবার।···

হ্যাঁ তাকাচ্ছিলেন—লীলা দেখেছে। হয়তো বিভাবতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়ায়নি সেটা।···আচ্ছা, তাই কি অতো বিরক্ত হয়েছেন বিভাবতী?···

অথচ—কেনই বা? কতো বড়ো উনি, কতো মহৎ।··· তার মতো ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ একটা প্রাণীকে সামান্য একটু স্নেহদৃষ্টিতে দেখেই থাকেন যদি, দোষ কি?

—লীলা! ওগো লীলা!—বেলামাসী এসে ডাক দেন।

আবার চমকে ওঠে লীলা! আজ সকলের কণ্ঠেই বাঁকা সুর কেন?

—যাও বাইরে। যিনি এসেছেন, খোঁজ করছেন তোমার।

—আমার খোঁজ করছেন? কে? কে এসেছেন বেলামাসী?

—আহা ওই যে গো, যিনি 'ভবন'-এর জন্য বাড়ী দিতে চেয়েছেন। তিনি নাকি এসে পর্য্যন্ত চোদ্দবার খোঁজ করেছেন তোমার।

—কেন বেলামাসী?

—কি জানি মা। বড়লোকের খেয়াল, কি বুঝবো বলো? তা যাও, দেরী কোরো না, গাড়ীতে নাকি আবার ওনার স্ত্রী বসে আছেন, দেরী করতে পারবেন না।

লীলা তবু স্থিরভাবে বলে—কিন্তু আমাকে ওঁর কিছুই তো দরকার নেই।

—আছে কি নেই তার আমি কি জানি বলো? মিসেস্ রায় বলে দিলেন—

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়ায় লীলা।

কেন আর এসব উপদ্রব?···সামান্য একটু স্নেহ দেখিয়ে তার জীবন অতিষ্ঠ করে দিয়ে যাবার দরকার কি লোকের?

তবু—না গিয়ে উপায় নেই। বিভাবতীর আদেশ।

বাইরে ছেলেদের 'ড্রিল' করবার মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিভাবতী আর মিষ্টার মুখার্জ্জি।···

লীলা গিয়ে নতমুখে দাঁড়াতেই বিভাবতী নীরস স্বরে বলেন—নমস্কার করবার কথাটা ভুলে যেও না লীলা।

—থাক্ থাক্—মিষ্টার মুখার্জ্জি সস্নেহে তার আনত মাথার উপর একখানি হাত রেখে বলেন—তোমার কথাই এতোক্ষণ জিগ্যেস করছিলাম।···কিছু মনে কোরো না, একটা কথা বলছি—খুব ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে?

—কেন?—লীলা বিদ্যুতাহতের মতোই শিউরে ওঠে।

—এমনি জানতে চাইছি।···ধরো, কোনো একটা নাম, কি কোনো একটা বাড়ী, কিম্বা কোনো একটা রাস্তার ঠিকানা?

"ছেলেবেলা"! "ছেলেবেলা"!···

লীলার আবার ছেলেবেলা কোথা? ছেলেবেলা যার আছে সে তো টুনি।···বাড়ী? রাস্তা? 'পদ্মপুকুর' কি রাস্তার ঠিকানা?···একটা নাম কেন? নাম কেন? কতো অজস্র নাম···মালা গাঁথার মতো সাজানো রয়েছে যে! 'রাঙামাসী' 'বড়দিদিমা' 'নীরদা' 'বিশুকাকা' 'সরকার মশাই' 'বিনোদ'—কতো নাম!

কিন্তু ইনি কে? কে ইনি? এঁকে তো চেনে না লীলা? টুনিও কি কোনোদিন দেখেছিল এঁকে?

—অমন বোকার মতো চুপ করে আছো কেন?—বিভাবতীর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে—যা মনে পড়ে বলো না? ছেলেবেলায় কোথায় ছিলে মনে পড়ে না?

এ কি, লীলা অমন নির্বোধের মতো মাথা নাড়ছে কেন? কিছু মনে পড়ে না তার? ছি ছি!

ভদ্রলোক হতাশভাবে বলেন—একেবারে কিছু মনে পড়ে না? ধরো ছ'সাত বছর বয়সের কথা?...তাও মনে পড়ে না? আশ্চর্য্য তো!

—তুমি যে অবাক করলে লীলা—বিভাবতী বিব্রতভাবে বলেন—আমার অবশ্য প্রয়োজন হয়নি বলেই কোনোদিন প্রশ্ন করিনি, কিন্তু 'ছেলেবেলা' বলে একটা জিনিস ছিলো তো তোমার? কালনায় যাবার আগে কার কাছে থাকতে?

—কারুর কাছে নয়, রাস্তায় বেড়াতাম।—বুনোঘোড়ার মতো ঘাড় গুঁজে উত্তর দেয় লীলা।

বিভাবতী ঘাড় নেড়ে বলেন—ওই দেখছেন তো? যা বলছিলাম আপনাকে। অনেক বিষয়ে উৎকর্ষ থাকলেও, একটু গোলমেলে। এই আছে বেশ, হঠাৎ ক্ষেপে যায়।...যাক্, লীলা, যেতে পারো তুমি।

—থাক্ না থাক্—আগ্রহের স্বর ধ্বনিত হয় মিষ্টার মুখার্জ্জির কণ্ঠে—আচ্ছা, অতো কম বয়সের কথা মনে না থাক্, আর একটু বড় বয়সের? চুঁচুড়োতে থেকেছো কোনোদিন? 'জয়ন্ত' বলে কাউকে চেনো? তোমাদের থেকে কিছু বড়ো একটি ছেলে—

—কে? কে আপনি? জয়ন্তর কে হন?

—জয়ন্তর কেউ হই না আমি, সে আমার অফিসে কাজ করে। চেনো তাকে?...তাও না? কী আশ্চার্য্য! তবে যে জয়ন্তের নাম করলে? তা'হলে—মিসেস্ রায়ের কাছে আসার আগে পর্য্যন্ত কিছুই মনে পড়ে না তোমার, কেমন?

—না।

হায়! হায়! লীলা এমন কাণ্ড করছে কেন? যে ছবি, যে সব নাম আগুনের রেখায় আঁকা আছে মনের মধ্যে, কেন অস্বীকার করছে তাকে?

—তবে আর কি করা যাবে!—ভদ্রলোক হতাশভাবে বলেন—বড্ডো প্রয়োজন ছিল আমার। আচ্ছা, ভালো করে ভেবে ভেবে কিছুই মনে আনতে পারো না?

—না।

লীলার কি হ'লো? এমন পাগলামির হেতু কি?

—আচ্ছা।...নমস্কার তা' হলে মিসেস্ রায়। বাড়ীটা আপনি একবার নিজে দেখতে গেলে ভালো হয়। ঠিকানা—তেরো নম্বর পদ্মপুকুর রোড।

"পদ্মপুকুর? পদ্মপুকুর? কি বলছো? তোমার বাড়ী পদ্মপুকুরে? কি রকম দেখতে সে বাড়ীটা? বারান্দা আছে? সরু মত লম্বা বারান্দা?"...

কে বলছে এ কথা?

কেউ না।

সুধু লীলার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে ধ্বনিত হচ্ছে কথাগুলো..."সে বাড়ীর দোতলার একটা ঘরে কি নীচু একটা খাট আছে? ফরসা ধপ্‌ধপে বিছানা পাতা? সে বাড়ীতে কি 'মণি' বলে কেউ থাকে? নীরদা? তরুবালা?"...

হৃৎপিণ্ড বলতে পারে—রসনা বলবে কোন্ ভরসায়? পদ্মপুকুরে কি একটিমাত্রই বাড়ী আছে? বললে লোকে হাসবে না? আর বলবেই বা কে? কণ্ঠ যার রুদ্ধ হয়ে গেছে?

মিষ্টার মুখার্জ্জি বিষাদগম্ভীর স্বরে বলেন—মাপ করবেন মিসেস্ রায়, আমার এই অযথা কৌতুহলের জন্যে।...খুলেই বলি আপনাকে—বারো-চোদ্দ বছর আগে আমাদের একটি-মাত্র মেয়ে অসাবধানে হারিয়ে যায়। সেই অবধি—এই এক পাগলামি। মানুষের দুর্ব্বলতা আর কি! আপনার আশ্রয়ের এই মেয়েটিকে সেদিন দেখেই হঠাৎ কেন কি জানি...মানে কিছুই নয়, আশার ছলনা বলতে পারেন।...তা' এঁকে তো ঠিক প্রকৃতিস্থ বলেই মনে হচ্ছে না। কাজেই খোঁজ পাবার চেষ্টা বৃথা।...যাই হোক, কাজের কথাই বলি—আমার স্ত্রী মণিমালা দেবীর একান্ত ইচ্ছে আপনার 'অনাথভবন'-এর নামটা বদলে আমাদের সেই হারানো ছোট্ট মেয়েটির নামে 'টুনি-স্মৃতি-ভবন' রাখা হয়...ও কি? ও কি? কি হ'লো?...

মিষ্টার মুখার্জ্জির সঙ্গে সঙ্গে বিভাবতীও চমকে ওঠেন—লীলা, ও কি! অমন অসভ্যের মতো ছুটছো—মানে?...দেখুন, আমি বুঝতে পারছি না মাথাটাই হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল নাকি মেয়েটার! নইলে—যথেষ্ট বুদ্ধিমতী কর্ম্মী মেয়ে, অবশ্য মাঝে মাঝে একটু—তা সেটা হওয়া অসম্ভবও নয়। ধরুন পূর্ব্ব-ইতিহাসটা হয়তো বিশেষ গৌরবজনক নয়। তার স্মৃতি মনে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।...যাক, আপনি যা বলেছেন তাই হবে...একি, আপনি নেমে এসেছেন দেখছি! নমস্কার!—সম্মুখবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করে দু'হাত জোড় করেন বিভাবতী।

—এই দেখো—মিষ্টার মুখার্জ্জি অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন—তুমি এলে আবার? আজ তোমার হার্ট-ট্রাব্‌লটা বেড়েছে, আর ওই জন্যেই বাড়ী থেকে বেরোতে মানা করছিলাম।

—না না, ভালোই আছি—মিসেস্ মুখার্জ্জি রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করেন—এখান থেকে ছুটে চলে গেল কে ?···কে ওই মেয়েটি ? অতো বড়ো বয়সের মেয়ে অমন ছেলেমানুষের মতো ছুটলো কেন ?

মিসেস্ রায় বলেন—ওর কথা বাদ দিন, ও এক পাগল। ···আপনি দয়া করে যে আমাদের আশ্রম দেখতে এসেছেন, এর জন্যে—

লীলাই সুধু পাগল ?—আর মিসেস্ মুখার্জ্জি ?

স্বচ্ছন্দে একজন ভদ্রমহিলার মুখের ওপর বলে বসলেন—না না না ! কে বলেছে আপনার আশ্রম দেখতে এসেছি ?··· ওই মেয়েটিকে দেখবো বলেই গাড়ী থেকে নেমে ছুটে চলে এলাম। দয়া করে ডাকুন ওকে।

বিভাবতী হতাশভাবে বলেন—আপনারা দেখছি মুস্কিলে ফেললেন। ডাকলে আসবে বলে মনে হয় না। একেই একটু খাপ্‌ছাড়া স্বভাবের, তার ওপর দু'একদিন দেখছি, মাথাটাও যেন—

—তা হোক, তা হোক—ডাকুন একবারটি।

—বেশ তো, আপনারাই চলুন না ভিতরে।

মুখার্জ্জি-দম্পতির মাথার উপরও বিশেষ আস্থা থাকে না বিভাবতীর।···বারো-চোদ্দ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে খুঁজে পাবার আশা! পাগল আর কাকে বলে ? এখন রজ্জুতে সর্পভ্রম করুন বসে বসে।

—অসম্ভব আশা করে লাভ কি মণি ?···তা' ছাড়া ওর পূর্ব্বস্মৃতি মনেই নেই। আমি অনেক প্রশ্ন করে ফেলিওর হয়েছি। শেষ অবধি ছুটে পালালো।

—তা হোক গো, তা হোক। আমি যে ওর মুখ দেখতে পেলাম।···নিয়ে চলুন না আমাকে তার কাছে, মিসেস্ রায় !

দরজার পর্দ্দা সরিয়ে মিসেস্ রায় রোষ, ক্ষোভ, বিরক্তি, সর্ব্ববিধ ভাব-সমন্বয়ে প্রশ্ন করেন—লীলা, তুমি হঠাৎ ওভাবে চলে এসে শুয়ে পড়েছো মানে ?···

—ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে বিভাদি।

কাতর স্বর ভেসে আসে ঘর থেকে।

—তা হোক, দয়া করে একবার বেরিয়ে এসো।···এ কি, আপনি কষ্ট করে এতোদূর পর্য্যন্ত এলেন! যেমন করে হোক ডেকে নিয়ে যেতাম আমি। লীলা শুনছো ? মিসেস্ মুখার্জ্জি তোমাকে একবার···

—লীলা ?···লীলা ?···কে বললে ওর নাম লীলা ? ও টুনি। নিশ্চয় টুনি!···আমার হারানো টুনি !

মিসেস্ মুখার্জ্জি হঠাৎ প্রায় আছড়ে এসে দুই হাত চেপে ধরেন লীলার—টুনি। টুনি! চিনতে পাচ্ছিস আমায় ?··· আমি—আমি!···মুখ তুলে দেখ্, ভালো করে···চিনতে পাচ্ছিস না ?···আমি তোর মা!

লীলার দৃষ্টিতে এ কী কাঠিন্য!···ও কি অন্ধ ?···ওর চোখ দুটো কি পাথরের তৈরী নকল চোখ ? ও কি দেখতে পাচ্ছে না ?···কী বলছে ও ?

—আমার মা নেই !

—আছে আছে! এই—এই যে তোর দুঃখিনী মা। আর এই তোর বাবা। তরুদি কেউ নয় টুনি! আমি—আমিই তোর মা।

তবু কী বলছে লীলা ?···আগ্রহব্যাকুল স্নেহকোমল মুষ্টি থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ দৃঢ়স্বরে বলছে কি ?···

—না না, আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই! ভুল করছেন আপনি।···আমার নাম লীলা।

মিষ্টার মুখার্জ্জি গম্ভীরভাবে বলেন—মণি, অসম্ভবের আশা করে করে সত্যি কি পাগল হয়ে গেলে ? বাড়ী চলো।

—ও গো, না গো না।···একলা ফিরে যাবো না আমি। টুনিকে নিয়ে যাবো।···আমি যে আজ বারো বচ্ছর পাগল হয়ে বেড়াচ্ছি ওর জন্যে! টুনি, চল্ আমার সঙ্গে।

—আঃ—ছেড়ে দিন—আমার নাম লীলা।

বিভাবতী মনে মনে ভাবেন—আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেল বাবা! মুখে বলেন—বোধ হয় আপনার ভুল হচ্ছে মিসেস্ মুখার্জ্জি। দেখছেন না, মোটেই চিনতে পারছে না আপনাদের! অথচ বলছেন সাত আট বছরের মেয়ে হারিয়েছিল।···একেবারে চিনতে না পারার কথা তো নয়—

—পারছে পারছে—দেখছেন না ও অভিমান করে চিনছে না।···টুনি টুনি, একবারটি চেন—টুনি লক্ষ্মীটি—

পাথরের চোখ দিয়ে কি আগুন বেরোয় ?···আগুনের শিখা ?···কিসের এই আগুন ?···মূল্যবান বেশবাসে সজ্জিত মণির সর্ব্বাঙ্গ লেহন করছে কেন সেই আগুনের শিখা ? কেন চাইছে জ্যোতিঃপ্রকাশকে দগ্ধ করতে ? কেন সেই আগুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য-রাখা সুরে বলছে—

—বাজে কথা বলছেন কেন ? আমি চিনি না আপনাদের —কখনই না—জীবনেও দেখিনি।

—মণি!

—ওগো যাচ্ছি যাচ্ছি।···তুমি একবার বলো না ভালো

ক'রে! ও অভিমান করে আসছে না। দেখছো না, অবিকল সেই মুখ-চোখ!···আমার কি ভুল হতে পারে? তুমি তো দেখোনি—তুমি কি করে জানবে? টুনি, টুনি, তোর মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, একবার চিনতে পারিস কি না? একবার ডাক্ 'মা' বলে!

ব্যাকুল সেই মূর্তির অলঙ্কারশিঞ্জিত হাত থেকে আবার ছাড়িয়ে নেয় লীলা শাঁখের মতো সাদা সম্পূর্ণ নিরাভরণ নিজের দু'খানি হাত।···

—সুধু সুধু ডাকবো কেন? বারবার তো বলছি আমি লীলা।···টুনি কে? টুনিকে চিনি না আমি।

প্রেম ও প্রয়োজন

—:*:—

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

প্রেম ও প্রয়োজন

—:•:—

এক

উত্তর-কলিকাতার এক অপরিসর গলির এক প্রান্তে যে পতনোন্মুখ বাড়ীখানি তাহার হাড়-পাঁজরা-সার দেহখানি লইয়া দীর্ঘকাল একই অবস্থায় টিকিয়া আছে, তাহারই রোয়াকের উপর বসিয়া সকালের রৌদ্রে পিঠ দিয়া কয়েকটি যুবক উদ্দাম তর্কের ঝড় তুলিয়াছিল।

তর্কের বিষয়বস্তু যাহাই হউক, সাদা বাংলায় ইহাকে আড্ডা দেওয়াই বলে এবং দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে —যুদ্ধের চাহিদায় বেকার-সমস্যার অনেকটা সমাধান ঘটিলেও, ইহাদের কাছে সমস্যাটা সমস্যাই রহিয়া গিয়াছে।

সিমেণ্ট চটিয়া যাওয়া, খাপরি ওঠা, ভাঙা রোয়াকে বসিয়া আধ-ময়লা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া ইহারা কথা কয় বড় বড়, আদর্শ গড়ে বিরাট, আর স্বপ্ন দেখে অসম্ভবের।

ইহাদের মধ্যে প্রবীর বলিয়া ছেলেটিই শুধু অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তাহার বেশভূষার বৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও, চেহারার লাবণ্য, মুখের সৌকুমার্য্য, সহজেই তাহার আভিজাত্যের প্রমাণ দেয়।

তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া সমর কহিল—তোমার কথা বাদ দাওনা, সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ, দুনিয়ার হালচাল তো কিছু জানলে না; তোমাদের মত নাড়ুগোপালদেরই বিয়ে করা মানায়।…আমরা—যারা লোহা পিটবো, রিক্‌শা টানবো, তাদের জন্যে বিয়ে নয়।

প্রবীর মৃদু হাসিয়া কহিল—তেমনি বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে, এমন মেয়েরও তো অভাব নেই।

—অভাব হয়তো নেই, কিন্তু আমি চাইনা যে আমার স্ত্রী এসে বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, বাটনা বাটবে।

—কিন্তু তুমি যদি লোহা পিটতে পারো, তোমার স্ত্রীই বা বাসন মাজতে পারবে না কেন শুনি?

কথাটা অপর কেহ বলিলে হয়তো সাধারণ তর্কের পর্য্যায়ে ফেলা হইত, কিন্তু প্রবীর ধনীর সন্তান বলিয়াই বোধ করি ইহার মধ্যে অহঙ্কারের গন্ধ আবিষ্কার করিয়া সমর ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিল—ভালবাসার জিনিষ সকলেরই সমান, বুঝলে মুখার্জ্জি? অবস্থার গতিকে আমাদের ছোট কাজ করতে হতে পারে, তাই বলে—ভালবেসে যাকে ঘরে আনবো, তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে না পারলে, স্বাচ্ছন্দ্য দিতে না পারলে, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে, এটা কি ক'রে আশা করছো তুমি? স্ত্রীকে 'দাসী' বলবার যুগ চলে গেছে বলেই আমরা আজ বিয়ে করতে ভয় পাই, কুণ্ঠিত হই।

প্রবীর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া কহিল—তোমার ভাষার ছটা আর কথার ঝাঁজ দেখে মনে হচ্ছে—ভয় কেটে এসেছে।

—অর্থাৎ?

চাপা কপাল আর উদ্ধত চোয়ালের জন্য সমরের মুখটায় আনিয়াছে একটা পরুষত্বের ছাপ, স্বভাবটাও তেমনি তাহার উদ্ধত; সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া যেন খাড়া দাঁড়াইয়াছে অস্ত্রে শান দিয়া।

পাড়ার ছেলে প্রবীর, ছেলেবেলা হইতেই একত্রে স্কুলে গিয়াছে, স্কুল পলাইয়াছে, লাট্টু ঘোরাইয়াছে, মার্ব্বেল খেলিয়াছে, কিন্তু তবু—প্রবীরকে দেখিলে সমরের রাগে গা জ্বালা করে, কথা শুনিলে বিষ লাগে। সমরের ক্রুদ্ধমুখের "অর্থাৎ" শুনিয়া কিন্তু প্রবীরের হাসি বন্ধ হইল না, সে তেমনি হাসিমুখে কহিল—অর্থাৎ মনে হচ্ছে যাঁকে ভালবেসেছ তাঁকে ঘরে আনতে বিলম্ব সইছে না।

—তার মানে ভালবাসাটা তোমাদের মত বড়লোকের নাড়ুগোপালদের একচেটে, কি বল?

মানেটা অবশ্য প্রাঞ্জল নয়, এবং কেবলমাত্র কলহ বাধাইবার জন্য "ধান ভানতে শিবের গীতের" মত একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা আনিয়া ফেলায় উপস্থিত সকলেই সমরের উপর বিরক্ত হইল।

আবহাওয়াটা হালকা করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে অমরেশ একটু আড়ামোড়া ভাঙিয়া কহিল—ভালবাসার রাইট নিয়ে যদি তর্কই ফাঁদতে হয় তো রোসো এক পেয়ালা করে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

অমরেশ এই বাড়ীরই ছেলে, এবং ইহাদের রোয়াকে আড্ডাটা বসে বলিয়া মাঝে মাঝে চায়ের খরচটাও যোগাইতে হয় তাহাকেই। ভাঙা রোয়াকে ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া আবার যে দিন ব্রিজের আসর বসে, সেদিন ঘন ঘন চায়ের ফরমাসে বাড়ীর কর্ত্রী উত্যক্ত হইয়া উঠেন।

অমরেশ যে তাহা না জানে এমন নয়, তবু বাড়ীর ভিতরে অনেক রকম কথা হজম করিয়াও সে বন্ধু মহলে নিজের যথার্থ অবস্থাটা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে।

শীতের সকালে সহনীয় রৌদ্রটা তখন ধীরে ধীরে মাত্রা ছাড়াইতে সুরু করিয়াছে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রবীর কহিল—থাকনা, আবার এখন চায়ের হাঙ্গামা কেন অমরেশ? শুধু শুধু বৌদিকে জ্বালাতন করা—ভালবাসার তর্কটা না হয় মুলতবী থাক এখনকার মত। সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সভা ভঙ্গ হোক।

—না না, বৌদি মোটেই জ্বালাতন বোধ করেন না, খুব খুশি হ'ন বলিয়া অমরেশ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

অমরেশের বৌদি আরতি কোলের ছেলের আহারপর্ব্ব সমাধা করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভাতমাখা ছেলেটিকে টানিয়া কলকাতায় লইয়া চলিয়াছিল, অমরেশকে দেখিয়া বিব্রতভাবে হাতের উল্টা'পিঠে মাথার কাপড়টা টানিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—দেখেছ ঠাকুরপো, কি দুষ্টু? খাওয়ার বেলায় বেশ ওস্তাদ, অথচ শীতের ভয়ে আঁচাতে রাজী নয়।···এই গাধা শীগগির চল্ নইলে কাকা মারবে।

ওস্তাদটি বাড়ীর মধ্যে সকলকেই অবজ্ঞার চোখে দেখেন, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে বলা শক্ত কাকাকে অপেক্ষাকৃত সমীহ করিয়া চলেন। কাজেই অনিচ্ছুক গতিটা মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন করিয়া বাধ্য ছেলের মত তিনি গুটিগুটি মায়ের অনুসরণ করিলেন।

আরতি ফিরিয়া আসিতেই অমরেশ মিনতির সুরে কহিল —বৌদি লক্ষ্মীটি, চুপি চুপি পেয়ালা চার পাঁচ চা করে দিতে পার?

—চা? এখন? অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে না?

—আরে চায়ের আবার বেলা-অবেলা! উনুনে আগুন নেই?

—ও মা কী কাণ্ড, আগুন থাকবে না কেন? কিন্তু—

এদিক ওদিক চাহিয়া আরতি গলা নামাইয়া কহিল— পিসীমা না দেখতে পান; এই খানিক আগেই বকাবকি করছিলেন।

—কি জন্যে শুনি?

—অমরেশের রুক্ষ প্রশ্নে কুণ্ঠিত হইয়া আরতি কহিল— কারণ সেই একই, 'খরচ আর খরচ', 'এ রকম উড়নচণ্ডে বাড়ীতে মা লক্ষ্মী টিকতে পারেন না—' এই সব।

অমরেশের মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, থাক প্রয়োজন নাই, কিন্তু এইমাত্র বন্ধুমহলে বড়মুখ করিয়া বলিয়া আসিয়াছে— এখন কোন্ মুখে আবার বলিতে যাইবে সামান্য দু'চার পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা করিবার স্বাধীনতাও তাহার নাই, নিজের বাড়ীতে নিতান্ত পরের মতই থাকিতে হয় তাহাকে।

আরতি বোধ করি তাহার মুখের ভাবে মনের অবস্থা অনুমান করিয়া লইল, তাই আঁচলে ছেলের মুখ মুছাইয়া কোল থেকে নামাইয়া দিয়া কহিল—আচ্ছা আর ভাবতে হবে না, দিচ্ছি চুপি চুপি, একে একটু ধরো দেখি।

—তা ধরছি, কিন্তু পারবে তো? না কি তোমায় আবার বকুনি খেতে হবে?

—না না, ঠিক হয়ে যাবে।

লঘু ক্ষিপ্রপদে রন্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল আরতি।

ছেলেটিকে র‍্যাপারের মধ্যে জড়াইয়া লইয়া অমরেশ আবার বাহিরে আসিয়া বসিল। হাসিমুখে কহিল—হচ্ছে ব্যবস্থা, একটু বোস ভাই।

ভিতরবাড়ীর রৌদ্রলেশ-শূন্য দালানে, স্যাঁতসেঁতে ঘরে, ছোট্ট ছেলেটি যেন এতক্ষণ শীতে নীল হইয়া গিয়েছিল, রৌদ্রের আঁচে তাজা হইয়া কোল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় ঝুলোঝুলি সুরু করিল।

"কালো গৌরাঙ্গ" ঠিক পাশের বাড়ীতেই থাকে, খোকার সহিত তাহার যথেষ্ট সৌহার্দ্দ আছে, তাহার ছটফটানি দেখিয়া কহিল—এই অমরেশ, ছেড়ে দেনা ওকে, আটকে রেখেছিস কেন?

—তার কারণ এটি এখন বাবা আদমের সেকেণ্ড এডিসন্।···এই শয়তান খবরদার নড়বি না।

কিন্তু শয়তান ততক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

ছেলেটির রং খুব ফরসা নয়, নিখুঁত মুখশ্রী ও নিটোল গঠনভঙ্গী দেখিবার মত। তাছ'ড়া বয়স্কদের কাছে শিশুর মত লোভনীয় খেলনা আর কিছুই নাই, টানিয়া টিপিয়া নাচাইয়া দুরন্ত ছেলেকেও নাকাল করিয়া তুলিতে বিলম্ব হইল না।

অবশেষে কাঁদাইয়া ক্ষান্ত হইয়া বিজয় হাসিয়া কহিল— যাই বল অমরেশ, তোমার দাদার তুলনায় ছেলেটি যেন গোবরে পদ্মফুল।

—তার কারণ খোকা ঠিক ওর মার মত—ঈষৎ গর্ব্বিত-ভাবেই অমরেশ কহিল—বৌদির চেহারা বাস্তবিকই দেখবার মত ছিল, খোকার রংটা তবু তার মায়ের মত নয়, কিন্তু সংসারের চাপে আর অযত্নে বৌদি বেচারার এখন আর কিছুই নেই। ···ভালবাসার তর্ক তুলেছিলে সমর? আমাদের দাদা-বৌদির বিয়েও তো শুনেছিলে বোধ হয় 'লাভ ম্যারেজ'। জামালপুরে মেজ-পিসীর বাড়ী দাদা গিয়েছিলেন চেঞ্জে—আর বৌদি এসেছিলেন মামার বাড়ী বেড়াতে—তারপর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। কিন্তু এখন? এখন, এই পাঁচবছরের মধ্যেই বৌদি একটি সংসারভার-প্রপীড়িতা বৃদ্ধা, আর দাদা ইহলোকের অনিত্য সুখ ত্যাগ করে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়েছেন, সারাদিনে দুটো গল্প করবারও সময় হয় না তাঁর।

প্রবীর এতক্ষণ খোকার কান্না থামানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, পেন্সিল রুমাল প্রভৃতি পকেটস্থিত যাবতীয় বস্তু ঘুষ দিয়া যখন প্রায় বাগে আনিয়াছে, তখন সহসা অমরেশের শেষ কথাটা কানে যাইতেই মুখ ফিরাইয়া সকৌতুহল প্রশ্ন করিল —পরকালের চিন্তাটা কি অমরেশ ?

—শোননি বুঝি, দাদা এক গুরু করেছেন ? ইয়া জটাজুট-ধারী অবধূত বাবা ! তাঁর নির্দেশে রাত তিনটে থেকে উঠে সাধনা করতে হয়, এবং এই সাধনার ফলে মনে হচ্ছে প্রায় আধ-সিদ্ধ হয়ে এসেছেন, আর কিছুদিন গেলেই পুরোপুরি সুসিদ্ধ হয়ে পড়বেন। ব্যাস, তখন আর তাঁকে পায় কে, শ্রীমৎ অখিলেশানন্দ স্বামী—স্ত্রী পুত্র পরিবার সব তখন তাঁর কাছে তুচ্ছ—জগৎটা স্রেফ্ ভুয়ো।

গলির ভিতর গায়ে গায়ে বাড়ী, মেয়ে মহলে যাতায়াত আছে, কাজেই তাঁদের মারফৎ বিজয় মল্লিক, কালো গৌরাঙ্গ, সমর প্রভৃতির এসব তথ্য জানা ছিল, ছিলনা শুধু প্রবীরের ; কারণ তাহার মা খুড়িমা নিজেদের প্রেষ্টিজ ভুলিয়া পাড়া বেড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নারাজ এবং এপক্ষও বড়লোকের ছায়া মাড়াইতে রাজী ছিলেন না।

কাজেই প্রবীর উৎসুক প্রশ্ন করিল—হঠাৎ এ রকম হবার মানে ?

—মানে ? দাদা বলেন—গুরু যখন যাকে কৃপা করেন—ও সব তোমার-আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর।

—বৌদির তো তা'লে খুবই কষ্ট ?

—হিসেব মত তাই হওয়াই উচিৎ, কিন্তু এও আমার বুদ্ধির অগম্য প্রবীর, আজ পর্য্যন্ত কখনো দেখলাম না—মুখে তাঁর হাসির অভাব, কখনো দেখলাম না—দাদার ওপর এতটুকু বিরক্তি। শেষ রাত্রে উঠে দাদার পুজোর গোছ করে দেন, মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত দাদার খাবার নিয়ে বসে থাকেন।

—অর্থাৎ একদা যে বিবাহকে 'লাভ ম্যারেজ' বলে উভয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, আসলে সেটি মায়ামৃগ।—প্রবীর মন্তব্য প্রকাশ করিল।

সমর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল—কেন, তোমার তো মতে —গরীবের স্ত্রীর কিছুতেই কষ্ট হওয়া উচিত নয়—বাসন মাজতে, ধান ভানতে—

—সে মত আমার বদলায়নি সমর, যদি ভালবাসা থাকে।

সমর ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে কহিল—এটা কি উল্টো কথা হ'ল না ? কত বড় ভালবাসা থাকলে মানুষ এমন আত্মহারা হয়ে, নিজের সত্তা হারিয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারে—সে আইডিয়া আছে ?

—বল যে [illegible] 'ঘোড়ার ডিম থাকলে'—একটা তীক্ষ্ণ হাসির রেখা মুখে আঁকিয়া প্রবীর কহিল—নিঃস্বার্থ ভালবাসা হচ্ছে 'সোনার পাথরবাটি', বুঝলে সমর ? যেখানে অভিমান নেই, সেখানে ভালবাসা আছে, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আজও নেই, কোনদিনও ছিল না।

আলোচনাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত বলিয়া অমরেশ একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, উদ্ধার করিলেন আলোচ্য ব্যক্তি স্বয়ং—ভিতর বাড়ী হইতে দরজার শিকলটা নড়িয়া উঠিল।

চা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহারই সঙ্কেত।

ট্রের পরিবর্ত্তে একখানি কাঠের পীঁড়ির উপর গুটি পাঁচেক চায়ের কাপ লইয়া অমরেশ ফিরিয়া আসিল। অবশ্য সব কয়েকটিকে কাপের মর্য্যাদা দিলে সত্যের অপলাপ হয়, অমরেশের নিজের চা ছিল চটা-ওঠা একটি এনামেলের গ্লাসে, এবং কালো গৌরাঙ্গ ঘরের ছেলের মত বলিয়া তাহার জন্য তদনুরূপ একটি পিরিচ-বিহীন একাকিনী পেয়ালা।

তবু মহোৎসাহে চা খাওয়া সুরু হইল, বৌদির চায়ের হাতটা যে বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য, সে বিষয়ে নূতন করিয়া আর একবার সার্টিফিকেট দেওয়া হইল।

বেলা রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তর্কের ঝড় ঈষৎ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল, প্রবীরের ভৃত্য আসিয়া ডাক দিতেই সভা ভঙ্গ হইল।

সমর সবিদ্রূপ হাস্যে কহিল—যাও নাড়ুগোপাল, বেলা হলে পিত্তি প'ড়ে সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাবে, ননীর শরীর গলে পড়বে—সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে ঘুম দাওগে।

জামার আস্তিন গুটাইয়া—সত্যই সোনার মত রঙের সুপুষ্ট বাহুখানি সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিয়া মৃদু হাসিয়া প্রবীর কহিল—গলে পড়বে ? এত সহজে নয়, তবে ডিসিপ্লিন ভাঙা আমি পছন্দ করি না।

খোকাকে আবার র‍্যাপারের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই অমরেশ দেখিল পিসীমা বধূকে লইয়া পড়িয়াছেন।

অমরেশকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন—ওই যে সোহাগের দেওর এসেছেন, যাও এখন চোখে নোনাপানি ঝরিয়ে লাগাও গে সাতখানা করে ?

—কি হ'ল পিসীমা ?

—হ'ল আমার পিণ্ডি, ছেরাদ্দ। বলি—এত কিসের আস্পর্দ্ধা ? পই পই করে বারণ করিনি—রান্নাঘরের কাপড়ে ভাঁড়ারে ঢুকোনা, হাঁড়ি কলসী নেড়ো না—কথা গেরাহ্যি হয় না ? খপ্ করে গিয়ে ভাঁড়ারে হাত দিয়ে চিনি নেওয়া ? কিসের জন্যে ? দফে দফে চা চাই—কেন ? এত নবাবি কি জন্যে ? দুধ চিনি অমনি আসে ? পয়সা লাগে না ?

অমরেশ উত্যক্ত হইয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, আরতি অলক্ষিতে দুই হাত জোড় করিয়া ইঙ্গিতে মিনতি জানাইল। তাহার সপক্ষে কিছু বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র, লাঞ্ছনা বাড়িবে বই কমিবে না।

অমরেশও তাহা না জানে এমন নয়, তাই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—চা আমি করতে বলেছিলাম পিসীমা।

—তা জানি বাছা, তুমি বলবে না তো কি আমি বলবো? আমার 'সই' 'গঙ্গাজল' এলে দুটো পান দিয়েও মান রাখতে যাবে না তোমাদের বৌ তা জানি—কিন্তু তুমিই বা কোন্ আক্কেলে যখন-তখন চায়ের ফরমাস করে পাঠাও শুনি? বয়েস তো কম হয়নি, বোঝো তো সব, জিনিস তো গাছে ফলে না—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আনতে হয়।

অবশ্য মনে করিবার হেতু নাই যে পিসীমাকেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু পিসীমার বাক্য-রচনা-প্রণালীই এইরূপ।

শৈশবে মাতৃহারা শিশুদের ভার লইতে তিনি যে দিন এ সংসারে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে দিন অমরেশের পিতা অবিনাশ অশ্রুসজল কণ্ঠে কহিয়াছিলেন—আজ থেকে ছেলে দুটোর সঙ্গে এ সংসারের সব ভারই তোর ওপর পড়ল কেষ্ট, এর ভালোমন্দ দেখতেও তুই, খরচ-পত্তর দেখতেও তুই, তোর বৌদি তো নিজের বোঝা হালকা করে চলে গেলেন।

তদবধি কৃষ্ণবালা এই দুরূহ বোঝাটি মাথায় লইয়া দাদার উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

সেকাল হইলে এবং স্ত্রীলোক না হইলে বোধ করি ইঁহার প্রবল দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাইত, এবং এই ত্রুটিটুকুর জন্যই শুধু সেই প্রবল দাপটের ঝাপটটা খাইতে হয় সংসারের বেচারা কয়টি প্রাণীকে।

কিন্তু আরতিকে যতটা পোহাইতে হয়, এমন আর কাহাকেও নহে।

অমরেশকে স্নানের তাগিদ দিবার ছুতায় তাহার ঘরে গিয়া আরতি ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—আর একটু হলেই তুমি পিসীমার কথার জবাব দিয়ে বসেছিলে! কী কাণ্ডটা যে হ'ত তা'হলে—লক্ষ্মীটি ভাই একটু সয়ে যেও, অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে।

—ঠিক সেই জন্যেই সয়ে যাই বৌদি, কিন্তু বলতে পারো কেন? কোন্‌কালে অজ্ঞানে কি উপকার করেছিলেন বলে —চিরকাল পদানত হয়ে থাকতে হবে? এ কি 'কর্ত্তার ভূত' এ সংসারের ঘাড়ে চেপে বসে আছে বলতো? কেন মানবো, কেন ভয় করবো, তার কারণ থাকবে না?

পিসীমা যে নিঃশব্দে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন কে জানে, সহসা উভয়কে চমকাইয়া দিয়া তাঁহার কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—

—ওগো নাই বা মানলে, নাই বা চিনলে, আমি তো তোমাদের গলগ্রহ হতে এ বাড়ীতে পা দিইনি,—পায়ে ধরে নিয়ে এসেছিল দাদা, তাই এসেছিলাম। এখন মানুষ হয়েছ, বৌদি চিনেছ, বৌদি 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো' বলে গদগদ হয়ে কোলের গোড়ায় ভাতের থালা ধরে দিতে শিখেছে, এখন আমায় দরকার কি? দাওনা, লাথি মেরে দূর করে দাও—মুড়ো খ্যাংরায় ঝেঁটিয়ে আপদ বিদেয় করো—একবেলা একমুঠো আলোচাল তাও তোমাদের সংসারে অমনি খাইনে, বসে খাইনে, যেখানে গতর খাটাবো সেখানেই পাবো।

ব্যাকুলভাবে আরতি পিসীমার হাত ধরিয়া সানুনয়ে কহিল—দোহাই পিসীমা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার মাথা খান, চুপ করুন, ঠাকুরপো ছেলেমানুষ, কি বলতে কি বলেছে—

পিসীমা জিহ্বা ও তালু সংযোগে একটা অবজ্ঞাসূচক ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—মরে যাই লো, কি আমার ছেলেমানুষ, বয়সে বে হলে সাতটা ছেলেমানুষের বাপ হতেন। এক পয়সার মুরোদ নেই, চব্বিশঘণ্টা গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন আর খোকার মতন 'বৌদি বৌদি' করে সাতবার রান্নাঘরে উঁকি দিচ্ছেন, তাই ছেলেমানুষ, কচি খোকা। তাও বলি বৌমা—তোমারই বা অতবড় দেওরের সঙ্গে হরঘড়ি এত ফুসফুস গুজগুজ কিসের? কথায় বলে—সোমত্ত ছেলে-মেয়ে আগুন আর ঘী, শাস্তর তো আর গায়ের জোরে মিথ্যে হয়ে যাবে না।

অমরেশ কথার প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছিল, আরতিও ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

যাই, ওদের ছোট বৌটা আমার হাতের কৎবেলের আচার খেতে চেয়েছিল, দিয়ে আসি এক ফোঁটা—বলিয়া পিসীমা 'ওদের বাড়ীর' উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

দুই

প্রবীর বাড়ীর ভিতর পা দিতেই মন্দিরা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল—বারে দাদাভাই, তুমি এত বেলা করলে যে বড়? আমার বুঝি খিদে পায় না?

—খিদে পেয়েছিল, খেয়ে নিলেই পারতিস, আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসতেই হবে, এমন কিছু মাথার দিব্যি দিয়ে যাইনি তো?

ত্রুটি স্বীকারের পরিবর্ত্তে প্রবীরের মুখে এইরূপ হৃদয়হীনের মত নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া অভিমানিনী মন্দিরার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে আদরিণী, সর্ব্বদা সকলে তাহাকে আদর করিবে। ইহাই এ বাড়ীর রীতি, তাহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই সর্ব্বনাশ।

প্রবীর একবার ভাবিল ক্ষমা প্রার্থনার ছুতা করিয়া একটু আদর করিয়া যায় কিন্তু মনটা কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল তাই সাবান তোয়ালে লইয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া গেল

প্রবীরের মা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী যতীন মুখুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, বিবাহের বৎসরখানেক পরেই একটি সন্তান প্রসব

করিয়া তিনি সেই যে ইস্তফা দিলেন, যষ্ঠীদেবী আর তাঁহার পাত্তা পাইলেন না।

অনেকে তাঁহাকে নিঃসন্তান বলিয়াই মনে করে, প্রশ্ন করিলে তিনিও হাসিয়া বলেন—পাগল, আমার আবার ছেলে কই? ছেলেমেয়ে সবই ওপক্ষের।

তাছাড়া তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ ও অটুট স্বাস্থ্য দেখিলে প্রবীরের পিঠোপিঠি দিদি বলিয়া ভ্রম হয়। অসময়ে যতীন মুখুয্যে যখন পাকাচুলের উপর টোপর চাপাইলেন, ঘরে-পরে সকলেই চোখ টেপাটেপি করিয়াছিল, কিন্তু বৌ দেখিয়া সকলের চোখের তারা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এমন রূপ দেখিলে যে বুড়ারও মাথা ঘুরিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রথম পক্ষের বড় মেয়ে সতীরাণী জ্যোতির্ম্ময়ীর চাইতে বয়সে বেশ কিছু বড়, তাহারই দৌহিত্রী এই মন্দিরা। অনেকগুলি ভাইবোনদের ভিতর হইতে একটিকে শৈশবাবস্থাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী চাহিয়া লইয়াছিলেন—মানুষ করিবার সখে, মন্দিরা অনেকদিন অবধি তাঁহাকে নিজের মা বলিয়াই বিশ্বাস করিত।

এ বাড়ীতে তাহার একচ্ছত্র আধিপত্য।

যতীন মুখুয্যে কারবারি লোক, স্নানাহারের নিয়ম যথাযথ মানিয়া চলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। বৃদ্ধ হইলেও তাঁহাকে কাজকর্ম্ম দেখা শোনা করিতে হয়—ইদানীং ধুয়া তুলিয়াছেন বটে প্রবীর সব বুঝিয়া লউক, কিন্তু প্রবীর সভয়ে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়ে। বাবা, বাবার অফিস, বাবার হিসাবের খাতা—এমন কি দোকানের কর্ম্মচারীদিগকে পর্য্যন্ত সে সমান ভয় করে।

ছোট অতীন মুখুয্যে উকিল মানুষ, তাহার সব নিয়ম বাঁধা। তস্য গৃহিণী অরুণপ্রভাও তাই। প্রায় আধ-কুড়ি সন্তান-সন্ততির জননী হইয়াও তিনি ডিসিপ্লিন রক্ষা করিয়া চলেন। মেদ-বাহুল্যে নীচে নামা কষ্টকর বলিয়া তাঁহাদের টেবিল পড়ে উপরেই। বয়সে ছোট অথচ মান্যে বড়, বড় জায়ের সহিত ঠিক কোন সম্পর্ক রাখিয়া চলা উচিত, সেটা বুঝিতে না পারার জন্যই বোধ করি উক্ত গোলমেলে বস্তুটিকে সযত্নে আজও পরিহার করিয়া চলেন।

আহারের স্থানে মন্দিরাকে না দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্মিত হইলেন। ঢিলে পায়জামার উপর হাফসার্ট চাপাইয়া আঁচড়ানো চুলের উপর সাবধানে হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রবীর আসিয়া কহিল—কই, তৃতীয় ব্যক্তিটি কই?

—তাই তো দেখছি, আমি বলি দু'জনেই আসছিস বুঝি এক সঙ্গে।...ও শ্রীপতি, দেখতো বাবা দিদিমণি কোথায় গেল।

প্রবীরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না মন্দিরার রাগ ভাঙে নাই। হাসিয়া কহিল—বসো মা, আমি ডেকে আনছি, খুকুমণি বিষম চটেছে।

পড়ার ঘরে একখানি ইতিহাসের বই খুলিয়া মন্দিরা গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল, প্রবীর তাহার ধ্যাননিরত মূর্ত্তি দেখিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

মন্দিরা অবশ্য ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই কিছুমাত্র না চমকাইয়া ধীরভাবে বইয়ের পাতা উল্টাইল।

হাতের বইখানা টানিয়া লইয়া প্রবীর কহিল—নাতনি, রাগটা কি খুব বেশী?

—আঃ ভাল হবে না বলছি, বই দাও।

তাহারই অনুকরণ করিয়া প্রবীর কহিল—বারে তুমি এখন বই পড়বে, আর আমার বুঝি খিদে পায়না?

—খিদে পায় খেয়ে নাওগে না—আমার সঙ্গে এক টেবিলে খেতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি নেই।

—হয়েছে, আমার অস্ত্রে আমাকে সংহার। বেশ, এখন কান মলছি, মানভঞ্জন হোক।

হাসি চাপিয়া রাখা দুষ্কর। অতএব মুখটা আরো ভারী করিতে হয়।

—বাঃ, চমৎকার হাঁড়িমুখ করতে পারোতো—ফাষ্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য, কিন্তু চল্ এখন খেয়ে নিবি, মা অনেকক্ষণ বসে আছেন। শোন্ তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। একটা কাজ করতে হবে তোকে।

বিবাদ ভুলিয়া মন্দিরা সোৎসুকে কহিল, কি?

—বলছি পরে।

—না, এখনই বল।

—এখন বলব না।

—না, এখুনি শুনবো।

—আহ্লাদী! আচ্ছা অমরেশকে চিনিস তো?

—চিনি না আবার? আগে তো সেই কত আসতো ক্যারম্ খেলতে। বিশ্রী রকমের ভাল খ্যালে, সকলকে হারিয়ে দেয়, সেই জন্যেই তো আর খেলি না।

—ওদের বাড়ী বেড়াতে গেলে পারিস।

—কী দায় পড়েছে? যা ওর পিসী, বাব্বা। গঙ্গা নাইতে যায় আর রাস্তার ছেলেদের যা-তা গালাগাল দেয়, কে যাবে ও-বাড়ী?

—ওর বৌদি কিন্তু খুব ভালো মেয়ে, একটু গল্পটল্প করবি গিয়ে—কিংবা ডেকে এনে মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে হয়।

—হঠাৎ?

—এমনি, বেচারা বড় দুঃখী। সত্যি আমাদের ঘরের মেয়েরা মুখ বুজে কত কষ্ট সহ্য করে, কেই বা তার সন্ধান রাখে?

—খুব বুঝি কষ্ট, দাদাভাই ?

—কষ্ট ? তাই তো মনে হয়—কেমন অন্যমনস্ক ভাবে প্রবীর যেন নিজের উদ্দেশ্যই কথা কয়—মেয়েরা কষ্টকে হাসিমুখে সহ্য করে কেমন করে দেখতে ইচ্ছা করে তার।

—দিদিমণি, মা বলছেন আপনারা কি আজ খাবেন না ? শ্রীপতি আসিয়া তলব দিল।

—যাচ্ছি যাচ্ছি, চল।

ব্যাপক অর্থে 'ও-বাড়ী' অর্থাৎ কালো গৌরাঙ্গ ও অমরেশদের বাড়ী।

পরিহাসের সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যায় না—কিন্তু গৌরাঙ্গের নামকরণকালে যিনি উক্ত কাজের ভার লইয়াছিলেন, পরিহাস-প্রবৃত্তিটা তাঁহার তখন বোধ করি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

কাজেই সম্বোধন কালে কেমন করিয়া যেন গৌরাঙ্গ নামের পূর্ব্বে একটি উপসর্গ আসিয়া জুটিল। শিশুকাল হইতে গৌরাঙ্গ উক্ত উপসর্গটি অগ্রে লইয়া সংসারে চলিয়া বেড়াইতেছে।

অমরেশের বাড়ীর এক দেয়ালেই ইহাদের বাড়ী। এ বাড়ীও কম জীর্ণ নয়, কিন্তু একতলা বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম ভয়ঙ্কর দেখায়। পুরুষানুক্রমে এই দুইটি পরিবার পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে।

সদ্ভাব আছে বলিয়াই যে বিবাদের অভাব আছে, এমন নয়। কখনো দুই পরিবারে কথা বন্ধ হইয়া যায়—মুখ দেখাদেখি থাকে না, দুই বাড়ীর যাতায়াতের সহজ পথটায় তালা চাবি পড়ে, ছোট ছেলেদের ঠ্যাং ভাঙিবার ভয় দেখাইয়া অপর পক্ষের এলাকায় যাওয়া নিবারণ করিতে হয়, বাড়ীর মেয়েরা শ্রুতিগোচর স্থান হইতে শুনাইয়া শুনাইয়া, ও পক্ষের নিন্দাবাদ করে, বাড়ীর পুরুষরা গলির মোড়ে দেখা হইলে না-দেখার ভান করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া সরিয়া পড়ে।

আবার এক সময়—সুখে দুঃখে বিপদে আপদে মাঝের দরজার তালা চাবি খুলিয়া যায়, মেয়েরা অন্তরঙ্গ সখিত্বে গদগদ হইয়া আলাপ করে, ছোট ছেলেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে, পুরুষেরা ধীরে ধীরে এ বাড়ীর তাসের আড্ডায় আসিয়া উঁকি দেয়।

ছোটরা বড় হয়, বড়রা বুড়া হইয়া পড়ে, বধূরা গৃহিণীপদ পায়, গৃহিণীদের শিথিল-মুষ্টি হইতে রাজ্যপাট খসিয়া পড়ে। সকলের শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার সমান নয়, এক একজনের আমলে এক এক রকম ভাবের আদান প্রদান চলে।

বর্ত্তমানে উভয় পরিবারে বিশুদ্ধ বাংলায় যাহাকে বলে—গলায় গলায় ভাব।

মাঝের দরজাটা খুলিয়া কেষ্টবালা কণ্ঠে মধু ঢালিয়া কহিলেন—অ ছোট বৌ, কই গো কোথায় ?

ছোট বৌ অর্থাৎ গৌরাঙ্গর মা ত্রস্তব্যস্তে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন—ঠাকুরঝি ডাকছো নাকি ?

—এই যে একফোঁটা কৎবেলের আচার এনেছিলাম, বলি পোয়াতি মানুষ মুখ ফুটে সেদিন বললি।

ছোট বৌ লজ্জিত ভাবে হাত পাতিয়া পাথরবাটিটা লইয়া কহিল—তোমার যেমন বাতিক, বলেছিলাম বলেই অমনি ছুটে দিতে এসেছ ? আর ভাই বুড়ো বয়সে এই সব কাণ্ড, লজ্জায় মরে যাচ্ছি, এখন আয়—

—মরণ আর কি, তোরাও যদি বুড়ো হলি তা'হলে আমরা কোথায় আছি লো ? এই তো কাচ্চা বাচ্চা পাঁচটা হবার বয়েস।

সাতটি সন্তানের জননীর পক্ষে এতটা ভালবাসা বরদাস্ত করা শক্ত, তবু তোষামোদের মোহিনীশক্তিতে মুগ্ধ ছোট বৌ গলিয়া গিয়া কহিল—আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরঝি, আর না। আমার গোরা এই যেঠের কোলে পঁচিশে পা দিলে, এখন ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ আনবো কবে তাই ভাবছি, মাঝখান থেকে আবার এই—

—তা হোক, এয়োস্ত্রী মানুষ ও কথা বলতে নেই। তা গোরার বিয়ের কি করছিস ?

—আর বিয়ে। ছেলে তো একেবারে ঝাড়া জবাব দিচ্ছে বিয়ে করবো না বলে। কি যে এখনকার ফ্যাসান হ'ল !

—ও মা বিয়ে করবে না কি? ছেলে বললেই শুনতে হবে ? জোর করে দিবি। উচক্কা বয়েস বিয়ে না করে স্বভাব চরিত্তির ঠিক রাখতে না পারলে ? কোনদিন কি বদনাম শুনবি তখন ঘেন্নায় মরে যাবি।

নিজের সন্তান সম্বন্ধে এ হেন আলোচনাটা শ্রুতিমধুরও নয়, গৌরবজনকও নয়। গৌরাঙ্গজননী নিস্পৃভাবে উত্তর দিল—তোমরা সব বলে কয়ে দেখনা ঠাকুরঝি, আমায় তো ছাই মানে।

—বলবো, একেবারে মেয়ে নিয়েই বলবো—গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ে দেখেছি সেদিন, খাসা ছিরি ছাঁদ, সন্ধান নিয়ে দেখলাম তোদেরই পালটি ঘর। বড় বৌকে নিয়ে একদিন যাবো তাদের বাড়ী গঙ্গাচানের ছুতোয়।···কই কোথায় গেল বড় বৌ ?

—দিদি এই গেলেন ছাতে, চারটি বড়ি দিতে।

—বড়ির কথা আর বলিসনে ছোট বৌ, বারো আনা এক টাকা সের ডাল, চোদ্দ আনায় এমনি এতটুকু একটা ছাঁচি কুমড়ো—কোত্থেকে খাবি বড়ি ?

—তা যা বলেছ ঠাকুরঝি,—প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তনে ছোট বৌ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

—আর আমাদের বাড়ীর নবাব-নন্দিনীটি হয়েছেন তেমনি—দুটো ভাল ভাত সেদ্ধ করতেই তাঁর দিন কেটে যায় তো বড়ি আচার করবে কখন? আমি বুড়ো মাগী যদি করলাম তো হ'ল!

ছোট বৌ সোৎসাহে কহিল—হরি বল, ওইটুকু সংসারের রান্না, তাতেই বৌমা সময় পায় না? আমাদের মতন হলে টের পেত। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, অখিল নাকি সত্যই সন্ন্যাসী হবে?

—কি জানি ভাই, ছেলের ধরণ ধারণ দেখলে তো গায়ে জ্বর আসে। ওই পুজো-আচ্ছা জপতপ নিয়েই আছে, বলে নাকি চাকরীও ছেড়ে দেবে।

গোপন করিবার কারণ না থাকিলেও ছোট বৌ ফিসফিস্ করিয়া কহিল—আচ্ছা ঠাকুরঝি, বৌমার সঙ্গে বুঝি তেমন 'ইয়ে' নেই? নইলে—ব্যাটা ছেলে, সোমত্ত বয়েস, অমন সোনার প্রতিমা ঘরে থাকতে ধম্ম ধম্ম বাতিক কেন?

তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির সংমিশ্রণে উদ্ভূত একটি উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া কৃষ্ণবালা কহিলেন—তবে আর বলছি কি? মেয়েমানুষ, একটু নেটিপেটি একটু পায়েপড়া ভাব দেখা—চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে থাক্, কান্নাকাটি কর—তা না ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেড়াচ্ছে। পোড়ার মুখে হাসিরও কামাই নেই এক দণ্ড।

ছোট বৌ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কে জানে কেমন মন, আমরা তো এই বুড়ো হয়ে মরতে যাচ্ছি, তবু লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি তোমার কাছে—একদিন এদিক ওদিক হবার জো নেই।

—তবে? তোরাই বল্? ওই সর্ব্বনাশীর খিষ্টানী মেজাজের গুণেই বাছা আমার বৈরাগী হ'ল—বলিয়া কৃষ্ণবালা চোখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিলেন।

—ওখানে কে?

উঠানের ওপার হইতে সমরের বিধবা দিদি উষারাণী উত্তর করিল—আমি গো কেষ্টপিসী। তুমি কতক্ষণ?

কেষ্টবালা ইহাকে দেখিতে পারেন না—স্পষ্টবক্তা বলিয়া ইহার দুর্নাম আছে।

উত্তরে মুখটা ঘুরাইয়া অবহেলার ভঙ্গীতে কহিলেন—আমার আবার দিন ক্ষণ, সর্ব্বক্ষণই আসছি যাচ্ছি, তোমাদেরই সেজে গুজে বেড়াতে আসা।

উষারাণী গায়ের র‍্যাপারটা ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া কহিল—এই একাদশী নইলে তো সময় হয় না—ভাবলাম যাই একবার এ-বাড়ী ও-বাড়ী বেড়িয়ে আসি, বেলা ছোট হয়েছে তেমনি, এক মিনিট সময় পাবার জো নেই।

—কি জানি মা তোমাদের কিসে এত সময়ের অভাব। এই তো সকাল বেলা গঙ্গায় গেছি, আহ্নিক পুজো করেছি—

উষারাণী বাধা দিয়া কহিল—তোমার তো বাবু বৌটিই সংসারের সব কাজ করে—তুমি আর সময় পাবে না কেন?

কৃষ্ণবালা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তোরা তো তাই দেখিস্? কথায় বলে না—"ছুঁড়ির তরে সোনার বাটা, বুড়ির তরে মুড়ো ঝাঁটা"—বৌ যদি হেঁটে যায় তো পাঁচ আবাগীর বুকে বাজে, আর আমি বুড়ো মাগী দিনরাত চাকরাণীর মত খাটছি চোখখাগীদের চোখে পড়ে না।

উষারাণী এ পাড়ার বৌ নয়, ঝিউড়ি মেয়ে, অতএব গায়ে পড়া গালিগালাজ সহ্য করিয়া যাইতে রাজী হইল না।

বিদ্রূপ-হাস্যে মুখ রঞ্জিত করিয়া কহিল—দুগ্‌গা, দুগ্‌গা, সকাল বেলা কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—ভরদুপুরে চোখের মাথা খেয়ে মলাম।

ছোট বৌ খণ্ড-প্রলয়ের আভাসে ভীত হইয়া কহিল—ও কি কথা উষা, ছি! ঠাকুরঝি তো তোমার নাম করে বলেন নি কিছু।

—নাই বা বললেন, ঘাসের বিচি তো খাইনা, বুঝি সবই। বৌটাকে যা সুখে রেখেছেন তা তো আর কারুর জানতে বাকী নেই, বললেই দোষ।

অতঃপর কৃষ্ণবালাকে ঠেকাইয়া রাখা দায় হইল।

পাড়ার লোকের কুমন্ত্রণাতেই যে বৌ বিগড়াইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ মত প্রকাশ করিয়া সগর্জ্জনে কহিলেন—তাঁহার ছাগল তিনি ল্যাজের দিকে কাটিলেই বা কাহার কি আসিয়া যাইতেছে?—কথায় কথায় আরো কথা বাড়িল।

উষারাণীর একটি আধটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য ও কৃষ্ণবালার প্রবল গালিগালাজের শব্দে শীতের দুপুরের অখণ্ড শান্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

বড় বৌ বড়ির ডালবাটা মাখা হাত লইয়া নামিয়া আসিলেন। বড় বৌয়ের বিবাহিতা কন্যা মেনকা চিঠির প্যাড্ চাপা দিয়া রঙ্গস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

আশপাশের অনেক বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, জানালায়, সুন্দরীদের সকৌতূহল মুখপদ্ম ফুটিয়া উঠিল। একটা মুখ-রোচক আলোচনার সুযোগ পাইয়া সকলেই যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না, তাহাদের তৃপ্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া!

এমনি করিয়াই ইহাদের দিন কাটে।

আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা নাই, দিনের পর দিন একই দিনের পুনরাবৃত্তি।

সরু গলির মধ্যে গায়ে গায়ে লাগা ঘিঞ্জিবাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করিয়া বাতাস উদারতার বাণী বহিয়া আনেনা, আকাশ আলোর আমন্ত্রণ পাঠায় না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, দিনের হিসাবে আসা যাওয়া করে মাত্র।

মানুষের পঙ্কিল নিঃশ্বাসে মানুষের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

বঞ্চিত বলিয়াই ক্ষুধাতুর ঈর্ষায় পরস্পরকে আঘাত করে।

অল্প লইয়া জীবন কাটাইতে হয় বলিয়াই অত্যল্পের জন্য হানাহানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্তরের ঐশ্বর্য্যের সন্ধান রাখে না বলিয়াই অন্তরের দৈন্য উলঙ্গ করিয়া দেখাইতে লজ্জা বোধ করে না।

তবু ইহারই মধ্যে চলিতে থাকে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের চিরন্তন লীলা, যুবক-যুবতীর প্রেমের খেলা।

পতিগৃহ-বঞ্চিতা মেনকা প্রত্যহ অশুদ্ধ বানান আর অপূর্ব্ব হস্তাক্ষর সম্বলিত দীর্ঘ প্রেমপত্র রচনা করিয়া নিত্যনূতন লোক ধরিয়া স্বামীর ঠিকানা লিখাইয়া পাঠায়।

অখিলেশ মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

বিজয় মল্লিক দেশোদ্ধার করে।

ঘড়িতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

ব্ল্যাক-আউটের মহিমায় কলিকাতা নগরীকে আর চিনিবার উপায় নাই। বিমুখ রাজ্যলক্ষ্মীই যেন প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে গিয়াছেন। রাত্রির কলিকাতা, ভাগ্যদেবতার পাদপীঠে যে অজস্র দীপমালার অর্ঘ্য সাজাইয়া আরতি করিত, দেবতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সে মালা খসিয়া পড়িয়াছে।

তাই আজ ঘরে-বাহিরে এত অন্ধকার।

মানুষ আর পথ দেখিতে পায় না।

শীতের রাত্রে সচরাচর এমন সময় পাড়া নিশুতি হইয়া পড়ে, অন্ধকারের জন্য আজকাল তাড়াতাড়ি লোকে পথের কাজ সারিয়া আপন আস্তানায় আশ্রয় লয়। যে অসংখ্য লোক ফুটপাতে পড়িয়া রাত্রি কাটাইত, তাহাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

কদাচিৎ এক-আধটা মানুষ আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ি দিয়া, বেসুরা সুরে সিনেমার গানের এক-কলি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—বোধকরি ভয় ভাঙিতে।

দৈবাৎ এক-আধটা গরুরগাড়ী কপি বেগুন বোঝাই দিয়া চলিয়াছে বাজারের অভিমুখে।

জানালা দিয়া শীতের কনকনে হাওয়া আসিয়া হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ছুঁচের মত বিঁধিতেছিল, তাই কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া আরতি সরিয়া আসিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিল।

বিছানায় বসিতে ভয় করে, সারাদিনের শ্রমক্লান্ত শরীর যদি বিছানার প্রলোভনে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে। অখিলেশ এখনও গুরু-আশ্রম হইতে ফিরে নাই, কড়া নাড়িলে দুয়ার খুলিয়া দিতে হইবে। বই থাকিলে সময়টা জলের মত কাটিয়া যায়, আজ একখানিও বই নাই।

আরতি মনে মনে ভাবে আবার কাল ঠাকুরপোকে খোসামোদ করিয়া খানকয়েক বই আনাইতে হইবে। কোথায় বা পায় বেচারা! আগে লাইব্রেরী হইতে আনিয়া দিত, কিন্তু অখিলেশের নিষেধে লাইব্রেরীর বই বন্ধ হইয়া গিয়াছে! অসার উপন্যাস পড়িয়া উচ্ছন্ন যাইবার জন্য অর্থ নষ্ট করা না কি অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার।

অমরেশ বই আনিয়া দেয় লুকাইয়া, আরতি লুকাইয়া পড়ে। এই একটি বিষয়ে সে বিবেকের বিরুদ্ধে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়। দীর্ঘদিন কাটিয়া যায় সংসারের তুচ্ছ কাজে, কিন্তু দীর্ঘরাত্রি কাটিবে কি লইয়া?

কৃষ্ণবালা এক ঘুম হইতে উঠিয়া আরতির ঘরে উঁকি মারিয়া ঘুম-ভাঙা ভারী গলায় কহিলেন—অখিল এখনও বাড়ী আসেনি?

আরতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

—হুঁ—বলিয়া একটিমাত্র শব্দে অখিলেশের অবিবেচনার সমস্ত অপরাধ নির্দ্দোষ আরতির স্কন্ধে চাপাইয়া তিনি সরিয়া গেলেন। অধিক কথা কহিলে ঘুমের আমেজ ভাঙিয়া যাওয়ার ভয়েই বোধ করি ফাঁড়াটা অল্পে কাটিল।

অখিলেশ আসিল সাড়ে বারোটায়।

বিদ্যুতের আলোর ব্যবহার নাই, হারিকেন ধরিয়া স্বামীকে সিঁড়ি পার করাইয়া দ্বিতলে উঠাইয়া দিয়া আরতি আবার নীচে নামিয়া আসিল।

অখিলেশের রাত্রের আহার্য্য ফল দুধ ও মিষ্টান্ন নীচে গোছান আছে। আনিতে হইবে তসরের শাড়ী পরিয়া। আহার্য্যের শুচিতায় অখিলেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

কাঠকয়লার আঁচে দুধ গরম করিয়া, আসন জল প্রভৃতি আনিয়া নামাইতেই অখিলেশ গম্ভীরভাবে কহিল—রাতের খাওয়াটা এবার থেকে ছেড়ে দেব মনে করছি।

আরতি শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিল।

—না না তোমার কিছু দোষ হয়নি, আমার জন্যে যে কেউ অকারণ কষ্ট পায়, এটা আমি পছন্দ করি না।

আরতি ধীরে ধীরে কহিল—শীত বেশী পড়েছে, পিসীমা বলছিলেন ঠাণ্ডা লাগে, একটু সকাল করে আসতে পারলে—

—এর চেয়ে আগে আসা সম্ভব নয়, গুরুদেব বলেন—সাধন-ভজনের শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে রাত্রি। গৃহস্থাশ্রমে থেকে অবশ্য কিছুই হয় না।

আরতির এবার ইচ্ছা হইল বলে—এ আশ্রমটা ছাড়িলেই তো পারো—কিন্তু প্রতিবাদ না করিয়া করিয়া এমনিই অনভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, কিছু বলিতে তাহার যেন মন ওঠে না।

আহারান্তে আরতির শয্যার প্রতি একবার দৃষ্টি পড়িতেই, অখিলেশ কহিল—খোকা কই?

—সে আজ তার কাকার কাছে শুয়েছে।

সন্ন্যাসীর পক্ষে অধিক কথা কওয়া নিষেধ, তাই অখিলেশ আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া আপনার শয্যায় আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

আরত্তি আলো নিভাইবে, দুয়ার দিবে, আশ্রয় লইবে আপনার একক শয্যায়। শিশুর উষ্ণতা তবু বিছানাটাকে সহনীয় করিয়া রাখে, আজ মনে হইতেছে কে যেন জল ঢালিয়া রাখিয়াছে তাহার শয্যায়—এমনি হিমেল ঠাণ্ডা।

উভয়ের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে ক্রমশঃ ঘরের বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হইয়া ওঠে, একসময় ঘুম আসেই—হয়তো ঘুমাইয়া উভয়েই স্বপ্ন দেখে মুক্তির।

তিন

বিজয় মল্লিক রিলিফ-কমিটি গঠন করিতেছে।

বোমায় যাহারা মারা গিয়াছে বা যাইবে তাহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার লইবে বিজয় মল্লিক।

তাই বিজয় মল্লিকের স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচিয়াছে। বেচারা জন্মদুঃখী। বন্যায়, মহামারিতে, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, যত সমস্যার সৃষ্টি হয় বিজয় মল্লিকের মস্তিষ্ক সেই দুষ্পূরণীয় সমস্যার পূরণের চেষ্টায় খাটিয়া মরে। যত লোক মারা পড়ে, প্রত্যেকের জন্য শোকগ্রস্ত হয় তাহার মন।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বিজয় মল্লিকের নাওয়া খাওয়ার অবকাশ ছিল না। বাঁধ-ভাঙা নদীস্রোতের মত অকস্মাৎ যে নরদেহধারী প্রেতের দল একটি মাত্র 'মাটির হাঁড়ি'র ভরসায় কলিকাতার রাজপথে জীবনযুদ্ধে নামিয়াছিল, তাহাদের ভাল করিবার দুশ্চেষ্টায় বেচারার দিন রাত্রির ঘুম ঘুচিতে বসিয়াছিল।

অকস্মাৎ যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, অকস্মাৎই তাহার অবসান ঘটিল। যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচিত এমন প্রশস্ত ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া তাহারা সহসা ছায়াবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল, কেন গেল, তাহার সম্যক রহস্যের সন্ধান অজ্ঞাত থাকিতে থাকিতেই পড়িল বোমা।

কলিকাতার লোকের স্নায়ু সবল হইয়া গিয়াছে। যাহারা একদা রেঙ্গুনে বোমা পড়ার গন্ধ শুনিয়া প্রাণভয়ে দিগ্বিদিকে জ্ঞান হারাইয়া ছুটাছুটি করিয়াছিল, তাহারাই এখন ফুলকপি আর ভেট্‌কী মাছের থলি দোলাইতে দোলাইতে বাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীতে বোমা পড়ার বিবরণ লইয়া খোশগল্প করে।

শুধু বিজয় মল্লিকের মত যাহারা জন্মদুঃখী তাহাদেরই আবার একটা নূতন অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

বোমাহত দুর্ভাগাদের দুঃস্থ স্ত্রীপুত্রের জন্য বিজয় মল্লিক রিলিফ কমিটি গড়িতেছে।

অমরেশ নিজের ইচ্ছায় যোগ দেয় না—দেয় বিজয় মল্লিকের তীক্ষ্ণ শ্লেষে, নিদারুণ ধিক্কারে, চাঁদার খাতা হাতে লোকের দরজায় দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যায়, তবু বিজয় তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়ায়।

এইখানে আছে অমরেশের দুর্ব্বলতা।

সেদিনও বৈকালে অমরেশ তাড়াতাড়ি বাহির হইতেছিল কমিটির মিটিঙের উদ্দেশ্যে, কিন্তু সহসা গলির মোড়ে ধাক্কা খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল মন্দিরার সঙ্গে।

মোড়ের মাথায় মন্দিরাদের বাড়ী বটে কিন্তু গলির ভিতরে কখনো পদার্পণ করিতে দেখা যায় না তাহাদের—তাই অমরেশ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

ভারী অদ্ভুতভাবে হাসে মন্দিরা, অকারণ এমন ভঙ্গীতে হাসে মনে হয় যেন কী এক গোপন রহস্য লুকানো আছে তার হাসির আড়ালে।

হয়তো টুক্‌টুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঈষৎ উঁচু দাঁত দু'টির জন্যই এইরূপ দেখায়।

—অমরেশ দা চিনতে পারছেন না বুঝি ?

—পারবো না কেন, বাঃ।

—বেরিয়ে যাচ্ছেন বুঝি ? আপনাদের বাড়ীই যাচ্ছি।

—আমাদের ভাগ্য। চল।

ছেলেবেলায় যাহাকে ফ্রক্ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে তাহাকে আপনি বলিতে কেমন আড়ষ্ট লাগে।

—কই জিগ্যেস করলেন না তো কেন যাচ্ছি ?

—প্রশ্নের উত্তর তো আমি নিজেই দিলাম, আমাদের ভাগ্য।

—আপনি বড় বাজে কথা বলেন, যাচ্ছি বৌদির সঙ্গে ভাব করতে।

বৌদির কথা মনে পড়িতেই অমরেশ অস্বস্তি বোধ করে, হয়তো বেচারা একখানা আধ-ময়লা মোটা শাড়ী পরা অবস্থায় রান্নাঘরে বদ্ধ আছে, নয়তো পিসীমার কাছে বকুনি খাইতেছে, এমন ফিট্‌ফাট্ কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে দেখিয়া আপনার দৈন্যে কতই বিব্রত বোধ করিবে হয়তো।

অমরেশকে বিমনা দেখিয়া মন্দিরা চলিতে চলিতে গতি মন্থর করিয়া কহিল—আপনি বুঝি রাগ করিলেন ?

—কেন ?

—আপনাদের বাড়ী যাচ্ছি বলে ?

—কী আশ্চর্য। এ কি একটা কথা হ'ল ?

—তবে কথা কইছেন না যে ?

অমরেশ হাসিয়া ওঠে।—আমাদের বাড়ীই তো যাচ্ছো, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দরকার ?

যাওয়াটা আপনি এপ্রিসিয়েট্ করেন কি না সেটাও দেখা দরকার তো?

—যাচ্ছো তো বৌদির সঙ্গে ভাব করতে?

—আপনার সঙ্গে করবো না বলেছি?

অমরেশের বুঝিতে বিলম্ব হয় না, ফ্রক্ ছাড়িয়া শাড়ী ধরিলেও বড় হইতে হইার এখনো বাকি আছে। গৃহস্থঘরের সুখ দুঃখে মানুষ হওয়া মেয়েরা অবশ্য এ বয়সেই যথেষ্ট পরিপক্ক হইয়া ওঠে, কিন্তু ধনীর ঘরের আদরের দুলালীদের বয়স বাড়ে অপেক্ষাকৃত বিলম্বে।

—আচ্ছা দেখা যাবে মতের পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ লাগে।

—কেন, আপনি বুঝি কারুর সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন না?

—বরং উল্টো।

—না না, আপনার সঙ্গে আমার অনেক দরকারি কথা আছে, আগে তো কত যেতেন, এখন আর যান না কেন?

—কেন বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু দরকারি কথাটা কি শুনি?

—আপনাদের রিলিফ কমিটির মেম্বার হবো আমি।

—তুমি!

—কেন আমি কি মানুষ নই? পরোপকারটা বুঝি ছেলেদেরই একচেটে? মেয়েদের শরীরে বুঝি দয়াধর্ম্ম থাকতে পারে না?

—খুব পারে, কিন্তু বাড়ীতে এ্যালাউ করবেন?

—ইস্।

এই একটিমাত্র সগর্ব্ব উক্তিতে নিজের প্রতিপত্তির প্রমাণ দিয়া মন্দিরা অমরেশের সন্দেহের নিরসন করিয়া দিল।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আলোচনা স্থগিত থাকিল। পথ চলিতে চলিতে কৌতুক আলাপে যে পুলকের আমেজে ভারাক্রান্ত মনটা লঘু হইয়া আসিয়াছিল, বাড়ীর দরজায় আসিয়া তাহা লোপ পাইল অমরেশের।

সহসা মনে হইল বাড়ীটা বড় বেশী জীর্ণ, ভিতরে দৈন্যের ছবি বড় বেশী নগ্ন। নিজেদের এই শ্রীহীন সাজ-সজ্জা যে এতদিন চোখে পড়ে নাই কেন, সেইটাই আশ্চর্য্য লাগে।

উঠানের দেওয়াল ভরিয়া, পিসীমা গোবর কুড়াইয়া আনিয়া ঘুঁটে লাগাইয়াছেন। দালানের আধখানা জুড়িয়া কয়লার গুঁড়ার গুল, পোড়া কয়লা, নারিকেলের ছোবড়া আর ডাবের মালায় ভর্ত্তি। সিঁড়ির দেওয়ালে দড়ি টাঙাইয়া ভিজা কাপড় মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, শোবার ঘরে বস্তাবন্দী করিয়া সংগ্রহ করা আছে চাল, ডাল, আটা—ভবিষ্যতের খোরাক।

এসব পিসীমার রাজ্য, কোন জিনিষ এতটুকু এদিক-ওদিক করিবার জো নাই, ঘর বাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া রাখবার চেষ্টাকে তিনি খৃষ্টানীপনা বলিয়া ঘৃণা করেন।

—আমাদের বাড়ী ঢুকলে বেশীক্ষণ বসবার ইচ্ছে হবে না।

সরল দৃষ্টি তুলিয়া মন্দিরা সাশ্চর্য্যে প্রশ্ন করিল—কেন?

—এত অপরিচ্ছন্ন। গরীবের ভাঙ্গা কুঁড়ে।

—আচ্ছা বেশ, জানলাম আপনি বিনয়ের অবতার, কিন্তু বৌদি কই? ও বৌদি, আমি আপনার সঙ্গে ভাব করতে এলাম, আর আপনি বেরোচ্ছেন না?

আরতি নূতন কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া রন্ধনশালা হইতে উঁকি মারিতেছিল, ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিল; মন্দিরা যে তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন নয়, ছাদে দাঁড়াইলে 'লাল বাড়ী'র অনেক কিছুই দেখা যায়, মানুষগুলিও প্রায় মুখ-চেনা, কিন্তু নিজেদের বাড়ীতে তাহাদেরই এই মেয়েটিকে দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গেল।

—কি, আপনিও রেগে যাচ্ছেন বুঝি? অমরেশ দা তো রাগ করে কথাই বন্ধ করে দিলেন।

আরতি মৃদুহাস্যে তাহার হাত ধরিয়া কহিল—এমন মুখ্যু কেউ আছে নাকি? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার, প্রবীর ঠাকুরপোর ভাগ্নী তো তুমি?

—ভাগ্নী হতে যাবো কি দুঃখে? নাতনী—নাতনী। আমার মা হচ্ছেন গিয়ে ভাগ্নী!

—ওঃ তা'হলে তো আমাদের সঙ্গেও সম্পর্কটা খুব মিষ্টি হ'ল।...যাও ঠাকুরপো, ওপরে নিয়ে গিয়ে বসাওগে।

—কেন আপনি?

—আমিও যাচ্ছি ভাই, রান্না চাপিয়েছি—ঈষৎ কুণ্ঠিত-ভাবে উত্তর দেয় আরতি।

—তবে চলুন রান্নাঘরেই বসা যাক্, শীতকালে রান্নাঘর বেশ মজার জায়গা। আপনার ঠাকুরপোর সঙ্গে ওপরে গিয়ে বসে থাকতে দায় পড়েছে আমার।

অমরেশ ছদ্ম-গাম্ভীর্য্যের সুরে কহিল—একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে, "নদী পার হয়ে নৌকায় লাথি"—কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

—আহা আপনি যেন কাণ্ডারী হয়ে আমায় নদী পার করে আনলেন। কোনদিন তো বলেনও নি বেড়াতে আসতে।

আরতি তাহার কোমল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে কহিল—আমাদের কি অত সাহস হয়?

—আপনিও ওই 'টোনে' কথা সুরু করছেন? তা'হলে কিন্তু পালাবো। আমরা কি বাঘ ভালুক? দাদাভাই তো কতদিন আসে, খেয়ে ফেলে বুঝি হালুম করে?

তাহার ছেলেমানুষি ধরণ ধারণে উভয়ে না হাসিয়া পারে না।

অমরেশ এদিক ওদিক চাহিয়া কহিল—খোকা কোথায় বৌদি?

—পিসীমা নিয়ে বেরিয়েছেন, আসবেন এখুনি।

খোকা আসিলে অমরেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে, শিশু বড় মানুষদের অনেকটা অবলম্বন, চক্ষুলজ্জার আড়াল। একটি শিশুকে কেন্দ্র করিয়া আলাপ-আলোচনার পথ সরল হইয়া যায়।

তাছাড়া—দেখাইয়া গর্ব্ব করিবার মত বস্তু যে তাহাদের একটিও আছে, তাহা জানাইতে ইচ্ছা হয় বৈকি।

পিসীমার গতিবিধি কোথায় কোথায় তাহা অনেকটা জানা আছে, খোঁজ নিতে দোষ কি?

—রান্নাঘরে বসলে তোমার কিন্তু ভালো শাড়ীখানা নষ্ট হয়ে যাবে—আরতি অনুযোগ করে।

একখানা ছোট পিঁড়ির উপর চাপিয়া বসিয়া মন্দিরা কহিল—

—ভারী শাড়ী! কিন্তু আপনার ঠাকুরপো চটে মটে গেলেন কোথা?

আরতি স্নেহস্নিগ্ধ স্বরে কহিল—আমার ঠাকুরপো চটবার ছেলে নয়।

দেখা গেল ঠাকুরপো সম্বন্ধে মন্দিরার কৌতূহল কম নয়।

গল্পে গল্পে এতশীঘ্র দুইটি অসমবয়সী মেয়ের মধ্যে কেমন করিয়া একটা নিবিড় সৌহার্দ্দ গড়িয়া উঠিল বলা কঠিন। আরতি যেন দীর্ঘদিনের পর খোলা আকাশের মুখ দেখিয়াছে। ইহার অভিসন্ধিলেশহীন সহজ কথা, প্রাণখোলা মুক্ত হাসি, সরল পরিহাসের ভঙ্গী, সর্ব্বোপরি মধুর প্রগল্ভ স্বভাব মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট করিয়া তোলে।

এ বাড়ীতে সচরাচর আনাগোনা করেন—কৃষ্ণবালার সখীমণ্ডলী। তাঁহাদের দেখিলে আরতির প্রাণ শুকাইয়া আসে। তাঁহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হওয়াও যতটা নিন্দনীয় ব্যাপার—ততটাই নিন্দনীয় সহজভাবে আলাপ করা।

বৌ-মানুষ লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া গিন্নীদের কথায় যোগ দিবে—এটা কৃষ্ণবালার অত্যন্ত না-পছন্দ ব্যাপার। উষারাণী আসে মাঝে মাঝে, তাহাকে দেখিলেও হৃৎকম্প হয়, স্পষ্ট-বক্তার গৌরবরক্ষা করিতে সে বধূর দিক টানিয়া পিসীমার সহিত বচসা করিয়া যায়—তাহার তাল সামলাইতে হয় আরতিকে।

আর আসে মেনকা।

তাহার হাবভাব দৃষ্টিকটু, কথাবার্ত্তা অমার্জ্জিত, পরিহাসের ভঙ্গী অশ্লীল, মোটের মাথায় সমবয়সী হইলেও মেনকার সখীত্ব বাঞ্ছনীয়ও নয়, প্রীতিকরও নয়।

তাই মন্দিরার মত সরল কিশোরীর সঙ্গ আজ আরতির কাছে যেন কোন বিস্মৃত জগতের হাওয়া বহিয়া আনিয়াছে।

খবর পাইয়া খোকাকে লইয়া পিসীমাও যে আসিয়া হাজির হইতে পারেন, এটা অমরেশের খেয়াল ছিল না। পিসীমাকে আসিতে দেখিয়া সে ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া গেল বিজয় মল্লিকের রিলিফ কমিটীর মিটিঙের উদ্দেশে।

অনাত্মীয়া বয়স্থা মেয়ের সহিত হাস্য-পরিহাস পিসীমার সন্দিগ্ধ চোখে যে কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, সে জ্ঞান অমরেশের আছে বটে, কিন্তু মন্দিরার নাই। সে আপন স্বভাবধর্ম্মে সহজ হইতে পারিবে কিন্তু অমরেশের পক্ষে হইয়া উঠিবে কঠিন।

অতএব সরিয়া পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ভাবিবে অভদ্র? ভাবুক, উপায় কি! আচ্ছা, রিলিফ কমিটীর প্রস্তাব লইয়া একদিন যাইলে কেমন হয়?

হঠাৎ মন্দিরার চিন্তাটাই বা এত করিয়া মনে আসিতেছে কেন? কত মেয়েই তো আছে পাড়ায়, ছেলেবেলায় কতইতো দেখিয়াছে তাহাকে।

শাড়ী ধরিলে মেয়েরা যেন নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করে।

পিসীমার কোলে খোকাকে দেখিয়াই মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া টানাটানি সুরু করিল।

—ও মা কী সুন্দর, কী চমৎকার মিষ্টি খোকাটা। এসো আমার কাছে।

পিসীমা একটু সরিয়া গিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন—হ্যাঁ গা বোমা, তুমি তো আর খৃষ্টানের মেয়ে নও? রান্নাঘরে জুতো পায়ে দিয়ে ঢুকতে নেই, এটুকু শিক্ষে দিতে পারনি?

মন্দিরা অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

আরতি যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। কথাটা যে তাহার মনে উদয় হয় নাই এমন নয়, কিন্তু এই সুদর্শনা সুসজ্জিতা তরুণীটির সম্মুখে ও-কথা উচ্চারণ করিতে তাহার বাধিয়াছে, কিন্তু পিসীমার যে ঘরে পা দিয়াই নজরে পড়িল ইহাই আশ্চর্য্য।

—তুমি যতীন মুখুয্যের মেয়ের দৌহিত্রী না?

মন্দিরা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

—গঙ্গাচান করতে যেতে রোজ গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যাও দেখি কিনা। বে-থা হয়নি বুঝি এখনো?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন আছে কি না বুঝিতে না পারিয়া মন্দিরা নীরব রহিল।

—যতীন মুখুয্যের এ পক্ষের বৌ তোমায় পুষ্যি নিয়েছে বুঝি?

এই শ্রীহীন প্রশ্নে মন্দিরা অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল।

কৃষ্ণবালা আবার স্বগতঃ মন্তব্য করিলেন—সেই যে কথায় বলে না, "কান কাঁদে সোনা বিনে, সোনা কাঁদে কান বিনে—" ঘরে পয়সার অবধি নেই যতীন মুখুয্যের, এ পক্ষে দু'দশটা ছেলেপুলে হলে তারা তো খেয়ে পরে বাঁচতো? তা না

আকালের ঘরে শূয়োরের পাল। তবে অতীন মুখুয্যের গুচ্ছির আণ্ডাবাচ্চা হ'য়েছে, না?

মন্দিরা বিস্মিত দুই চক্ষু মেলিয়া পিসীমার বাক্যনিরত রসনার পানে চাহিয়া রহিল।

—দুই ভায়ে এক অন্ন? না ভেন্ন হাঁড়ি?

পিসীমাকে যতই ভয় করুক তবু এই অভদ্র প্রশ্নের বিরুদ্ধে আরতির সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

—ছেলেমানুষ অত কথা জানে না পিসীমা।

—কি জানি মা একটা কথারও তো উত্তুর পেলাম না, অথচ এতক্ষণ তো মুখে খই ফোটাচ্ছিলে দু'জনে, আমায় দেখে বাক্যি হ'রে গেল একেবারে।···যাই অবেলায় আবার চান করে মরি, জুতো পরে ছোঁয়া গেল।—বলিয়া দুইটি বাক্যহীনা তরুণীকে প্রস্তরে পরিণত করিয়া খোকাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন পিসীমা। খোকার—"মা'ল কাথে দাবো, মা'ল কাথে দাবো—" শব্দের করুণ আবেদন গ্রাহ্যও করিলেন না তিনি।

বিজয় মল্লিক তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছে অমরেশকে। মিটিং বন্ধ হইয়া আছে, মেম্বাররা কেহই আসে নাই—বিজয় মল্লিক একা আর কতদিক সামলাইবে?

চাঁদা যাহা উঠিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে লজ্জা করে। উচিত হইতেছে পাড়ার ছেলেদের জড় করিয়া চাল, ডাল, পুরোনো কাপড় সংগ্রহ করিতে বাহির হওয়া। আবশ্যক খানিকটা লাল সালু, দু'খানি বাখারি আর ভাঙাচোরা একটা হারমোনিয়াম।

গান বাঁধিয়া দিবে বিজয় মল্লিক নিজে।

অমরেশ বাধা দিয়া কহিল—ক্ষেপে গেছিস, গান গেয়ে ভিক্ষে করতে বেরোলে গায়ে ধুলো দেবে লোকে। ও-সব কি ভদ্রলোকের কাজ?

—তবে ভদ্রলোকের কাজটা কি শুনি? শাড়ীর আঁচল দেখলেই মূর্চ্ছা যাওয়া?

এইমাত্র বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া অসতর্ক অবস্থায় মন্দিরার নামোল্লেখ করিয়া ফেলিয়াছে অমরেশ। ভাবিয়াছিল মনগড়া একটা কারণ দর্শাইয়া দিবে, কিন্তু মিথ্যাকথা কেমন জিবে আটকায়।

বিজয় মল্লিক ঝাঁজালো গলায় কহিল—যদি বুদ্ধিমান্ হ'স্ তো মেয়েটার সঙ্গে ভাব করে ফেলে ফুসলে-ফাসলে মোটা কিছু আদায় করে নে। বড়লোকের ধিঙ্গি মেয়ে, চাই কি একখানা গয়নাই খুলে দিতে পারে গা থেকে।

—মতলব নিয়ে ভাব-টাব করতে পারবো না আমি।

—তা' পারবে কেন? ভাবুক-চূড়ামণি প্রেমে পড়গে যাও। কাল যেতে হবে প্রবীরের বাড়ী, বুড়োতো টাকার কুমীর, কিছু খসানো দরকার।

—যেতে হয় তুই একলা যা।

—কেন তোর কি হ'ল শুনি?

অমরেশ একটু চালাকী করিয়া বিজয় মল্লিকের সেন্টিমেণ্টে আঘাত করে—কেন, বড়লোকের খোসামোদ করতে যাবো কেন? আমরা গরীব, গরীবের মত করেই আমাদের নিরন্ন ভাইবোনদের সাহায্য করবো। করবো আমাদের প্রাণ দিয়ে, মুখের অন্ন দিয়ে, পরিধেয় বস্ত্রের আধখানা ছিঁড়ে দিয়ে—ধনীর দরজায় ভিক্ষা নিয়ে নয়।

বিজয় সহসা চমকাইয়া ওঠে, নূতন আলোক চোখে পড়িয়াছে তাহার। অমরেশের পিঠে একটা মৃদু আঘাত দিয়া বলে—ঠিক বলেছিস অমরেশ, সত্যিই বটে, এঁ্যা? আমরা আমাদের মুখের অন্ন দিয়ে, পরণের আধখানা দিয়ে গরীবকে বাঁচিয়ে তুলবো—কি বলিস?

—তাই তো বলছি, কিন্তু সাবধান, চট্ করে ছিঁড়ে ফেলিস নি যেন ধুতিখানা। বারো টাকা জোড়া—মনে রাখিস সেটা।

—দূর, অত হিসেব কষে কিছু হয় না।

পূর্ব্বের আইডিয়া বাতিল করিয়া নূতন আইডিয়া করিতে থাকে বিজয় মল্লিক।

—কিন্তু তুই বোধ হয় ইচ্ছে করলেই লেকচার দিতে পারিস অমরেশ?

—সকলেই পারে।

—পাগল! ভাব থাকলেও আমার তো ভাষাই জোগায় না মুখে। কিন্তু তোর—মনে হচ্ছে ভাব-ভাষা দুইই আছে। কবিতা-টবিতা লিখিস না তো? মানে ওই এখনকার কটমটে ভাষায়? "লাল আকাশ" "লৌহ দানব" "মরা শকুন" আর "ভাগাড়ের গরু" নিয়ে?—মাথা খারাপ!—বলিয়া সমস্ত আলোচনার উপর যবনিকা টানিয়া দেয় অমরেশ।

বিজয় কল্পনা করিতে থাকে—অমরেশ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বাক্যের ঝড় তুলিয়াছে—হাজার হাজার শ্রোতা বক্তার যুক্তির সারবত্তায় মুগ্ধ হইয়া পকেট উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে—বিজয় মল্লিকের বৃহৎ বাক্সটির কণ্ঠিত গহ্বরে।···মেয়েরা দিতেছে গলার হার, হাতের চুড়ি, ব্রোচ, কানপাশা খুলিয়া। দুর্গতের ঘরে ঘরে দুই হাতে দান করিতেছে বিজয় মল্লিক, অন্নবস্ত্র ঔষধপত্র।

হায় এই স্বপ্ন কি সফল হইবার নহে!

এতই অসম্ভব!

অমরেশ কি বক্তৃতা দিতে রাজী হইবে?

যাহার যতো সামর্থ্য, ব্যয় করিতে সে ততো কুণ্ঠিত হয় কেন?

প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যের সামান্যতম অংশটুকুও দান করিতে বিমুখ হয় মানুষ কোন্ লজ্জায়?

প্রবীর হীরার আংটি পরিয়া বেড়ায় কিসের সুখে?

বিজয় মল্লিকের দৃষ্টি দিয়া সকলে দেখিতে চায় না কেন?

মানুষের উপর মানুষের সহানুভূতির অভাব তাহাকে ক্লিষ্ট করিতে থাকে॥

আর অমরেশ ভাবিতে থাকে অন্য কথা।…

…বোমা যদি পড়েই, এ পাড়ায় পড়িলে দোষ কি?

…'বড় বাড়ী' 'ছোট বাড়ীর' বিবাদ ঘুচিয়া রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতে হয় সকলকে। ক্ষীণ সুকুমার প্রাণগুলি রক্ষা করিতে বলিষ্ঠের সবল বাহু অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়।…কত অসম্ভাব্য ঘটনা ঘটিতে পারে। বিপদের মুখে হৃদয়ের আদান-প্রদান সহজ হইয়া আসে।

সহসা খোকার মুখ মনে করিয়া শিহরিয়া ওঠে অমরেশ।

মেনকার চিঠির উত্তর আসে না।

কিন্তু উত্তর আসিবার আশা কি সত্যই আছে?

তবুও মেনকা প্রত্যহ রঙিন কাগজে 'প্রাণাধীকেষু' সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিবেই। মেনকার মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলে—মরণ আর কি, তোর যেমন গলায় দেবার দড়ি জোটে না মেনি, তাই সেই চামারকে খোশামোদ করে মরিস। পেটে যদি ঠাঁই দিতে পেরে থাকি, হাঁড়িতেও ঠাঁই দিতে পারবো।

যেন পেটের ভাত জুটিলেই সকল প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে মেনকার।

মেনকার মা আরও বলে—তোর ভাত-কাপড়ের জোগান দিতে পারবো মেনি, চিঠি লেখার খরচ জোগাতে পারবো না।

মেনকা তাই পাড়ার ছেলেদের ধরিয়া চিঠির ঠিকানা লেখায়, আর পোষ্টেজের খরচ দিতে ভুলিয়া গিয়া বলে—চিঠিটা অমনি ডাক বাক্সোয় ফেলে দিয়ো না ভাই।…আজও তাই জানালা হইতে অমরেশকে দেখিতে পাইয়া ডাক দেয়—ও অমরেশদা!

অমরেশ জানে মেনকার ডাকিবার কারণ কি। মেনকার এই ব্যর্থ চেষ্টায় দুঃখ হইলেও হাসি আসে অমরেশের। বলে—কি রে মেনি?

—বলছি এই চিঠিখানায় আপিসের ঠিকানা লিখে দেবে অমরেশ দা? ফিকে গোলাপীরঙের খামখানা হাতে লইয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়ায় মেনকা।

লিখিয়া দিয়া অমরেশ প্রশ্ন করে—চিঠি দিলে উত্তুর পাস না তো দিস কেন?

হঠাৎ মেনকা অমরেশের নিতান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া ছলছল চোখে অকারণ মৃদুস্বরে বলে—প্রাণের ভেতর যে বড্ড হু-হু করে অমরেশ দা!

অমরেশ এই গায়েপড়া ভাবটায় অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছে মেনিকে, লজ্জা করিবার কিছুই নাই, আপনার বোনের মতই মনে করা চলে।

কিন্তু মেনকার ধরণ ধারণ কেমন বিশ্রী। কাছে আসিলেই, সাদা কথাও কয় ফিস্‌ফিস্ করিয়া, নিঃশ্বাস ফেলে দ্রুত, চুলে-মাখা সস্তা কেশতৈলের উগ্র গন্ধটা নাকে আসিয়া গা ঘিনঘিন করে।

—কালো গৌরাঙ্গ গেল কোথায়?—বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গের পরিবর্ত্তন করে অমরেশ।

—ছোড়দা গেছে কয়লার চেষ্টায়—আবার তো দু'টাকা করে মণ হ'ল।

—তাই নাকি? আমাদেরও তো তা'হলে দেখতে হয়—বলিয়া যেন এইমাত্র কয়লাই দেখিতে যাইতেছে অমরেশ, এইভাবে মেনকাদের রোয়াক হইতে নামিয়া পড়ে।

মেনকা তাড়াতাড়ি বলে—চিঠিটা অমনি নিয়ে যাও না ভাই—ডাকে দিয়ে দিও।

উল্টাইয়া দেখিবার আবশ্যক করে না। অমরেশ ঠিক জানে, ষ্ট্যাম্প মারা নাই।

অমরেশ চলিয়া গেলে মেনকা ঘরে আসিয়া আরসির সামনে দাঁড়ায়। মাড়ি বার করা বড় বড় উঁচু দাঁতের পাটির উপর হাতটা চাপা দিয়া মুখের উপরের অংশটা ঘুরাইয়া দেখে।

কপালের টিপ্‌টা সাবধানে বাদ দিয়া আঁচলে মুখটা মুছিয়া লয়। জ্যালজেলে খোলের রঙিন ডুরেখানা আবার একবার গুছাইয়া পরে, বহুক্ষণ ধরিয়া আপনাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকে।

সাজিতে এত ভালো লাগে কেন মেনকার? কেন ভালো লাগে ঠমক-ঠমক করিয়া বারবার আরসির সামনে তার যৌবনকে দেখিতে?

স্বামী নেয়না, তবু বিকাল হইলেই পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিতে ইচ্ছা হয় কেন? রঙিন শাড়ীখানি পরিতে না পাইলে মন ওঠে না কেন? পায়ে আলতা দিয়া কপালে টিপ আর মুখে পাউডার লাগাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালো লাগে কেন?

বাছিয়া বাছিয়া এই সময়টাই চিঠির ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য একে-ওকে ডাকিতে ইচ্ছা হয় কেন? নিজের আচরণের অসামঞ্জস্য নিজের চোখে ধরা পড়ে না মেনকার।

বিবাহের পর মাত্র বৎসর খানেক শ্বশুরঘর করিয়াছিল মেনকা, কিন্তু তাহার পর আজ দেড় বৎসর বাপের বাড়ী পড়িয়া আছে, আর উদ্দেশ করে না তাহারা। মেনকার মা জামাই-বাড়ীর প্রত্যেকের নামে কুৎসা রটাইয়া বেড়ায়, আর উদ্দেশে শাপ শাপান্ত করে।

চার

প্রবীরের লেখার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া মন্দিরা নিজের বিজয়-অভিযানের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া, দুইহাত

জোড় করিয়া বলে—দোহাই দাদাভাই আর যাচ্ছিনা। বৌদিকে খুব ভালো লাগলো সত্যি, কিন্তু শ্রীমতী পিসীমা? তাঁর শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম, সে এক অদ্ভুত চিজ্!

—আহা বেচারা বৌদি সারাদিন ওই দুর্দ্দান্ত শাসনের তলায় থাকে!—প্রবীর বলে।

—তা সত্যি—মমতাপূর্ণ কণ্ঠে মন্দিরা সায় দেয়—প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল বেচারা।

—পরের ওপর কোন হাত নেই, দেখেছিস মন্দিরা? একজন আর একজনের উপর শত অত্যাচার করছে দেখেও প্রতিকারের উপায় থাকে না।

—চারিটি বই পাঠিয়ে দিলে কিন্তু বেশ হয় দাদাভাই, বলছিলেন বই পড়তে পেলে আমি পৃথিবীর কোন দুঃখই গায়ে মাখি না। খুব বই পড়তে ভালবাসেন। ছেলেবেলায় মা মারা গিয়েছিল, বাপের কাছে একলা কাণপুরে মানুষ হয়েছেন—শুধু বই আর গান নিয়েই থাকতেন।

—গান?

—হ্যাঁ ভাই, মনে হ'ল গান-বাজনা ভালই জানতেন, এখন অবশ্য একেবারেই ভুলে গেছেন বলছিলেন, সেতারের ওয়াড়ের ওপর দু'ইঞ্চি ধুলো জমেছে। আচ্ছা দাদাভাই, মানুষ কেন মানুষকে এত দুঃখ দেয় বলতো?

—সারা জগৎ তো ওই 'কেন'র উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছে মন্দিরা।

রাধা ঝি আসিয়া হাঁক দেয়—দিদিমণি, মা বললেন আজকে আপনাকে খাবার তৈরি শেখাবেন, ওপরে চলে আসুন।

—কি খাবার?

রাধা দুই হাত উল্টাইয়া বলে—আমি কেমন করে জানবো গা? মা তো সেই এষ্টোভ জেলে নানাবিধি নিয়ে বসেছেন। আমায় বললেন—রাধা, দিদিমণিকে ডেকে দে, আজ কলেজের ছুটি আছে, আমার কাছে বসে খাবার তৈরি শিখুক।

চঞ্চলা মন্দিরা লাফাইয়া উঠিয়া বলে—দাদাভাই নেমন্তন্ন রইল।

—কি তুই অখাদ্য করে রাখবি, খেতে না পারলে?

—তাই বই কি? সেদিন মাংস রেঁধে খাওয়াই নি? বড় যে প্রশংসা করা হয়েছিল?

—সেদিন? ওঃ চামচটা একবার ডুবিয়েছিলি বটে—নইলে ঠাকুরই তো—

—ইস্, ঠাকুর তো শুধু নুন আর আদা-টাদা প্রভৃতি হিজিবিজি কতকগুলোর মাপ দেখিয়ে দিয়েছিল আর ডেকচিটা নামিয়েছিল—গরম ডেক্‌চি নামাতে পারি আমি?

—ডেক্‌চিটা ঠাকুর নামিয়ে দিয়েছিল আর চাপিয়ে দিয়েছিল, কেমন?

—হুঁ।

—বাকীটা সবই তুই রান্না করেছিলি? বাঃ বাঃ বেশ বেশ, খাবারটাও ওই ভাবে সমস্ত তৈরি করে রাখিস, কেমন?

—তুমি আমায় ঠাট্টা করছো—হ্যাঁ?

—ঠাট্টা? বলিস্ কি রে?—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রবীর বলে—তোর সঙ্গে কি আমার ঠাট্টার সম্পর্ক—করলেই হ'ল! পাগল আর কি!

মন্দিরা একটা কীল দেখাইয়া ছুটিয়া পলায়।

উপরের দালানে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ক্ষীরমোহন আর কড়াইসুঁটির কচুরীর মাল মসলা লইয়া গুছাইয়া বসিয়াছেন। মন্দিরা পিছন হইতে দুইহাতে গলা জড়াইয়া পিঠের উপর মুখ ঘষিয়া কহিল—মাগো মা-মণি, কি বলছো মা!

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলেন—রকম দেখ মেয়ের, বলছি, দু'একটা খাবার শেখনা।

—কেন মা তুমি তো সব জানো।

—আমি জানলেই তোর কাজ চলবে? বড় হচ্ছিস্ শিখবি না?

—বারে, কেবল তুমি আমায় বড় করে দিচ্ছ মা,—বড় হচ্ছিস সেলাই শেখ, বড় হচ্ছিস রান্না শেখ—বড় হয়ে কী চোর দায়ে ধরা পড়েছি বলতো?

—আচ্ছা পাগল মেয়ে, কাজকর্ম্ম না শিখলে তোর বাবা মা বলবে—মেয়েটিকে আদর দিয়ে ধিঙ্গি করেছে।

বাপ মার উল্লেখে ভারী দমিয়া যায় মন্দিরা। জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাহার সত্যকার মা, ছেলেবেলাকার এ ধারণাটা অবশ্য আর নাই, জ্যোতির্ম্ময়ীর নির্দ্দেশমত তাহার চির অপরিচিত পিতা মাতাকে চিঠি পত্রও দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটা নিতান্তই বাধ্য হইয়া!

জ্যোতির্ম্ময়ী জানেন পূর্ণশশী এবার মেঘে ঢাকা পড়িল, তাই সস্নেহে বলেন—তোর বাবা যে আসছে শীগগিরি। তা' হাতের রান্না-টান্না খাবার-দাবার খাইয়ে দিবি না দু'চারখানা? সার্টিফিকেট আদায় হবে।

—সার্টিফিকেট—আমার কি দরকার? নিরুৎসাহভাবে প্রশ্ন করিয়া মন্দিরা বলে—হ্যাঁ মা সত্যি না কি?

—কি সত্যি?

—ওই যে কার আসবার কথা বললে।

—ওমা, কার কি রে, তোর বাবা মার আসবার কথা বলছি যে! মাঝে মাঝে তো আসে কলকাতায়, কিন্তু কখনো এখানে উঠতে চায় না। সেই কোথায় পিসীর বাড়ী গিয়ে ওঠে, আর এবারে তো প্রায় ছ'সাত বছর পরেই আসছে, কি ভাগ্যি যে চিঠি দিয়েছে এসে দু'চার দিন থাকবে বলে।

অপরিচিত পিতামাতা সম্বন্ধে লেশমাত্র কৌতূহল ছিল না মন্দিরার, বরং একটা অকারণ বিদ্বেষ-ভাবই ছিল, তাই

আগমন সংবাদে উল্লসিত না হইয়া মনমরা ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ীর নির্দ্দেশমত কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী অবশ্য প্রবীরের অপেক্ষা কিছু কম দেখেন না মন্দিরাকে, নিজের কন্যা থাকিলে যে আরো অধিক ভালো বাসিতেন, এমন কথা নিজের কাছেও স্বীকার করেন না, তবু 'নিজের নয়' এই বোধটুকু ভিতরে ভিতরে পীড়া দেয় বৈকি।

তাই দৌহিত্রী-জামাতার আসার সংকল্পে ঈষৎ চিন্তিত হইয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী। কলিকাতায় আসিলে অমিয়া অথবা আনন্দময় যে তাঁহার বাড়ী না উঠিয়া দূর সম্পর্কে পিসীর বাড়ী উঠে, এতে তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেও খুব বেশী দুঃখিত হ'ন না। তত্ত্বতাবাসের কাপড় জামা প্রভৃতি পাঠাইয়াই এ পক্ষের কর্ত্তব্যের ভার লাঘব করেন।

লোকে হয়তো বলিতে পারে সতীনের নাতনী নাত-জামাইয়ের উপর কতই আর টান হইবে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ীর সে বিদ্বেষবোধ ছিল না। যেমন 'বড়' হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তেমনি স্বামীর আত্মীয়-কুটুম্ব প্রিয়-পরিজন সকলের সঙ্গেই বড়র মত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। বয়সে বড় অরুণপ্রভা অনেক বেশী দিন আগে আসিয়াও অর্দ্ধেক আত্মীয়-কুটুম্বের নাম পর্য্যন্ত জানেন না।

শুধু মন্দিরাকে লওয়ার পর হইতেই জ্যোতির্ম্ময়ীর মনে জন্মিয়াছিল ভয়। এই বুঝি চাহিয়া লয়, এই বুঝি কাড়িয়া লয়। বিধিবদ্ধ ভাবে পোষ্য লইতে ইচ্ছা হয় না—তাঁহার প্রবীর বাঁচিয়া থাক্। তাছাড়া ওটা কেমন যেন সেকেলেপনা বলিয়া মনে হয়। তবু আজ আনন্দময় আসার নামে ভিতরে ভিতরে একটা বিষাদের সুর বাজিতেছিল, এখন ভাবিতে-ছিলেন আইনসঙ্গত ভাবে পোষ্য লইলে হয়তো এমন হারাই-হারাই ভাব হইত না। ভাবিলেন, তাহার শিক্ষায় সভ্যতায় আচারে আচরণে এতটুকু খুঁৎ বাহির করিতে দিবেন না তাহার পিতার কাছে। তাহারা যেন ভাবিতে পারে মেয়েকে বিলাইয়া দিয়া ক্ষতি হয় নাই তাহাদের।

পয়সা থাকিলে যে উগ্র আত্মম্ভরিতা থাকা স্বাভাবিক, সেইটির অভাব ছিল বলিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ীর এত উদ্বেগ।

নতমুখে কিছুক্ষণ কাজ করিয়া মন্দিরা সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আর ভাল লাগছে না মা।

—সে কিরে, এই 'পাক'টা শেষ পর্য্যন্ত দেখ্। রসটা গাঢ় হয়ে ক্ষীরমোহনগুলো ক্রমে লালচে হয়ে আসবে—

—ছাই ক্ষীরমোহন—বলিয়া মন্দিরা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

নীচে প্রবীর তখনো মন্দিরার পরিত্যক্ত সোফাখানায় বসিয়াছিল। মন্দিরা ছুটিয়া আসিয়া তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া কহিল—দাদাভাই চলনা কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কই আমার নেমন্তন্ন ? কি সব রান্না করতে গেলি—

—ছাই নেমন্তন্ন। চল বাইরে কোথাও ঘুরে আসি, ভাল লাগছে না বাড়ীটা।

বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রবীরেরও হইতেছিল, কিন্তু শীতের মধ্যাহ্নের সংকল্পটা কার্য্যে পরিণত হইতে না হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাটাও শিথিল হইয়া গেল।

মন্দিরার তাড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমারও তো বাড়ী বসে থাকতে ভাল লাগছে না, লম্বা কোথাও বেড়িয়ে আসলে মন্দ হ'ত না, কিন্তু বেলা পড়ে এল যে, ফিরতে রাত হয়ে যাবে না ?

—হোকগে, ভূতে ধরবে না তো। চলো বেলুড় মঠে যাওয়া যাক্।

—বেলুড়ে ? এখন ?

—কেন নয় ? সন্ধ্যারতি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে !

—বলেছিস মন্দ নয়—আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে আয় না যদি যেতে রাজী হ'ন।

—না না, মার এখন কুটুম্ব আসবে, ভীষণ ব্যস্ত। তুমি নিয়ে যাবে কি না তাই বলো ?

—চল্ যাওয়াই যাক্।

বলিয়া আলস্য ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়ে প্রবীর।

জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্মিত স্বরে কহিলেন—সে কিরে মণি, তোর বাবা আসছে, গাড়ী গেছে ষ্টেশনে, আর এখন বেরোবি ?

—এসেই আমাকে কি দরকার পড়বে শুনি ?—সিল্কের শাড়ীখানা গুছাইয়া পরিতে পরিতে দুষ্টু হাসি হাসিয়া বলে—তোমার সঙ্গে তো সম্বন্ধ ভালোই, কোরো না গল্প টল্প—বলিয়া ছুটিয়া পলায়।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিবার সময় গলির মুখ হইতে বাহির হইল অমরেশ ও বিজয় মল্লিক। বলা বাহুল্য চাঁদা চাহিতে বাহির হইয়াছে। কাঁচপোকার সহিত তেলাপোকার মত নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উভয়ের মধ্যে—অমরেশকে টানিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক, কিন্তু কাজ যে খুব বেশী অগ্রসর হইতেছে তাহা নয়। তাছাড়া যাহাদের উপকারের চেষ্টায় বিজয় মল্লিকের আহার নিদ্রা নাই, তাহারা যে উপকারের প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া আছে, এমন মনে করিবারও হেতু নাই।

তাহারা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, কিন্তু মানিয়া লয়। মানাইয়া লয় আপনাদেরকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দুঃখ-দুর্দ্দশার সঙ্গে। যে অবিচারের মৃত্যু আসিয়াছে মানুষের হাত হইতে, তাহার জন্য মানুষকে তাহারা দায়ী করে না, করে নিয়তিকে।

মানুষের কাছে তাহারা আশা করে না, করে জুলুম। তাহাদের ভালো করিবার, মঙ্গল করিবার জন্য কাহারও মাথাব্যথা পড়িয়াছে, এ বিশ্বাস নাই বলিয়াই ক্ষুধার অন্ন, লজ্জার আবরণ ও মাথার আচ্ছাদনের জন্য লোকের দয়ার উপর জুলুম করিয়া বেড়ায়।

তাই বিজয় মল্লিকের মত আত্মহারা প্রেমিকের কোন মূল্য নাই উহাদের কাছে বরং অকারণ মাথাব্যথাকে সন্দেহের চোখেই দেখে তারা।

তবু বিজয় মল্লিকের ছুটাছুটির কামাই নাই।

গাড়ীর ভিতর হইতে মন্দিরা ডাকিল—ও অমরেশ দা, কোথায় চলেছেন?

অমরেশ ইতস্ততঃ করে, বিজয় মল্লিক পিছন হইতে ঠেলা মারে—অর্থাৎ চল চল নিজের কাজে চল।

অমরেশকে নিরুত্তর দেখিয়া মন্দিরা আবার বলে—কোন দরকারি কাজে না কি? না হয় তো আসুন না আমাদের সঙ্গে, বেড়িয়ে আসা যাক্।

দুই জনের মধ্যে বিশেষ করিয়া এক জনকে আহ্বান করার মধ্যে যেটুকু ভদ্রতার অভাব আছে, তাহার জন্য বিব্রত বোধ করে প্রবীর, তাড়াতাড়ি বলে—ওকি মন্দিরা, ওর হাতে কাজ র'য়েছে।

—আহা বলছিই তো যদি কাজ না থাকে।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অমরেশকে ঠেলিয়া দিয়া বিজয় মল্লিক উপরপড়া হইয়া বলে—হ্যাঁ কাজ আছে বইকি, গরীবের সর্ব্বদাই কাজ। আপনাদের মত গাড়ী চড়ে, হাওয়া খেয়ে বেড়াবার অবস্থা তো সকলের নয়।

অমরেশ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, ঈষৎ বিরক্তভাবে বলে—সব সময়টা ফাইট্ করিসনে বিজয় থাম্... তোমরা কোন্ দিকে প্রবীর?

—যেদিকে দু'চক্ষু যায়—প্রবীরের হইয়া উত্তর দেয় মন্দিরা—আচ্ছা থাক, আপনার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে কথা কইলে—আমরা নিষ্কর্ম্মা মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

মন্দিরা কি সকলের কাছেই মান-অভিমান করিবে নাকি! আচ্ছা এক মেয়ে হইয়াছে, ভারি হাসি পায় প্রবীরের। ঈষৎ হাস্যে ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে—ইনি সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করে মঠে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, বুঝলে অমরেশ? আমি রথের সারথি।

—আঃ দাদাভাই আবার লাগছ আমার সঙ্গে?

—লেগেই তো আছি—প্রবীর হাসিয়া ওঠে। —বরং তুই-ই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিস।

—তার মানে?

—মানে, মান-অভিমানের পালা সুরু হয়েছে আর এক-জনের সঙ্গে।

দুষ্টহাসি হাসিয়া মৃদুস্বরে কথা কয়টা উচ্চারণ করে প্রবীর।

সহসা মুখরা মন্দিরা লজ্জায় রাঙা হইয়া চুপ করিয়া যায়, কিছু একটা উত্তর না দেওয়া যে অধিকতর লজ্জার বিষয়, এ জ্ঞানটুকু থাকা সত্ত্বেও চট করিয়া উত্তর দিতে পারে না।

ইহার অবসরে—"তোমরা তা'হলে দরকারী কথাগুলো সেরে নাও অমরেশ—আমার কাজ আছে" বলিয়া বিজয় হন হন করিয়া আগাইয়া যায়।

বিজয়ের রূঢ় মন্তব্যকে অমরেশ ভয় করে—কিন্তু সুন্দরী তরুণীর অভিমানস্ফুরিত দৃষ্টির আহ্বান কি জগতের সমস্ত ভয়কে তুচ্ছ করিতে শেখায় না? তাছাড়া অভদ্রের মত কথার মাঝখানে চলিয়া যাওয়াই বা কেমন দেখায়?

মন্দিরা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলে—যান, আপনার বন্ধু রাগ করে চলে গেছেন—

—রাগ কিসের? পাগল না কি, ও অমনি ব্যস্তবাগীশ, জগতের লোকের অশান্তির চিন্তায় নিজের শান্তি হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—ও, উনিই বুঝি সেই রিলিফ কমিটীর!

—হ্যাঁ তারই একটা কাজে যাচ্ছিলাম একটু।

—তাই নাকি?—অনুতপ্তভাবে মন্দিরা বলে—তা'হলে তো যথার্থই কাজের ক্ষতি করলাম, যান যান।...কিন্তু কই আমাকে তো আপনাদের মেম্বার করে নিলেন না? চলুন, কোথায় আপনাদের কি হচ্ছে দেখে আসি।

প্রবীর ষ্টিয়ারিং হুইলে আঙুলের টোকায় তাল দিয়া গুনগুন করিয়া গান গাইতেছিল, আর মাঝে মাঝে মৃদু হাসিতেছিল। মন্দিরা পিছন হইতে তাহার মাথায় ঠেলা দিয়া কহিল—দাদাভাই, শুনছো, আজ আর বেলুড় মঠ হ'ল না বোধ হয়।

—তা জানতাম, বলতে হবে না!

—জানতে? কি করে শুনি?

—ঈশ্বর আমার বাড়তি দুটো চোখ দিয়ে ফেলেছিলেন কি না—ভবিষ্যৎটা পরিষ্কার দেখতে পাই।

—পাও তো বেশ করো। চলোনা দাদাভাই, আমরাও অমরেশ দা'দের...কি নাম আপনাদের সমিতির?

—নাম? 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' গোছের কি একটা লম্বা চওড়া আছে যেন।

—ঠাট্টা করবার কি আছে? চল দাদাভাই, আমরাও দলে নাম লেখাই গে, তবু কাজ করবার সুযোগ পাবো। সত্যি, শুধু বেড়ানো আর ঘুমানো ছাড়া কি বা করছি আমরা?

—যার যেটুকু ক্ষমতা তার বেশী সে কি করবে?—প্রবীর অভিমত ব্যক্ত করে।

—বলতে চাও কিছু কাজ করবার ক্ষমতা নেই আমাদের?

—আমার তো তাই ধারণা।

—তোমার ধারণা নিয়ে তুমি থাকো।...অমরেশদা আমি আপনাদের দলে।—বলিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়ে মন্দিরা।

—যাক, এতদিনে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচলো আশা হচ্ছে।—বলিয়া প্রবীর গাড়ীখানা গ্যারেজে ঢুকাইতে যায়।

'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র সভা বলিতে বিজয় মল্লিকের একতালার ঘরখানা, আর ছারপোকা বহুল একখানা বড় চৌকি। সে ঘর অবশ্য প্রবীর চেনে, যাইতে গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। মন্দিরাকে নিবৃত্ত করিতে চাহিলে ফল ফলিবে উল্টা জানা কথা—কারণ তাহার জেদি স্বভাবের পরিচয় প্রবীরের চাইতে বেশী কে জানে? অতএব সে ভাবিল—আস্তানাটা দেখাইয়া আনি, সখ মিটুক।

বিজয় মল্লিক রাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল, সহসা উহাদের এই অভূতপূর্ব্ব আবির্ভাবে অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু মন্দিরার সদা-সপ্রতিভ রসনা কাহাকেও চুপ থাকিতে দেয় না।

—খুব রাগ করে চলে এলেন তো? আমি কিন্তু আপনার—'আর্ত্তত্রাণ সমিতি'র একজন সভ্য হতে এলাম। আজ থেকে আমাকেও আপনাদের কাজের অংশ বহন করতে দেবেন।

—যথা, ভয়ার্ত্তকে ভরসা দান, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, কি বলিস? শেষেরটা থেকেই বুঝি সুরু?

প্রবীরের টিপ্পনীতে জলিয়া উঠিয়া মন্দিরা কহিল—দেখ দাদাভাই, সব কিছুতেই হেসে উড়িয়ে দেবার কোন মানে হয় না। তোমার যদি নষ্ট করবার মত সময় হাতে না থাকে তুমি বাড়ী চলে যেতে পারো, এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

—অর্থাৎ নষ্ট করবার মত সময় তোমার যথেষ্ট আছে?

—হ্যাঁ আছে, একশোবার আছে।...কই অমরেশ দা, আপনাদের খাতাপত্র বার করুন। পরে দেখবেন মেয়েদের আপনারা যত বাজে ভাবেন, ততো বাজে তারা নয়।

—আমি কখনো বাজে মনে করি না।—অমরেশ উত্তর করে।

—কিন্তু আমি করি, মেয়েদের দ্বারা কিছু হয়, এ বিশ্বাস আমার নেই।

বিজয় মল্লিকের এই রূঢ় মন্তব্যে যুগপৎ সকলেই বিস্মিত হইল, শুধু প্রবীর স্বাভাবিক পরিহাস-প্রিয়তার গুণে কথার রূঢ়তা উড়াইয়া দিয়া কহিল—যাক্, আমার দলে তা'হলে একজনও আছে? ঠিক আমারও তাই মত।

মন্দিরা তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—কেন মেয়েরা কখনো বড় কিছু করতে পারেনি, না করেনি?

প্রবীর গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল—কেউ পারেনি এটা বলতে চাইনে—কিন্তু পার্সেণ্টেজ কষলে তার সংখ্যা এতই নগণ্য যে, সেটা ধর্ত্তব্যর মধ্যেই নয়!

—সেটা মেয়েদের সুযোগের অভাব।

মন্দিরাকে উত্তেজিত হইতে দেখিলেই যে প্রবীরের হাসি চাপা দায় হইয়া উঠে এও বিপদ। তবু কষ্টে সে হাসি চাপিয়া বলে—ওরে একটা প্রবাদ আছে জানিস—প্রতিভা কখনো সুযোগের মুখ চেয়ে বসে থাকে না।

—প্রবাদের কথা ছেড়ে দাও—সুযোগের দাম আছে বইকি! রবি বাবু যদি ঠাকুর বাড়ীর মত ঘরে না জন্মাতেন—

প্রবীর বাধা দিয়া বলে—থাক্ ও তুলনা ঢের শুনেছি, কিন্তু আর একটা জিনিষ ভেবে দেখেছ কখনো যে ঠাকুর-বাড়ীতেও মেয়েদের অভাব ছিল না? কম্ প্যারেটিভ্‌লি তাঁরা হয়তো তোমার আমার ঘরের মেয়েদের চাইতেও অনেকটা এগিয়ে গেছেন—তবু নক্ষত্রই, সূর্য্য নয়।

মন্দিরা চট্‌পট্ একটা লাগসই উত্তর না পাইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভাবে বলে—আচ্ছা সেকালেও তো অনেক মেয়ে—

—যথা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, এই তো? ও সব শুনতে শুনতে কান ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, তবু বিচার বিবেচনা করে দেখলেই বুঝতে পারি, অভাব আছে বলেই মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিতে দু'হাজার বছর আগের নজীর হাতড়াতে হয়। মেয়েদের হাত পা গুলো না হয় পুরুষেরা বেঁধে রেখে দিয়েছে, কিন্তু মগজটা তো আর কেউ আয়রণ চেষ্টে তুলে রাখেনি? মেয়েদের মধ্যে একটা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির আবির্ভাব ঘটেছে কোনোদিন?

মন্দিরা আর কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই অমরেশ হাসিয়া কহিল— তারা সারাদিন এক বাড়ীতে বাস করিস প্রবীর?

মন্দিরা দীপ্ত দুইটি চোখ অমরেশের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিল—সারাদিন ঝগড়া করি এই বলছেন তো?

—বলিনি কিছু, শুধু অনুমান করছি।

—ঝগড়া না হলে বুঝতে হবে—সেদিন শ্রীমতীর স্বাস্থ্য ভাল নেই, বুঝলে অমরেশ।—প্রবীর হাসিতে হাসিতে বলিল।

—সর্ব্বনাশ!—মন্দিরার মান বাঁচাইয়া অমরেশ মৃদুস্বরে কহিল—অভ্যাসটিতো সাংঘাতিক খারাপ করে রাখছ হে, ভবিষ্যতে যিনি ভুগবেন, তাঁর অবস্থাটা ভেবে দেখেছ?

—ভেবে আর কি করবো, যার যা ভাগ্য! কিন্তু কই তোমাদের সমিতির খাতাপত্তর কিছু আছে, না কি তাও নেই?

বিজয় মল্লিক গম্ভীর ভাবে বলে—কাগজে কলমে কাজ আমরা করি না, যা করি হাতে কলমেই করি। চাঁদার খাতা অবশ্য আছে একটা, কিন্তু বড়লোকের দয়ার দান আমারা নিতে ইচ্ছুক নই।

কথা বলে বিজয়, কিন্তু বিব্রত হইয়া উঠে অমরেশ। কথা চাপা দিবার জন্য বলে—কিন্তু শুধু তোমার আমার

দয়ার দানে তো গরীবের পেট ভরবে না বিজয়, তাছাড়া ইনি তোমার সমিতির মেম্বার হতে চান, ভেবে দেখ এতে সুবিধেও কত? ধর গরীবের ঘরে ঘরে ঢুকে, তাদের মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে, তাদের সুখ-দুঃখে ইতিহাস সংগ্রহ করে আনা মেয়েদের দ্বারা যত সহজে হতে পারবে, তেমনি আমাদের দিয়ে হবে কি?

মন্দিরা অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল—থাক অমরেশ দা, আপনাকে আর আমার হয়ে সুপারিশ করতে হবে না। উনি সমিতির কর্ত্তা, ওঁর যখন ধারণা বাজে লোক ঢুকিয়ে কাজ হবে না, তখন আর বলবার কি আছে! আমরা অকর্ম্মা, আমরা রাবিশ, আমরা ঢেঁকি, সেই ভাল।

এবার বিজয়ও হাসিয়া উঠে। অপ্রতিভ ভাবে বলে এই দেখুন আপনি রেগে যাচ্ছেন! মানে আমি বলতে চাচ্ছি—অর্থাৎ আমার বক্তব্য—আমরা যতটা কষ্টসহিষ্ণু আপনারা ততটা—

—নাই বা হ'ল, কিন্তু কাজেরও তো ডিভিশান আছে? তাছাড়া 'আহা উহু' 'বেচারা অবলা' শুনে শুনেই আমাদের হাত পা বুদ্ধিবৃত্তি সব পঙ্গু হয়ে গেছে জানেন?

ইতিমধ্যে আরো জনকয়েকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ এ সময়টা সমিতির ঘরে তালা দেওয়া থাকে, অসময়ে আলো ও মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া উঁকি দিতে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে গুটি গুটি।

সমরও আসিয়াছিল, তবে সাধারণতঃ সে বসিতে চাহে না, দাড়াইয়া কথা কহিতেই ভালবাসে, তাই দরজার বাহিরে পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। মন্দিরার কথাটা শেষ হইতেই ভিতরে ঢুকিয়া কহিল—আশা করি, আপনার কথার উত্তরে দু'একটা কথা বললে আপত্তি করবেন না।

—না।

মন্দিরা একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া থাকে।

—বললেন তো বড় বড় কথা কিন্তু আজকের দিনে—শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ সুবিধে কোনোটাই তো পুরুষের চেয়ে কম পাচ্ছে না মেয়েরা, কিন্তু তার প্রতিদান কই? লম্বা লম্বা ডিগ্রিই নিচ্ছে অথচ দিচ্ছে কি দেশকে? দু'জন মেয়ে একত্র হলেই কি আলোচনা করবে জানেন? লেস আর ফিতে, জরি আর জর্জ্জেট—তা সে রান্নাঘরেই হোক, আর ড্রইংরুমেই হোক। ডক্টরেট পেয়েছেন এমন এক ভদ্রমহিলা—লেকচার দিচ্ছেন—ভারতের ঐতিহ্য আর কৃষ্টির ইতিহাসের—তাঁর পরিধানে অর্গ্যাণ্ডি শাড়ী আর নেটের ব্লাউজ, হাতে ঢুকিয়েছেন ডজন দুই কাঁচের চুড়ি আর মুখের সজ্জায় কাজল এবং লিপষ্টিকের শ্রাদ্ধ! কি বলেন একে?—একটা মেয়েকে যদি সারা পৃথিবী ঘুরিয়ে আনেন, সে শিখে আসবে কি—না কোন্ দেশের মেয়েরা কি ভাবে নিজেদেরকে পুরুষের চোখে অধিকতর এট্রাকটিভ্ করে তুলছে, তারই কৌশল। অস্বীকার করুন, বলুন সত্যি নয়?

অমরেশ বিরক্ত ভাবে বলে—কি বাজে বকছিস সমর, স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা জিনিষ আছে—সে জ্ঞানটা হারিয়েছিস্?

মন্দিরা আরক্ত মুখে বলে—বলেছেন হয়তো ঠিকই, কিন্তু এটা হচ্ছে অনেক যুগের অলসতার ফল। একদিন হয়ত পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে বাস্তবের রূঢ় ক্ষেত্রে খাটতে খাটতে তার নিজের চোখের কাজল আর পুরুষের চোখের মোহ দুইই মুছে যাবে।

প্রবীর ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে বলে—ঈশ্বর করুন, সে একদিনটা আমার জীবদ্দশায় না আসে। উঃ কী ভয়াবহ সেই দিন!...কিন্তু তুমি এক কাজ কর সমর, লড়াইয়ে যাও, সেটাই তোমার উপযুক্ত বিচরণক্ষেত্র। এতখানি স্পিরিট নষ্ট হতে দেওয়া ঠিক নয়।

—লড়াইয়ে যেতাম, যদি এই হতভাগা দেশটাকে উচ্ছেদ করবার সুযোগ পেতাম। এই বিজয়ের 'আর্ত্তত্রাণ'! শুনলে হাসি পায়। সারা দেশটা মরে পচে গন্ধ বেরোচ্ছে—এক মুঠো খুদ নিয়ে ত্রাণ করতে এসেছিস্ কা'কে? দুটো দুটো ভাত খাইয়ে কোনো রকমে দেহ-পিঞ্জরের প্রাণ-পাখীকে আটকে রেখে লাভটা কি? একে কি বাঁচা বলে? ফুটপাতে পড়ে মরছে?—মরুক না! যাদের মরবার সময়ে ফুটপাত ছাড়া আর কিছু জোটেনি, তাদের মরাই উচিত। তোমার বাড়ীর আস্তাকুঁড়ে একটু ঠাঁই দিয়ে, আর তোমার নর্দ্দমায় ফেলে দেওয়া একটু ফ্যান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখবে কেন তুমি? কি রাইট আছে তোমার খোদার ওপর খোদকারী করার? দুটো আতস-বাজীর আগুনে ক'টা হতভাগার লীলা-খেলা শেষ হয়েছে, তা'তেই একেবারে বিগলিত দরদে গদ গদ হয়ে উঠেছ? লজ্জা করে না? সমস্ত দেশটা যে দিন দাউ দাউ করে জ্বলবে, সেই দিনই আমার শান্তি হবে, তার আগে নয়!

সমরের কথার ছটায় মন্দিরা নীরব হইয়া গিয়াছিল, প্রবীর কণ্ঠস্বরে চিন্তার সুর আনিয়া কহিল—সমর, তুমি মাথায় মাখতে কি তেল ব্যবহার কর?

—কেন? যা পাই। হঠাৎ?

—মানে আমি বলছিলাম কাঁচা তিলের তেলটা ভালো' জিনিষ, নিয়মিত ব্যবহার করে দেখতে পারো। ... অর্থাৎ দেশের সেই চরম সুখের দিনটা আসা পর্য্যন্ত মাথাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো? ওটাই আবার কোন দিন না দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তাই ভাবছি।

তোমার মত নাড়ুগোপালের উপযুক্ত কথাই হয়েছে—বলিয়া কপাটটা সশব্দে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া পথে নামিয়া পড়ে সমর।

পরিহাস এবং উপহাসের মধ্যকার সূক্ষ্ম প্রভেদটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি সকলের থাকে না। সমর ইহাদেরই দলে।

অবশ্য বিনা প্রতিবাদে দাদাভাইয়ের এমন অপমান সহিয়া যাওয়া মন্দিরার পক্ষে কষ্টকর। সমরের অভাবে সমরের বন্ধুবর্গকেই সে দেখিয়া লয়।

ক্রমশঃ তর্ক পূর্ব্ব খাতে ফিরিয়া আসে, মন্দিরার সারালো এবং ধারালো যুক্তির মুখে বিজয় মল্লিকের পূর্ব্ব মত ভাসিয়া যায়, ভাবুক বিজয় আবার নূতন আলোক দেখে, নারীই পুরুষের কর্ম্মের প্রেরণা, শক্তির উৎস, শ্রান্তির ঔষধ, এই সহজ কথা'টা এতদিন উপলব্ধি করে নাই কেন, এই ভাবিয়া আপশোষ আর উৎসাহে হাঁফাইয়া উঠে একেবারে।

তর্কে তর্কে যথেষ্ট রাত্রি হইয়া গিয়াছিল—প্রবীর এইবার উঠিয়া পড়িয়া বলে—আচ্ছা আজ তা'হলে ওঠা যাক, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কাছে পিঠে দু'চারটা বোমা পড়ে রাতারাতি, তা'হলে মেয়েদের—"অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি আর কোমল হৃদয়বৃত্তির" আসল নমুনাটা চট করে দেখে ফেলা যায়।

বলা বাহুল্য, মন্দিরারই ভাষার নমুনা এটা।

অমরেশও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িতেছিল, বিজয় তাহাকে টানিয়া বসাইল, আরো অনেক কিছু আলোচনা করিবার আছে তাহার। অগত্যাই বাধ্য হইয়া অমরেশকে বসিয়া পড়িতে হয়।

মন্দিরা দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল—বিজয় বাবু চললাম, কিছু মনে করবেন না।···অমরেশ দা, বৌদিকে আমার প্রণাম দেবেন—আর আপনি নেবেন নমস্কার।

তাহারা দুইজনে পথে নামিতেই পিছন হইতে বিজয় একটা টর্চ্চ ধরিয়া আলো দেখাইল। রাত্রি সত্যই বেশী হইয়া গিয়াছিল।

পথে বাহির হইয়া প্রবীর বলিল—কি গো মহাশয়া, ভক্তি যে একেবারে উথলে উঠলো দেখছি?

—অভক্তি হবারও কোনো কারণ নেই। ছোট থেকেই বড় হয় জিনিষ, হঠাৎ একটা বড় কিছু গজিয়ে ওঠে না।

—ওঠে বৈ কি।

—কি?

—হাতীর ডিম—এবং তোমার মগজ।

ইহার পর মন্দিরাকে কথা বলানো দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এবং যদি বা এতক্ষণ সংকল্প শিথিল ছিল, এখন মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করিয়া বসে—সমিতির উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সে করিবেই।

বলা বাহুল্য, বাড়ীর কথা—পিতার আসিবার কথা, কিছুই মনে ছিল না তাহার।

কিন্তু বাড়ীতে তখন বিপরীত আবহাওয়া বহিতেছিল।

আনন্দময় আসিয়াছেন, যতীন মুখুয্যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্দরে আসিয়াছেন। উপস্থিত আপ্যায়ন, সময়োচিত ভোজন, কুশল প্রশ্নের বিনিময় ইত্যাদি যথারীতি শেষ হইয়াছে—ভদ্রলোক এখন কন্যাকে দেখিবার আশায় উৎসুক, আগ্রহান্বিত, ব্যস্ত, ইত্যাদির অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিরক্তির পর্য্যায়ে আসিয়াছেন।

কিন্তু কন্যার দেখা নাই।

না প্রবীর, না মন্দিরা। কাহারও চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত না দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীও স্থির নাই। বেড়াইতে যাইব বলিয়া বাহির হইয়াছে অথচ গাড়ী পড়িয়া আছে নাকি গ্যারেজে। কি প্রয়োজনে গেল, কোথায় গেল, কখনই বা আসিবে, এই সহজ ও সরল প্রশ্ন তিনটির সদুত্তর দিতে রীতিমত বেগ পাইতে হইতেছে তাঁহাকে। এবং তাহারই ঝাল ঝাড়িতে স্বামীর দরবারে আসিয়া হাজির হন তিনি।

যতীন মুখুয্যে আলবোলার নলটা মুখ হইতে সরাইয়া কহিলেন—বললে তুমি রেগে যাবে ছোটরাণী, কিন্তু শাসন একটু থাকা দরকার বই কি,—শাসন থাকা দরকার। তোমার যে ছেলে মেয়ের ওপর দাব নেই একেবারে!

অভিমান ভরা কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—শাসন তুমি করলেই পারো। আমি ওটা করতেও পারি না, সইতেও পার না। যতীন মুখুয্যে বাঁধানো দাঁতে হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—সে কথা একশোবার, ওই তো চোখে জল এসে গেছে। ছি ছি, আচ্ছা পাগল তো! এসো এসো, কাছে এসো।

—কেন, বেশ আছি।

অদূরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

—না বেশ নেই, এসো। কেন বুড়ো মানুষকে ওঠাবে।

—কে বলেছে উঠতে।

—বলেছে, বলেছে—ওই দুটি ছল ছল চাউনি, ওই রাঙা রাঙা মুখটি।

—হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর বাজে বোকো না বেশী।

—বুড়ো আর হতে দিলে কই ছোটরাণী? তোমায় দেখলেই তো আমার পঁচিশ বছর বয়স কমে যায়।

—দেখো যেন বার বার দেখোনা, কমতে কমতে শেষে কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে—বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া যান জ্যোতির্ম্ময়ী।

—বুড়োকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় চললে?

—খুবোর কাছে, বলিয়া মুচকি হাসিয়া প্রস্থান করেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

নাতজামাই একাকী বসিয়া আছে ভাবিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

কিন্তু আনন্দময় একা ছিলেন না—কাছে ছিলেন অরুণপ্রভা। বিরাট দেহভার বহিয়া তিনি এ অঞ্চলে বড় একটা আসেন না—কোন সূক্ষ্ম মনোবৃত্তির প্রেরণায় মেদবহুল শরীরটাকে এতটা নাড়া চাড়া করিয়াছেন, সেটা প্রণিধান-যোগ্য।

সেইমাত্র পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন—তোমরা ভাই পল্লীগ্রামের মানুষ, তোমাদের কথা বাদই দাও, আমাদের চোখেই এসব বেয়াড়াপনা কটু ঠেকে। হ্যা, শিক্ষা দেখতে চাও তো দেখগে আমার ঘরে। নিজের মুখে বললে গৌরব করা হয়, ছেলে মেয়েদের সায়েস্তা করতে হয় কেমন করে, আমার কাছে শিখে যাওয়া উচিত লোকের।

আনন্দময় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া সায় দিতেছিলেন।

বস্তুতঃ আনন্দময়কে দেখিয়া আনন্দের উদয় হইবার কোনই কারণ নাই, কিন্তু নামের সার্থকতা কয়জনেরই বা থাকে! সমান করিয়া ছাঁটা ছোট ছোট চুলের নীচে পেশীবহুল নীরস মুখ, চোখের দৃষ্টি রুক্ষ, রূঢ়। আঁটসাঁট বেঁটে খাটো গড়ন, শুধু রংটা ধবধবে ফরসা বলিয়াই বিশ্রী বলা চলে না। কিন্তু দেখিলে কাছে ঘেঁষিবার সখ বড় একটা হয় না।

জ্যোতির্ম্ময়ী অবশ্য ইঁহাকে সঙ্গী হিসাবে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আসেন নাই, আসিয়াছিলেন নিতান্তই কর্ত্তব্যের তাগিদে। তবে অরুণপ্রভাকে আসর জমাইয়া রাখিতে দেখিয়া বুঝিলেন, না আসিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন অবশ্য চলিয়া যাওয়া যায় না, কাজেই মৌখিক হাসি টানিয়া কহিলেন - ছোড়দি যে আগে থেকেই নাতজামাইকে দখল করে বসে আছো দেখছি?

—দখল করা-করি আর কি বল? দেখলাম একলা বসে রয়েছে বেচারা—পল্লীগ্রামের লোক, এ-অঞ্চলের ধরণ-ধারণ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে—তাই দুটো কথা কইছিলাম। যাক, যাচ্ছি—নষ্ট করবার মত সময় আমারও বেশী নেই।

টানাসুরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া অরুণপ্রভা চক্ষুলজ্জার মাথায় পদাঘাত করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখের সামনেই উঠিয়া যান বিপুল দেহখানি টানিয়া।

—আশ্চর্য্য হবার বিষয় কি দেখলে বলতো ভাই?

সোৎসুকে প্রশ্ন করেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

—আমরা গরীব মানুষ, আমাদের চোখে আপনাদের বড়মানুষী কায়দা—বুঝলেন কিনা সবই আশ্চর্য্য ঠেকে। এই যে আপনারা আপ-টু-ডেট ছেলে মেয়ে তৈরী করছেন—আমাদের অঞ্চলে—বুঝলেন কিনা—বয়স্থা মেয়েকে সহোদর ভাইয়ের সঙ্গেও এক প্রহর রাত অবধি বাইরে হাওয়া খেতে ছেড়ে দেবার রেওয়াজ নেই।

কথাটার অপমানকর ইঙ্গিতে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেলেও জ্যোতির্ম্ময়ী ঠোঁটের হাসি বজায় রাখিয়া কহিলেন—ওইখানেই তো মজা, কেউ বা কুয়োর ভেতরটাই সারা জগৎ মনে করে সুখে কাল কাটায়, কারোর বা পৃথিবীখানাতেও কুলোয় না, আকাশে উড়তে চায়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর শ্লেষাত্মক বাক্যের প্রচ্ছন্ন মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আনন্দময়ও জ্বলিলেন, এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—তা যা বলেছেন, আমাদের হচ্ছে সেই কূপমণ্ডুকের দশা, উড়তে শিখলে বোধ হয় ভালই হ'ত, শহরে এসে সমাজে কল্কে পেতাম।...আচ্ছা, প্রণাম হই।

জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ শঙ্কিত ভাবে কহিলেন—সে কি, প্রণাম কিসের, চলে যাচ্ছো না কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—না না, তাই কখনো হয় নাকি? বললে যে থাকবে দু'দিন?

—ভেবে দেখলাম না থাকাই যুক্তিসঙ্গত। দাদামশাইকে নমস্কার দেবেন।

বলিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া যান আনন্দ সান্যাল—প্রত্যেকটি পদক্ষেপে অভিযোগের সুর ফুটাইয়া।

ক্রোধে, ক্ষোভে, লজ্জায় সিঁদুরের মত রাঙা হইয়া উঠে জ্যোতির্ম্ময়ীর সাদা মুখ। উদ্যত বজ্রের মত সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত ক্রোধ, স্থির হইয়া থাকে অনুপস্থিত অপরাধী যুগলের উদ্দেশে।

এতখানি অপমানিত তিনি জীবনে হন নাই।

আজ প্রথম অনুভব করিলেন মন্দিরা তাঁহার আপন সন্তান নয়, প্রথম বিবেচনা করিলেন পরের সন্তানকে আপন করায় গৌরব নাই।

অপরাধীরা অবশ্য স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাদের আচরণে বাড়ীতে এত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন ভাবের উদ্দীপনায় প্রবল তর্কে ঝড় তুলিয়া আসিতেছে তাহারা। শেষ মীমাংসার ভার অবশ্য জ্যোতির্ম্ময়ীর।

বরাবর উভয়ের তর্কযুদ্ধে জ্যোতির্ম্ময়ী যুক্তির বালাইহীন কাঁচা তার্কিকটির পক্ষই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির জোরে তাহার কাঁচা মতটিকে দাঁড় করাইয়া দিয়া প্রবীরকে জব্দ করেন।

কাজেই মন্দিরা—"মা, ও মামণি-গো" শব্দে বাড়ী সচকিত করিয়া লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিয়া আসিল।

বলা-বাহুল্য পিতার কথা তাহার মনেও ছিল না।

শুষ্ক গম্ভীর মুখে তেমনি বসিয়াছিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী, মেয়ের ডাকে সাড়া দিলেন না।

সারাবাড়ী ঘুরিয়া অবশেষে এ-ঘরে আসিয়া উভয়েই বিস্মিত ভাবে কহিল—কি হয়েছে মা তোমার?

জ্যোতির্ম্ময়ীর নীরবতায় আরো আশ্চর্য্য হইয়া মন্দিরা পিঠের উপর পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া কহিল—বলনা মা, কি হ'ল?

হাত দুইখানা ছাড়াইয়া দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী কঠিন কণ্ঠে কহিলেন—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—একটা নতুন জায়গায় মা, রাগ করেছ?

ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে উত্তর করে প্রবীর।

—আমার রাগে কি এসে যাচ্ছে তোমাদের?···মন্দিরা, আজ তোমার বাবা এসেছিলেন জানো?

রৌদ্রে ঝলসাইলে ফুটন্ত ফুলের যেমন অবস্থা হয়, তেমনি অবস্থা ঘটে মন্দিরার হাস্যোজ্জ্বল মুখের।

—তোমাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন, আমার অনুরোধ ঠেলে।

মার অনুরোধ ঠেলিয়া যাওয়ার মত অভদ্র কাজ করা যাহার পক্ষে সম্ভব, তাহার জন্য সমীহ বোধ থাকা অনাবশ্যক জ্ঞানে মন্দিরা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলে—কেন, কী এমন দুর্ব্যবহার করেছি আমরা?

—তিনি আসছেন জেনেও নটা পর্য্যন্ত বাইরে থাকা উচিত হয়েছে তোমার?

অনুচিত হইয়াছে স্বীকার করিতে গর্ব্বে আঘাত লাগে, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলভাবে মন্দিরা বলে—তা'তে কি হয়েছে বাপু, আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না? দিব্যি জামাই-আদরে খেয়ে দেয়ে সাটিনের বিছানায় লম্বা হলেই পারতেন—আমার জন্যে এত মাথা-ব্যথা কেন বাবা?

—তার কারণ তুমি তাঁরই মেয়ে, আমার নও। সত্যিকার দাবি আমার নেই বলেই অনায়াসে অপমান করে যেতে বাধল না তাঁর। প্রবীরের কাজের কৈফিয়ৎ চাইবার সাহস কি জগতে কারুর আছে? এখন দেখছি তোমাকে আদর দেওয়া আমার ভুলই হয়েছে।

এ রকম মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুর উক্তিতে মন্দিরার সমস্ত শরীর আলোড়িত করিয়া একটা চাপা কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

—দিও তা'হলে আমাকে বিদেয় করে।—বলিয়া কান্না চাপিতেই বোধ করি দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায় মন্দিরা।

প্রবীর ব্যথিত ভাবে তাহার গমন-পথের পানে চাহিয়া ম্লান স্বরে বলে—তুমি কি পাগল হলে মা? ওটার কি সত্যিই কোন বোধ আছে?

—ওর নেই, তোমার তো ছিল?

—আমি কোন অন্যায় করেছি বলে মনে করি না।—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া বাহির হইয়া যায় প্রবীর। অবহেলার সুর স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কণ্ঠস্বরে।

স্তব্ধ অনড় হইয়া বসিয়া থাকেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

শিশুর মত আদর করা যায়, কিন্তু শিশুর মত শাসন করা চলে না। হাসে, লাফায়, ছুটাছুটি করে, আবদারে খুনসুড়িতে অকারণ আনন্দে পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়, দেখিলে মনে হয় ভার নাই, ওজন নাই। কিন্তু এতটুকু অভিযোগের সুর, একতিল শাসনের দৃষ্টি দেখিলেই মুহূর্ত্তে খসিয়া পড়ে সাবানের ফানুসের মত, রঙচঙে আবরণখানা। ভিতর হইতে উঁকি দেয় কঠিন লৌহপিণ্ড।

বড় সাবধানে ঘর করিতে হয় আধুনিক ছেলে-মেয়েদের লইয়া। যেটুকু মান বাঁচাইয়া চলে সে যেন নিতান্তই করুণা করিয়া—অনায়াসে অপমান করিয়া বসিতে ইহাদের বাধে না। বয়সের মর্য্যাদা, সম্বন্ধের মর্য্যাদা দূরে থাক, স্নেহের সম্মানটুকুও রাখিতে জানে না ইহারা।

সত্য বটে—এমন কিছুই বলে নাই প্রবীর, কিন্তু তাহার গলার স্বর, চোখের চাহনি, প্রতিটি পদক্ষেপ জানাইয়া দিয়া গিয়াছে—প্রয়োজন হইলে অনেক কিছুও বলা অসম্ভব নয়।

সহসা নিজের পানে চাহিয়া দেখেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

এই দীর্ঘ জীবন নির্ব্বিরোধ শান্তিতে কাটিয়া গেল কিসের অনুশাসনে? প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিদ্রোহ মাথা তুলিতে চাহিয়াছে—তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে কোন্ শাস্ত্র-মন্ত্র?

যে নতুন-বৌ বৃদ্ধ যতীন মুখুয্যের শয্যাপার্শ্বে ধরা দিয়েছে, সে কি জ্যোতির্ম্ময়ী?

তবু এ অভিনয়ও নয়, ছদ্মবেশও নয়। রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আছে যে নম্রতা, যে বাধ্যতা, অদৃষ্টকে মানিয়া লইবার যে শিক্ষা, এ শুধু তাই।

আধুনিক ছেলে-মেয়েরা চলে আপন আপন হৃদয়ের অনুশাসন মানিয়া। কিন্তু কোন্‌টা ভাল? জিতিল কাহারা?

দিন কয়েক পরের কথা। অমরেশ আসিয়াছিল মন্দিরা ও প্রবীরের খোঁজে। প্রবীর তাহাদের সমিতিতে দুই তিন দিন গিয়াছিল মাত্র, কিন্তু মন্দিরা মহোৎসাহে দুই বেলা যাতায়াত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই দিন একেবারে চুপচাপ। কাজ কতটা অগ্রসর হইয়াছে সেটা সমিতিই জানে, কিন্তু হৃদয়টা কি বড় বেশী অগ্রসর হইতেছে না? নিত্য দুই বেলা সমিতির অপিসে যাইবার যে প্রেরণা তাহাকে ঠেলা মারিয়া বাহিরে পাঠায়, সেটা যথার্থই পরোপকার-স্পৃহা কিনা সেটা যাচাই করিতেই বোধ হয় মন্দিরা দুই দিন আপনাকে দমন করিয়াছিল। অমরেশ আসিয়া হাসিয়া কহিল—'মেয়েদের অফুরন্ত কর্ম্মপিপাসা' কি মিটে গেল নাকি?

মন্দিরা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল—খুব নিন্দে কচ্ছেন!

—কেন করব না?

—বেশ করুন, যত খুসী, আমি এদিকে অসুখে মরে যাচ্ছিলাম, একবার খোঁজও ত নিলেন না ?

—অসুখ করেছিল ?—অনুতপ্ত হইয়া উঠে অমরেশ। কি আশ্চর্য্য, প্রবীর তো বললে না একদিনও ?

অবশ্য এ অনু.যাগের কোন কারণ ছিল না, প্রবীর বাড়ীর কোন কথা কখনো আলোচনা করে না।

তব্ মন্দিরার অসুস্থতার সংবাদ না জানা যেন কেমন অন্যায় অপরাধ বলিয়া মনে হয় অমরেশের। কি সূত্রে কখন যে এই আত্মীয়তা স্থাপন হইল, সেটুকু ভাবিয়া দেখিবার স্থৈর্য্য হয়তো ছিল না। শুধু অমরেশের মনে হয়—মন্দিরার মুখখানি শুকনো, হাসি ম্লান, আগের চাইতে যেন অনেক রোগা হইয়া গিয়াছে সে।

ব্যথিত স্বরে বলে—কষ্ট, কি হয়েছিল বললে না তো ?

অসুখের ছলনাটুকু অবশ্য মন্দিরার বানানো, কিন্তু এই সামান্য মিথ্যাটুকু যদি এমন কাজে লাগানো যায়, ক্ষতি কি ?

—সে জেনে আপনার লাভ ? শুনলে কি দেখতে আসতেন ?

—দেখতে ? হয়তো আসতাম না মন্দিরা, কিন্তু দেখতে আসাই কি সব ? দেখতে না আসার মধ্যে কি কিছুই থাকতে পারে না ?

স্পষ্ট কথার স্থির অকম্পিত দৃষ্টির সামনে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না মন্দিরা। খেলাচ্ছলে কথার জাল বুনিয়া দীর্ঘপথ চোখ বুজিয়া পার হওয়া সহজ, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানোই কঠিন।

তাই সহসা কাঁপিয়া ওঠে সে।

অমরেশ উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া থাকিয়া ম্লানস্বরে বলে—রাগ করলে মন্দিরা ?

—বাঃ, কেন ?

—ভাবছো লোকটার কী স্পর্দ্ধা ? কিন্তু বলবার সাহস যদি দাও তাহলে বলবো—হয়ত দেখতে আসতাম না, কিন্তু আমার সমস্ত দিন রাত ভরে থাকতো সেই মধুর কল্পনায়। অন্য কোন অধিকার না থাক, কল্পনা করার অধিকার তো কেউ বন্ধ করতে পারে না ?

—বারে, অসুখ করলে দেখতে আসবেন—তা'র আবার অধিকার অনধিকার কি ? কি যে মাথামুণ্ডু বকেন আপনি।

অমরেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে মন্দিরার মুখের পানে। সত্যই কি এত ছেলেমানুষ সে, না আপনাকে লুকাইবার এ সকল ছল মাত্র ? অমরেশ কি বড় বেশী বোকামি করিয়া ফেলিয়াছে ?

এত অল্প পরিচয়ে এত কাছাকাছি আসিবার চেষ্টা পাগলামি নয় তো ?

কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ে হৃদয়াবেগ এমন অসামান্য হইয়া উঠিল কেন অমরেশ ? গরীবের এ কি আকাশকুসুম কল্পনা ?

তাড়াতাড়ি আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অমরেশ বলে—আচ্ছা তোমার যখন শরীর ভাল নয়, তখন তো যাওয়া হতেই পারে না। প্রবীর এলে বোলো !—

চলে যাচ্ছেন বুঝি ? বসুন না আর একটু—দাদাভাই আসবেন এখুনি।

আপনাকে আড়াল করিতে একখানা খবরের কাগজ মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে অমরেশ যেন প্রবীরের প্রতীক্ষায়। আর মন্দিরা অকারণ টেবিলের এটা-ওনা নাড়াচাড়া করিতে থাকে। কথাও জোগায় না—চলিয়া যাইতেও পারে না।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গে কুমুদ ঝির ব্যস্ত ডাকে—

—দিদিমণি তুমি হেথা ? সেই থেকে খুঁজতেছি—দাদাবাবু কমনে গেল ?

—দাদাভাই নেই তো, কেনরে কুমুদ ?

—তুমি একবার এস দিকিন যদি ডাক্তারবাবুকে টিলিফোন করতি পারো—বড়বাবু কেমন যেন করতেছে !

—সে কি ?…কেনরে ?…কখন ?

কুমুদের ভয়ার্ত্তভাব মন্দিরার মুখ পাংশু করিয়া তোলে।

—এই খানিক আগে ছোটমার কাছে বুঝি জল চায়লো —জল এনে দেখে ঘাড় গুঁজে ঢুলতেছে—সাড়াও দেয় না, চোখও খোলে না—

রুদ্ধকণ্ঠে অমরেশকে চলিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া মন্দিরা ছুটিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

তখন চাকরেরা ধরাধরি করিয়া চেয়ার হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়াছে যতীন মুখুয্যেকে।

জ্যোতির্ম্ময়ী তখনো অসহায় স্বরে ডাকিতেছেন—শুনছো গো—কি, কি কষ্ট হচ্ছে ? শুনছো ?

কিন্তু যতীন মুখুয্যে আর শুনিলেন না। সাধের ছোটরাণীকে ফেলিয়া সুদীর্ঘকাল পরে বোধকরি পলাতক বড়রাণীর অভিমান ভাঙ্গাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন তখন।

শ্মশান হইতে ফিরিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিতেই কৃষ্ণবালা স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—তুই আবার কি করতে মরতে ওদের মড়ায় কাঁধ দিতে গেলি অমরেশ ? বড় মানুষের সেথোর অভাব কি ?

—অভাব না থাকলে যেতে নেই ?—বলিয়া আরতি-প্রদত্ত শুকনো কাপড়খানা হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে অমরেশ।

—যেতে থাকবে না কেন—ভাব-ভালবাসা থাকলে সবই আছে।…ভাব-ভালবাসার উপর একটি বিশেষ সুর বসাইয়া

কৃষ্ণবালা কথাটার উপসংহার করেন অন্য প্রশ্নে।—মিনসের কি হ'ল হঠাৎ!

—হার্টফেল করলেন।

—তা বুড়োর বয়েস কম হয়নি—এ পক্ষের বৌ নিয়েই বিশ পঁচিশ বছর ঘর করলো। টাকার কুমীর ছিল মিনসে, ওই ছোটগিন্নীর ছেলেটাই বোধ হয় সব গ্রাস করবে? নাকি ও পক্ষের মেয়ের যে নাতনী ছুঁড়িটাকে মানুষ করেছে সেটাকেও দেবে-থোবে কিছু?

—আমি অত কথা জানবো কি করে?—বিরক্তভাবে উত্তর করে অমরেশ।

—কেন, ছুঁড়ির সঙ্গে তো তোর খুব ভাব শুনতে পাই, আমাদের মেনি বলছিল "বুড়োর মরণকালে—'অমরেশদা অমরেশদা' করে ছুঁড়ির কি ঢলাঢলি।" মেনির সই পদ্ম বুঝি গেছল রগড় দেখতে।

—মানুষের মরণকালে যারা রগড় দেখতে যায়, তাদের গলায় দেবার দঁড়ি যদি না জোটে পিসীমা, বোলো আমি নিজের পয়সায় কিনে পাঠিয়ে দেব। আর তোমারও একগাছা—বলিয়া কৃষ্ণবালাকে মূক করিয়া দিয়া সশব্দ পদক্ষেপে উপরে উঠিয়া যায় অমরেশ।

পিসীমার বিদ্রূপকুঞ্চিত কদাকার মুখের পানে চাহিতেও ঘৃণা বোধ হয় তাহার। এই অভদ্র ইতর নির্লজ্জ মানুষটাকে এতকাল ধরিয়া ভয় সমীহ তো' দূরের কথা, সহ্য করিয়া আসিয়াছে কেমন করিয়া এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য লাগে অমরেশের।

কৃষ্ণবালা রুদ্ধ আক্রোশে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করিয়া পাড়ায় বাহির হইয়া যান বিষ উদ্‌গীরণ করিতে।

ইহারই কিছুক্ষণ পরে ও বাড়ী হইতে মেনকা আসিল বেড়াইতে।

—অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই বৌদি?

আরতি তাড়াতাড়ি একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া কহিল—বোসো ঠাকুরঝি।

—না আর বোসব না, আজ আবার তোমার ননদাইয়ের আসবার কথা আছে—(সংবাদটা অবশ্য কাল্পনিক)—দাদা একটা কথা বলতে বলেছিল তাই—তা' অমরেশদা বুঝি বাড়ী নেই?

—হ্যাঁ আছেন তো—এই এলেন শ্মশান থেকে, ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন বোধ হয়—লাল বাড়ীর বড়কর্ত্তা মারা গেলেন কিনা।

হ্যাঁ—পদ্ম তাই বলছিল—ধন্যি বাড়ী বাবা—মানুষটা মরে গেল, একটু টু-শব্দ নেই, বেহ্ম নাকি? বড়-মানুষের শোকও কম, কি বল বৌদি?

আরতি বিব্রত ভাবে বলে—আস্তে আস্তে কেঁদেছেন বোধ হয়। সবাই কি আর—

—ওমা, তোমারও যে বেহ্মজ্ঞানীর মতন কথা হ'ল বৌদি। কথায় বলে মড়াকান্না! কেউ না কাঁদুক, মাগী তো কাঁদবে মাথা-মুড় খুঁড়ে? দোজপক্ষের বৌয়ের অ'দর তো ছিল খুব শুনতে পাই। বুড়ো-হাব্ড়া যাই হোক, স্বামী তো! মাছ খাওয়া, সিঁদুর পরা উঠে গেল তো জন্মের মতন? তবে? বাবা মরতে—আমার মার কাণ্ডখানা মনে করো দিকিনি? সাতটা মানুষে ধরে রাখতে পারে না—হিমসিম খেয়ে গেল এমন অবস্থা! কপাল ফেটে রক্ত-গঙ্গা, বুক চাপড়ে ছড়া-ছড়া কালসিটে, মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিন ভাগ শেষ। কান্নার শব্দে বোধ হয় তিন পাড়ার লোক জড় হ'ল। তা'কেই বলি শোক!

যথার্থ শোকের আসল নমুনার বৃত্তান্তে আরতির অত্যন্ত হাসি পাইতেছিল, তাড়াতাড়ি কহিল—ঠাকুরপোকে কি বলবে বলছিলে?

—বলবো তো বলছিলুম, তুমি আবার বলছো শুয়ে আছে!

—শুয়েছেন, ঘুমোন নি বোধ হয়। যাওনা ওপরে।

—কি জানি ভাই, আমার কেমন পুরুষ মানুষের শোবার ঘরে একলা যেতে গা ছম্‌ছম্ করে।

বলিয়া বিড়ালীর মত লঘু সতর্কপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যায় মেনকা।

আপাদমস্তক একখানা র‍্যাপার ঢাকা দিয়া বিছানায় পড়িয়াছিল অমরেশ, সহসা গায়ের উপর মানুষের স্পর্শ পাইয়া চমকিয়া মুখ খুলিতেই চোখে পড়িল মেনকার পাতা কাটিয়া চুল বাঁধা কুশ্রী মুখখানা।

এই মাত্র না কি মেনকার সখী পদ্মর নির্লজ্জ মন্তব্যটা মনের মধ্যে বিষ ছড়াইতেছিল, তাই মেনকাকে দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বিরক্তিপূর্ণ কটুকণ্ঠ মোলায়েম করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অমরেশ কহিল—কি দরকার?

—দাদা বলতে বলেছিল—

দাদার বক্তব্যটাও অবশ্য মেনকার নিজস্ব কল্পনা, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হয়। গুছাইয়া মিথ্যা বলিবার জন্যও যেটুকু বুদ্ধির আবশ্যক সেইটুকুর অভাব ছিল তাহার মধ্যে যথেষ্ট।

—কি বলেছে দাদা?—রুক্ষস্বরেই প্রশ্ন করে অমরেশ।

মেনকা বোধ করি এরূপ অভ্যর্থনার আশা করে নাই, তাই কোটরগত ক্ষুদ্র চোখ দুইটিতে অভিমানের ছায়া ফুটাইয়া তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া বাষ্পগদগদ কণ্ঠে উত্তর করে—কিচ্ছু বলেনি দাদা, শুধু শুধু বকছো কেন আমায়, বাঃ রে?

এই ন্যাকামী, এই আদিখ্যেতা মেনকার স্বভাবধর্ম, সুযোগ পাইলেই ন্যাকামী করিবে সে। করিবে ওই মাঝারি বয়সের ছেলেদের কাছেই।

ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই গালে দুই চড় বসাইয়া দিবার প্রবল ইচ্ছাকে কষ্টে দমন করিয়া—"দরকার না থাকে তো নীচে যা"—বলিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শোয় অমরেশ।

মেনকা কিন্তু বসিয়াই থাকে।

পাউডার লেপা হাড় উঁচু গালের উপর ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়ে।

অবস্থাটা যন্ত্রণাদায়ক। হাজার হইলেও পায়ের কাছে বসিয়া মেয়ে মানুষ অশ্রুপাত করিতেছে, এটা পুরুষ মানুষের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অস্বস্তিও কম নয়, পিসীমার চোখে ছবিখানা পড়িলে?

অমরেশ উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ নরম সুরে বলে—খামোকা কান্না জুড়ে দিলি যে? কি বলেছে দাদা—আমায় কেটে রক্ত দর্শন করতে?

—তাই বুঝি, বা।

ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা।

অবাক হইয়া যায় অমরেশ, মেনকা কি পাগল? উহার আচরণে সঙ্গতি অসঙ্গতির বালাই নাই কেন?

—আমাকে কেউ দেখতে পারে না অমরেশদা, সবাই আমায় ঘেন্না করে, কপালটাই মন্দ আমার, বড় দুঃখিনী আমি!

—শচীনের চিঠি পাসনি বুঝি এখনো? যা দিকিনি, গুছিয়ে গাছিয়ে পাতা আষ্টেক চিঠি লিখে ফেলগে যা—মন ভালো হয়ে যাবে।—অমরেশ হাসিয়া ফেলে।

—সে আর আমাকে নেবে না অমরেশদা, আমায় ত্যাগ দিয়েছে—আমার কি হবে ভাই?—বলিয়া সহসা দুইহাতে অমরেশের পা চাপিয়া ধরে মেনকা।

—পাগলামি করিসনে মেনি, বাড়ী যা—

বলিয়া নিজেই উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

শুধু মেনকাকে ঘেন্না করা নয়, সমস্ত মেয়ে মানুষ জাতটার উপরই অদ্ভুত বিতৃষ্ণা বোধ আসে তার। বসিয়া থাকিতে পারে না অমরেশ, পায়চারি করিয়া বেড়ায়। সীমাবদ্ধ চারখানা দেওয়ালের ভিতর সে নিজেও যেমন পাক খাইতে থাকে, মনের মধ্যেও তেমনি সহস্র চিন্তার জট ওই একটা বস্তুকেই কেন্দ্র করিয়া পাক খাইয়া মরিতে থাকে।

পিসীমা, ঊষা, মেনকা, ও-বাড়ীর বড়জ্যোঠি, ছোটখুড়ি, আরতি, জ্যোতির্ময়ী, মন্দিরা, সব এক ছাঁচে ঢালা, এক মাল-মসলায় গড়া সব। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার গুণে বাহিরের খোলোসটার প্রভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। সমর ঠিক কথাই বলে।

—ওয়ার্থলেস!

চিন্তার সশব্দ অভিব্যক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এক কথায়—এই একটিমাত্র সংজ্ঞা আছে মেয়ে মানুষের।

সতীত্ব-গর্ব্বে গরবিনী কৃষ্ণবালার সর্ব্বত্র সন্দেহ-দৃষ্টি, বড়জ্যোঠির অহরহ মালা-জপা, ঊষাবতীর পান-দোক্তা গালে ঠেসিয়া ধর্ম্মকথার আলোচনা, বেয়াল্লিশ বছর বয়সে নূতন সন্তানের জননী ছোটখুড়ির জোয়ান ছেলের বিবাহে অনাসক্তি লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ, আরতির সন্ন্যাসী স্বামীর ধ্যানের আয়েসের জন্য পশমের আসন বোনা, আর মেনকার যখন তখন অকারণ ভাবালুতার মধ্যে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই।

ন্যাকামি।

সাদা বাংলায় এ ছাড়া আর কোনো নাম নাই ইহার —এমন খাপ্ খাওয়া লাগ্‌সই নাম।

রূপসী জ্যোতির্ম্ময়ীর বৃদ্ধ স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া থাকায় যে নিঃশব্দ শোকের মূর্ত্তি কিছু পূর্ব্বে তাহাকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দৃশ্য কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ ভারী হাসি পায় অমরেশের। আরো হাসি পায়—মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগে সে নিজেই মন্দিরার মত রাবিশ মেয়ের কাছে গদগদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করিতে বসিয়াছিল ভাবিয়া।

পদার্থ বলিয়া কিছু আছে নাকি মন্দিরার ভিতর?

পদ্মার বলিবার ভঙ্গীটা হয়তো শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিয়া দেখিলে—অমরেশ নিজেই কি মন্দিরার অধৈর্য্য আচরণের ওই একই ব্যাখ্যা করিবে না?

তখনকার বিসদৃশ দৃশ্যটা স্মরণ করিয়া এখন লজ্জায় কান রাঙা হইয়া উঠে।

নীচে তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় আরতির সামনে বিস্ফারিত চক্ষু মেনকা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিতেছিল—হাতখানা চেপে ধরে মুখের দিকে এমন হাঁ করে চেয়ে রইল অমরেশ দা, লজ্জায় যেন মরে গেলাম! বলে কিনা—'পা দুটো একটু টিপে দিবি মেনি'—ভয়ে বুক দুর-দুরিয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাইনা, মাগো!

প্রতিবাদ কল্লে আরতি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সহসা পিসীমা পিছন হইতে কঠোর কণ্ঠে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন —বটে নাকি লা মেনি? বলি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার ঘরের ছেলে গিয়েছে তোর সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে? রূপের ছটায় সোয়ামীতে ভয় পায়—তোকে রুচি যে যমেও করবে না লো! তুই তাই এখনও ভাবন কেটে, টিপ কাজল পরে লোকের কাছে মুখ দেখাস, অন্যে হলে গলায় দড়ি দিত!

কৃষ্ণবালা নিজে অবশ্য কোনো ছেলে-মেয়েকেই বিশ্বাস করেন না, ঘরের হইলেও না, তাই বলিয়া অন্যে বলিলে সহিয়া যাইবেন কিসের খাতিরে ?

মেনকা পাংশু মুখে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

সহসা উপর হইতে নামিয়া আসিল অমরেশ, পিসীমা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া কাহলেন—

—এই শোনগো বাছা তোমার ভাল মানুষ বৌদির গুণ, ফিস্ ফিস্ করে দুটিতে মিলে তোমার কুচ্ছো করা হচ্ছে—আমি যত বজ্জাত, আর সব সগ্গের দেবী! বলি এখন বিশ্বাস হ'ল তো ?

—অসম্ভব নয়, মেয়েমানুষ তো—বলিয়া যুগপৎ সকলের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া চটি জুতাটা পায়ে গলাইয়া বাহির হইয়া যায় অমরেশ।

পাঁচ

সমরের কিছুই ভালো লাগে না।

সমস্ত জগৎটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিলে যেন তাহার শান্তি হয়। ভাঙিয়া গুঁড়া করিতে পারিলে আক্রোশ মেটে।

কিন্তু এত অশান্তি কেন ? এত আক্রোশ কাহার উপর ? কেন তাহার সমস্ত চেতনা উদগ্র হইয়া থাকে অপরকে আঘাত করিতে ?

সৃষ্টিকর্ত্তাকে ধরা-ছোঁয়ার উপায় নাই বলিয়াই কি সৃষ্টিকর্ত্তার উপর দিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে চায় ?

সমর নিজেই জানে না যন্ত্রণার মূল উৎস কোথায়।

মোটের উপর কিছুই ভাল লাগে না তাহার।

ছোট কথা, ছোট কাজ, ছোট সুখ, ছোট আশা, ছোট আবেষ্টন আর ছোট মানুষ গুলার মাঝখানে তার বিরাট প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে।

কেবলমাত্র একটা বিধবা দিদির মুখ চাহিতে সংসারে আটকাইয়া থাকার কোন অর্থ হয় ?

যুদ্ধে যাইবার চেষ্টা করিয়া বেড়ায় সমর।

ভাতের থালাটা সামনে ধরিয়া দিয়া সেই কথাই উত্থাপন করিল উষা।

—হ্যাঁরে সমর, তুই নাকি যুদ্ধে যাবি বলেছিস ?

—বলেইছি তো—তোমায় কে বললে ?

—ওদের গোরা বলছিল—খবরদার ওসব কুমতলব করিসনে বাপু, সর্ব্বনেশে কথা শুনলেও গা কাঁপে।

—তোমার তো আরশোলা দেখলেও গা কাঁপে। যুদ্ধে আমি যাবোই, সব ঠিক করে ফেলেছি।

—ভালই করেছিস, যাবার আগে আমায় একতাল আফিং কিনে দিয়ে যাস, একটি কথাও কইতে আসব না।—বলিয়া ভারী মুখে উঠিয়া যায় উষা।

এই উষাকে লইয়াই এক জ্বালা সমরের।

মা বাপ ভাই ভগ্নীপতি সকলে মিলিয়া একযোগে শত্রুতা সাধিতে এই বিরাট বোঝাটি সমরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, তাই মাথা তুলিবার উপায় খুঁজিয়া পায় না বেচারা।

এত বড় পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে সমরের ঘাড়ের বোঝা হালকা করিয়া দিতে পারে।

অথচ বসিয়া বসিয়া উষার হাতের পরিপাটি করিয়া রাঁধা শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, সুক্ত, চচ্চড়ি খাইয়া শুধু দিনের পর দিন কাটাইয়া দেওয়া দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে তাহার পক্ষে।

অহরহ অশান্তি তাহার।

বিজয় মল্লিক বলে—কাজে নেমে পড় সমর, সব ঠিক হয়ে যাবে। দুঃখীর দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারিলেই নিজে শান্তি পাওয়া যায়।

—কাঁচকলা পাওয়া যায়, তোমার মাথা পাওয়া যায়।

এত ছোট স্কীমে এই সব ছোট ছোট কাজ দেখিলে হাসি পায় সমরের, বলে—এ হতভাগা দেশের দুঃখ ঘোচাবার সাধ্য স্বয়ং ভগবানেরও নেই, বুঝলি ? তুই যা নিয়ে অগাধ আত্ম-প্রসাদ লাভ করছিস—আসলে সে একটি অশ্ব ডিম্ব! লোকের দোরে দোরে দু'মুটো চাল ভিক্ষে করে যদি এই বুভুক্ষিত দেশের পেট ভরতো তা'হলে ভাবনা ছিল না। তাছাড়া শুধু পেট ভরাতে পারলেই বুঝি সব হ'ল ? কোন প্রকারে দুটো অন্ন জোটা—শুধু এই! এতেই সকল দুঃখ মোচন হয়ে যাবে, এই তোর ধারণা ? আর কোন অভাব নেই মানুষের ?

বিজয় মল্লিক মূঢ়ের মত বলিয়া ফেলে—কেন, শুধুই পেটের ভাত কেন, পরণের কাপড়, শীতের কম্বল, মাথা গোঁজবার আস্তানা, সবই জোগাবো আমরা আস্তে আস্তে।

—কেন, শুধু শীতের কম্বল কেন ? 'রাতের কম্বল' চাইনা একটা করে ? একটা বৌ ? সেটাই বা বাকী থাকবে কেন ?

রূঢ় ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে হাসিয়া ওঠে সমর!

—ঠাট্টা করছিস ?—আহত হয় বিজয় মল্লিক।

—ঠাট্টা! মোটেই না—বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ। তোমাদের এই 'আর্ত্তত্রাণ সমিতি' আর 'অনাথবন্ধু ভাণ্ডার' গোছের ব্যাপারগুলো দেখলে হাসি পায় না বিজয়, ঘেন্না করে। তাছাড়া এই যে দয়া, এই যে করুণা, এটা দিনে দিনে মানুষকে কত নীচের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ভাবতে পারো ? নিজের দুর্ভাগ্যের ফল নিজে ভোগ করবে না কেন মানুষ ? কেন আশা করবে অপরের ওপর ? কেন চাইবে দয়া ?

—বাঃ, মানুষ মানুষের কাছে দয়ামায়ার আশা করবে না?

—না, করবে না। বোমা আমাদের ততটা সর্ব্বনাশ করতে পারবে না বিজয়, যতটা করেছে এই দয়া। তারাও ডুবছে, তোমাকেও পাঁকে পুঁতছে!

বিধবা হইবার পর হইতে জ্যোতির্ম্ময়ীর আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বারব্রত পূজাঅর্চনা দানধ্যানের তালিকা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, যেখানে এক বেলা উপবাস দিলে চলে, সেখানে তিন বেলা উপবাসের ব্যবস্থা।

কৃচ্ছ সাধনের এ এক অদ্ভুত মোহ।

ছেলে মেয়েরা রাগ দুঃখ করিলে শুধু মৃদু হাসি হাসিয়া তাহাদের চুপ করাইয়া দেন।

অরুণপ্রভাও অনুযোগ করিতে ছাড়েন না, আজকাল প্রায়ই তিনি এ অঞ্চলে যাতায়াত করেন। ঐদিনও, ভাসুরের শ্রাদ্ধে পাঁচজন আসিবে বলিয়া যে হাতীপাড়ের ফরাসডাঙার শাড়ী জোড়া কিনিয়াছিলেন, তাহারই একখানা পরিয়া হেলিতে দুলিতে এধারে আসিয়া কহিলেন—নতুনদির আজও উপোস নাকি?

জ্যোতির্ম্ময়ী স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—আশ্চর্য্য! বিধবা আর কোন্ মেয়ে মানুষটা না হচ্ছে বল? সিঁদুর তো কেউ লোহা দিয়ে বাঁধিয়ে আসেনি—কিন্তু তোমার যে অনাসৃষ্টি বাড়াবাড়ি!

কিছু বলা আবশ্যক বোধে জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—উপোস দিলে শরীর ভালো থাকে ছোড়দি।

—সে তো চেহারা দেখলেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রবীরের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিৎ।

—প্রবীর কি করবে?

—বারণ করবে। উপযুক্ত ছেলে, তার মতামতটা তো তোমায় মেনে চলতে হবে? না না, এ হাসির কথা নয়, অবশ্য তুমি যদি না মানো সে আলাদা কথা। এই বড়ঠাকুর যখন আবার বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপলেন—কারুর মানা শুনলেন কি? সতীরাণীর কত কান্নাকাটি—কিছুই মানলেন না। মরে গেছেন স্বর্গে গেছন, তাঁর নিন্দে করা ঠিক নয়—তবে ভয়ানক একজেদি ছিলেন তিনি। সেইটি এখন দেখছি তোমায় বর্ত্তেছে। ত' এই যে মাসে পাঁচ সাত শো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, বাজে খরচে বামুন পুরুতের পেটে, সেটা কি ঠিক হচ্ছে?

মমতার আসল উৎস কোথায়, সেইটি অনুমান করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ঈষৎ দৃঢ়স্বরে কহিলেন—এতে আর মানা করবার কথা ওঠে কেন ছোটদি? তিনি তো কম রেখে যান নি, যে দু'পাঁচশো খরচ করলে প্রবীরের ভাগে টান পড়বে?

—তা অবশ্য বলছিনা আমি—তাছাড়া কত রেখে গেছেন সে খবর আমরা কি কোরে জানবো বলো? কারবার তো তিনিই সমস্ত দেখতেন, ইনি তো কোট-কাছারী নিয়েই ব্যস্ত, কারুর সাতে পাঁচে নেই, তবে বলছিলেন সে দিন কথাচ্ছলে, আইনে নাকি বলে—এক ভিটেয় এক অন্নে যতক্ষণ থাকা যায়, যে যা আয় করুক সকলেরই সমান ভাগ থাকে। জয়েণ্ট ফ্যামেলির এই বুঝি আইন। যাক্, তার জন্যে আমি কিছু ইয়ে করি না, আইনে যদি থাকে অবশ্যই তা রদ হবে না। কিন্তু এমন ভাবে কাঁচা পয়সাগুলো এরকম বাজে খেয়ালে নষ্ট হতে দেওয়াও আর উচিত মনে করছি না।

এসব কথার জন্যে জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

সত্যই যে তিনি স্বামী হারাইয়া শূন্য হৃদয়ের হাহাকার লইয়া ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের উদ্দেশে ছুটিতেছিলেন, এমন নয়। বিধবা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম করা উচিত, এই এক সংস্কার।

তাছাড়া অবসর প্রচুর, কাজ অল্প। অর্থের অগাধ স্বাধীনতা এ এক নতুন খেলার আস্বাদ দিয়াছে। হয়তো আরও গোপনে, নিজের অজ্ঞাতসারে লুকানো আছে, চিত্ত-দৈন্যের ক্রটিপূরণ।

স্বামীবিরহে যতটা কাতর হওয়া উচিত, সে কাতরতা মনের মধ্যে খুঁজিয়া পান কই? নূতন করিয়া কোন শূন্যতা আসিল জীবনে?

শুধু অবসর। দিনরাত্রির অনেকখানি সময় যাহার জন্য উৎসর্গ করা ছিল, তাহার অভাবে হঠাৎ অবসর বাড়িয়া গিয়াছে প্রচুর।

অরুণপ্রভা জ্যোতির্ম্ময়ীর অসহায় আত্মবিস্মৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া আর কথা বাড়াইলেন না।

প্রথম নম্বর হোমিওপ্যাথি ডোজ দেওয়াই ভালো।

আহারের সময় জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরকে সোজাসুজিই প্রশ্ন করিলেন—হাঁরে প্রবীর, আমি যে এই আমার বাজে খেয়ালই বলি, পুজোপাঠে কিছু খরচপত্র করি, এটা কি অন্যায় হচ্ছে?

—সে কি, একথা বলছ কেন মা?

আশ্চর্য্য ভাবে প্রশ্ন করে প্রবীর।

—এতে তো তোর কমে যাচ্ছে?—ঈষৎ হাসেন জ্যোতির্ম্ময়ী।

প্রবীর স্থিরদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল মায়ের মুখের পানে তাকাইয়া কহিল—এটি তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে বলতে পারো? ছোটখুড়ি বোধ হয়?

—কেনরে আমার মাথায় কি বুদ্ধি একেবারেই নেই?

—আছে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি নয়। আমার কমে যাওয়ার কথা বলছো—ঠিক যদি বিশ্বাস করো মা, আমি কোন দিনই মনে করতে পারি না যে, এ সব আমার। বাবাকেও যেন মনে হ'ত বড় বেশী দূর, প্রায় পরের মতন, তাই বাবার টাকাতেও কোন অধিকার-বোধ জন্মায় নি।

এ-তথ্যের সন্ধান কিছু কিছু রাখিতেন জ্যোতির্ম্ময়ী। ছেলের এই এড়াইয়া যাওয়া ভাবটা স্বামীকে যে পীড়া দিত সেটা অনেক সময়ই লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি। তাহার জন্য লজ্জাও করিত সময় সময়।

ব্যথিত করুণার সুরে কহিলেন—এটায় কিন্তু 'উনি' বরাবরই মনঃক্ষুণ্ণ হতেন প্রবীর।

—হ্যাঁ, এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সে কথা। যাক গে, কিন্তু তোমায় অভয় দিয়ে র'খছি মা, টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে মামলা করতে বসব না। যত খুশী টাকা তোমার ওই ভট্চায্য মশাইয়ের গোদা পায়ে ঢেলো, কিন্তু দোহাই তোমার এই উপোসটা একটু কম করো। পিতৃহীন হওয়াটা সয়েছে, মাতৃহীন হওয়াটা চট করে বরদাস্ত করতে পারব না।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—সবই সয়ে যায় রে প্রবীর, কিছুই অসহ্য হয় না মানুষের।

প্রবীর গম্ভীর হইয়া গিয়া বলে—তা ঠিক, আর একটা কষ্টকর জিনিষও হয়তো শীগগির সইতে হবে, কাল থেকে তোমায় 'বলবো বলবো' করে বলা হচ্ছে না—বলিয়া বাম হাতে পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি বাহির করিয়া দিল।

পত্র লিখিয়াছেন আনন্দময়। লিখিয়াছেন অবশ্য প্রবীরকেই। তবে হিসাব মত জ্যোতির্ম্ময়ীর উদ্দেশেই লেখা। তিনি সবিনয়ে জানাইয়াছেন—অতঃপর মন্দিরাকে পাঠাইয়া দেওয়া হউক, কারণ এতদিন যাঁহার ভরসায় মেয়েকে চোখের আড়ালে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই যখন নাই, তখন আর—তা'ছাড়া—যাঁহারা মেয়েকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, মেয়ের বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইয়া উঠিবেন এইরূপ ধারণা তাঁহার ছিল, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যখন দেখা যাইতেছে 'ধিঙ্গি' করিয়া তুলিয়া পরের মেয়েটির মাথা খাওয়া ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তখন মানে মানে মেয়ে লইয়া সরিয়া পড়াই ভালো। দাদা মহাশয়ের অবর্ত্তমানে আরো কত বেচাল বা চাল বাড়িতে সুরু করিয়াছে, এই আশঙ্কায় দিশাহারা হইয়া পত্রখানি লিখিয়া ফেলিয়াছেন তিনি।

বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করিতে ভাষা যতদূর প্রাঞ্জল ও যুক্তি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত তাহার ত্রুটি করেন নাই ভদ্রলোক, পরিশেষে জানাইয়াছেন—অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া না হইলে তিনি নিজেই আসিয়া লইয়া যাইবেন। কারণ আইন তাঁহার পক্ষে।

পড়া সাঙ্গ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী নীরবে চিঠিখানা আবার খামের ভিতর ভরিয়া ফিরাইয়া দিতেই প্রবীর কহিল—কই বললে না কিছু?

—কিছু তো বলবার নেই বাবা।

—কি উত্তর দেওয়া যাবে?

—লিখে দিও রেখে আসবার সময় কারো হবে না, তিনি যেদিন ইচ্ছে এসে নিয়ে যেতে পারেন।

—বল কি মা? আইন দেখালেই হ'ল অমনি? প্রতি-পালনের দাবি নেই একটা? নিয়ে যেতে বলছো, মানে?

—ঠিকই বলছি রে, উনি যেতে যেতেই কি ঘরে বাইরে আইনের মার-প্যাচ নিয়ে লড়তে বসবো? তোর কাকার যদি সত্যিই দাবি থাকে তো তিনি যেন চুল চিরে ভাগ করে নেন, মন্দিরাকেও নিয়ে যাক আনন্দ, আমি নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে তীর্থধর্ম্ম করে বেড়াই।

—চমৎকার! আদর্শ ভারত-নারী! বাস্তবিক কতটা আত্মজ্ঞান লাভ হলে এত সহজে মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায়, তাই শুধু ভাবছি মা।

প্রবীরের রাগে হাসিয়া ফেলিলেও পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন—তা হোক, ওছাড়া আর কিছু উত্তর দেওয়া যাবে না প্রবীর, আনন্দময় লোক ভাল নয়, বাধা পেলে রাগের মাথায় নিজের মেয়ের নামে বদনাম দিয়ে বসতেও ওর বাধবে না।

—পাঠিয়ে দিয়ে থাকতে পারবে?

—পারবনা বললে চলবে কেন বাবা? মেয়েকে তো শ্বশুরবাড়ীও পাঠাতে হয়? সে তো নিতান্তই পরের বাড়ী, আর এতো তবু ওর নিজের ঘর।

—ছাই নিজের। ওই লক্ষ্মীছাড়াটা ওর বাপ, মনে করলে আমার হাড় জ্বলে যায় মা। কিন্তু সে যাক, মন্দিরাকে এ কথা বলবে কে? সেটাও বোধ করি আমার ঘাড়ে?

—না বাবা, আমিই বুঝিয়ে বলবো ওকে, তুই চিঠিখানা রেখে যা।

—বেশ, যা খুসী করো, আমিও একদিন অমরেশের মত কেটে পড়বো দেখো।

ছয়

গৃহত্যাগ করিবার কথা অখিলেশের, করিল অমরেশ।

ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলাইয়া সেই যে সে বাহির হইয়া গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না। খোঁজ খবর যা হইল যৎসামান্য, আরতির ব্যাকুল অনুরোধে কালো-গৌরাঙ্গ কিছু-

দিন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিল তা'ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, ব্যস।

হারাইয়া যাইব বলিয়া যে পণ করিয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর বৈ কি? পৃথিবীর এই বিশাল জনারণ্যে অগণ্য ছেঁড়া চটির ভীড়ে তাহার পদচিহ্ন কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে কে বলিবে?

শুধু খোকা মাঝে মাঝে অবুঝ প্রশ্ন করে—কাকা কবে আসবে মা?

ছেলেকে বুকে চাপিয়া আরতি আপনাকেই সান্ত্বনা দেয় হয়তো—আসবে বাবা, কাল পরশু দু'চারদিন পরে আসবে। এতবড় গাড়ী চড়ে, ভালো ভালো পোষাক পরে—এই এতো খেলনা নিয়ে এসে বলবে 'খোকন কই, খোকন?'

এসব সান্ত্বনা পুরাতন, হঠাৎ বীররসের অবতারণা করিয়া খোকন বলে—পিসীকে মেরে ফেলবো।

পিসী অবশ্য কৃষ্ণবালা, সহসা তাঁহার উচ্ছেদ সাধনের স্পৃহা খোকনের মনে জাগিয়া উঠে কেন কে জানে, কিন্তু কাকার গৃহত্যাগের ব্যাপারে পিসীর কোথায় যেন হাত আছে, এই ধারণা অতটুকু ছেলের ভিতরও বদ্ধমূল হইয়া গেল কেমন করিয়া, সেইটুকুই বলা কঠিন।

ভাবা গিয়াছিল ভ্রাতার গৃহত্যাগে অখিলেশের দায়িত্ববোধ কিছুটাও ফিরিয়া আসিবে—কিন্তু দেখা গেল আরো নিস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে সে। আজকাল আহার নিদ্রার ব্যাপারটাও এত সংক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, কদাচিৎ তাহার দর্শন মেলে।

আর লোকের মধ্যে তো পিসীমা, আরতি ও খোকন।

পিসীমা—সে হতভাগার মুখ দেখিতে চান না—খোকনও তথৈবচ, শুধু আরতি।

আরতির কথা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

তবু সংসার চলিয়া যায়। কাহারও জন্য কিছুই আটকায় না। কালো গৌরাঙ্গ স্বেচ্ছায় এই হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া নৌকাখানার ভার লইয়াছে—তরতর করিয়া না চলুক কাদায় ঠেক খাইতে খাইতেও চলে।

প্রবীরও অংশ্য প্রায় আসিয়া খোঁজ খবর লয়, বিপদের সময় আরতি তাহার সহিত পরিচয় করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। তবু সম-অবস্থাপন্ন গৌরাঙ্গের নিকট যত সহজে সাহায্য লওয়া চলে, প্রবীরের কাছে তেমন সহজে চলে না।

কিন্তু সম্প্রতি সময় আসিয়াছে নূতন।

অখিলেশ যাহা উপার্জ্জন করিত—গুরুপ্রণামী বাদেও সংসার-খরচটা আটকাইত না। এইটুকু কর্ত্তব্যবোধের সূক্ষ্মসূত্রে সংসারের সঙ্গে যোগ ছিল তাহার, কিন্তু সম্প্রতি নাকি সাধন-ভজনের বিঘ্নস্বরূপ এই চাকরিটা সে ত্যাগ করিয়াছে।

ইহার পর অপরের কাছে অর্থসাহায্য লওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকিবে না।

আটার ঠোঙাটা নামাইয়া দিয়া গৌরাঙ্গ বলে—অখিলেশদার আপিসে খোঁজ নিয়েছিলাম পিসীমা, খবরটা সত্যিই বটে!

পিসীমা মুখখানা কালো করিয়া বলেন—সে আমি আগেই বুঝেছিলাম—এইবার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরোতে হবে আর কি! একজন বিবাগী হ'লেন, একজন বৈরিগী হ'লেন, এখন মর মাগী তুই!

গৌরাঙ্গ চড়াগলায় বলে—আমার যদি পয়সা থাকতো পিসীমা, তা'হলে অখিলেশদার চাকরি ছাড়ায় থোড়াই কেয়ার করতাম! খোকার আর বৌদির ভার—

—পয়সা থাকলেও—তুমিই বা পরের মাগছেলের ভার নিতে যাবে কেন—আর আমরাই বা নেবো কোন্ সুবাদে বাছা?—বলিয়া গৌরাঙ্গের প্রদীপ্ত উৎসাহে বরফজল ঢালিয়া দিয়া বিরস মুখে উঠিয়া যান কৃষ্ণবালা।

গভীর রাত্রে 'আসন' 'প্রাণায়াম' 'ধ্যান জপ' ইত্যাদির পালা সাঙ্গ করিয়া অখিলেশ কম্বল বিছাইয়া শয়নের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় ও ঘর হইতে আরতি আসিয়া দুয়ার ভেজাইয়া কপাটে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল।

ইদানিং কাজকর্ম্মের সুবিধার ছুতায় কোণের দিকের এই ছোট ঘরখানি অখিলেশ বাছিয়া লইয়াছে। আরতি এ ঘরের ছায়াও মাড়ায় না। স্বামীর অনুপস্থিতির অবসরে ঝাড়ামোছা করিবারও সুবিধা নাই, তালা লাগাইয়া যায় অখিলেশ।

হঠাৎ অসময়ে আরতিকে দেখিয়া অখিলেশ বিস্ময়ের সঙ্গে একটু কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। চাকরি ছাড়ার খবর যে আরতির কানে গিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! কাজটা করিয়া পর্য্যন্ত খুব বেশী স্বস্তিবোধ ছিল না তাহার। কিন্তু গুরুদেব বলিয়াছেন—'দাসত্ব মোচন না হলে আত্মার উন্নতি হবে কোথা থেকে? ভেতর বার দুই-ই স্বাধীন করতে হবে'।

অকারণে কম্বলের কল্পিত ধূলাগুলো হাত দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে অখিলেশ নিজের সপক্ষে নানা যুক্তি গুছাইতে থাকে।

মিনিট কয়েক মৌন থাকিয়া আরতি মৃদুস্বরে কহিল—এখন কি দু'একটা কথা শোনবার সময় হবে?

—বেশী কিছু?—অখিলেশও মৃদুগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

—না, বেশী কিছু বলবার ধৈর্য্য আমার নেই। শুধু জানতে চাইছি—খোকার ভার কি তুমি নিতে চাও?

—খোকার ?

—হ্যাঁ, খোকার।—দৃঢ়স্বরে উত্তর করে আরতি—পিসীমার যা সম্বল আছে একলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু খোকার জন্যে হয়তো বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের সম্বল খোয়াতে হবে। তাই জানতে চাইছি ওর ভার তুমি রাখতে চাও কি না।

—শুধু খোকা ?—আর তুমি ?—মুখ ফস্‌কাইয়া বাহির হইয়া যায় অখিলেশের।

—আমি ? হঠাৎ হাসিয়া ওঠে আরতি, দীর্ঘদিন আগে গভীর রাত্রে স্বামীর আদরে-পরিহাসে যেমন করিয়া হাসিয়া উঠিত—যে অবাধ হাসির জন্য পিসীমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত অখিলেশ।

কতদিন যে হাসি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে আরতির।

হাসি থামাইয়া স্থির গলায় সে বলে—আমার জন্যে নাই বা ভাবলে ? রূপ আর বয়স, মেয়েমানুষের ওজন হাল্কা করে দেয়, সকলের কাছে ভার লাগেনা। এইটুকুই শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম তোমায়।

অখিলেশ অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে। আরতির নির্ব্বাক সহিষ্ণু-মূর্ত্তিই দেখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে—এমন রূঢ় তীক্ষ্ণভাষা সে শিখিল কখন ?

কিন্তু আপনার ওজনও হাল্কা করিতে না দিয়া ধীর স্বরেই বলে অখিলেশ—তুমি কি আমায় অপমান করতে এলে ?

—অপমান ? না না, শুধু তোমার অনুমতি চাইতে এলাম—খোকাকেও কি, আমার সঙ্গে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো ?

—দুর্গতির পথটাই কি শেষ পর্য্যন্ত বেছে নিলে আরতি ?

বহুকাল পরে স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনিয়া চকিতের জন্য কাঁপিয়া ওঠে আরতি, কিন্তু পরক্ষণেই সহজ গলায় উত্তর দেয়—অগত্যা। তবু তো গতি ? তিলে তিলে পাঁকে পুঁতে যাওয়ার চেয়ে হয়তো ভালো। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছো।

—কি ·খোকা ? ওকে ভগবান দেখবেন, তার নেবার কর্ত্তা তুমি আমি নয়—অহঙ্কার ত্যাগ করে এইটুকুই শুধু বিশ্বাস কোরো।

—তাই চেষ্টা করবো।

বলিয়া দুয়ার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ায়—অখিলেশকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়া।

বাহির হইয়া যাইবার জন্য উঠিয়া আসে নাই অখিলেশ, সরিয়া আসিয়াছে আরতিরই কাছে।

কাছাকাছি দাঁড়াইয়া বজ্রগভীর দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকে। অভিমানে অন্ধ হইয়া সত্যই কি নরকের অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায় আরতি ? সত্যই কি কোন অস্বাভাবিক পথ ধরিয়া বসিবে ?

কিন্তু সন্ন্যাসী অখিলেশের তাহাতে কি ক্ষতি ? আরতি তাহার কে ? বাহিরের বন্ধন মাত্র। বরং সেই বন্ধন হইতে যদি সে স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়া যায়, মন্দ কি ? হয়তো এই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

—তুমি তা'হলে সত্যই থাকতে চাও না ?

—না।

—গৃহত্যাগের সঙ্কল্প স্থির করে ফেলেছ ?

—হ্যাঁ।

—হুঁ। সেই নরকের সঙ্গীটি কে জানতে পারি কি ?

—সে কথা বলতে বাধ্য নই আমি।

যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল আরতি, তেমনিই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। শুধু চলিয়া যাইবার সময় আধময়লা শাড়ীখানার পিঠের উপরকার প্রকাণ্ড সেলাইটা যেন নির্লজ্জ ব্যঙ্গ করে গেল অখিলেশকে।

…আরতির জন্য শেষ কবে শাড়ী কিনিয়াছে অখিলেশ ? …অমরেশ নিরুদ্দেশ হইয়াছে কতদিন ?…এ সংসারের নিত্য প্রয়োজনের বাহানা মিটায় কে ?

ভগবান ?

সমরের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। এ, আর, পি,র কাজ পাওয়া সহজ, 'ফ্রন্টে' যাওয়া অত সোজা নয়। কিন্তু বোমা পড়িলে মড়া বহিবার প্রবৃত্তি সমরের নাই, সে চায় রীতিমত যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ প্রাণ, কোটি কোটি টাকা যেখানে মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া যায়, জীবন আর মৃত্যুর যেখানে আলাদা কোন অর্থ নাই, তেমন যায়গায় যাইতে চায় সমর। তাই না-মঞ্জুর পত্রখানা ছিঁড়িয়া চটকাইয়া চিবাইতে চিবাইতে পায়চারি করিয়া বেড়ায়, ঘর হইতে দালানে, দালান হইতে ঘরে।

মেনকা আসিয়া উঁকি মারিল উষার খোঁজে।

—উষা দি কোথায় সমর দা ?

—বাড়ী নেই।

ছ্যাবলা মেনকাকে এর বেশী সম্মান কেহ করে না। কিন্তু মেনকা নিজেই চাপিয়া বসে—কোথায় গেছে ?

—কে জানে—ননদের শ্যালার বাড়ী না কোন্ চুলোয়।

—ননদের শ্যালা ? সে আবার কি জন্তু সমর দা ?—বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে থাকে মেনকা।

—ওই রকম কি একটা বললে। তাসের আড্ডা আজ আর বসবে না, যাও।

—তাই যাই—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া টানা সুরে কয় মেনকা—ফাগুনে হাওয়ায় প্রাণটা কেমন হুহু করছিল, বাড়ী বসে থাকতে ভালো লাগল না, কোথায় বা যাই। তুমি না কি যুদ্ধে যাবে সমর দা ?

—যমের বাড়ী যাবো।

—বাঃ বেশ জায়গা তো?—ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে মেনকা—শুনে লোভ হচ্ছে।

—লোভ হচ্ছে? বটে?—রুক্ষদৃষ্টিতে এই নির্লজ্জ মেয়েটার পানে তাকাইয়া তীক্ষ্ণস্বরে সমর বলে—যমের বাড়ী যাবার ইচ্ছে হচ্ছে? কিন্তু খবরদার, টুঁ শব্দ করলে টুঁটি টিপে ছিঁড়ে দেব।

—বারে, শুধু শুধু বকছো কেন?

—চুপ।

সহসা দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই মেনকা কাঁদিয়া ওঠে—ও সমর দা, তোমার পায়ে পড়ি দোর খুলে দাও, লক্ষ্মীটি, বড্ড ভয় করছে।

—খবরদার, বলেছি না টুঁ শব্দ করলে খুন করবো?

—সমর দা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। দোর খুলে দাও ভাই।

—কেন? যমেরবাড়ী যাবার বড্ড যে সখ হচ্ছিল?

—মাপ করো সমর দা ছেড়ে দাও আমায়।

—ধরলাম কোথায় যে ছেড়ে দেব? তোর মত মেয়েকে শয়তানেও ছোঁয়না বুঝলি? যা বেরো। রাবিশ! মাটির পুতুল! রাস্তার কুকুর!

দরজা খুলিয়া দিতেই কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে মেনকা—আমায় একটু বিষ এনে দাও সমর দা, সব দুঃখের শান্তি হোক! বড় কষ্ট আমার।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মেনকার এই অসহায় পশুর মত আর্ত্ত ক্রন্দন দেখিতে দেখিতে একটু নরম সুরে প্রশ্ন করে সমর—শ্বশুরবাড়ী যাবি মেনকা?

—ওরা আমায় নেবে না সমর দা?

—কেন? কি করেছিস তুই?

—কিছু করিনি—এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—আমি কালো কুচ্ছিত বোকা, তাই।

—আচ্ছা নেয় কি না দেখে নেবো। বিশ্বাস করে যেতে পারবি আমার সঙ্গে?

—তুমি নিয়ে যাবে?

অবাক হইয়া তাকায় মেনকা।

—হ্যাঁ যাবো কিন্তু এই একবস্ত্রে এখুনি। উত্তরপাড়ায় তোর শ্বশুরবাড়ী না? বাড়ী চিনতে পারবি?

—কিন্তু লোকে কি বলবে সমর দা?

—লোকে? লোকে যদি বলে—'আমি তোকে নিয়ে পালিয়েছি', সে অপবাদে স্বর্গে যাবি বুঝলি?···দাঁড়া, হাণ্টারটা নিয়ে আসি, সঙ্গে থাকা ভালো।

—চাবুক নিয়ে—ওকে মারবে না কি?—আর একপালা কাঁদিবার জোগাড় করে মেনকা।

—প্যান প্যান করিসনে মেনি, দরকার হলে মারতে হবে বৈ কি পাগলা কুকুর রাস্তায় ছেড়ে রাখলে—কুকুরের মালিকের ফাইন হয়, সেটা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে রাস্কেলকে।

সাত

খুলনা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম হইতে চিঠি লিখিয়াছে মন্দিরা।—'দাদাভাই, কেমন আছি আর কেমন লাগছে জানতে চেয়েছ? যদি রাগ না করো বলি—খুব খারাপ লাগছে না—এখানের যিনি মা—দেখলে দয়া হয় বেচারাকে। রোগা ছোট্ট এতটুকু মানুষ—আর অগাধ ছেলে মেয়ে। তাদের বায়না আর বাড়ীর কর্ত্তার শাসন এই দুটো জিনিষ দু'দিক থেকে অহরহ পিষছে বেচারাকে। আমার মত একটি কাজের মেয়েকে পেয়ে—(হাসছ যে? কাজের নই ভাবছ? দেখো এসে—সেই এক ডজন শিশুর পালকে কি রকম সায়েস্তা করে রেখেছি—) হাতে চাঁদ পেয়েছেন প্রায়।

সত্যি একদিন এই দুঃখের সংসার থেকে ছিটকে গিয়ে আমি একলা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেছি মনে করে লজ্জা হচ্ছে। তাই অহরহ ভুলতে চেষ্টা করছি, আমি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রধানা ছাত্রী, সকল গুণের আধার, সঙ্গীত-শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া, বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণা, চিত্রবিদ্যার অনুরাগিনী, আর দাদা ভাইয়ের আদরিণী শ্রীমতী মন্দিরা দেবী।

মনে রাখছি, আমি হচ্ছি—মঞ্জু, অঞ্জু, বেলা, বাসু, লাড্ডু, হাসু, সোনার পূজনীয়া দিদি। গ্রাম্য হাইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা, সৎপাত্রের অভাবে এতদিন পাত্রস্থ হতে পারিনি।

এর জন্যে পাড়াসুদ্ধ সকলে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। শোনা যাচ্ছে, 'পল্লী-মঙ্গল সমিতি' থেকে চেষ্টা চলেছে আমার বিয়ে করতে।

সব তো শুনলে? শুধু দোহাই তোমার, একটি অনুরোধ—'হাত খরচের' ছুতো করে অনর্থক কতকগুলো অর্থ নষ্ট করতে পাঠিও না তুমি। দরিদ্রের ঘরে লোভের সৃষ্টি করো না। আমি যা তাই থাকতে দাও আমায়।

অমরেশ বাবু ফিরে এসেছেন কি?

—তোমাদের মন্দিরা।'

মন্দিরা চলিয়া গিয়াছে—বিষয় ভাগ করিয়া লইয়া অতীন মুখুয্যে পৃথক্ হইয়াছেন। উঠানের মাঝখানে 'ব্যাফস্ ওয়ালের' মত প্রকাণ্ড এক পার্টিশন উঠিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রত নিয়ম দানধ্যানের এলোমেলো পথ ছাড়িয়া গুরুমন্ত্র লইয়াছেন, আর পাত্রী খুঁজিতেছেন প্রবীরের জন্য।

বিজয় মল্লিকের আর্ত্তত্রাণ-সমিতি অনেক দিন লোপ পাইয়াছে, ত্রাণকর্ত্তারা সকলেই সরিয়া পড়িয়াছে—'আর্ত্ত' খুঁজিয়া পাওয়াও দুষ্কর।

নিজের বৈঠকখানায় এক নাইট্‌-ইস্কুল খুলিয়াছে বিজয়, পাড়ার বস্তির ছেলেদের 'কাঠি বরফ' ও 'শোন্ পাপড়ির' লোভ দেখাইয়া পড়াইতে হয়।

সেখানেই মাঝে মাঝে ঢুঁ-মারিতে যায় প্রবীর।

এমনি একদিন পড়ানোর মাঝখানে—শ্রীপতি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া খবর দিল—অমরেশ বাবুর বাড়ী থেকে আপনাকে ডাকতে এসেছে দাদাবাবু।

—ডাকতে এসেছে? কে রে?

—সেই বজ্জাত বুড়িটা।

—কেন বল দেখি?

—বলছে—বলছে যে ওদের বাড়ীর সেই ছোট্ট ছেলেটি না কি মারা গেছে।

—মারা গেছে!

সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হইয়া যায় একটি কথার আঘাতে।

বিজয় মল্লিক যখন অনেক খোঁজাখুঁজির পর অখিলেশকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঢুকিল, তখনো পিসীমা পাড়ার মেয়েদের কাছে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উন্মাদ ভঙ্গীতে চীৎকার করিতেছেন—ওরে আমার সোনার যাদু, একফোঁটা ওষুধ তোমার পেটে পড়লনা মানিক। রাক্ষসী ডাকাত মা, সামনে বসে থেকে তোমায় হত্যে হতে দিলে বাবা। হে বাবা নকুলেশ্বর, কি অপরাধ হ'ল বাবা!

ঘরের ভিতর পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে আরতি।

ঘটনা অত্যন্ত মামুলি—গতরাত্রি হইতে ভেদবমি সুরু হইয়াছিল, আজ সন্ধ্যায় সেটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূতনের মধ্যে এই—সকাল বেলা অখিলেশ গুরুর চরণামৃত দিবার উপদেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—আর আসে নাই। আর পিসীমা গিয়াছিলেন কালীঘাটে, মায়ের হাতের 'খাঁড়া ধোওয়া' জল আনিতে। এই মাত্র ফিরিয়াছেন।

সারাদিন আরতি কাহাকেও খবর দেয় নাই, ডাকে নাই —ঘুমন্ত ছেলেকে আগলাইয়া থাকার মত নিঃশব্দে বসিয়া আছে।

পিসীমা আসিয়া দেখেন এই কাণ্ড!

সন্ন্যাসী অখিলেশের 'মায়াবাদ' ঘুচিয়া গেল না কি? সিঁড়িতে উঠিতে পা কাঁপিতেছে কেন? সারা রাস্তা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছে কেন সে?

কিন্তু দুয়ারের নিকট আসিতেই পাথরের পুতুল উন্মাদিনীর মতো বিদ্যুৎ-বেগে উঠিয়া আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

—না, ভেতরে যেতে পাবে না তুমি, কিছুতেই না।

—দেখতে দেবে না খোকাকে?

—না না না! কি দেখতে চাও? নিজের কীর্ত্তি? সাধু তুমি—তোমার হুকুম ভগবান শুনবেন না? শুনেছেন বৈ কি? খোকার ভার নিজেই নিয়েছেন। আর কেন? যাও যাও—

মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায় অখিলেশ।

এইমাত্র গুরু উপদেশ দিতেছিলেন—স্ত্রী পুত্র কেউ কারো নয়রে ব্যাটা, জন্মমৃত্যু সব সমান—

গুরু-উপদেশের ভিত আলগা হইয়া আসিতেছে কেন?

নিজের ঘরের কাজকর্ম্ম ফেলিয়া পরের সংসারের তামাসা দেখিবার সময় কার কতক্ষণ থাকে? রাত্রিও হইতে থাকে। সমর, বিজয়, প্রবীর আর গৌরাঙ্গ চারজনে মৃতদেহটার সদ্‌গতির উদ্দেশে বাহির হইয়া যাইতেই যে যার আপন আপন ঘরে ফিরিলেন।···রাত্রি হইলেও কৃষ্ণবালা বাহির হইলেন গঙ্গাস্নানের চেষ্টায়। তাঁহার গুরু-মন্ত্রের শরীর, সারারাত তো আর অশুচি হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না।

মেনকার মা কৃষ্ণবালাকে পথে বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহার পিছু লইতে লইতে ছোট জাকে ডাকিয়া বলেন— ঝোলটা চাপানো থাকলো ছোট-বৌ দেখো, আমি একবার যাই ঠাকুরঝির সঙ্গে।

ছোট-বৌ শঙ্কিত ভাবে বলে—এই রাত্তিরে?

—তা রাত বলে আর করছি কি। মানুষের বিপদ আপদে কি আর দিনক্ষণ দেখলে চলে?···কি জানি—গঙ্গা জায়গা, শোকে তাপে মানুষটা যদি আত্মঘাতী হয়?···ভালো কথা—গঙ্গা জলের বড়ো ঘটিটা দাওতো বার করে—অমনি জল আসুক একঘটী, এক ফোঁটা জল নেই ঘরে।

আরতির জন্য মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় না। একে তো সদ্যোমৃত সন্তানের জননীর মুখ দেখাই অকল্যাণকর, তাহার উপর আবার যে মেয়েমানুষ একমাত্র সন্তানকে যমের হাতে ধরিয়া দিয়া নির্জ্জলা চক্ষে বসিয়া থাকে, তাহার মুখ দেখা!

সে যে মহাপাতক!

কোটি জন্মের নরকবাস নির্দ্দিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়।

অখিলেশ কোথায় গেল কে জানে! হয়তো বা পরম সান্ত্বনার আশায় আবার ফিরিয়া গিয়াছে সাধের গুরু-আশ্রমে। কৃষ্ণবালা গঙ্গাস্নানের ফেরৎ পূজার ঘরে ঢুকিবার আগে অখিলেশের আশায় সদর দরজাটার খিল বন্ধ করার বদলে

সুধু কপাট ভেজাইয়া দিয়া, দালানের একধারে স্তিমিত-শিখা হারিকেন লণ্ঠনটা বসাইয়া রাখিয়া উঠিয়া যান উপরে।...

সারাদিনে পরিশ্রমও তো কম হয় নাই তাঁহার। কালীঘাট গঙ্গারঘাট, নকুলেশ্বর তলা, ছুটোছুটি কাণ্ড! আহ্নিক পূজার শেষে ঠাকুরের প্রসাদী বাতাসা দুইখানা গালে দিয়া একঘটি জলপানান্তে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলেও সত্যি দোষ দেওয়া যায় না তাঁকে।...

ঝড়ের ঝাপটে ভারী কপাট দুইখানা থাকিয়া থাকিয়া ঝনাৎ ঝনাৎ' শব্দে আছাড় খাইতে থাকে...সে শব্দ যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহার কাণে যায় না, যে জাগিয়া আছে তাহাকে যেন থাকিয়া থাকিয়া আছাড় মারে।...

... ...

অনেক রাত্রে কে একজন উঠানে আসিয়া ধীরে ধীরে—"পিসীমা পিসীমা" বলিয়া ডাকে, কিন্তু কে কোথায়? কিছুক্ষণ ইতস্ততের পর সে বেচারা নিতান্ত নিরুপায়ের ভঙ্গীতে লণ্ঠনের শিখাটা সতেজ করিয়া দিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া যায় উপরে।...

বিপদ মন্দ নয়! সমর আর বিজয় তো দিব্য কাটিয়া পড়িল পথ হইতে, গৌরাঙ্গ শ্মশান-ঘাটে একবার বমি করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী ঢুকিয়াছে, আর এই রাত্রি একটার সময় এই ভয়াবহ প্রেতপুরীতে আসিবার ভার পড়িল প্রবীরের ঘাড়ে।...

কিন্তু প্রবীরই বা আসিল কেন?

না আসিলে কে বা তাহাকে ফাঁসি দিত?

খোকনের গলার সুতার মতো সরু সোনার হারটুকু একরাত্রি প্রবীরের পকেটে পড়িয়া থাকিলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না। তবে? গোপন অন্তরের গভীর তলায় নিজেরই কি একবার আগ্রহ জাগে নাই প্রবীরের? সেই পাষাণ-প্রতিমাকে আর একবার দেখিবার আগ্রহ?...

তেমনি করিয়াই বসিয়া আছে—না আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিয়া মায়া-মমতাহীন রুক্ষ নিষ্ঠুর পৃথিবীর মাটিতেও চেতনা জাগাইয়া তুলিতেছে? কে দেখিবে তাহাকে?...

...অখিলেশ?

...কৃষ্ণবালা?

... ...

উপরের দালানে আসিয়া আর একবার মৃদু ভীরু কণ্ঠে—'পিসীমা' বলিয়া ডাকিতেই আরতি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্ন করিল না—'কে'? সুধু চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিল। যেন চোর ডাকাত হইলেও ক্ষতি নাই তার। যেন ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আর কিছুই নাই পৃথিবীতে।

—পিসীমা কোথায়?—মৃদু কণ্ঠ শোনা যায় প্রবীরের।

—কি জানি। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মানুষের কণ্ঠস্বরে যেন রাত্রির গভীরতা কিছুটা হালকা হইয়া আসে...নিশ্বাস প্রশ্বাস সহজে বয়।...

—খোকার গলার এই হারটা—

কুণ্ঠিত অপরাধীর ভঙ্গীতে হার সমেত হাতটা বাড়াইয়া দিতেই, চিরশান্ত সুস্থির মানুষটা হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বসে।...সোনার হার সমেত হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলে—প্রবীর ঠাকুরপো! আপনি! আপনি আমাকে একটু দয়া করতে পারেন?...আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন?...

সংস্কারের বশেই হাতখানা খসিয়া পড়ে হাতের উপর হইতে, মুহূর্ত্তের সুযোগকে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিবার সাহস সহসা হয় না।...

—কোথায় যেতে চান বলুন?

—যেখানে হোক!...সুধু এ বাড়ীর চৌকাঠের বাইরে।

এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া প্রবীর আর একবার প্রশ্ন করে—কিন্তু একটা কোথায় ঠিক না করে—দেশে বিদেশে যেখানেই আপনার কোনো আত্মীয় থাকুন, পৌঁছে দেবো আমি কথা দিচ্ছি।...

—বিদেশে? জামালপুরে পৌঁছে দিতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই।...এ বাড়ীতে—এ অবস্থায় আপনাকে ফেলে রেখে গিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাও সহজ নয়।...অখিলেশদা ফেরেন নি তো?...

—না।

•

দালানের আলোর উজ্জ্বল শিখা, অথবা মনুষ্য-কণ্ঠের মৃদু রেশ—কারণটা যাই হোক—কৃষ্ণবালার এতক্ষণে ঘুম ভাঙে—'অখিল এলি বাবা?' বলিয়া আলুথালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়াই যেন বিদ্যুতাহতের মতো আড়ষ্ট হইয়া যান। সম্বিৎ পাইয়া যখন ফিরিয়া যান, মনে হয় লজ্জায় ঘৃণায় মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গেলেই যেন বাঁচেন তিনি।

—আ আমার কপাল! তাই বলি—অখিল আমার এই বয়সে—

শ্লেষ, বেদনা, হতাশা, ধিক্কার, অনেক কিছুর সংমিশ্রিত তীক্ষ্ণ এই মন্তব্যটুকু শোনা যায় কৃষ্ণবালার ঘরের ভিতর হইতে।

সেই ঘরের দিকে একমিনিট তাকাইয়া থাকিয়া প্রবীর দৃঢ় স্বরে বলে—আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন বৌদি, কালই নিয়ে যাবো।

আট

ট্রেন জামালপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইতেই প্রবীর বাঙ্কের উপর হইতে আপনার ভারী সুটকেশটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল—বৌদি এসে গেল।

আরতি উঠিয়া বসিয়া এতক্ষণে প্রথম কথা কহিল—তুমি কোথায় যাবে ঠাকুরপো?

—এই তো আপনার সঙ্গেই এলাম।

—আমায় পৌঁছে দিয়েই চলে যাবে?

—তবে? কেন বলুন তো?

—এত বড় সুটকেশ সঙ্গে নিয়েছ দেখে ভাবছি বুঝি আরো অনেক দূরে যাবে।

—এতে আপনার কাজে লাগাবার মত কতকগুলো মাল আছে, সত্যি তো আর একবস্ত্রে ভদ্রলোকের বাড়ী ওঠা চলে না? অবশ্য জামা-টামাগুলো মাপে ঠিক হবে কি না জানি না, আন্দাজি নেওয়া।

আরতি মুহূর্ত্তের জন্য প্রবীরের চোখের উপর চোখ রাখিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—তুমি সব কিনেছ?

আসল প্রশ্নটা এড়াইয়া প্রবীর খোলা কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে তাড়াতাড়ি কহিল—কেন, রাগ করলেন না কি?

—রাগ? না, রাগ করিনি, এখনো আমার জন্যে কেউ ভাবে দেখে আশ্চর্য্য লাগছে।

—ভাববে না কি রকম? কি মুস্কিল। নিন উঠুন, বাড়ীর ঠিকানাটা বলতে পারেন তো? ষ্টেশন থেকে খুব দূর না কি?

—কি জানি, এখানের কোনো ঠিকানাই তো আমি জানি না ঠাকুরপো।

—বলেন কি!

উদ্‌ভ্রান্ত আরতি যখন এই জায়গাটার নাম করিয়াছিল তখন প্রবীরের ধারণা জন্মিয়াছিল খুব সম্ভব আরতির পিত্রালয় এখানে।

কিন্তু এখন এ বলে কি!

—তা'হলে হঠাৎ এখানে আসতে চাইলেন যে?

—কি জানি, ছেলেবেলায় একবার এসেছিলাম—খুব ভালো লেগেছিল জায়গাটা, তাই হয়তো—

ছেলেবেলায় কাদের বাড়ী এসেছিলেন তা'হলে?

—মামীর বাপের বাড়ী এসেছিলাম মামীমার সঙ্গে, কিন্তু তারা তো আর নেই।

ট্রেন প্লাটফরমে আসিয়া পৌঁছাইয়া গেল, কিন্তু এখন আর নামিবার তাড়াহুড়া নাই, তাছাড়া এটা গাড়ীর বিশ্রামস্থল কাজেই খুব ব্যস্ত হইবারই বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রবীর প্রশ্ন করিল—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? কেউ নেই সেখানে?

—না।

অসহায় নারীর ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি বলিষ্ঠ পুরুষচিত্তকেও সহজে আর্দ্র করিয়া তোলে—সকরুণ মমতায় সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া আসে।...

এই বাষ্পভারাবনত দীর্ঘ আঁখিপল্লব, এই কম্পিত অধর, এই করুণ কোমল মুখশ্রী, কোন দিন কি সন্ন্যাসী অখিলেশের চোখে পড়ে নাই? মুহূর্ত্তের জন্যও কি ব্রত ভঙ্গ করিয়া এই ক্ষীণ সুকুমার তনুখানি সবল বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিতে সাধ জাগে নাই?...

পুঁথির অন্তরালে স্নেহমমতা প্রীতিপ্রেম সমস্ত বিসর্জ্জন দিল কেমন করিয়া? যে লোক দয়াময়ের ভজনা করে, মানুষকে অবহেলা কি তাহার গায়ে লাগে না?...

—আচ্ছা জামালপুর ছেড়ে দিন, ভালো করে ভেবে বলুন তো আর কোথায় যেতে চান—অর্থাৎ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করবে এমন কেউ আছে কি না।—কোমল স্বরে প্রশ্ন করে প্রবীর।

ঈষৎ হাসির ছাপ কম্পিত ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া ওঠে আরতির —স্বামীর বাড়ী থেকে পালিয়ে আসা মেয়েকে কেউ আদর করে নেয় না ভাই, নিজের বাপ্ মাও না। তাড়িয়ে দিতে যদি নিতান্ত না পারে—লাঞ্ছনার সঙ্গে নেয়।

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আরতির নত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর স্বরে প্রবীর কহিল—কিন্তু যদি কেউ আদরের সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে নিতে চায়—তা'কে সে অধিকার দিতে পার না কি আরতি? নাম ধরলাম বলে রাগ করো না, অসহায় দেখে অপমান করছি মনে কোরে ভুল বুঝোনা—বড্ড ছোট, ভারী ছেলেমানুষ মনে হয় তোমাকে, তাই নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছা করে।

আরতি কথার উত্তর দিবে কি, এই স্নেহ-সহানুভূতির স্পর্শে তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের রুদ্ধবেদনা দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন বহাইয়া দেয়।

চাহিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেয় প্রবীর। অবস্থাটা বড় কষ্টকর!

সস্নেহে সান্ত্বনা দিবার অধিকার নাই, অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি কাছে টানিয়া মুছাইয়া দিবার উপায় নাই, দিবার কথা ভাবিতেও নাই। নিরুপায় ক্ষোভে শুধু বসিয়া বসিয়া দেখে।

চোখের জলকে অনেকক্ষণ ঝরিতে দিয়া কিছু পরে আরতি নিজেই বলে—না, রাগ কোরব না—কিন্তু সাহস কি তোমার সত্যিই হবে? এতবড় বোঝা বইতে পারবে? একদিনের দয়ামায়া নয়—চিরকাল—চিরদিন?

—বিশ্বাস করে দিয়েই দেখ আরতি। আজ আর স্বীকার করতে লজ্জা-করব না—এ শুধু একদিনের দয়ামায়া নয়—যখন তোমার সঙ্গে না ছিল পরিচয়, না ছিল চোখের দেখা, তখন থেকে—প্রতিনিয়ত তোমার বঞ্চিত জীবনের গ্লানি আমাকে পীড়া দিয়াছে—তোমার ক্ষোভের বেদনা অহরহ করেছে আকর্ষণ। অমরেশ যখন পালালো, তখন—কি ইচ্ছে হয়েছিল জানো আরতি? ইচ্ছে হয়েছিল—সেই নিষ্ঠুর দৈত্যপুরীর কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি তোমাকে। নিজের মনকে সব সময়ে বিশ্বাস করতে পারতাম না বলেই এড়িয়ে যেতাম তোমার সঙ্গ। আজ দৈব—দুর্দৈব যাইবল—দুজনকে সংসারের গণ্ডির বাইরে—এত কাছাকাছি এনে ফেলেছে বলেই হয়তো এতো বড় অসম্ভব কথা শোনাবার দুঃসাহস হ'ল। তাই বলছি—তোমার সব ভার বইবার সৌভাগ্য আমাকে দাও আরতি।

আপনার উত্তপ্ত মুষ্টির ভিতর আরতির হিমশীতল কম্পিত আঙুল কয়টি চাপিয়া ধরে প্রবীর।

আরতি হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করে না, তেমনি ভাবে বসিয়া সরল দুই চোখ প্রবীরের মুখপানে তুলিয়া ধরে। বাষ্পলেশহীন স্থিরকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলে—আমারও আজ স্বীকার করতে বাধা নেই—স্বামী যখন নিজের দায় এড়িয়ে——গেলেন মুক্তির পথ খুঁজতে, ধিক্কারে অভিমানে নিজেকে নষ্ট করবার এক দুর্দান্ত সখ জেগেছিল। ভেবেছিলাম—ওকে দেখিয়ে দেব অবহেলায় ফেলে রাখলেই সব জিনিষ পড়ে থাকে না। মানুষ তো জড় নয়—তার রক্তমাংসের শরীরের সমস্ত প্রয়োজনকে চোখ বুঁজে অস্বীকার করে গেলেও অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অহঙ্কার করে বলেছিলাম—ভার যদি কাউকে দিতেই হয় তার দাম দেব—হাত পেতে ভিক্ষার ভাত খাবো না। কিন্তু খোকা সে সাহস নষ্ট করে দিয়ে গেছে। দেখলাম—প্রতিশোধ নেওয়াও সহজ নয়। তারও বড় বেশী দাম দিতে হয়।

—কিন্তু এতো প্রতিশোধ নেওয়া নয় আরতি? এ শুধু বাঁচবার চেষ্টা। একজনের খেয়ালের খেলায় আর একজনের জীবন মিথ্যে হয়ে যাবে, এর কোনো অর্থ হয়? এত বড় জীবনটা তোমার কাটবে কি নিয়ে বলতে পারো?

—বিধবারও তো দিন কাটে প্রবীর?

—না, কাটে না। সংসার সমাজের শাসন, আর লোকনিন্দার বেড়া-আগুনের ভয় তাকে কাটাতে বাধ্য করে। নইলে কাটত না।

—আচ্ছা আমার কথা থাক, তোমারও তো সমাজ, সংসার, লোকনিন্দের ভয়, সবই আছে?

—আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। তা'ছাড়া ভুলে যাচ্ছো কেন, আরো একটা জিনিষ আমার ভগবানের দয়ায় প্রচুর আছে, যা সকলের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারে। আমার কথা ভেবো না, শুধু তোমার নিজের কথা বল—জীবনটাকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা কি অসম্ভব চেষ্টা?

—বুঝতে পারছি না প্রবীর—আগে ভাবতাম—পথে বেরোতে পারলেই বুঝি অনেক পথ খোলা পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে পথ? কোন্ পথে সত্যিকার মঙ্গল? নিজের ভুলে অপরকে দুর্গতির পথে টেনে নিয়ে যাবো কোন্ ধর্মে? একটা সামান্য মেয়েমানুষের দায় যে এত বড়, আগে সে খেয়াল ছিল না। তার চাইতে হয়তো—ফিরে যাওয়াই ভালো।

—কোথায় ফিরবে?

—যেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

—কখনো না, কিছুতেই না—তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিয়া ওঠে প্রবীর—ভিখিরীর দরজায় হাত পাতার অপমান থেকে তোমায় বাঁচাবো আমি।

নয়

আনন্দময় যে চাল চালিতে জিদ করিয়া মন্দিরাকে আনিলেন, সে চাল ব্যর্থ হইল মন্দিরার জিদে। জ্যোতির্ময়ী-প্রদত্ত অর্থের কানাকড়িও আনন্দময়ের ক্যাশবাক্সে উঠিল না।

মন্দিরার কাছে আনন্দময়কে হার মানিতে হইল। বার বার—'লইতে অনিচ্ছুক' ছাপ মারিয়া প্রেরিত অর্থ, আবার দাতার ভাঁড়ারেই ফিরিয়া গেল।

দরিদ্রের ঘরে দরিদ্রেরই মত থাকিতে চায় মন্দিরা।

এখন এই ধাড়ি আইবুড় মেয়ে লইয়া আনন্দময় করেন কি? মুস্কিল এই—ধমক দিয়া 'ঠাণ্ডা' করিয়া দিবার সাহসও হয় না। নিজের দুর্বলতা দেখিয়া নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে আনন্দময়ের।

কিন্তু মেয়ের কাছে হারিয়া যাওয়ার লজ্জা মেয়েকে জব্দ করিবার ফিকির খুঁজিয়া বেড়ায়। এবং ইহারই সহজ উপায় হইতেছে—কন্যাকে অনভিপ্রেত এবং অরুচিকর বিবাহে বাধ্য করা।

মন্দিরাও ভাবিয়া আশ্চর্য্য হয়, সকলের সঙ্গেই বেশ মানাইয়া চলা যায়—মাকে ভাইবোনগুলিকে তো বেশ ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে, কিন্তু শুধু পিতার উপরই বা এমন বিজাতীয় বিদ্বেষ আসে কেন তাহার?

পিতা ও কন্যার অন্তরে অন্তরে এই এক রেষারেষির লড়াই চলে।

আজও সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াই আনন্দময় বামুকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—নবাব কন্যাটি গেলেন কোথা?

'নবাব কন্যাটি'র অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হইলেও—শুনিয়া শুনিয়া বাসুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তাই সহজেই প্রশ্নের উত্তর দিল—দিদি সেই রাত্তির থেকে পড়া করছে। জানো বাবা, দিদি নাকি শান্তিকাকার চাইতে অনেক অনেক বেশী পড়া জানে?

—তবে আর কি, চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল আমার, একে কেরোসিনের এই দুরবস্থা, আর রাত্তির থেকে পড়া হচ্ছে? যার যা খুশী তাই করছে যে দেখি।

বলাবাহুল্য মন্দিরার কর্ণগোচর করাইবার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি উচ্চারিত হইল। এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবার পক্ষে কোন বাধাও ছিল না। কিন্তু গায়ে পড়িয়া কথা বাড়াইবার বা মতামত ব্যক্ত করিবার মেয়ে মন্দিরা নয়।

যদিও সকালের আলো ফুটিয়াছিল—তথাপি কেরোসিনের শিখাটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মন্দিরা "নবাব কন্যা" কথাটা লক্ষ্য করিয়া হাসুকে উদ্দেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলে—বাবার নবাব হবার সখটি ষোলো আনা, না রে হাসু? লোকে না মানুক নিজেই বলে বলে যতটা পারেন, কি বলিস?

মেয়েকে সমীহ অমিয়াও করে না তা নয়, তবু মেয়ে আসায় ছোট ছেলে-মেয়েগুলির দায় হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইয়া সে যেন বাঁচিয়াছে। স্বামীর আচার আচরণ অবশ্য কখনোই সে ভাল চক্ষে দেখে না। জ্যোতির্ময়ীর কাছ হইতে অর্থ সাহায্য লইতে আপত্তি করার পর হইতে মেয়ের উপর আনন্দময়ের ব্যবহারটাও তারও নিতান্তই দৃষ্টিকটু ঠেকে, তবু সাহস করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে না। কিন্তু—আজ যখন আনন্দময় বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া গায়ের ফতুয়াটা খুলিতে খুলিতেই উচ্চ চীৎকারে কহিলেন—সম্বন্ধটা পাকা করে এলাম বুঝলে?—তখন প্রতিবাদ না করা অসম্ভব হইল বেচারার পক্ষে।

ঈষৎ জোর গলায় কহিল—পাকা করে এলে মানে? সে আবার কি?

—অবাক হয়ে গেলে যে? মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

—দিতে হবে বলে যা তা দিতে হবে না তো? তাছাড়া ওর বিয়ের জন্যে আমাদের এত ভাবনা কেন? নতুন দিদিমা—

আনন্দময় বিকৃত মুখে কহিলেন—হ্যাঁ, তোমার নতুন দিদিমা তো সবই করলেন। কুড়ি বছরের মেয়ে পুষে ধাড়ি করলেন, অথচ বিয়ের নাম গন্ধ নেই। ওসব বড়মানুষের ধার আমি ধারি না। আমার মেয়ে, আমি যেখানে খুশী যার সঙ্গে খুশী বিয়ে দেব, ব্যস। এর ওপর আর কথা নেই।

জজসাহেবের শেষ রায় দিবার ভঙ্গীতে শেষের কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া কর্ত্তাজনোচিত ভাবে তেলের বাটি লইয়া জল-চৌকীতে বসিলেন আনন্দময়।

অমিয়া বোধ করি মরিয়া হইয়া আরো কিছু বলিতে যাইতেছিল, মন্দিরা পিছন হইতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—ও মা, বেশী পাকা কথা কইতে বারণ করো বাপু, পাড়াগেঁয়ে মানুষ—আইনকানুন অতশত জানেন না তো, জোর করে বিয়ে দেবার অনেক ফ্যাসাদ আছে কি না—শেষটায় মুস্কিলে না পড়েন।

—বাঃ, চমৎকার—বাপকে আইন দেখানো। কলকাতার শিক্ষা বটে!—বলিয়া আনন্দময় ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মাতা কন্যা উভয়কে বিদ্ধ করিয়া হন হন করিয়া পাতকুয়ার ধারে প্রস্থান করিলেন।

নাঃ, মেয়েকে তিনি দেখিয়া লইবেন।

জবরদস্তি করিয়া বিবাহ দেওয়ার কল্পনাটা এমনই হাস্যকর ছেলেমানুষি লাগে যে, সেটা লইয়া বেশী মাথা ঘামায় না মন্দিরা।

মাথা ঘামায় অমরেশের চিন্তায়।...

কেন গেল! কোথায় গেল! এসব ভাবনা পুরনো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু জলজ্যান্ত একটা মানুষ সত্য সত্যই হারাইয়া গেল, এই চিন্তাটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। এটাই নূতন হইয়া উঠে।

প্রথম প্রথম ভাবিতে চেষ্টা করিত, দূর হোক ছাই—যাহারা তাহার পরমাত্মীয় তাহারাই যখন মনকে মানাইয়া লইতে পারিল—মন্দিরার এত মাথাব্যথা কিসের?

চেষ্টা করিলে কি হয়, মাথা আপন হিসাবেই ব্যথাগ্রস্ত থাকিয়া যায়। অবশেষে মন্দিরা চিন্তার অন্তধারা বাছিয়া লয়।...আচ্ছা—একথাও তো ভাবিবার মত, অহরহ অমরেশের চিন্তাই বা তাহার মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে কেন? এত পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত, স্বল্প-পরিচিত লোকের মাঝখানে অমরেশই বা এমন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল কোন্ অধিকারে? ইহাকেই প্রেম বলে না তো? কিন্তু—যখন অমরেশ হারাইয়া গিয়াছিল তখন তো এতো অধৈর্য্যভাব আসে নাই। যতীন মুখুয্যের সদ্য মৃত্যুর আঘাতটা বোধ হয় তখন অন্য অনুভূতির তীব্রতা কমাইয়া আনিয়াছিল।... তারপরই তো এখানে চলিয়া আসা।...কি জানি বিরহের আগুনের আলোতেই বুঝি মনের ভিতরটা এ'তো স্পষ্ট ধরা পড়িয়াছে।

প্রেমের লক্ষণ বিচার করিয়া করিয়া অবশেষে সন্দেহের আর কিছু থাকে না, এবং বেহায়া মেয়েটা একদিন জোর কলমে লিখিয়া বসে—দাদাভাই গো, তোমার নিরুদ্দেশ বন্ধুর উদ্দেশ করছনা কেন? দেখছো না তার জন্যে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি?

দুইবার রিডাইরেক্ট হইয়া সে চিঠি এলাহাবাদে প্রবীরের হাতে পৌঁছিয়া উত্তর আসিতে দেরী হইল অনেক। উৎসাহী

আনন্দময় ইতিমধ্যে কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা রীতিমত ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু প্রবীরই বা করিবে কি, সে তো আর অমরেশকে ধরিয়া আনিয়া মন্দিরার আঁচলে বাঁধিয়া দিবে না? আপনার জীবনের নূতন সমস্যা লইয়াই তখন সে ব্যস্ত।

শুধু লেখার ভিতর ব্যক্ত করিয়াছে তার বলিষ্ঠ হৃদয়ের স্পষ্ট মতামত। লিখিয়াছে—"মন্দিরা, আমার বন্ধুর ভাবনায় তুই মরতে বসেছিস, এটা সত্যি আমায় অবাক করে দিয়েছে। এটা আবিষ্কার করলি কখন? 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' প্রবাদটা মিলে যাচ্ছে যে? কিন্তু মরতে যদি সত্যি বসে থাকিস—বসে বসে মৃত্যুর দিন গুনিস নি। শুধু মনে রাখিস বাঁচতে হলে বাঁচবার চেষ্টা চাই। তোর জীবনের জটিল সমস্যার জট তোকেই খুলতে হবে। এটুকু চেষ্টার জন্যে যে ধৈর্য যে বল থাকা আবশ্যক তা যদি নাই থাকে—মরা আর বাঁচার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। হয়তো কাছে থাকলে তোর কিছু সাহায্য করতে পারতাম—কিন্তু আমার জীবনের সমস্যা আরো অনেক বেশী জটিল হয়ে উঠেছে। তার সত্যিকার সমাধান যে দিন সহজ হয়ে দেখা দিবে, সেই দিন ফিরব তোদের কাছে, তার আগে নয়।"

কলিকাতায় থাকিলে হয়তো অমরেশের সন্ধান করা অসম্ভব হইত না, কিন্তু অমরেশের উপর অভিমানে, জ্যোতির্ময়ীর উপর অভিমানে, যেন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরেই অভিমান করিয়া মন্দিরা এই অপরিচিত পিতৃগৃহে আপনাকে নির্বাসন দিয়াছে।

কিন্তু জীবনটা কি মিথ্যা অভিমানে নষ্ট করিয়া ফেলার মত তুচ্ছ বস্তু? অমরেশকে যদি সত্যই তাহার প্রয়োজন থাকে—সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কি বাহির করিতে হইবে না তাহাকে?

আপনার নিভৃত হৃদয়ের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া প্রয়োজনের ওজন অনুমান করিবার চেষ্টা করে মন্দিরা।

বিনিদ্র রাত্রির অনেকটা অংশ কাটিয়া যায় অসম্ভব কত কিছুর কল্পনায়।...

কখনো সে-কালের রাজকন্যার মত 'ময়ূরপঙ্খী নায়ে' চড়িয়া বাহির হয় নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে—বাহির হয় পুরুষের সঙ্গে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তেপান্তরের মাঠে—কখনো এ-কালের লর্ড-দুহিতার মত নিজস্ব 'প্লেনে' চড়িয়া আকাশের গায়ে—অথবা টু'-সিটার খানায় চাপিয়া অজানা শহরের পীচঢালা রাস্তায়।

হয়তো কাছে থাকিলে প্রয়োজন এত তীব্র হইয়া দেখা দিত না। দূরে সরিয়া গিয়াছে বলিয়াই তার জায়গায় শূন্যতাটা এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হয়তো অমরেশ উপলক্ষ্য মাত্র, সদ্যোজাগ্রত যৌবনের দুর্নিবার আবেগ আপনাকে প্রকাশ করিবার একটা পথ চায়।

নিজেকে বাঁচাইবার কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, মন্দিরাই জানে। ইতিমধ্যে আনন্দময় নিশ্চেষ্ট নাই। স্কুল হইতে ফিরিয়া অমিয়ার উদ্দেশে কহিলেন—মেয়েটাকে চট্ করে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দাও দিকিন, ঝিঁকরগাছার তারা আজকে দেখতে আসছে।

অমিয়া কহিল, কেন? আসছে রবিবারে আসবার কথা ছিল না?

—ছিল তো হয়েছে কি? আজই আসবে তারা, তাদের খুসী। তোমার ওই ধিঙ্গি মেয়ের কলকত্তাই চালের সাজ-গোজ খুলে ভদ্রলোকের মেয়ের মত যা হয় একটা পরিয়ে দাও।

অমিয়া বিপন্নভাবে কহিল—আমি আবার ওর কি করে দেব? তাছাড়া ওর চেহারায় কিছু না সাজলেও চলবে।

—ওই গুমোরেই গেলে, লজ্জায় যে আমার মাথা ছাড়িয়েছে, সে হুঁস আছে? আর রং তো হাসু বাগ্দির চেয়ে ময়লা বই ফরসা নয়।

বাহিরের লোকের কাছে অবশ্য অন্য কথা বলেন আনন্দময়।

পাত্রী দেখিতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের কাছে সালঙ্কারে মেয়ের গুণবর্ণনা করিয়া অবশেষে বলেন—চেহারার কথা আর নিজে কি বলবো, আপনারা দেখে নেবেন—কইরে লাটু, তোর বড় দিদিকে নিয়ে আয় না।

লাটু আসিয়া সভয়ে নিবেদন করিল—বড়দি বললেন—মাথা ধরেছে, আসতে পারবেন না।

—মাথা ধরেছে? অ্যাঁ বলিস কি! আঃ সারা সকালটা হেঁসেলঘরে থাকবে, মানা শুনবে না তো! অত করে বললাম আজকের দিনটা অন্ততঃ বন্ধ দে, তা মা লক্ষ্মীর মন উঠলো না। নিজে হাতে করে সকলকে না খাওয়ালে তার আর—যাই দেখে আসি: পারবে না বললে কি চলে? ভদ্রলোকেরা এসেছেন—বলিয়া আনন্দময় ব্যস্তভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া যান।

অমিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল, আজ যে কি মহাপ্রলয় ঘটিবে, তাই ভাবিয়া তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। মন্দিরাকে অবশ্য সাধ্যমত বুঝাইয়াছে সে, কিন্তু মন্দিরাও আনন্দময়েরই কন্যা।

তবে মাকে সে জ্বালাতন করে নাই, শুধু হাসিয়াছে আর বলিয়াছে—আচ্ছা মা, তুমি অত ভয় পাও কেন, বলতো? বড্ড বাপু বোকা মেয়ে তুমি। যত ভয় করবে ততই ঠকে যাবে। চোখ রাঙাতে শেখ, দেখবে আনন্দ সান্যাল 'স্পিকটি নট্'।

হতাশ অমিয়া অবশেষে বাহিরে আসিয়া বসিয়া আছে।

আনন্দময় ভিতরে ঢুকিয়াই চাপা গর্জনে 'মা লক্ষ্মী'র

ন্দেশে কহিলেন—সে হারামজাদী লক্ষীছাড়ি গেল কোথায় ?

অমিয়া চোখের ইঙ্গিতে একখানা ঘর দেখাইয়া দিল।

দুই কোমরে দুই হাত রাখিয়া আনন্দময় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দুয়ারের চৌকাঠে দাঁড়াইয়া কহিলেন—তুমি কি ভেবেছ বলতে পারো ?

মন্দিরা নিবিষ্টচিত্তে নাটুর অঙ্কর খাতা পরিদর্শন করিতেছিল, পিতার কথায় চম্‌কানোর ভঙ্গীতে পিছনের দিকে তাকাইয়া কহিল—ভাবছি, নাটু এবার প্রমোশন পেলে হয়—আঁকে যে রকম কাঁচা !

—রেখে দাও তোমার শুষ্টির মাথা। বলি, বাইরে যেতে পারবে না বলেছ কেন শুনি ?

ছদ্ম-সরলতা ত্যাগ করিয়া মন্দিরা ঈষৎ গম্ভীর ভাবে কহিল—তা'র কারণ, এখানে যখন বিয়ে হতেই পারে না, তখন শুধু শুধু কেন কষ্ট করে বাইরের লোকের সামনে বেরবো ?

—যথেষ্ট জ্যাঠামী হয়েছে—হতে পারে না মানে কি ? আলবাৎ হবে।

—না, অসম্ভব।—বলিয়া মন্দিরা আবার খাতার পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে।

—আমি এইখানেই বিয়ে দেব তোমার। শীগগির চলো, যদি ভালো চাও।

—আচ্ছা যাচ্ছি।—বলিয়া খাতা মুড়িয়া দাঁড়ায় মন্দিরা।

সাজগোজের কথা বলিবার ভরসা বা স্পৃহা হয় না আনন্দময়ের। তবে সর্ব্বদাই এতো ভালো ভালো শাড়ী ব্লাউজ পরিয়া থাকে মন্দিরা যে, এ অঞ্চলে তাহাকে নিমন্ত্রণ-বাড়ীর সাজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সব চাইতে কম ভালো শাড়ীগুলাই তাহার এইরূপ।

তবু বিশেষ করিয়া আজ সে চুল বাঁধিয়াছে চাঁচিয়া ছুলিয়া কপাল বাহির করিয়া।

বিষদৃষ্টিতে একবার মেয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দময় তাহাকে সেই অবস্থাতেই একরকম টানিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া যান।

মেয়ের এরূপ রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অবশ্য পাত্রপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না, তবু ভদ্রতা বজায় রাখিয়া তাঁহারা 'মা লক্ষ্মী এসো মা' বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলেন।

পাত্র দ্বিতীয়পক্ষ, দলের মধ্যে তিনিও ছিলেন, কিন্তু আত্মগোপন করিয়া। কারণ, বিবাহ করার উদ্দেশ্য তাঁহার কয়েকটি মাতৃহারা শিশুসন্তানের লালনপালনের জন্য। মেয়েটি তদুপযুক্ত হইবে কি না, সেইটি শুধু দেখিয়া লওয়া, এই আর কি।

অবস্থাপন্ন লোক। জোত-জমা বিস্তর আছে, এবং এ বাজারে যে ধান-জমি ক্ষেত-খামার অপাঙ্‌ক্তেয় নহে, সে জ্ঞানটুকুও বিলক্ষণ আছে। মেয়েটি সুন্দরী বয়স্থা এবং কলিকাতায় শিক্ষিতা শুনিয়াই তিনি এতটা ঝুঁকিয়াছেন।

মন্দিরা শান্তভাবে আসিয়া বসিল, প্রণাম করিল এবং পুরোহিতের প্রশ্নোত্তরে যখন নির্ব্বিবাদে নিজের নামও বলিল—তখন আশ্বস্তচিত্ত আনন্দময় মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—এই ত' ভড়্‌পানি বন্ধ হয়ে গেছে। হুঁ বাবা, যা ধমক দিয়েছি, মেয়েমানুষ চোখ রাঙালেই জব্দ। সাধে কি আর বলে কুকুরের জাত।

সহসা একটি শব্দ বজ্রপতনের মত সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

—আচ্ছা, বিবাহিতা মেয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ আপনারা ভাল বলেন ?

পাত্রের মাতুল সচকিত প্রশ্নে কহিলেন—বিবাহিতা কন্যার বিবাহ ? হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন মা লক্ষ্মী ?

—দেখুন, আপনাদের জানিয়ে রাখা ভালো, বাবা আমাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে চান জোর করে—পাত্র শুনেছি বিপত্নীক, সধবা বিধবা কিছুতেই তাঁর আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আপত্তি আছে যথেষ্ট। এখন আপনার—

আনন্দময় এতটা কথা মন্দিরাকে বলিতে দিলেন বোধ করি বাক্‌শক্তির অভাবে, কিন্তু আর সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ গর্জ্জন করিয়া ওঠেন—থাম্ সর্ব্বনাশী, যা মুখে আসছে তাই বলছিস যে ?

মাতুল হাত ধরিয়া ধীরস্বরে কহিলেন—আপনি থামুন সাণ্ডেল মশাই, ব্যাপারটা পরিষ্কার হোক।···সবটা খুলে বলতো মা লক্ষ্মী।

'মরিয়া' নামক যে অবস্থা আছে একটা, তাহারই চরম সীমায় উঠিয়া মন্দিরা মুখ তুলিয়া পরিষ্কার কণ্ঠে কহে—খুলে বলবার বেশী কিছু নেই—স্বামী নিরুদ্দেশ, বাবা বোধ করি আর খেতে প'রতে দিতে অক্ষম, কাজেই এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

মাতুল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—সাণ্ডেল মশাই !

সাণ্ডেল মশাই মেয়ের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

সেকাল হইলে বোধ করি মন্দিরার ভস্ম হইতে বিলম্ব হইত না, কলির ব্রাহ্মণ 'ঢোঁড়া সাপের' সামিল বলিয়াই অক্ষত দেহটা লইয়া সে বসিয়া রহিল।

পাত্রপক্ষ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

'পাড়াগেঁয়ে' হইলেই যে বোকসোকা হইবে, মন্দিরার এ ধারণাটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভুল···ব্যাপারটা রহস্যময় হইলেও মন্দিরার কথাটা যে তাঁহারা যথার্থই বিশ্বাস করিয়াছেন, এমন মনে করিবার হেতু নাই।

স্বয়ং পাত্র আশাভঙ্গের দারুণ মর্ম্মবেদনায় সঙ্কোচ হাস্যে

কহিলেন—আচ্ছা এক রগড় দেখতে আসা গিয়েছিল, কি বল মামা? আশ্চর্য্যি কাণ্ড!

মন্দিরাও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। টুকটুকে ঠোঁটের উপর চাপিয়া ধরা ঝিকঝিকে দুইটি দাঁতে ঈষৎ হাসির আভাস আনিয়া কহিল—আশ্চর্য্য কাণ্ডের আভাব কি বলুন? আপনার স্ত্রী তো শুনেছি বাইশ বছর ঘর করে মারা গেছেন—নাতি-নাতনীরও অভাব নেই, তবু অনায়াসেই নতুন করে আবার বিয়ে করবার সখ হ'ল—আশ্চর্য্য নয়?

বলিয়া সুস্পষ্ট অবহেলার ভঙ্গীতে দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। ইহাকেই যে পাত্র বলিয়া চিনিল কেমন করিয়া, সেটাও কম আশ্চর্য্যের কথা নয়।

ক্রোধ প্রকাশের প্রধান পথ রসনা। যাঁহারা অপমানিত হইয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহারা যে রসনার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়া যাইবেন না, এটা আশা করা অন্যায়।

'চল হে চল' খুব শিক্ষা হ'ল, 'সাণ্ডেলকে দেখে নেব, আমিও রতন মুখুয্যে', 'মিলিটারি মেয়ে' 'স্বামী কি সাধে নিরুদ্দেশ হয়েছে, মনের ঘেন্নায়—'প্রভৃতি নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আর একবার আনন্দ সান্যালকে শাসাইয়া বাহির হইয়া গেলেন তাঁহারা।

এদিকে আময়া পাঁচখানি রেকাবিতে গোকুলপিঠে, নারিকেল নাড়ু ও জিবেগজা সাজাইয়া বসিয়া আছে।

মন্দিরা বাড়ার মধ্যে ঢুকিয়াই কহিল—যাক বাঁচা গেল, খাবারগুলোয় আর বাজে লোকে ভাগ বসাবেনা—আয় হাসু নাটু লাটু আমরা সদ্ব্যবহার করি জিনিষগুলোর।…বেলা কোথায় গেলি, তুই তো খুব ভালবাসিস গোকুলপিঠে।… আচ্ছা মা, এর নাম গোকুলপিঠে হ'ল কেন বলতো? গোকুলের লোকে বুঝি শুধু এই খেয়েই থাকত?

অমিয়া মেয়ের উচ্ছ্বাসের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া ব্যস্তভাবে বলে—এই দেখ পাগল মেয়ের কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা খাবে যে রে।

—আর তোমার ভদ্রলোক! তাঁরা এতক্ষণে হাটতলা ছাড়িয়ে গেলেন।

আনন্দময় প্রথমটা ভাবিলেন—মেয়ের মাথায় একখানা থানইট ছুঁড়িয়া মারেন, কিয়ৎকাল পরে মনে হইল কাঁচা বেত লইয়া আগা-পাশতলা বিতাইয়া দেন, অবশেষে স্থির করিলেন—দূর করিয়া দেওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা।

সেই সাধু সঙ্কল্পের বশবর্ত্তী হইয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া দেখিলেন, মন্দিরা মহোৎসাহে ভাইবোনেদের সহিত মিষ্টান্নপর্ব্ব সমাধা করিতে সুরু করিয়াছে।

ধারালো আর সারালো যে ভাষাটি মক্স করিয়া আসিতেছিলেন, কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। মন্দিরাকে ছাড়িয়া অমিয়াকে উদ্দেশ করিয়া আনন্দময় কহিলেন—গলায় দড়ি দাওগে, গলায় দড়ি দাওগে—দড়ি যদি না জোটে আঁচলে ফাঁস দিয়ে আড়ায় ঝোলো গে। ছি ছি ধিক্!

হঠাৎ প্রেমময় স্বামীর এইরূপ এলাহি হুকুমে গ্রীষ্মের দিনেও অমিয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে। শঙ্কিতদৃষ্টিতে একবার মেয়ের ও একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া ব্যাপারটা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করে।

মেয়ে অবশ্য নির্ব্বিকার।

আনন্দময় এবার ধাতস্থ হইয়া মেয়েকে লইয়া সুরু করেন —তোমার মতন কুলাঙ্গার মেয়েকে বেশী কিছু বলবার দরকার নেই, শুধু আমার নয়—সাণ্ডেল বাড়ীর—এ বংশের কলঙ্ক তুমি—তুমি আমার মেয়ে—একথা মনে করে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

—আমারও বাবা!—আস্তে আস্তে কথাটা উচ্চারণ করে মন্দিরা।

বোধ করি 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন এই প্রথম।

আনন্দময় যেন রাগ করিবারও দিশা খুঁজিয়া পান না। জিবেগজায় কামড় দিতে দিতে অবলীলাক্রমে এতবড় কঠিন কথাটা বলিয়া বসিল? আনন্দময়ের কন্যা বলিয়া লজ্জায় তাহারও মাথা কাটা যাইতেছে। কতটা গর্জ্জন করিলে এতবড় ধৃষ্টতার উপযুক্ত হয় তাহা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম হইয়াই যেন হঠাৎ গুম্ হইয়া যান আনন্দময়।

কিন্তু দেখিয়া লইবেন তিনি যতীন মুখুয্যের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে। শেষোক্ত সঙ্কল্প সশব্দে স্বগতোক্তি করিয়া চলিয়া যান আনন্দময়। অগত্যা অমিয়াকেও পিছন পিছন যাইতে হয়, ভাবনায় যে পেটের ভাত চাল হইয়া গেল তাহার।

সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া অমিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল—এ সব কী কাণ্ড মন্দিরা?

—কাণ্ড কিছুই না মা। বাবার অমন নাদুসনুদুস জামাইটি হাতছাড়া হয়ে গেল—তাই খেদ হয়েছে। তা' অঞ্জুর সঙ্গে দিলেও মন্দ হ'ত না, কি বলিস বেলা? বয়সেও বেশ মানিয়ে যেত—বলিয়া, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে মন্দিরা।

—'বিয়ে হয়ে গেছে', 'স্বামী নিরুদ্দেশ' এসব কী কথা? বানিয়ে বলবার আর কথা খুঁজে পেলে না?

—সত্যি কথাই মা।

—কী সত্যি?

—ওই যা বললাম। তোমরা আর আমাকে লজ্জাসরম রাখতে দিলে না বাবু, এমনিতেই তো বলো আমি নাকি ভারী বেহায়া।…মা, রাগ করলে? কর, আমার দুর্ভাগ্য! যদি কখনো খুঁজে পাই, যদি তোমার কাছে এনে দেখাতে পারি, সেদিন কিন্তু রাগ করে থেকোনা যেন।

সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া হঠাৎ বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু

গালের উপর গড়াইয়া পড়ে। মন্দিরার মত মেয়েও তাহা হইলে 'সিরিয়াস্' হইতে পারে? কিন্তু হারানো মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এ কি সর্ব্বনাশা পণ করিয়া বসিল মন্দিরা?

রাত্রে আনন্দময় ও অমিয়া কোলের ছেলেটিকে লইয়া পাশের ঘরে শুইতে গেলে মন্দিরা আপনার ছোট সুটকেসটিতে শাড়ী ব্লাউস ভরিয়া গুছাইয়া লইয়া বড় ট্রাঙ্ক ও সুটকেসটা খুলিয়া রাশীকৃত শাড়ী বাহির করিয়া কহিল—বেলা, হাসু, মঞ্জু, কোন্ শাড়ীটা কার পছন্দ হয় বল?

এক মাত্র বেলা ছাড়া শাড়ী পরিবার উপযুক্ত বয়স কাহারও হয় নাই, তথাপি হাসু মঞ্জু আগেই দুইখানা শাড়ী তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। শুধু বেলাই বিস্মিতস্বরে কহিল —কেন বড়দি?

—এমনি। এই সব তোকে দিয়ে দিলাম। ট্রাঙ্কটা শুদ্ধ।

—যাঃ। পরিহাস ভাবিয়া হাসিয়া ওঠে বেলা। বড়দি আসিয়া পর্য্যন্ত অবশ্য সাজিবার সখ তাহার ষোলআনা মিটিয়াছে —তাই বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব দান? ট্রাঙ্ক সুটকেশ সমেত!

—সত্যিরে বেলামণি, ওসব আমার আর দরকার নেই। সব নিস তুই।

—হেজলিন পাউডার, সাবান-টাবান, চিরুনি-টিরুনি, বই-খাতা সব?,

—সব রে সব। মন্দিরা হাসিয়া উঠে—বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি? আর শোন্, নাটু লাটু বাসুকে যা চাইবে কিনে দিস, টাকা থাকলো ট্রাঙ্কে বুঝলি?

—কেন বড়দি তুমি কোথায় যাবে?

শঙ্কিত দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে বেলা।

—কোথায় যাবো? তাতো জানিনারে—কতকটা আপনার মনেই বলিতে থাকে মন্দিরা—কে জানে—কতো দূরে, কোন্ দেশে—

—বাবা বকেছে বলে রাগ করে চলে যাবে বড়দি?

—দূর পাগলী!

ছোট ভাইবোনগুলির গাল ধরিয়া আদর করে মন্দিরা, কাছে টানিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেয়, ঘুমন্তগুলিও বাদ যায় না।

—আর তোর বিয়ের সময় যদি না থাকি, এইটা পরে' বড়দিকে মনে করিস—বলিয়া গলার হারটা খুলিয়া বেলার গলায় পরাইয়া দিতেই বেলা কাঁদিয়া ফেলিয়া দিদিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ওঠে—হার চাই না বড়দি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, যেয়োনা ভাই।

চকিতের জন্য একবার মনে হয় থাক্ দরকার নাই। অসম্ভবের আশায় কোন পথে পাড়ি দিবে সে? তার চেয়ে এই বা মন্দ কি? ইহাদের লইয়া কি হাসিয়া-খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেওয়া যায় না? ইহাদের কাছে থাকিলে নিজেকে কত বড় লাগে!

কিন্তু তাই কি হয়? কোন্ দুঃখ অমরেশের এমন গভীর হইল—যা ঘর ছাড়া করিয়া ছাড়িল তাহাকে, সেই হিসাবটা লইবে কে? চোখ বুজিয়া নিজের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়াই বা ক'দিন চলিবে মন্দিরার? কেবলমাত্র নিজেকে 'বড়' ভাবিবার মধ্যে গৌরব যতোই থাক, খোরাক কই? দুধ জিনিষটা ভালো—কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন হয় ডাল ভাতের।

চোখ মুছাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলে—না গিয়ে আমার উপায় নেই বেলু, যেতেই হবে।

—কোথায় যাবে বল না বড়দি?

—যাবো? যাবো আমার নিরুদ্দেশ বরের সন্ধানে। বুঝলিরে বোকা মেয়ে।

দশ

বিজয় মল্লিক এতদিনে উপযুক্ত বিচরণ-ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে।

নাইটস্কুল অবশ্য যথানিয়মে উঠিয়া গিয়াছে। বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের উদ্দেশ্যে যে 'দি বান্ধব হোমিও হল' খুলিয়াছিল, তাহারও অস্তিত্ব এখন আর নাই।

এখন বিজয় মল্লিক 'জ্যোতির্ম্ময়ী বিধবাশ্রমের' সেক্রেটারী।

বিজয় মল্লিকের ভরসা করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী এই আশ্রম খুলিয়াছেন—অথবা জ্যোতির্ম্ময়ীকে কেন্দ্র করিয়া বিজয় মল্লিকই খুলিয়াছে, আলাদা করিয়া বলা কঠিন। আপাততঃ একজনের অর্থে ও অপরজনের সামর্থ্যে এই নাতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি সতেজে চলিতেছে।

তিনতলায় খান দুই ঘর ব্যতীত বিরাট বাসভবনের সমস্ত অংশই জ্যোতির্ম্ময়ী আশ্রমকে দান করিয়াছেন। নানা বয়সের বিধবা মেয়ের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নীচের তলায় 'তাঁত ঘর', 'চরকা ঘর', 'সেলাই ঘর' প্রভৃতি অনেক কিছু কাণ্ডকারখানা।

অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া বেড়ায় বিজয় মল্লিক এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতির চেষ্টায়। পৃথিবীর আরো অসংখ্য লোকের অভাব-অশান্তির চিন্তা করিতে অবসর নাই বলিয়াই বোধ করি এতদিনে শান্তি পাইয়াছে বিজয়।

তাই বা শান্তি পাওয়া বলা যায় কেমন করিয়া? এই আশ্রমের জন্যই তো তাহার অশান্তির শেষ নাই। এই প্রতিষ্ঠান আরো বড় আরো বিরাট হয় না? পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, প্রত্যেক জেলায় ছড়ানো থাকিবে ইহার শাখা-প্রশাখা!

বাংলা দেশের সমস্ত বিধবাকে আশ্রয় দিতে পারিলেই যেন যথার্থ শান্তি হয় বিজয়ের। গাধার মত খাটিয়া মরিতে

হয়, তাই রাত্রির গাঢ় নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিবার ফাঁক থাকে না। দিবা দ্বিপ্রহরে জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখে বিজয় মল্লিক।···

দুই পাঁচ হাজার চরকা ঘুরিতেছে একতালে···এক ছন্দে ওঠা-নামা করিতেছে শত শত মাকু···সারা বাংলা ছাইয়া গিয়াছে আশ্রমবালাদের হাতেকাটা সূতার খদ্দরে···ঘরে ঘরে ছেলে বুড়ো সকলের গায়ে সার্ট, প্যাণ্ট, ফ্রক, পাঞ্জাবী—সেলাইঘরের অপূর্ব্বকীর্ত্তি।

বিধবারা আর অপরের গলগ্রহ নয়, সংসারের আবর্জ্জনা নয়, স্বাধীন স্বাবলম্বী উপার্জ্জনশীল।

স্বপ্ন দেখা নিবারণ করিবার উপায় নাই।

গড়েরমাঠের গরু কি অড়রক্ষেতের স্বপ্ন দেখে না? পেট ভরিলেও দেখে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দিন আর কাটিতে চাহে না।

প্রবীর নাই, মন্দিরা নাই।

একজনকে জ্যোতির্ম্ময়ী স্বেচ্ছায় বিদায় দিয়াছেন, আর একজন জ্যোতির্ম্ময়ীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ত্যাগ ছাড়া আর কি? যখনই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রবীরের কীর্ত্তির কথা মনে করিবার চেষ্টা করেন—ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া যান।

জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবনের অবলম্বন, হৃদয়ের আশ্রয়, একমাত্র গৌরব প্রবীর, কোন্ তুচ্ছবস্তুর লোভে আপনাকে নষ্ট করিয়া বসিল।

জ্যোতির্ম্ময়ীর উঁচু মাথা চিরদিনের জন্য হেঁট হইয়া গেল না কি?

বাধ্য বিনীত মার্জ্জিতরুচি ভদ্র ছেলে জ্যোতির্ম্ময়ীর, উচ্ছন্ন যাইবার জন্যও মায়ের কাছে মত চাহিতে আসিয়াছিল। বলিয়াছিল—মা তোমার কাছে আমি অনেক বড় উত্তরের প্রত্যাশা করে এসেছিলাম—তুমি ত শুধু আমার মা নয়, আমার বন্ধু। আমার দুর্দ্দিনে তোমার সাহায্য পাবো এ আশাটুকু কি অন্যায়?

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রবীরের আকাঙ্ক্ষিত 'বড়' উত্তর দিতে পারেন নাই।

জগতে কোন্ মা কবে পারিয়াছে? সন্তানের মমতা যতই গভীর হোক—তবু সন্তানের হৃদয়ের পানে চাহিয়া—আপন স্বার্থ খর্ব্ব করিবার ক্ষমতা আর যাহার থাক, মায়ের থাকে না।

সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া যে গুরুমন্ত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহারও নূতনত্ব হ্রাস হইয়াছে, ধ্যানের মন্ত্রে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠে না। লক্ষ জপ করিবার সংকল্প লইয়া যে মালা হাতে জপের আসনে বসেন—সে মালা কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে তাহার হিসাব থাকে না।

স্বামীর এনলার্জ্জ করা প্রমাণ সাইজের ছবি, রূপার ফ্রেম, গুরুদেবের খড়ম, আর সোনার সিংহাসন, বালগোপালের মূর্ত্তি ও তাঁহার সেবার অসংখ্য উপকরণ, একে একে অনেক কিছু আসিয়া জড় হইয়াছে পূজার ঘরে।

প্রথমে উৎসাহের অবধি ছিল না—এখন ধুলার পুরু স্তর জমিয়াছে রূপার ফ্রেমে আর সোনার সিংহাসনে।

চন্দনকাঠের পালঙ্কে নেটের মশারি ফেলিয়া বালগোপাল তাঁহার ছোট্ট বালিশটিতে মাথা রাখিয়া দিনের পর দিন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে ঘুম ভাঙাইয়া টিপ কাজল পরাইয়া, চূড়া-বাঁশীতে সাজাইয়া, ক্ষীর ননী খাওয়াইয়া গোষ্ঠে পাঠাইবার খেলা আর ভাল লাগে না।

বিস্বাদ বিবর্ণ দিনগুলি যেন বাঁধিয়া মারিতেছিল জ্যোতির্ম্ময়ীকে। কাহারও জন্য কিছুই করিবার নাই, কী ভয়ঙ্কর এই অবস্থা।

মন্দিরা হাতখরচ ফিরাইয়া দেয়, প্রবীর অর্থ সাহায্য লইবে না পণ করিয়াছে, এত অর্থ লইয়া তবে করিবেন কি জ্যোতির্ম্ময়ী? দীর্ঘ জীবনভোর যতীন মুখুয্যে যে ভিতরে ভিতরে কত সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, এতদিনে তাহা ধরা পড়িয়াছে।

এমন দুর্দ্দিনে বিজয় মল্লিক আসিয়া ধরা দিল বিধবাশ্রমের আইডিয়া লইয়া। এখন দিনগুলা তবু কতকটা সহনীয় হইয়াছে। কথায় কাজে, আলোপে আলোচনায় নূতন নূতন দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সহজে কাটিয়া যায় দিন।

জীবনেই কি আসে নাই কিছু সরসতা? খ্যাতির আর তোষামোদের মিষ্টিরস কম সারালো সার নহে। নির্ব্বিচারে সকল বয়সের বিধবারা 'মা' বলে। শুধু মা নয়, 'দেবী মা'!

বিজয় শিখাইয়াছে।

ছাঁটা কোঁকড়ান চুলের উপর সাদা গরদের থান বেড়িয়া প্রশান্তমুখে যখন আশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ান জ্যোতির্ম্ময়ী—সত্য সত্যই দেবীর মত দেখিতে লাগে। তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে।

জ্বালিয়া নিঃশেষ হইয়া যাওয়া মোমবাতির মত যাহা নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল, বিজয় মল্লিক তাহাতে নূতন পলিতা সংযোগ করিয়া কাজে লাগাইয়াছে।

এসব কাজের অবশ্য দায়িত্ব সোজা নয়, তবে মানুষ যখন দেবীর প্রাপ্য সম্মান পাইতে থাকে, তখন দেবীর মত কঠিনও হইতে হয় বৈ কি। আশ্রমের কড়া আইনের ফাঁকে কে কখন কি বে-আইনি কাণ্ড করিয়া বসিল, সে দিকে দৃষ্টি সজাগ রাখিতে হয় অহরহ। এতটুকু অসতর্ক হইবার জো নাই।

রাত্রে গেটের চাবি পড়িলে চাবি গচ্ছিত থাকিবে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিজের কাছে। চিঠি যদি কাহারও আসে, পাশ হইয়া আসিবে জ্যোতির্ম্ময়ীর হাত দিয়া। চিঠি লিখিতে গেলেও সেই এক হুকুম।

তাছাড়া কে উপাসনায় সময় দিয়াছে কম, আর স্নানের ঘরে সময় লাগাইয়াছে বেশী, কাহার ঘুম ভাঙিতে বেলা হয়

আর কাহার ঘুমাইতে যাইতে দেরী হয়, এসব তত্ত্বাবধান না করিলেই বা আশ্রম চলিবে কোন্ শৃঙ্খলায় ?

তবু ইহার ভিতরও মাঝে মাঝে বেখাপ্‌পা ব্যাপারের অবতারণা হয় না এমন নয়। আট ফিট উঁচু প্রাচীরের অবরোধের মধ্যেও বেহায়া বসন্তবাতাস দৈবাৎ ঝাপটা মারিয়া যায়। মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারিণীর মনেও হঠাৎ একছোপ সবুজের আভাস লাগে। তাই জ্যোতির্ম্ময়ীর নিশ্চিন্ত শান্তি ঘুচিয়াছে। এসব অনাচারের প্রশ্রয় দিলে চলে না—শাসন কড়া না হইলে—বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতের মত বিশৃঙ্খলার ঢেউ আসিয়া বিধবা-আশ্রমকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে কিনা, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?

তাই সেদিন সকালবেলা তিনতলার পূজার ঘর হইতে নামিয়াই, কমলা নামের যে মেয়েটি কিছুদিন হইল ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া পড়িলেন।

কমলার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ সাবান মাখা লইয়া। আশ্রমের নিয়মানুসারে সে আসিয়াই মাথা মুড়াইয়াছে—নরুণপাড়ের ধুতিখানা ছাড়িয়া সাদা থান ধরিয়াছে—আহারাদিতেও তাহার সম্বন্ধে কোন অভিযোগ আসে নাই, কিন্তু ওই—সাবান সে মাখিবেই।

কেমন করিয়া জোগাড় করে, সে কথা বলা শক্ত, কিন্তু দেখা যায় সুযোগ পাইলেই সে উক্ত অপকর্ম্ম করিতে ছাড়ে না।

জ্যোতির্ম্ময়ী তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে কহিলেন—কমলা আবার তুমি সাবান মেখেছ ?

রোগা শ্যামবর্ণা পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, বছর বাইশ বয়স হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু দেখিতে ছোট লাগে।

দেবী মা'র সামনে মুখ তুলিয়া কথা কওয়ার রেওয়াজ নাই, তাই মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। থাকিল বটে—তবে ভয়ে কাতর হইয়াছে দেখিলে মনে হয় না। বার বার তিরস্কারেও 'আর করিব না' এমন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে না পারিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী অন্য পয়েন্টটা ধরিলেন, বলিলেন—সাবান তোমায় কে জোগায় বলতে পারো ?

ইহারই উত্তরে ফস্ করিয়া আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল—বাগানের দরজা দিয়ে রোজ যে দেখা করতে আসে, সেই বোধ হয়।

বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান জ্যোতির্ম্ময়ী। কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বলেন—কমলা এসব কি শুনছি ? কে দেখা করতে আসে ?

—একটি ছেলে।

অস্ফুটস্বরে এইটুকুই শুধু বলিতে পারে কমলা।

—ছেলে, সেটুকু কষ্ট করে না বললেও চলতো—কে সে তাই জানতে চাচ্ছি।

—আগে আমাদের পাড়ায় থাকতো।

—ওঃ। তা বেশ, কিন্তু কি বলতে চায় সে ? কি জন্যে আসে তোমার কাছে ?

হঠাৎ মরিয়া হইয়াই যেন কমলা স্পষ্ট গলায় বলিয়া ফেলে—বলে যে ওর সঙ্গে চলে যেতে। আমি যাবো।

—কোথায় যেতে বলে ?

—তা জানিনা।

—তোমায় নিয়ে গিয়ে খেতে পরতে দেবার সামর্থ্য ওর আছে ?

—তা জানিনা।

—তাও জানো না ? চমৎকার ! কি করে, কি নাম, তাও জানো না বোধ হয় ?

—নাম অরুণ, কিছু করে না।

—শেষ পর্য্যন্ত না খেয়ে মরতে হবে সেটা জানো ?

—ও বলে এখানে থাকলেও মরে যাবো।...আর—আর—দুটি ভাত খেয়ে সুধু বেঁচে থেকে লাভ কি ? আমায় ছেড়ে দিন।

—তা'লে এলে কেন ?

—আমি ইচ্ছে করে আসিনি, বিজয়বাবু রোজ রোজ আমার কাকাকে বলে রাজী করিয়েছিলেন ! কাকারা দশ বছর ধরে পুষছেন, তাই রাজী হয়ে গেলেন।...ও তখন থেকেই আমাকে—কমলা চুপ করিয়া যায়।

নন্দরাণী একজন পাকা বিধবা। সাতচল্লিশ বৎসর যাবৎ বৈধব্য পালন করিয়া আসিতেছেন তিনি। আশ্রমে ভর্ত্তি হইবার মত অনাথা তিনি নন। শুধু এখন আতপ চাউলের দর সাতচল্লিশে উঠিয়াছে বলিয়াই চেষ্টা চরিত্র করিয়া অনাথার দলে নাম লিখাইয়াছেন।

মিথ্যা কথাও হয় না বটে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী যিনি নাথ-হারা হইয়া কাটাইয়াছেন, অনাথা ছাড়া কি আর বলা যায় তাঁহাকে। নন্দরাণী হাতের মালাটা কপালে ঠেকাইয়া খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল—তখন থেকেই যদি এত পিরীত, তো বেরিয়ে গেলেই পারতিস ? আশ্রমে এসে ঢলাঢলি কেন ?

ক্রুদ্ধ কমলা ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি আর মুখ নেড়ো না নন্দদি। তুমি চুরি করে খাওনা ? একাদশীর দিন গোপালকে ঘুষ দিয়ে বেগুনী ফুলুরি আনালে না সেদিন ? দেবী মা'র আংটিটা তোমার বাক্স খুঁজলে বেরোবে না ? তবে ? এসব বুঝি দোষ নয় ?

জ্যোতির্ম্ময়ী অবাক হইয়া বলেন—ছিঃ কমলা, কাকে কি বলছো ? থাকতে না চাও চলে যেও, তাই বলে—

নন্দরাণী নাচিয়া উঠিয়া কহিল—চলে গেলেই হ'ল ? খাতায় নাম সই করেনি ? বেরিয়ে গেলে আশ্রমের কেলেঙ্কারী নয় ? ওর জন্যে কি নতুন আইন ছিষ্টি হবে নাকি ? বলি কমলি, ইহকাল তো গেছে, পরকালের চিন্তেও কি এককড়া নেই ?

কমলি বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া স্বচ্ছন্দে জানাইল —না। পরকালের চিন্তায় ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই তাহার।

মার্জ্জিত রুচিসম্পন্না বাসন্তী কমলার চাইতে সামান্য কিছু জ্যেষ্ঠত্বের দাবীতে উপদেশের সুরে মিহিগলায় কহিল—ছিঃ কমলা, এসব কথা উচ্চারণ করতে লজ্জা করে না তোমার?

কমলা বোধ করি এতগুলি রসনা আর দৃষ্টির সম্মুখে তোপের মুখে সৈনিকের মত মরিয়া হইয়াই উঠিয়াছিল, তাছাড়া সাবানের অপমান তখনো মর্ম্মান্তিক জ্বলিতেছিল, তাই তীক্ষ্ণস্বরে কহিল—সবাই মিলে আমার সঙ্গে লাগতে এসনা বলছি—সকলের সব কথা বলে দেব।

বাসন্তী চাপাগলায় কহিল—কি কথা শুনি? বলবার আছেই বা কি?

—কেন থাকবে না? তোমার মাসতুতো ননদের দেওর—বিশু না-কে—নিত্যি চিঠি দেয় না তোমায়? জানলায় ঢিল বেঁধে নাওনা তুমি? বিধুদিরা পান-দোক্তা খায়না চুপি চুপি? সুধারাণী খালি শুয়ে থাকে—কিছু খেতে পারে না—আর দেবী মা'র সামনে বেরোয় না কেন, জানি না বুঝি? তবে?

দেখা গেল, যত ভালমানুষ ভাবা গিয়াছিল মেয়েটিকে, তেমন নয়।

জ্যোতির্ম্ময়ীর দুই কান ঝাঁ ঝাঁ করিয়া সমস্ত মুখ আগুনের মত রাঙা হইয়া আসে। দীর্ঘকাল দেবীগিরিতে পোক্ত না হইলে এত কথা হজম করিবার মত স্নায়ু সবল হয় না।

ব্রহ্মচর্য্যের যে অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া এতগুলি অসহায়া নারীকে স্বর্গের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা সহসা যেন নিজেদের সঙ্গে তাঁহাকেও আছাড় মারিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিল।

বিজয় মল্লিককে ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আশ্রম ভাঙিয়া দেবার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

আজ না ভাঙিলেও—ভাঙিতই একদিন।

বিজয় মল্লিকের মুখটাও ভাঙিয়া গেল।

যাক্, হয়তো কোনদিন দেখা যাইবে—ভাঙা প্রাণে পলস্তারা লাগাইয়া আবার কোন নূতন স্বপ্ন গড়িয়া তুলিতেছে বিজয় মল্লিক।

এগারো

দীর্ঘকাল পরে আবার মন্দিরাকে দেখিলাম।

পশ্চিমের এক অখ্যাত সহরের ধূলি-ধূসরিত ক্ষুদ্র একটি ধর্ম্মশালায়। বেশভূষার অবস্থাও ধর্ম্মশালার চাইতে খুব বেশী উচ্চাঙ্গের নয়—কিন্তু সে বিষয়ে বোধ করি সে নিতান্তই নির্ব্বিকার।

বসিয়াছে—'বাগান' নামধারী একটি আগাছার জঙ্গলের ধারে, চটাওঠা ইটভাজা সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া, আর ছোট ছেলেদের গল্পবলার ভঙ্গীতে পাশের ভদ্রলোকটিকে রূপকথা শোনাইতে সুরু করিয়াছে।

ভদ্রলোকটি যদিও মন্দ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নয়, কিন্তু ধূলায় বসিতে তাঁহারও আপত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

—হ্যাঁ, কি বলছিলাম? তারপর কি না—ভোরের পাখী বাসা ছাড়বার আগে শুকতারাকে সামনে রেখে দুঃখিনী রাজকন্যা নিষ্ঠুর রাজপুরী ছেড়ে চললেন তেপান্তরের মাঠ-ভেঙে নিরুদ্দেশ রাজপুত্রের উদ্দেশে। কত মাঠ কত পথ পার হয়ে —কত নৌকো ইষ্টিমার রেলের গাড়ী গরুর গাড়ী চড়ে অবশেষে—এক সহরে এসে হাজির হলেন রাজকন্যা।

হলেন তো, কিন্তু কোথায় রাজপুত্র? মুস্কিল এই—এটা আবার কলিকাল। চোখের কাজল দিয়ে পদ্মপাতায় পত্ররচনা করে হংসদূতের মারফৎ রাজপুত্তুরের সন্ধান নেবেন তার জোটি নেই।

কাজেই—অন্য বুদ্ধি খাটাতে হয়। তারপর—চোখের কাজলের বদলে ছাপার কালি আর হংসদূতের বদলে—সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে বার্ত্তা পাঠিয়ে বসে বসে রাজপুত্তুরের আশায় দিন গোণে। দিন যায় রাত্রি আসে, রাত্রি যায় দিন আসে—ভেবে ভেবে রাজকন্যার চক্ষে ঘুম নাই। এদিকে—রং হ'ল ময়লা, দেহ হ'ল ক্ষীণ, মুখ হ'ল শুকনো আর চুল হ'ল রুক্ষ, সাজ-গোজের কথা বলেই কাজ নেই—মোটের মাথায় রাজকুমারীর যখন একটি কাঠকুড়ুনীর মত অবস্থা—তখন নিষ্ঠুর রাজকুমার এসে দিলেন দেখা।

বললেন—রাজকন্যা কি বার্ত্তা?

রাজকন্যা বলেন—সাধনার সিদ্ধি হ'ল, এই বার্ত্তা?

রাজপুত্তুর বলেন—সিদ্ধি তো হ'ল, এখন চাও কি?

—কিছু না—শুধু তোমাকে।

শ্রোতা ভদ্রলোকটি হঠাৎ ভারী যেন রেগে উঠে বলেন—'কিছু না শুধু তোমাকে' মানে? আমি বুঝি 'কিছু না'র সামিল?

—তুমি? তোমাকে আবার কে কি বললো? গায়ে পেতে নিচ্ছ কেন? আমি তো শুধু গল্প বলছি।

—হোক গল্প, আমিও অল্পে ছাড়ছি না।

'অল্পে' তো দূরের কথা, অনেক কষ্টেও রেহাই পায় না বেচারা।

—কি হচ্ছে? জানো এটা ধর্ম্মশালা?

– হয়েছে কি? অধর্ম্ম কিছু করছি নাকি?

—হয়েছে—হয়েছে, এত ভালবাসা কোথায় ছিল শুনি?

—ভালবাসা যেখানে থাকবার—ঠিক সেইখানেই ছিল মন্দিরা, শুধু ভালবাসার লোকটিই ছিল দূরে।

—মধ্যে কথা বোলো না বেশী,—মন্দিরা স্বভাবগত শাসনের সুরে প্রায় ধমকই দেয়—নিরুদ্দেশ হয়েছিলাম বুঝি আমি? জানো এতে আমার কত অপমান হয়েছে?

অপমান কিছু হয়নি মন্দিরা, কাছে থাকলে তোমার এ মনকে তুমি সহজে খুঁজে পেতে না। অভাবেই অভাব বোধটা এত তীব্র হয়ে ধরা পড়ে।

—হয়তো তাই, কিন্তু সত্যি বলছি, এতদিন ধরে শুধু এই একটি মাত্র প্রশ্নই তোমার কাছে ছিল আমার—ভালবাসলে যদি তো কেন চলে গেলে?

—একটিমাত্র উত্তরে ও কৌতূহল মিটবে না মন্দিরা, ওর পিছনে জমানো আছে অনেক গ্লানির ইতিহাস। ভালবেসে ধিক্কার এসেছিল, ভেবেছিলাম—ভালবাসার যথার্থ অধিকার আমাদের নেই, এত ছোট এত হীন এত তুচ্ছ আমরা।

—কিন্তু ভালবাসাই কি আমাদের বড় করে তোলে না? সমস্ত গ্লানির উপর এনে দেয় না গভীর মর্য্যাদা? সত্যি করে ভালবাসলে নিজেকে আর ছোট মনে হয় না—হীন মনে হয় না, তুচ্ছ মনে হয় না। কিন্তু থাক ওসব কথা, এ সব সাধু ভাষায় কথা কইলেই বেজায় হাসি পেয়ে যায় আমার। তার চেয়ে তুমি বল তোমার অজ্ঞাতবাসের কাহিনী।

—তার আগে তুমি বদলে এসো তোমার কাঠকুড়ুনির বেশ। এখান থেকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলে ভেবে অবাক লাগছে আমার, আগে গাড়ী নইলে যে—আচ্ছা থাক পরে হবে সব কথা। এখন যাও লক্ষীটি গায়ের ধুলো ধুয়ে ফেলো গে।

টুকটুকে ঠোঁটের উপর উদ্ধত দু'টি দাঁত ঝিলিক মারিয়া ওঠে, প্রিয় পরিচিত ভঙ্গীতে।

—ধুলো শুধু শাড়ীতে—গায়ে ধুলো লাগে না আমার।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অমরেশ মন্দিরার খোঁজ করিতে আসিয়া অবাক। অমরেশের খোলা সুটকেশের সামনে গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে মন্দিরা, বেশভূষার পরিবর্ত্তন কিছুই করে নাই।

—এ কি, কি হ'ল তোমার?

তোমার সুটকেশে এত শাড়ী কেন শুনি!

—ও হো হো, এখুনি চোখে পড়েছে—কিন্তু যদি না বলি?

—বলতে বাধ্য।

—এখন থেকেই শাসন সুরু?

—নিশ্চয়।

—সত্যি কথা বিশ্বাস করবে মন্দিরা? হেসোনা কিন্তু? কোম্পানীর এজেন্সি নিয়ে কত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে—বম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ। শাড়ীর দোকানের কাছাকাছি গেলেই তোমার গায়ে মানায় এমন শাড়ী একখানা কেনবার দুর্দ্দান্ত সখ হ'ত।

—অর্থাৎ সর্ব্বদা আমি তোমার অন্তরে বিরাজ করছিলাম —এই তো তোমার বক্তব্য?—মন্দিরা ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে বলে—আমার বিশ্বাস, এ কৈফিয়ৎটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যাক, পরে এর বিচার হবে। আপাততঃ এই প্রিণ্টেড, শাড়ীখানি দয়া করে গ্রহণ করলাম।

—এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ।

—উঁহু বলতে হয়, আমি ধন্য।

—সেটা কি মুখে বলবার দরকার হবে মন্দিরা?

ষ্টেশনে আসিয়া মন্দিরা প্রশ্ন করিল—এখন কোথায় যাবে?

—এই গরীবের কুটিরে।

—একেবারে সোজাসুজি?

—লক্ষী যখন নিজে এসে ধরা দিয়েছেন—তখন আর ছাড়বো কেন বল? ঈষৎ চিন্তিত ভাবে মন্দিরা বলে—কিন্তু সংসারের চোখে সমাজের চোখে, আমি হারিয়ে যেতে রাজী নই। তাছাড়া আমার মার কাছে—আমার নিজের মার কাছে—প্রতিশ্রুত আছি তোমায় নিয়ে গিয়ে দেখাবো বলে।

—কি বলে দেখাবে?

—বলবো? বলবো—মা দেখ তো—জামাই পছন্দ হয়?

—কি সর্ব্বনাশ! পারবে বলতে?

—অনায়াসে। এত তপস্যার পর বর মিললো—পারবো না? সেখান থেকে বিধিবদ্ধ ভাবে তোমার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হয়ে—ভাবছি যাবো এলাহাবাদে দাদাভাইয়ের কাছে।

সহসা স্তব্ধ হইয়া যায় অমরেশ, একটু চুপ করিয়া ধীরে ধীরে বলে—সে হয় না মন্দিরা।

—কেন?

—সত্যি কথাই স্বীকার করবো মন্দিরা, মন থেকে সায় দেবার ক্ষমতা নেই। একথা ঠিক যে, দাদার ব্যবহার আমায় সর্ব্বদা পীড়ন করেছে, বৌদির নিরীহ বাধ্যতা, তাঁর বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, উত্তেজিত করে তুলেছে—অহরহ চেয়েছি তাঁর বন্দী জীবনের মুক্তি, কিন্তু তবু এ আমি সইতে পারবো না। হয়তো দূরে থেকে প্রার্থনা করবো তাঁদের কল্যাণ, কিন্তু বৌদিকে বৌদির মতন ভিন্ন অন্য ভাবে দেখবার সাহস আমার সত্যিই নেই। খোকন নেই, বৌদি আছেন, এ কি দেখা যায় মন্দিরা?

প্রফুল্ল দুইখানি মুখে নামিয়া আসে দুইটি মেঘছায়া।

হয়তো এই নিয়ম, সাংসারিক বিধি ইহাকেই বলে। পরিপূর্ণতার মাঝখানে দেখা দেয় শূন্যতা, আনন্দের উপর পড়ে বিষাদের ছায়া, জীবনের কোলাহলের ভিতর ধরা দেয় মৃত্যুর স্তব্ধতা।

বারো

উত্তর-কলিকাতার এক অপরিসর গলির একপ্রান্তে হাড়-পাঁজরা সার সেই জীর্ণ বাড়ীখানি তার দীর্ঘ দেহখানি লইয়া এখনো—একই অবস্থায় টিকিয়া আছে।

ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্তন ঘটে। বর্ষার জল, বৈশাখের ঝড়, বারে বারে আসিয়া পুরনো বনেদের শিকড়ে ঘা মেরে, কাঁপন ধরায়, ভাঙিতে পারে না।

বোমা যদি সত্যই কখনো বজ্রের বেশে নামিয়া আসে, তখনই হয়তো একদিন জরাজীর্ণ দেহটা লইয়া হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে—তার আগে নয়।

শুধু দেওয়ালের দাঁতগুলি হইয়া উঠিয়াছে আরো প্রখর স্পষ্ট, আরো নিলজ্জ হইয়া উঠিয়াছে—খাপরি ওঠা মেঝের নিরাভরণ নগ্নতা।

আজকাল—চটা ওঠা রোয়াকের উপর শীতের রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিবার লোভে যাহারা আসে, তাহারা বড় কথা লইয়া তর্ক করে না—বড় চিন্তা লইয়া মাথা ঘামায় না, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকে না।

ছোট কথা লইয়াই তাহাদের কারবার।

সিঁড়ি ভাঙিতে কষ্ট হয় বলিয়া মেনকার মা আসেন বড়ির টিন লইয়া, বড়ি দিতে। সত্যোবিধবা ছোটবৌ ম্লানমুখে আসে শিশুপুত্রের ভিজা বিছানা রৌদ্রে দিতে। উষাবতী তাসের জোড়া কোল-আঁচলে বাঁধিয়া গীতাখানা খুলিয়া বসে, তাস জোড়াটা বাহির করিতে লজ্জা পায়। আনিয়াছে, একথা টের পাইতে দেয় না কাহাকেও, তবু আনিতে ছাড়ে না।

ভাই যাওয়ার পর হইতে এই এক উপসর্গ জুটিয়াছে—চক্ষুলজ্জা। সহজ ভাবে হাসিতে, গল্প করিতে, তাস খেলিতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ ওসব না করিলেও যে প্রাণ হাঁফাইয়া আসে।

আর আসেন কৃষ্ণবালা।

হরিনামের ঝুলিগাছটা লইয়া বিরসমুখে বসিয়া থাকেন এক পাশে। ঝড় বৃষ্টির প্রলেপ কিছুটা লাগিয়াছে তাঁহার দেহে। সামনের কয়টা দাঁত পড়িয়া গিয়া মুখের ভাবে আসিয়াছে উগ্র নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে অসহায় কুশ্রীতা।

ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আলোর আভাস ইহাদের চোখে ধরা দেয় না—প্রত্যহ দেখা সংসারের ঘটিয়া যাওয়া পুরানো কাহিনীর পুনরাবৃত্তিই ইহাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

নূতন যদি কেহ আসে, সোৎসাহে শুনাইতে বসে—পুরানো দিনের গল্প।

আজ এ আসরে নূতন শ্রোতা আসিয়াছে মেনকা।

খোলা রোয়াকে এতগুলা চোখের সামনে বসিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে কোলের ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে শ্বশুরবাড়ীর সুখ ঐশ্বর্য্যের গল্প ফাঁদিয়াছে।

বড় গিন্নী বড়ির ডালমাখা হাতখানা উষাবতীর প্রায় মুখের সামনে নাড়িয়া বলিয়া ওঠেন—এই শুনলি তো? তখন আমার মেনিকে কানাঘুষো কতলোকে কত নিন্দেই করেছে, আর এখন? এখন দেখ—মেনির আমার গোছাভর্ত্তি সোনার চুড়ি, পঞ্চাশখানা পঞ্চাশ রকমের শাড়ী সেমিজ, কোলে সোনারচাঁদ ছেলে, দেখছিস্ তো? বাবা ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। যাঁরা ভালো-মানুষী দেখিয়ে ভিজে বেড়ালের মতন থাকতেন, তাঁদের কীর্ত্তির কথাও ভাবো!

মেনকা মহোৎসাহে প্রশ্ন করে—হ্যাঁগা অখিলেশদার বৌর কথা যা শুনি তা কি সত্যি?

—কপাল আমার, সত্যি নাতো কি মিথ্যে? শুনতে পাই এলাহাবাদে না কোথায় আছে। ছোঁড়া তো মায়ের তেজ্যপুত্তুর, খেতে দেবার মুরোদ নেই—নিজে ইস্কুলে মাষ্টারী করে, ছুঁড়িকেও মেয়ে ইস্কুলে গানের মাষ্টারী করে পেটের ভাতের জোগাড় করতে হয়। অমন পিরিতের কাঁথায় আগুন। শুনতে পাই একটা মেয়ে না ছেলে কি হয়েছে! ছি ছি ছি—অমন সোনার পুতুল ছেলে হারিয়ে—

নূতন করিয়া আর একবার সকলের ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইয়া আসে। কৌতূহলী মেনকা বলে—অমরেশদা'র খোঁজ খবর কিছু পাওয়া যায় নি?

—ও মা তা জানিস না বুঝি, সে 'তা ইনসোর অপিসে' দিব্যি মোটা মাইনের চাকরী করছে—যতীন মুখুয্যের দৌত্রীর মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। সেও এক কেলেঙ্কারে কাণ্ড! মেয়ে নাকি একলা হিল্লি দিল্লি ঘুরে পাকড়াও করে এনে বিয়ে করেছে। কালে কালে কতই শুনবো, কতই দেখবো। বামুন কায়েতের বিয়েও তা'হলে 'চল' হ'ল!

মেনকা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—অখিলেশ দা'র কি হ'ল শেষটা? হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে—

—গলায় দড়ি আর দেবে না! ব্রহ্মচারীই হোক্ আর নাগা ফকিরই হোক—ব্যাটাছেলে তো? বিয়ে করা পরিবার—নাকের সামনে দিয়ে ডাং ডাং করে পর-পুরুষের হাত ধরে বেরিয়ে গেল, কোন্ ঘেন্নায় মুখ দেখাবে পাঁচজনকে?

বিষদন্তহীন কেউটের মত নিস্তেজ কৃষ্ণবালাকে বেশী সমীহ করিবার আবশ্যকতা কেহ আর অনুভব করে না। আলোচনার স্রোত যথেচ্ছ বহিতে থাকে।

শুধু সমরের কথা উঠিতেই কয়েকটা করুণ নিশ্বাস চাপা-গলির রুদ্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তোলে। যুদ্ধে যাওয়ার পর হইতে আর কোন সংবাদ নাই তাহার।

হয়তো মারা গিয়াছে—হয়তো মারা যাইবে—একই কথা।

সুস্থ আর স্বাভাবিক মানুষ কালো গৌরাজ মোটাসোটা কালোকোলো একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া সুখে সংসার পাতিয়াছে। বোধকরি বংশের ধারা, আর জীর্ণ-গলির চিরন্তন জীবনলীলার ধারা অব্যাহত রাখিবার ভার তাহারই।

অনির্ব্বাণ

—:*:—

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

১৬

অনির্ব্বাণ

—:•:—

স্টেশনে নেমে উৎসুক দৃষ্টিতে চারিদিক চেয়ে নিখিল যতটা না হতাশ হ'ল, অবাক হ'ল তার চাইতে বেশী। অন্য অন্য বারে—ট্রেনের গতি মন্থর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে বাবার হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখখানি এবং টিনের শেডের ওপারে পরিচিত সাইকেল-রিক্সাখানির অপেক্ষমান ভঙ্গী। ট্রেণ আসবার নির্দ্দিষ্ট টাইমের অনেক আগেই যে নিখিলের অভ্যর্থনার আয়োজন প্রস্তুত হয়ে থাকে সেটা বেশ বোঝা যায়।

আর এইবারেই কিনা তিনি অনুপস্থিত?

এমন কি গাড়ীখানা পর্য্যন্ত আসেনি? অথচ এবারেই তার সঙ্গে সম্মানিত অতিথি। পরপর দু'খানা চিঠিতে সে মিসেস চ্যাটার্জ্জির আগমন সংবাদ দিয়েছে, এমন কি তাঁর রুচি প্রকৃতি অভ্যাস অনুরাগের তথ্য জানাতেও ত্রুটী করেনি, পাছে অভ্যর্থনার দোষ ঘটে।

পল্লীগ্রাম দেখার সখ যতই প্রবল হোক, অসুবিধা সহ্য করবার সৎসাহস যে সহুরে মহিলাদের বেশী থাকেনা, সহুরে বাস করে এ বোধটুকু তার জন্মেছে।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি বা বলাকা দেবীকে যে সে নিজের ইচ্ছেয় নিমন্ত্রণ করে এনেছে এমন নয়, তাঁর অতি আগ্রহের ঠ্যালায় ভদ্রতার খাতিরেই মৌখিক আমন্ত্রণ করতে হয়েছে, না করে উপায় ছিল না বলেই, কিন্তু আদর যত্নের ঘাটতি হয় এটা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু বাবা করলেন কি?

চিঠি পাননি? দু' দু'খানা চিঠি মারা পড়বে এরই বা যুক্তি-সঙ্গত কারণ কি থাকতে পারে?

স্বাস্থ্যবান শক্তিমান তার পিতাকে কখনো অসুস্থ দেখেছে বলে মনে পড়েনা নিখিলের, তবু যদিই অসুখ বিসুখ করে থাকে কিছু, আসা নিতান্তই অসম্ভব হয়ে ওঠে, আশ্রমের আর কাউকেই কি পাঠানো চলতো না একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করে?

ছোট গ্রাম, ছোট ষ্টেশন—ব্যবস্থাও নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। টিনের শেড, দেওয়া যে স্বল্প স্থানটুকু 'ষ্টেশন' নামের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, তার ধারে কাছে যান-বাহনের চিহ্নমাত্র নেই।

বাংলার পল্লীগ্রামের দুঃখসহিষ্ণু লোক ষ্টেশন এবং গ্রামের মধ্যবর্ত্তী পাঁচ-সাত মাইল রাস্তাকে বিরাট একটা কিছু মনে করেনা, গাড়ী পাল্কীর প্রশ্ন কমই ওঠে। ভদ্রশ্রেণীর যারা হাঁটতে অক্ষম, গ্রামের মধ্যে থেকে পূর্ব্বাহ্নে সংগ্রহ করে রাখেন পুষ্পক রথ—সত্যযুগের প্রারম্ভে যে অপূর্ব্ব যান অবতীর্ণ হয়েছিল পৃথিবীতে।

সম্প্রতি যে দু'একখানা অতি আধুনিক সাইকেল-রিক্সা নজরে পড়ে, সেটা—"মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র নিজস্ব সম্পত্তি।

বাংলাদেশের অসংখ্য লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আর একটি নাতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই "সেবাশ্রম"।

নিখিলের বাবা বিভূতিবাবু এর প্রতিষ্ঠাতা।

—অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না, চলুন পা চালাতে সুরু করা যাক—

বলে ক্ষোভের হাসি হেসে এ্যাটাচী কেস্ দুটো হাতে তুলে নিলে নিখিল।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি দুই চোখ কপালে তুলে শিউরে উঠলেন—বল কি নিখিল, হাঁটতে হবে? কতটা রাস্তা?

—তা' মাইল পাঁচ সাত কোন্ না হবে?

দূরত্বের বহর শুনে বলাকা দেবী বালিকার মত হেসে উঠলেন, হাঁটার প্রস্তাবটা নেহাৎই পরিহাস ভেবে।

—হাসছেন যে? যাবেন কি করে শুনি?

—হাঁটবোই বা কি করে শুনি? গ্রামে পদার্পণ করেই তো আর চাষা-বউ হয়ে উঠিনি?

—কিন্তু উপায় কি বলুন? পল্লী-জীবনের অভিজ্ঞতাটা না হয় গোড়া থেকে সুরু হোক।

—অভিজ্ঞতা মাথায় থাক্, ফেরবার টিকিট কাটো দিকিন।

—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আর ফেরবার গাড়ী নেই।

—এই রকম ব্যবস্থা যেখানে সেক্ষেত্রে যে কি করে তোমার বাবা গাড়ী রাখবার কথা ভুলে গেলেন এই আশ্চর্য্য! অদ্ভুত দায়িত্বজ্ঞান কিন্তু!

বলাকা দেবী ঝিলিক মেরে ওঠেন।

আহত নিখিল একটা কি উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—নিশ্চয়ই তিনি অসুস্থ, না হ'লে এরকম ঘটনা সম্ভব নয়।

বলাকা দেবী অবশ্য অনেক সময় অনেক আলাপ আলোচনায় নিখিলের পিতার উপর সুগভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে এসেছেন, তবু তর্কের লোভ সামলাতে পারেন না।

মুচকে হেসে বলেন—হতে পারে তিনি অসুস্থ, কিন্তু গাড়ী পাঠাতে নিশ্চয়ই পারতেন। উচিৎ ছিল না কি পারা? একজন ভদ্রমহিলা যে তাঁদের দেশের মেয়েদের মত বিশ ক্রোশ রাস্তা ভাঙতে পারে না এটা অবশ্যই বিবেচনা করবার মত কথা। না কি আমার আসার কথা জানাওনি তাঁকে?

নিখিল শুষ্ক মুখে ঘাড় কাৎ করে।

জানায়নি এতবড় মিথ্যা কথাটাই বা বলে কোন্ মুখে?

অকারণে বাবা এরকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেবেন সেটা অসম্ভব। আছে কোন বিশিষ্ট কারণ, নয় তো দৈব দুর্বিপাক। নিজে একলা হলে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে এতক্ষণ ছুটে এগোতে পারতো, কিন্তু এক্ষেত্রে যে তাও হচ্ছেনা।

শত দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও বাবার উপর রাগে অভিমানে ওর হাত পা আছড়াতে ইচ্ছে করে। নিখিল নিজে অসুবিধায় পড়েছে বলে অতটা নয়, যতটা হচ্ছে—তিনি নিজেকে বাইরের লোকের সমালোচনার বস্তু করে তুলেছেন বলে।

মনে মনে প্রার্থনা করে, গিয়ে যেন দেখে—ভয়ঙ্কর একটা কিছু বিভ্রাট ঘটেছে। বরং বাবার বিপদও সহ্য করতে পারবে তবু বাবার নিন্দে নয়।

মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থেকে নিখিল বললে—তবে এক কাজ করা যাক্, আপনি এখানে বসে থাকুন, আমি গিয়ে গাড়ী নিয়ে আসি।

—পাগলা নাকি? আমি এই দুর্দ্দান্ত রোদে মাঠের মাঝখানে বসে থাকবো? বেশ বলছো তো? বা রে ছেলে!

বসে থাকাটা যে সম্ভব নয় সেটা নিখিলও অস্বীকার করে না। কিন্তু করেই বা কি বেচারা? মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে না কি অধ্যাপক-পত্নীকে?

দিগন্ত-বিস্তৃত রুক্ষধূসর প্রান্তর যেন অগ্নি উদ্গীরণ করছে, শরতের শেষ হলেও রৌদ্রের তেজ সমান প্রখর। ছায়া-লেশহীন জনস্ত মেঠোপথ, শুধু জায়গায় জায়গায় নিরলস প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘ সতেজ শালগাছ। পত্রবহুল হ'লেও ছায়াশ্যামল নয়। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর আলোয় নিজের বিরাট কাণ্ডকে কেন্দ্র করে অল্প একটু ছায়াবৃত্ত রচনা করে রেখেছে মাত্র।

—আশ্চর্য্য! একখানার বেশী ট্রেণ নেই? এ সময় ভদ্রলোকে আসে?

বলাকা দেবী আগুনের মতই ঝলসে ওঠেন। কথার সুর শুনে মনে করা অসম্ভব নয় যে নিখিল জেনে শুনে তাঁকে বিপদে ফেলতে এনেছে এখানে।

অল্প হেসে নিখিল বললে—কতটুকু দেশ, কটা বা লোক, যে রেলকোম্পানী দু'চারবার গাড়ী থামাবার কষ্ট স্বীকার করবে?

—কিন্তু এরকম পাণ্ডববর্জ্জিত জায়গায় আশ্রম করে কী উপকার হয়েছে শুনি?

বলাকা দেবীর রাগ দেখে আর না হেসে থাকতে পারে না নিখিল, দস্তুরমত হেসে ওঠে।

—পাণ্ডববর্জ্জিত হতে পারে কিন্তু দুঃখী-বর্জ্জিত নয় মিসেস চ্যাটার্জ্জি। চৌরঙ্গীতে বসে এদের কতটুকু উপকার করতে পারেন আপনি?

—চাইও না করতে। আমার প্রাণান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর দুঃখের একবিন্দু লাঘব হবে—না দুঃস্থের সংখ্যা একটা কমবে? নট্ এ সিঙ্গিল। তবে? ফরনাথিং খেটে মরি কেন?

তর্কের বিষয় বস্তুটা বড়, তবে স্থান কাল পাত্র অনুকূল নয়। তা'ছাড়া অতিথির মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে আবহাওয়া বদলে নেওয়া ভালো।

—বেশ পরের জন্যে নাই খাটলেন, নিজের জন্যেই খাটুন? হাঁটা ছাড়া গতি নেই—বলে হেসে ওঠে নিখিল।

তখনো—প্রতিমুহূর্ত্তে আশা করতে থাকে—খানিকটা অগ্রসর হ'তে হ'তেই হয়তো দেখা যাবে—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসা সাইকেল-রিক্সাখানার মধ্যে বাবার আগ্রহব্যাকুল মুখ-খানি, উৎসুক দৃষ্টি, ধবধবে খদ্দরের চাদরের একাংশ, সোনায় মাজা নীটোল বাহুর বলিষ্ঠভঙ্গী।

কিন্তু কই?

এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে হাঁটাই কি সম্ভব?

বাবার সম্বন্ধে কত গল্প করেছে সে মিসেস এবং মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির কাছে, গল্প করেছে—আশ্রমের সুন্দর-শৃঙ্খলা-সুব্যবস্থার কথা, উচ্চ আদর্শের কথা, সৌন্দর্য্যময় পবিত্র আবেষ্টনের মধ্যে নবপরিকল্পিত আশ্রম-গৃহের কথা—সবটা মিলিয়ে 'মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম' যেন একটা সুন্দর শিল্পসৃষ্টি, স্রষ্টা তার মহান চরিত্র পিতা।

বলাকা দেবাকে আসবার জন্যে অনুরোধ না করুক, প্রলুব্ধ একরকম করেছিল বৈ কি। তিনি হচ্ছেন সেই ধরণের স্ত্রীলোক যারা নিত্য নূতন হুজুক নইলে বাঁচে না। যা হয় একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত হওয়া, অধীর হওয়া, খেয়াল চরিতার্থ করতে না পেলে অধৈর্য্য হয়ে ওঠা, এই তাঁর স্বভাব।

অধ্যাপক স্বামীর নিস্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দ মিলিয়ে চলতে যে শুধু অক্ষম তাই নয়, রাজীও নয়।

অবাধ স্বাধীনতা উপভোগের যে অন্তরায় মেয়েদের জীবনে আসে তা' থেকেও তিনি মুক্ত।

চ্যাটার্জ্জি-দম্পতি নিঃসন্তান।

অটুট যৌবন আর অনবদ্য রূপ নিয়ে সুদীর্ঘ ত্রিশটা বছর ফ্যাসানের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে দিয়ে আর হুজুকের হাওয়ায় হৈ হৈ করে কাটিয়ে এলেন বলাকা দেবী।

কর্ম্মহীন অলস জীবন বটে, তবু তারুণ্যকে আটকে রাখবার একটা দুশ্চর তপস্যা আছে বৈ কি? তার জন্যে পরিশ্রম না করলে চলবে কেন? ত্রিশবছরকে আঠারোর রূপ দিতে না পারলে অষ্টাদশীর লীলাচাপল্য মানাবে কেমন করে?

শুধু মুখের উপর তুলি বুলোনোই নয়—হাসি, কথা, সামান্য ভঙ্গীটুকুও যে চারুশিল্পের অন্তর্গত একথা এতবেশী করে কে অনুভব করেছে বলাকা দেবীর মত?

এই আশ্রম দেখতে আসার দুরন্ত সখ, বাংলার পল্লী দেখে বেড়াবার সৌখিন আবদার—এও একরকম আর্ট নয় কি?

কাজেই মনে মনে যথেষ্ট বিচলিত হ'লেও চকচকে টাকটীতে হাত বুলিয়ে বিমর্ষমুখে সম্মতি দিতে হয়েছিল প্রফেসর চ্যাটার্জ্জিকে।

আশ্রম পরিদর্শন শেষ করে, যাবেন নিখিলদের জমিদারী দেখতে—এই রকম পরিকল্পনা বলাকা দেবীর।

মেদিনীপুর জেলার অনেকখানি অংশ জুড়ে নিখিলদের সুবিস্তৃত জমিদারী।

—আপনি এই ছায়াটায় বসুন, দেখি যদি ষ্টেশন মাষ্টারের পাত্তা পাই—নিখিল বলে।

—তিনি কি উপকারে লাগবেন?—ভ্রূ কুঞ্চিত করেন বলাকা দেবী।

—একটা গরুর গাড়ীর চেষ্টা দেখি—যদি সন্ধান দিতে পারেন ভদ্রলোক।

—গরুর গাড়ী? বল কি নিখিল? গায়ে ব্যথা হবে না?

—তবে কি আশা করেছিলেন আপনি? এরোপ্লেন? ওই জুটলেই এখন যথেষ্ট ভাগ্য বলতে হবে!

এই নিখিল ছেলেটীকে বলাকা দেবী ঠিক আয়ত্ত করতে পারেন না। শুনলে অবাক হ'তে হয়—ও প্রথমদিনে তাঁকে 'মাসীমা' বলে ডেকেছিল। হয়তো প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির টাকের অনুপাতে সম্বন্ধটা ধার্য্য করেছিল। অল্প বয়সে বেয়াড়া ভুঁড়ি আর বেখাপ্পা টাক গজিয়ে বিট্‌কেল করে তুলেছে লোকটা নিজেকে।

কিন্তু তাই বলে বলাকা দেবীকে 'মাসীমা'? একটী সুশ্রী সুকুমার তরুণ? যে বয়সের ছেলেরা 'দিদি' 'বৌদি' 'ছোড়দি' পাতিয়ে গদগদ ভক্তিতে মুখের কথায় প্রাণটা বিসর্জ্জন দিতে পারে—বয়সে বড় অথচ সুন্দরী মহিলাদের জন্যে!

সারারাত সেদিন ঘুম হ'ল না বলাকা দেবীর। 'মাসীমা' শব্দটা কেবলি ছুঁচের মত ফুটতে থাকে মনের মধ্যে আর কিভাবে ওটা পাল্টানো যায় তারই হিসাব করতে থাকেন।

অনেক কষ্টে অবশ্য সেই বিস্তৃত সম্বোধনটা ছাড়িয়েছিলেন—কিন্তু বান্ধবীর পর্য্যায়ে পড়তে পারলেন না আজ পর্য্যন্ত।

শিভাল্‌রি জ্ঞান নেই, মার্জ্জিত রুচির অভাব—হাজার হোক গাঁইয়া ভূত বৈ তো নয়—এই ভেবে আহত মনকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু ছেলেটা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী রত্ন সে কথাও যে অস্বীকার করা যায় না।

তা'ছাড়া ভালো চেহারা আর অনেক টাকার অধিকারী হ'লে তার ব্যবহারের ত্রুটি সহ্য করা যায়, এমন কি হাসিমুখেই করা যায়। "আপনাকে এনে কী কষ্টে ফেললাম··· না জানি আমাদের হতভাগা দেশকে কি ভাবছেন আপনি"··· ইত্যাদি বিনয়েগলা কথাগুলো বললে অবিশ্যি ভালোই লাগতো শুনতে, কিন্তু না বললেই বা করা যাচ্ছে কি?

—আচ্ছা ডাকো তোমার ভাগ্যকে—বলে নিখিল যে ছায়াটুকু নির্দ্দেশ করে দিয়েছিল সেই বড় বাদাম গাছটার গুঁড়িতে মাথা হেলিয়ে আঁকাছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন বলাকা দেবী।

মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে একচুল খাটো নয় · এ নিয়ে কাগজে কলমে আস্ফালন করা চলে, তর্ক করা চলে, 'লাঞ্ছিতা পদদলিতা' বঙ্গনারীর বিলুপ্ত দাবী নিয়ে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুদ্ধঘোষণা করা চলে, 'পুরুষের শাসন মানব না' বলে স্বামীর সঙ্গে কলহ করে পথে বেরোনোও চলে, তাই বলে তো আর বেঘোরে পড়ে দু'দশ মাইল পথ হাঁটা চলে না?

মেয়েদের বহন করে নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে পুরুষের এটা আবার বলতে হবে না কি কষ্ট করে?

নিজেকে এলিয়ে দেবার, 'আহা বেচারা' গোছ মনোভাব জাগিয়ে তোলবার, মাথার বোঝাকে মাথার মণি মনে করাতে পারবার যে সূক্ষ্মবুদ্ধিটুকু সেটুকুর দামই কি কম?

'স্বাধীনতা' শব্দের অর্থই যারা জানতনা, সেকালের সেই নিরক্ষর ঠাকুমা বুড়িরাই তলপি তলপা ব'য়ে পাহাড় ভেঙ্গে তীর্থভ্রমণ করে বেড়াতো, অসম্ভব জায়গায় অঘটন ঘটিয়ে কাঠ কেটে জল তুলে প্রিয়জনের আরামের আর আহার্য্যের উপকরণ সংগ্রহ করতো, কোনো মাধুর্য্য কোনো সৌন্দর্য্যের ধার ধারতো না। পুরুষের চক্ষুশূল সেই কাব্যগন্ধহীন স্ত্রীলোকগুলোর জন্যই 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা'র হিতোপদেশ ছিল।

আধুনিক মেয়েরা আর যাই হোক অত নীরেট নয়।

পথেঘাটে যথাসময়ে চায়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে সঙ্গিনীর মাথাধরার ভোগটাও যে পুরুষকেই ভুগতে হবে এ আবহাওয়াটা বাঁচিয়ে রাখবার কৌশল তা'দের জানা।

তাই নিখিলের সঙ্গে পল্লীভ্রমণ করে বেড়াবার সখের মধ্যে দ্বিধাবোধ করবার কিছু ছিল না বলাকা দেবীর। মাঠের মাঝখানে ছবির মত দাঁড়িয়ে পড়তে পারাটাও তো কম নয়?

* * *

পথ আর পথের দু'পাশের দৃশ্য হয়ে উঠেছে উপভোগ্য।

গরুর গাড়ীর উত্থান-পতনলীলার সঙ্গে তাল রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে উচ্ছ্বসিত হাসির বন্যায় খান্‌খান্ হয়ে যান বলাকা দেবী।

—কি মজা কি মজা, চমৎকার এক্সপিরিয়েন্স, হাড় কখানা কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো নিখিল? উঃ এই তোমাদের দেশের একমাত্র ভরসা? তোমাদের নিজেদের—মানে জমিদার-বাড়ীরও কি মোটর নেই এক-খানা? যদি থাকে, ঈশ্বরের দোহাই, সেখানা দখল করবো আমি যে ক'দিন থাকবো।

নিখিল এই প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে প্রাণখুলে যোগ দিতে পারে না, মনটা নানারকমেই বিগড়ে গেছে। দু একটা 'হাঁ' 'না' দিয়েই সারে।

গাড়োয়ান বেটা নেহাৎ চাষা বলেই মনে মনে ভাবে··· 'মাগী কি বাচাল বটে, খোকাবাবু আবার এটাকে জোটালে কোন্ চুলো থেকে? "আছ্রমের' জন্যে ম্যাষ্টারণী নিয়ে যাচ্ছে হবেক বা।'

প্রশ্ন করতে সাহসে কুলিয়ে ওঠে না।

বাবাকে অসুস্থ দেখতে হবে গিয়ে, এই ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিল নিখিল, কিন্তু গিয়ে যা শুনলো একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আশ্রমের ম্যানেজার নৃপেনবাবু যেরকম কুণ্ঠিতভাবে দিলেন সংবাদটা, সহজেই সন্দেহ হয় ভিতরের কোন গুরুতর তথ্য চেপে যাচ্ছেন।

স্তম্ভিত নিখিল অবাক বিস্ময়ে বার বার প্রশ্ন করতে থাকে—বাবা আশ্রমের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছেন? 'শালবনীর' কাছারী বাড়ীতে গিয়ে বাস করছেন? বলছেন কি বলুন তো? ব্যাপারটা ভালো করে বোঝান তো আমায়। আপনি বলছেন বাবা দু'মাস এখানে অনুপস্থিত—অথচ প্রত্যেক চিঠিই আমি এখানের ঠিকানায় দিচ্ছি এবং উত্তরও পেয়ে আসছি বরাবর! গত সপ্তাহেও—

নৃপেনবাবু মাথা চুলকে বলেন—চিঠিপত্রের জন্যে ওই রকম একটা ব্যবস্থা করা আছে কি না।

—কেন বলুন তো? অজ্ঞাতবাস না কি? না কি—তপস্যা টপস্যা কিছু করতে সুরু করেছেন?

সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস নৃপেনবাবুর গোঁফের অন্তরালে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন—আমাকে মাপ করতে হবে নিখিল বাবু! ধরুন নয় অজ্ঞাতবাসই, কিন্তু আমার মনে হয়—এক্ষেত্রে আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই ভালো—বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিখিলের পশ্চাদ্বর্তিনী মহিলাটীর দিকে তাকান।

বোঝা গেল এই অপরিচিতা মহিলাটীকে খুব সুদৃষ্টিতে দেখছেন না তিনি, এবং ওঁর সামনে ঘরের কথা খুলে বলতে নারাজ।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে ঈষৎ এগিয়ে এসে মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—কিন্তু কলকাতায় ফিরে যাবার কি দরকার হচ্ছে নিখিল? তোমাদের সমস্ত রাজত্বটা দেখে বেড়ানোই তো আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে? এক—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হওয়া—এখানে না হয়ে আর কোথাও হবে এই তো—ক্ষতি কি?

নিখিল অন্যমনস্ক সুরে বললে—ও আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না মিসেস চ্যাটার্জ্জি। বাবাকে তো আপনি জানেন না, বাবার পক্ষে কোনো কারণেই কোন গোপনতার আশ্রয় নেবার দরকার হতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে।

—তোমার সবই বাড়াবাড়ি নিখিল—বলাকা দেবী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—ছোট জিনিষকে বড় করে দেখার মানে হয় না কিছু। অতবড় জমিদারী তোমার বাবার, নানা কারণে গোলমাল বাধতে পারে, হঠাৎ যে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে না এমন কি কথা আছে? বর্ত্তমান যুগে প্রজা-বিদ্রোহ তো লেগেই আছে।

—বাবা বিষয়-সম্পত্তির কিছু দেখেন না কখনো।

—কখনো দেখেন না বলেই যে কখনো দেখবেন না এ তোমার অন্যায় আবদার নিখিল। তা'ছাড়া—চিরদিনই যে এই আশ্রম নিয়ে পড়ে থাকতে হবে এরও কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। বুড়ো বয়সে স্টেট নেবার ইচ্ছেও তো হ'তে পারে?

—বুড়ো বয়সে?—বিষণ্ণ চিত্তেও হেসে ফেলে নিখিল,—বাবাকে আপনি কি ভেবে রেখেছেন বলুন তো? পলিত কেশ গলিত দন্ত গোছের কিছু একটা? মাত্র বেয়াল্লিশ বছর বয়স তাঁর।

—বেয়াল্লিশ?

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ভুরু কুঁচকে তাকালেন বলাকা দেবী—হিসেবটা মিলোনো শক্ত হচ্ছে—আশা করি তুমি তাঁর পালিত পুত্র নও?

—নিশ্চয় না।

এইবার সকৌতুকে হো হো করে হেসে ওঠে নিখিল।

—সেকেলে জমিদার-বাড়ীর ব্যাপার বুঝতেই পারছেন—প্রবেশিকা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সংসার প্রবেশের পরীক্ষাটা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দ্দা ঠাকুমা কর্ত্তব্যের বোঝা হাল্কা করে বাঁচলেন—এদিকে বাবার প্রাণান্ত, কুড়ি বছর বয়স হতে না হতেই এ হেন পুত্ররত্ন লাভ!

বলাকা দেবী যেন ক্রমশঃই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন নিখিলের পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে। বলেন—প্রাণান্ত কিসে?

—এই তো—ছেলে বলে মানতেই চায় না লোকে। বাস্তবিক বাবাকে আর আমাকে হঠাৎ দেখলে ছোট বড় দুই ভায়ের মতন দেখতে লাগে। অবিশ্যি আমার চেয়ে অনেক ফর্সা রং বাবার।

বলাকা দেবী বাঁকা চোখে তাকালেন একটু, কারণ নিখিলের রংটাও ফেল্‌না নয়। পাকা সোনার মত উজ্জ্বল রং, সুশ্রী সুকুমার মুখ, আর দীর্ঘ উন্নত দেহ, সবটা মিলিয়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

—কিছু মনে করবেন না, আমাদের বংশটা রূপের জন্য বিখ্যাত, এখনো ঠাকুমাকে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, গরদের শান পরে থাকলে গায়ের রঙের সঙ্গে তফাৎ করা শক্ত হয়ে ওঠে। শুধু আমিই কালো আমার মায়ের মত, যদিও মাকে আমার মনে পড়ে না।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি হয়তো আলোচনাটা আরো চালাতেন কিন্তু বাধা দিলেন নৃপেনবাবু, বললেন—যাই হোক আজ রাত্রে তো আর কোথাও যাচ্ছেন না, এঁর ব্যবস্থাটা—

ব্যবস্থার কথা অবশ্য নিখিল কিছু ভেবে আসেনি, জানতো—'বাবা আছেন সব ঠিক হয়ে যাবে'—একটু ভেবে নিয়ে বললে—শৈলদিকে বললে—হবে না একটা কিছু?

—হবে না কেন? তবে আশ্রমের মেয়েদের তো সম্বলের মধ্যে কম্বল আর চটের বালিশ, তা'তে কি আর উনি—কথার শেষে ড্যাস দিয়ে ছেড়ে দিলেন বটে কিন্তু বেশ কিছু উহ্য থাকলো। মহিলাটিকে যে তিনি বিশেষ ভালো চক্ষে দেখেননি সেটা গোপন করবারও বিশেষ চেষ্টা দেখা গেল না।

নিখিল কিছু বলবার আগেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি লীলায়িত ভঙ্গীতে দুই হাত জোড় করে বললেন—রক্ষে করুন, আপনাদের কম্বলশয্যায় আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই, দয়া করে ইজিচেয়ার জোগাড় করে দেবেন একটা, রাতটা কেটে যাবে।

যেন এরকম জায়গায় ইজিচেয়ারটাই নিতান্ত সুলভ।

অবশেষে—ভেবে চিন্তে আশ্রমের ডাক্তার মিহির গুপ্তর কোয়ার্টার্স থেকে নেয়ারের খাট আর চাদর বালিশ আনিয়ে নিয়ে—বলাকা দেবী এবং আশ্রম উভয় পক্ষের মান বজায় রাখা হ'ল।

অনেক রাত্রে যথাসাধ্য সৌষ্ঠব বজায় রেখে বলাকা দেবীর আহার ও সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিখিল শৈলদির ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। বিভূতিবাবু এঁকে মাসীমা বলেন, সেই সূত্রে নিখিলের 'দিদি'।

আশ্রমের মহিলামহলের ইনিই কর্ণধার।

দরকার হ'লে আশ্রমবাসীদেরও কর্ণধারণ করতে ছাড়েন না। বাঘরাশ নৃপেনবাবু পর্য্যন্ত এঁকে ভয় করে চলেন। দুর্দ্দান্ত মানুষ নয়, খাঁটি মানুষ। যেমনি নিয়মী তেমনি পরিশ্রমী, বিভূতিবাবুর অনুপস্থিতিতে আশ্রমের কাজ আটকাচ্ছেনা, কিন্তু শৈলদি একদিন অনুপস্থিত থাকলে চালুমেসিন অচল।

এসময়টা তিনি আলো জ্বালিয়ে বইটই পড়েন নিখিল জানে, তাই দরজায় এসে দাঁড়ালো।

দরজার ভিতর ছায়া পড়তেই শৈলদি মুখ না তুলেই বই বন্ধ করে রেখে বললেন—আয় নিখিল, তোর জন্যেই আরো জেগে বসেছিলাম এতক্ষণ।

—বা রে আপনি জানলেন কি করে যে আমি আসবো?

—হাত গুণতে জানি। আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? 'বাবা কেন আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন'—এই জানতে এসেছিস তো?

—নাঃ সত্যিই হাত গুণতে পারেন দেখছি, ভাবছিলাম কি করে কথাটা পাড়ি। আচ্ছা বলুন তো সত্যি, আমি তো রহস্যের কূলকিনারা কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

—কূলকিনারা খোঁজবার চেষ্টা না করলেই বা ক্ষতি কি বল দিকিন? মনে কর আমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন।

বলে মৃদু হেসে চুপ করলেন শৈলবালা।

—যেটা অসম্ভব সেইটাই বা মনে করতে যাবো কেন শুনি?

হ্যারিকেনটার সামনে একটা বই আড়াল দিয়ে বোধ করি দৃষ্টিকটু আলোটা সহনীয় করে নিয়ে শৈলদি একটু থেমে বললেন—আর যদি ওর চাইতে আরো অসম্ভব, হাজার গুণ অসম্ভব কথা শোনাই, কি করবি?

হঠাৎ কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে নিখিল।

মধ্যরাত্রির থমথমে অন্ধকার, নিদ্রিত আশ্রম-বাড়ীর গভীর স্তব্ধতা, পিছনের বিরাট উন্মুক্ত প্রাঙ্গণবাহী ঝোড়ো হাওয়ার শনশনানি, আর অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত দীপশিখার কম্পমান ছায়ার আলো-আঁধারি, সবটা মিলিয়ে একটা গম্ভীর পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করেছিল, তার উপর সহজ মানুষ শৈলদির এরকম রহস্যাবৃত কথায় সারাদিনের ক্লান্ত দেহমন যেন অবশ অবসন্ন হয়ে আসে—দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার আর সাহস হয় না।

—কি রে ভয় পেয়ে গেলি না কি?

শৈলদি একটু শব্দ করে হেসে ওঠেন।

—না, ভয় করবো কেন? ভয়ের কি হচ্ছে?—নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নেয় নিখিল।

আবহাওয়াটা হালকা করে নেবার জন্যই বোধ করি শৈলদি সহজ পরিহাসের সুরে বলে ওঠেন—

—ভরসারই বা কি বল? তোর যে সৎমা হয়েছে রে—

—কি হয়েছে?

চমকানিটা সুস্পষ্ট।

শৈলবালা বলেন—ওই তো চমকে উঠলি! 'সৎমা' কথাটার মানে ভুলে গেছিস না কি রে? সাধুবাক্যে যাকে বিমাতা বলে। ঢুকেছে মাথায়?

—না:—বলে হতাশভাবে মাথা নাড়ে নিখিল।

—কেন? না ঢোকবার কি আছে? তোর বাবার কি বিয়ের বয়স ফুরিয়ে গেছে? চিরদিন সন্নিসি হয়ে থাকবে—এমন কি কথা?

—ঠাট্টা তামাসা ছাড়ুন শৈলদি, আসল খবরটা দিন আমায়।

এবার যেন একটু বিষণ্ন হয়ে পড়লেন শৈলদি—চেষ্টাকৃত হাসির আবরণ ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বলেন—ওইতো আসল খবর—বিভূতি এখান থেকে চলে গেছেন আশ্রমের একটী মেয়েকে নিয়ে।

—বিয়ে করে?

শুধু এই দু'টী শব্দ উচ্চারণ করতে পারলো নিখিল।

—হ্যাঁ লৌকিক বিয়ে একটা দিতে হ'ল বৈ কি, নইলে সমাজে মানবে কেন? বিভূতি রাজী হননি, আমিই একরকম জোর করে—

শৈলদি চুপ করে যান।

কাটলো কয়েক মুহূর্ত···হয়তো বা কয়েক যুগ···অসাড় মৃত গলায় নিখিল আর একবার প্রশ্ন করে—কিন্তু রাজী না হবার কারণ?

—বলছিলেন—'লোক দেখানো এ অনুষ্ঠানের কোনো মানে হয় না—গর্হিত কাজকে ভদ্রপোষাক পরিয়ে সমাজের সমর্থন নেওয়া আরো খারাপ; ওতে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।'—মেয়েটা একেই বিধবা তায় কায়স্থ কি না।

শেষের কথা কয়টা বেদনায় গভীর হয়ে আসে। ম্লান দৃষ্টি মেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকেন।

হয় তো এই মর্ম্মাহত মুখচ্ছবি দেখাতে চাননা বলেই।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কি বলতে গিয়ে দেখলেন নিখিল কখন উঠে গেছে।

নিখিল যে খুব বেশী মর্ম্মাহত হয়ে গেল তা' নয়, আচম্কা একটা ধারণাতীত বস্তুকে আয়ত্ত করতে গিয়ে যেন হাঁফিয়ে উঠল।

হঠাৎ আঘাতে বেদনা বোধের বৃত্তিটা অসাড় হয়ে যায়।

বিভূতিবাবুর নির্দ্দিষ্ট ঘরখানা তালাবন্ধ পড়ে ছিল, নৃপেন বাবু খুলিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। শৈলদির ঘর থেকে উঠে এসে মাতালের মত টলতে টলতে মেজের পাতা বিছানায় ঝুপ্ করে শুয়ে পড়লো।

খাট পালঙ্কের পাট এখানে নেই।

এদিকের দেয়াল ঘেঁসে জলচৌকির উপর একখানা কম্বল ভাঁজ করে গোটানো ও খান দুই মোটা মোটা বই—বিভূতিবাবুর অভিনব বালিশ।

আসবাবপত্র নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেয়ালে আটকানো আনলায় একখানা আধময়লা খদ্দরের চাদর ও একটা পুরনো গেঞ্জি ঝুলছে, কয়েকখানা ইটের উপর বসানো একটা ছোটোখাটো মজবুত ষ্টীল ট্রাঙ্ক, কুলুঙ্গিতে রক্ষিত একটি মাকড়সার জাল-বেষ্টিত ধূলি ধূসরিত জলের কুঁজো।

এই সম্পত্তি বিভূতিবাবুর।

ধনীর দুলাল বিভূতিভূষণ পূর্ণযৌবনের উদ্দাম তরঙ্গময় দিন থেকে এই সুদীর্ঘকাল এমনি কৃচ্ছ্রসাধন করে আসছেন। অকালগত স্ত্রীর পুণ্য নাম জড়িত "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রম" তাঁর সাধনার সিদ্ধি—জীবনের অবলম্বন। এর প্রতিটী ধূলিকণাও তাঁর স্নেহরসে সঞ্জীবিত।

দেশের বাড়ীতে গিয়ে যে অল্প কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে, সে নিতান্তই বৃদ্ধা জননীর অবুঝ কাতরতায়।

কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষীণ নক্ষত্রালোকিত বোবা আকাশের পানে বিনিদ্র দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে নিখিল···কে সেই অলোকসামান্যা নারী যার মোহে প্রায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত আযৌবন ব্রহ্মচারী তার পিতার ব্রত ভঙ্গ হ'ল?······সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করবার গোপন ছিদ্র আবিষ্কার করলো সে কোন্ ছলে? কোন্ দুর্নিবার আকর্ষণে সেই ধীর আত্মস্থ পুরুষ জীবনের সমস্ত সঙ্কটকাল অতিক্রম করে এসে এমন অদ্ভুত পরাজয় স্বীকার করলেন? ভূমিকম্প? বজ্রপাত? যা পাহাড় ভেঙে চৌচির করে দেয়, বিশাল শালবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে?······অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করে নিয়ে জেনে বুঝে তার কাছে আত্মসমর্পণ করার মত দুর্ব্বলতা কোথায় লুকানো ছিল তাঁর বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডে?······কোন অন্ধকার গুহায় লালিত কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভঙ্গের প্রচণ্ড ক্ষুধায় তার আদর্শ চরিত্র পিতার আজন্ম-অর্জ্জিত শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা শালীনতা রুচি প্রবৃত্তি সমস্ত একলহমায় গ্রাস করে বসলো?

নিরুত্তর প্রশ্নে আপনাকে আপনি ক্ষত বিক্ষত করতে করতে কখন একসময় ঘুম এসে গেল, বোধকরি নিতান্তই শারীরিক ক্লান্তিতে।

পরদিন সকালে বেশ কিছু বেলায় ঘুম ভাঙলো বলাকা দেবীর কলকাকলীতে।

—কী আশ্চর্য্য ছেলে তুমি নিখিল? এখনো পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছো? আর আমি কখন উঠে সমস্ত দেখেশুনে পুরানো করে ফেললাম।

ঘুমে ভারী চোখের পাতা কষ্টে খুলে প্রথমটা ঠাহর করে উঠতে পারে না নিখিল, আছে কোথায় সে।

মাথাটা একবার ঝেড়ে উঠে বসে চারিদিক তাকিয়ে সমস্ত মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল গত রাত্রির তীব্র চিন্তার গ্লানি।……

অন্য বারে যখন এসেছে—এই সময় ডেকে ঘুম ভাঙাতেন বাবা, প্রাতর্ভ্রমণ সেরে আশ্রমের বাগান দেখাশোনা করে এতক্ষণে ফিরবার সময় হ'ত তাঁর।……

চিরদিনের ঘুমকাতুরে নিখিলের বিছানার কাছে ঈষৎ অবনত হয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহ পরিহাসের সুরে ডাকতেন—"কি হে নিখিলবাবু, নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল? কলকাতায় থেকে ঘুমের অভ্যাসটা বেশ বাদশাহী করে তুলেছ বাপ, জমিদারের নাতি বটে। গাত্রোত্থান হবে না কি? আপনার 'অনারে' আজ আশ্রমে রীতিমত ভোজের ব্যবস্থা যে—ছেলেমেয়েগুলো ভাবছে ফস্কে গেল বুঝি বা।"……

সেই তার পরম স্নেহময় পিতার অভাবে বিকল মনটা অকারণে হঠাৎ মিসেস চ্যাটার্জ্জির উপর খাপ্পা হয়ে উঠলো। কুক্ষণে তাঁকে সঙ্গে এনেছিল। 'অপয়া' কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে মেয়েদের মতন।

আবার একবার হাসির সঙ্গে কথার সুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো—কই উঠলে? খুব ঘুম তো?…সঙ্গে সঙ্গে দরজার ফাঁকে দেখা গেলো একখানি প্রসাধন-রঞ্জিত উজ্জ্বল মুখ। এই ভোর বেলাতেই সারা হয়ে গেছে সমস্ত বেশ-বিন্যাস, কাজলের রেখা, ঠোঁটের রং, ভুরুর ভঙ্গিমা, চিবুকের ডানপাশ ঘেঁসে একটী কৃত্রিম তিল, ব্যতিক্রম হয়নি কিছুর—সব কিছু নির্ভুল পরিপাটি।

বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা তিক্ত হয়ে উঠলেও বাহ্যিক ভদ্রতার হাসি হেসে বলতে হবে একটা কিছু, করতে হবে হাসিখুসির অভিনয়।

বাবার পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত ঘরে শ্রদ্ধালেশহীন মিসেস চ্যাটার্জ্জির স্যাণ্ডাল শোভিত পদক্ষেপের ভয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে নিখিল।

যা হয়েছে হোক, সে অবর্ণনীয় ক্ষতির পরিমাপ করা শক্ত, কিন্তু যা ছিল—তা'র অবমাননা করবে কোন্ হিসেবে? দেখলে—গতরাত্রির বিক্ষোভ কখন শান্ত হয়ে গেছে। সেই অবিশ্বাস্য কলঙ্ককাহিনী স্মরণ করতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কই পিতার বিরুদ্ধে খুব একটা দুরন্ত ঘৃণা অথবা দুর্জ্জয় ক্রোধ কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছে না মনের মধ্যে?

শুধু একটা সকরুণ বেদনাবোধ। হয় তো সূক্ষ্ম একটু অভিমান।

কেন তিনি শ্রদ্ধা-সম্মানের উচ্চ শিখর থেকে নেমে এলেন পথের ধূলোয়? নিজেকে দাঁড় করালেন অপরের বিচার-দৃষ্টির সামনে?

নিখিলের যা ক্ষতি হয় হোক, রাস্তার পাঁচজনে এসে তার পূজার দেবতার গায়ে ধূলো দিয়ে যাবে, এ চিন্তা অসহ্য।

বলাকা দেবী ওর মুখের পানে চেয়ে একটু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—সারারাত ঘুম হয়নি না কি নিখিল? মুখ চোখ এমন শুকিয়ে গেছে যে?

—এমনি। ঘুমটা হয়নি ভালো, আপনি ঘুমোতে পেরেছিলেন তো?

—মন্দ নয়। টায়ার্ডও কম ছিলাম না তো? তাই বলে তোমার মত আজ পর্য্যন্ত তার জের টানছিনা মহাশয়। কই এখানে কি কি দ্রষ্টব্য আছে সেগুলো দেখিয়ে দাও চটপট্?

—দ্রষ্টব্য? দ্রষ্টব্য বলতে এখানে আর কি-ই বা আছে?

নিখিল একটা আলস্য ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বললে—বরং তোমাকেই এখানে দ্রষ্টব্য মনে করতে পারে লোকে।

আশ্রম পরিদর্শন করতে অবশ্য মাঝে মাঝে আসে লোকে। নানা বিভাগ, নানা প্রকার কাজকর্ম্ম, আশ্রমবাসী দুঃস্থ অনাথদের শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহায্য-কেন্দ্রের হিসাব নিকাশ—সব কিছু দেখিয়ে বেড়াবার উৎসাহ তারও কম ছিল না, সুযোগ পেলে করতে ছাড়ত না।

আজ আর কোন প্রেরণা খুঁজে পেল না। যে উৎসাহে মিসেস চ্যাটার্জ্জির কাছে আলোচনা করেছে আগে, তার একতিলও অবশিষ্ট নেই।

কাজকর্ম্ম হয় তো ঠিকভাবেই চলছে, কিন্তু নিখিলের কাছে ওর যথার্থ কোনো মূল্য আছে কি? প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর শূন্যমণ্ডপের মতই অর্থহীন আকর্ষণহীন।

নিখিলের বিপর্য্যস্ত মনের খবর বলাকা দেবীর চতুর দৃষ্টিতে ধরা পড়তে দেরী হ'ল না, কারণ এইমাত্র আশ্রমের একটী নিতান্ত নির্ব্বোধ মেয়ের কাছ থেকে সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত তথ্যই সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

মুখটিপে হেসে বললেন—বিমাতার তাড়নার ভয়ে ধ্রুব যে এখুনি শুকিয়ে উঠলেন।

নিখিল চকিতে মুখ তুলেই নামিয়ে নিলে।

কি আশ্চর্য্য! ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সুখবরটী দিলে কে এঁকে? শৈলদি কি আর গল্প করবার লোক পেলেন না? কিন্তু তাই কি সম্ভব? নিজে বয়সে অনেক বড় হ'লেও বিভূতিবাবুর উপর তাঁর অচঞ্চল শ্রদ্ধা-ভক্তির খবর তো নিখিলের অবিদিত নয়।

কে বললে?

কী বলেছে, কতদূর বলেছে, কত কি বানিয়ে বলেছে কে জানে!

ধিক্কারে মাথা হেঁট হয়ে গেলেও নিজেকে নিজে সামলে নিলে নিখিল! সত্যি, খেলো হয়েই বা পড়বে কেন সে?

হেসে উঠে বলে—শুকিয়ে উঠবো কেন বলুন তো? বরং মাতৃহীন হতভাগা একটী মা পাওয়ার খবরে খুসীই হয়েছি, বাবাকে তবু আমাদের একজন বলে মনে হচ্ছে।

বানানো কথাটা বলতে গিয়ে নিখিল হঠাৎ যেন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠলো। কথাটা সত্যি নয় তো?

একান্ত প্রিয়জনকে দেবতা ভাবতে পারার একটা গৌরব আছে সত্যি, কিন্তু 'মানুষ' ভাবতে পারার মধ্যে কি কিছুই নেই? কিছু তৃপ্তি, কিছু নিশ্চিন্ততা?

এই সময় দালানের ওদিক থেকে শৈলদির গলার স্বর শোনা গেল, এবং কেউ কিছু বলবার আগেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি ঘাড় ফিরিয়ে বলে উঠলেন—তোমাদের এখানে চায়ের ব্যবস্থা কি একেবারেই নেই না কি? তা'হলে তো দেখছি এখুনি কলকাতার টিকিট কাটতে হয়। এমন জানলে—

ছাঁটা চুল, ছোটোখাটো গড়ন, একখানি থান মাত্র পরা, শ্যামবর্ণ মানুষটীকে দাসী ব্যতীত আর কিছুই ভাবেননি বলাকা দেবী। তা'ছাড়া গত রাত্রে খাওয়া শোওয়ার সমস্ত ব্যাপারে একেই খাটতে দেখেছেন।

শৈলদির বুঝতে দেরী হয় না ব্যাপারটা, কিন্তু নিখিল অবাক বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকাতে থাকে—কার উদ্দেশে কথা ক'টি উচ্চারিত হ'ল দেখতে।

একমাত্র শৈলদিই আসছেন নিখিলের কাছে।

—এই যে মা, চায়ের জন্যেই ডাকতে এসেছি। নিখিল আর কত শুয়ে পড়ে থাকবি? নে শিগগির চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নে, ডাক্তার বাবুর ওখানে আজ তোদের চায়ের নেমন্তন্ন।

ব'লে যুগপৎ উভয়কেই চমকিত করে দিয়ে শৈলদি এসে দাঁড়ালেন।

বলাকা দেবী উদ্বিগ্ন মুখে ঈষৎ নীচুস্বরে দ্রুত উচ্চারিত ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন—কি আশ্চর্য্য! উনি তোমার আত্মীয়া না কি?

—শুধু আত্মীয়া নয়, রীতিমত শ্রদ্ধেয়া গুরুজন, কিন্তু বাংলায় বললেও ক্ষতি ছিল না, উনি দুটো ভাষাই বোঝেন —কণ্ঠস্বরে মনের চাপা বিরক্তি কতকটা প্রকাশ করে ফেলে নিখিল এগিয়ে বলে—কিন্তু আজকেই হঠাৎ ডাক্তারবাবুর এত ভক্তি উথলে উঠলো কেন বলুন তো শৈল দি?

—কার কখন কি জন্যে ভক্তি উথলে ওঠে আমি তার হিসেব রেখে বেড়াচ্ছি বুঝি? আর—মানুষ মানুষকে নেমতন্ন করবে না তো বনের পশুপক্ষীকে করতে যাবে না কি রে?

বলে প্রশ্নের উত্তরটা এড়িয়ে গেলেন শৈল দি। কারণ আসল খবর, নিমন্ত্রণটা তাঁরই ব্যবস্থার ফল।

নিখিলও যে কতকটা অনুমান না করে এমন নয়, কিন্তু বেশী কথা বাড়ায় না। যদিও বেশী দূর যেতে হবে না— আশ্রম-সংলগ্ন একখানি ছোট বাংলোয় ডাক্তার বাবুর বাসা, তবু নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা নিখিলের তেমন পছন্দ হ'ল না। চক্ষু-লজ্জা তো বটেই, তা'ছাড়া বলাকা দেবীকে নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াবার স্পৃহা তা'র আর বিন্দুমাত্রও নেই।

অথচ—প্রতি কথায় কলকাতার টিকিট কাটার কথা তুললেও তিনি যে এখন সহজে কলকাতায় ফিরে যেতে চাইবেন না, এটা যেন ক্রমশঃই টের পাওয়া যাচ্ছে।

যারা উপভোগের খাতিরে দুর্ভোগ সইতে পিছপা হয় না, তাদের দলের লোক বলাকা দেবী। কিন্তু মজা এই— প্রতি মুহূর্তে খুঁৎ খুঁৎ করবেন, বিরক্তি প্রকাশ করবেন এবং ইচ্ছে করে তাঁকে কষ্টে ফেলা হয়েছে—এই রকম একটা স্পষ্ট অভিযোগের ভাব সর্ব্বদা চোখে মুখে ফুটিয়ে রাখতে দ্বিধা করবেন না।

অথচ তারই ফাঁকে ফাঁকে বজায় রাখতে চাইবেন কিশোরীর লীলা-চাপল্য। হয় তো ছুটবেন একটা রঙিন প্রজাপতির পিছনে, উঠতে যাবেন গাছের ডালে, অক্ষমতার লজ্জায় হেসে খান্ খান্ হয়ে পড়বেন গড়িয়ে।

কিন্তু এ সব নাটুকেপণা ভালো লাগবার মত মনের অবস্থা এখন নিখিলের নয়।

ভালো অবশ্য কোনো দিনই লাগে না। চ্যাটার্জ্জি-গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ নিতান্তই চ্যাটার্জ্জি-সাহেবের খাতিরে। এই আর একটী যথার্থ শ্রদ্ধা করবার যোগ্য মানুষ দেখেছে নিখিল, যাঁকে প্রায় তার বাবার মতই আদর্শ-চরিত্র বলে মনে হয়।

আজন্ম খদ্দরধারী নিরীহ অধ্যাপক। তাঁর নামের পিছনে 'সাহেব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে সমাজে চালিয়ে বেড়াতে পারার সমস্ত ক্রেডিটটাই মিসেস চ্যাটার্জ্জির।

অধ্যাপকের কাছে যারা আসে, প্রথমে তাদের পক্ষে অধ্যাপক-পত্নীকে চেনবার প্রয়োজন কিছুই হয় না, কিন্তু তলে তলে কোথায় কি মন্তর চলে—স্বয়ং অধ্যাপককেই শেষে

চিনতে পারে না তারা। বেড়াতে আসবার সময়টা বেছে বেছে নির্দ্দিষ্ট করে রাখে অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সময়টা।

নিখিল ঠিক সে দলের নয় বলেই বোধকরি বলাকা দেবী ধরে ফেলেছেন ওর আর একটা রীতিমত দুর্ব্বলতার দিক—ওর অতিমাত্রায় চক্ষুলজ্জা আর সূক্ষ্ম ভদ্রতা-বোধের দুর্ব্বলতা!

নিখিল ইসারায় নিমন্ত্রণে অনিচ্ছার কথা জানাবার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু শৈলদি ততক্ষণে রান্না বাড়ীর ওদিকে চলে গেছেন। মিসেস চ্যাটার্জ্জি বললেন—আচ্ছা, তুমি তৈরি হয়ে নাও, আমি শাড়ীটা বদলে আসি।

—কেন, বেশ তো আছেন? মন্দ কি শাড়ীটা?

—বাঃ তা' বলে ভদ্রলোকের বাড়ী যাবার মত নয়।

বলে প্রিণ্টেড্ শাড়ীখানা ছেড়ে বোধকরি ঢাকাই পরতে গেলেন।

শৈলবালা রান্নাঘর থেকে কি একটা কাজে ঘুরে এদিকে আসতে গিয়ে নিখিলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—ভালো কথা—কাল থেকে জিগ্যেস করাই হ'ল না কথাটা, মেয়েটা কে রে নিখিল?

নিখিল মৃদু হেসে বললে—'মেয়েটা' কি গো শৈলদি? বলুন মহিলাটী? না আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। এটিকেটের ধার ধারেন না, সভ্য ভাষা ব্যবহার করেন না—অচল অচল।

—অচল বটে, কিন্তু মেকি নয়, বুঝলি? এ মেকি টাকাটাকে কোথা থেকে জোটালি বলতো?

—প্রফেসর অরুণ চ্যাটার্জ্জির গল্প করেছিলাম না? তাঁর স্ত্রী।

—প্রফেসরের বৌ? বয়স কত বল তো? খুকীর মত নেচে বেড়াচ্ছে!

—সর্ব্বনাশ করেছে, আবার আপনি ভদ্রতার বাইরে চলে যাচ্ছেন শৈলদি, মেয়েদের বয়সের কথা জানতে আছে?

—কি জানি বাবু, আমাদের ওসব চোখে সয়না। ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের বৌ রং মেখে সং সেজে বেড়াবে কি? ছিঃ।

নিখিল উত্তর দেবার আগেই বলাকা দেবী সেণ্ট স্নো আর পাউডারের একটা সম্মিলিত সুবাস বহন করে হালকা হাওয়ার মত ভেসে এলেন।

—কই, হ'ল তোমার? উঃ চায়ের অভাবে তো মাথা ধরে উঠলো। চলো দেখি ভাগ্যে কি জোটে।—বলে শৈলদিকে প্রায় আড়াল করে নিখিলের গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তাঁরও চোখে সয়না নেহাৎ বাজেমার্কা একটা বুড়ির সঙ্গে নিখিলের এমন সহজ হাস্যালাপ। এই বুড়িটাকেই বরং মাসী পিসি বললে কোন ক্ষতি ছিল না, ওকে আবার 'দিদি'—রুচিকে ধন্যবাদ!···

কী মুরুব্বিয়ানা চালের কথাবার্ত্তা বুড়ির, শুনলে হাড় জ্বলে যায়।

আশ্রমের হাতার মধ্যেই একটেরে মিহির ডাক্তারের আড্ডা। উঁচুপোতার উপর খড়ের ছাউনী দেওয়া নীচু বাংলা। ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে ছাউনীতে হাত ঠেকে, জানলা দরজারও যে বিশেষ বাহুল্য আছে এমন নয়, কিন্তু বারান্দাটী চমৎকার।

বেশ কয়েকটী সিঁড়ি উঠে সামনেই কাঠের রেলিং ঘেরা লাল সিমেণ্টের চওড়া বারান্দা, বসলে যতদূর দৃষ্টি চলে উদার উন্মুক্ত মাঠ। দৃষ্টি কোনখানে ব্যাহত হয় না। দূরাঞ্চলে ঘন শালবন আকাশের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গেছে।

এই বারান্দায় খানকয়েক বেতের চেয়ার পেতে ডাক্তার অতিথি যুগলের প্রতীক্ষা করছিলেন। ছোকরা ডাক্তার, অবিবাহিত মানুষ, কিন্তু অবিবাহিতদের মত বাউণ্ডুলে নয়, সৌখিন ফিটফাট।

আসবাবপত্র বেশী নয়, খুব যে মূল্যবান এমনও নয়, তবে রুচিসম্মত। বেশভূষাতে আশ্রমবাসীর কৃচ্ছ্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই।

প্রথম দিন এসেই তিনি দরাজগলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন—'সেবাশ্রমের' চাকরী নিয়ে এসেছি বলেই যে সেবানন্দ স্বামী বনে বসে থাকবো সেটী মনে করবেন না বিভূতিবাবু। আপনাদের ওসব কম্বলাসন আর কচুভক্ষণের মধ্যে আমি নেই। আমি আর আমার চাকর রাঁধবো বাড়বো খাবো-দাবো, আর মাঝে মাঝে ব্যাগ বগলে করে কে কোথায় আপনার বিনিচিকিৎসায় মরছে তার হিসেব নিয়ে আসবো—ব্যস্।

বিভূতিবাবু সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন—চিকিৎসাটা কে করবে? আমি? আপনি শুধু হিসেব নিয়েই খালাস?

—চিকিৎসা? চিকিৎসার আবার আছে কি মশাই? রোগ তো দারিদ্র্য! সে রোগের দাওয়াই যদি আমার ষ্টকে থাকতো তাহলে কি আর এই অজ পাড়াগাঁয় মরতে আসতাম? যখন দেখি—বেটা বেটিদের চালে খড় নেই, ঘরে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, রোগে পথ্যি নেই, অথচ কুইনিন ঠুসে ঠুসে পেটজোড়া পীলেটিকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছেটুকু আছে ষোলো আনা, তখন বাসনা হয় দিয়ে দিই একেবারে মোক্ষম দাওয়াই ঠুকে। কি করবো, আইনের দড়াদড়িতে হাত পা বাঁধা যে।

বলাবাহুল্য নবনিয়োজিত ডাক্তারের অভিনব মতামত শুনে

বিভূতি বাবু ভয় খাননি। এ বোধটুকু তাঁর ছিল—প্রাণে দরদ না থাকলে গলায় এমন দরাজসুর ফোটে না।

—এই যে আসুন, আপনাদের নেমন্তন্ন করে আমার তো মশাই পিত্তি পড়ে গেল—দুই হাত জোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিতের সম্বর্দ্ধনা করলেন ডাক্তার।

—বিলক্ষণ, আপনাদের দেশে এসে আমারও—মিষ্টিহাসি হেসে মিসেস চ্যাটার্জ্জি বারান্দায় উঠে এসে একখানি চেয়ার দখল করে বসলেন।

—নিখিলবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে? গলবস্ত্রে অনুরোধ করতে হবে না কি? বসে পড়ুন, হাত চালান।

মিহির ডাক্তার সকলেরই বন্ধুলোক। বিভূতিবাবুর সঙ্গে এবং নিখিলের সঙ্গে একই সুরে কথা কইতে তাঁর বাধে না।

আহারের আয়োজন নিতান্ত সামান্য নয়, রসনার সঙ্গে রসালাপ চললো বেশ কিছুক্ষণ। এবং মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞতা বোধ করল নিখিল এই দেখে—যে ঘুণাক্ষরেও একবার বিভূতিবাবুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন না ডাক্তার।

—ভারী খুসি হলুম আপনার সঙ্গে আলাপ করে। কাল থেকে তো এসে পর্য্যন্ত হাঁফিয়ে উঠেছিলাম।

বলাকা দেবীর এই মধুর সার্টিফিকেটের উত্তরে ডাক্তার কিছু একটা বলার আগেই নিখিল বলে উঠলো—ডাক্তারবাবুর আর একটা গুণের কথা শোনেন নি মিসেস চ্যাটার্জ্জি—উনি একজন লেখক।

—আই সি। পুরো নামটা কি? মিহির—

—মিহির গুপ্ত। কিন্তু সাহিত্যের আসরে ও নামে পরিচিত নয়, ছদ্মনাম আছে একটা—"বিক্রমাদিত্য"।

—ছদ্মনাম কেন?

—সাহসের অভাব, আর কেন—ডাক্তার হেসে ওঠেন।

—"বিক্রমাদিত্য"—"বিক্রমাদিত্য"—ও—ভ্রূ কুঁচকে বলাকা দেবী স্মরণ করতে চেষ্টা করেন—আপনারই লেখা "নীল জ্যোৎস্না" না?

ভেবে চিন্তে একখানি বইয়ের নাম মনে আনা লেখকের পক্ষে অবশ্য খুব বেশী গৌরবের নয়। ডাক্তার কিঞ্চিৎ নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসেন। কিন্তু এর চাইতে গৌরব ক'জনার ভাগ্যেই বা ঘটে?

পাঠক সম্প্রদায়ের—বিশেষ করে পাঠিকা সম্প্রদায়ের মধ্যে বারো আনা অংশ তো লেখকের নাম দেখে বই পড়ার বা বই পড়ে লেখকের নামটুকু মনে রাখার কষ্টস্বীকার করতে নারাজ। ঘুমের সহায়ক হিসেবে যাঁরা বই হাতে করেন, তাঁদের কথা বাদ দিলেও, বলাকা দেবীর সংখ্যাও কম নয়।

ফ্যাসানের খাতিরে বিখ্যাত লেখকের লেখা কিছু কিছু পড়ে রাখা দরকার, আলোচনা চালাতে হলে কথার পিঠে কইতে পারার মত কিছু কথা শিখে রাখা দরকার এই হিসেবেই যা কিছু করা। যেমন..."মন্বন্তর" পড়েন নি? আছেন কোথায়?..."উদয়াচল" দেখেন নি? লোকালয়ে মুখ দেখাবেন না—"..."নবান্ন" দেখে এলেন? বাস্তবিক মার্ভেলাস।"

সৌভাগ্যের বিষয় "নীল জ্যোৎস্না" সম্প্রতিই পড়ে এসেছিলেন বলাকা দেবী। গল্প চালাবার একটা সুযোগ পেয়ে সোৎসাহে বলে উঠলেন—বলতে হয় এতক্ষণ? সাহিত্যিক মানুষের সঙ্গে কথা কইছি ভেবে সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতাম।

—সাহিত্যিক তো আর একটা কিম্ভূত জীব নয়? মিহির গুপ্ত হেসে ওঠেন।

—আমাদের কাছে। কিম্ভূত না হোক অদ্ভুত তো বটেই। আচ্ছা কি করে আপনারা লেখেন বলুন না—আবদেরে খুকীর ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে ফ্যালফেলে দু'টি চোখের দৃষ্টি ডাক্তারের মুখের উপর তুলে ধরলেন ভদ্র মহিলা।

—ও আর কি শক্ত। চেষ্টা করলেই হয়। ধরুন—আপনারা যেমন একটা পশমের তাল নিয়ে সামান্য দুটো কাঁটার সাহায্যে ঘরের পর ঘর বাড়িয়ে মাফ্‌লার সোয়েটার মোজা টুপি কত কি গড়ে তোলেন, এও একরকম তাই। ভাবের তাল থেকে কথার জাল বুনে বাড়িয়ে বাড়িয়ে গল্প গড়ে তোলা এই আর কি। তফাতের মধ্যে আমাদের যন্ত্র মোটে একটা।

—আর ব্রেণের খাটুনীটা বুঝি কিছু নয়?

—হ্যাঁ, ওই একটু বাজে খরচা আছে বটে—ডাক্তার মুচ্‌কি হাসলেন।

—উঃ আমার তো মনে করলে ভয় করে, একটা চিঠি লিখতে গেলেই মাথায় বজ্রাঘাত।

—সেটা মাথার গুণ। ডাক্তার আর একবার মুচ্‌কি হাসলেন।

—সম্প্রতি আর কি লিখছেন ডাক্তার বাবু? নতুন কোনো উপন্যাসে হাত দিয়েছেন না কি?

নিখিল প্রশ্ন করলে।

ডাক্তার বাবু মুখটা ঈষৎ পাশ ফিরিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করছিলেন—জ্বালিয়ে নিয়ে ধীরে সুস্থে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উত্তর করলেন—কি বললেন—নতুন কিছু লিখছি কি না? কই আর লিখলাম মশাই, প্লট কই?

—বলেন কি? বর্ত্তমান যুগে আবার প্লটের অভাব?

ফোড়ন কেটে উঠলেন বলাকা দেবী।

'বাঙালী তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসে আছে' সত্যি, কিন্তু বাংলার মেয়ে আজও সেটা হারায়নি। এখনো—

তার প্রপিতামহীর কিছুটা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে—নিজের অতি আধুনিক স্বভাবের ফাঁকে ফাঁকে।

অপরের কথায় ফোড়নকাটা তার একটী।

কাজেই আলোচনার মোড়টা ঘুরে যায় তাঁর দিকে, নীরব শ্রোতা নিখিল অন্য মনস্কের মত তাকিয়ে থাকে সুদূর-বিস্তারি খোলা মাঠের পানে। বাংলাদেশ বটে, তবু বাংলার সেই সুজলা সুফলা রূপ এ অঞ্চলে কম। রুক্ষ প্রান্তর, দৃষ্টি কোথাও ব্যাহত হয় না।

আঁকা ভ্রূ বাঁকিয়ে রঞ্জিত ওষ্ঠাধরের রক্তিম হাসিটুকু মুছে একটু করুণ রসের প্রলেপ লাগিয়ে বলাকা দেবী আবার বলে উঠলেন—এই যে—চতুর্দ্দিকে অভাব অভিযোগ দুঃখ দারিদ্র্য হাহাকার, এই যে মারী মন্বন্তর—তের শো পঞ্চাশের শোচনীয় লীলা—এর মধ্যে আবার প্লটের অভাব? এই তো দিন এসেছে আপনাদের—সাহিত্যিকদের—

বাধা দিয়ে শব্দ করে হেসে ওঠেন মিহির ডাক্তার—তা যা বলেছেন, এই তো দিন এসেছে আমাদের। 'কিউ' 'কণ্ট্রোল' আর 'কালোবাজারের' মত খুচরো ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিলেও তের শো পঞ্চাশই আমাদের অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে। শেয়াল কুকুরের মত কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া লোক অন্নজলের অভাবে রাস্তায় পড়ে মরে গেল বটে—কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকদের কিছুকালের অন্নজলের সংস্থান করে দিয়ে গেল।

—তার মানে?

কথাটার নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে একটু মুস্কিলে পড়ে যান মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

—মানে তো একটু আগে আপনিই বলে দিলেন—আজকালকার দিনে আবার প্লটের অভাব? ধরলেই হ'ল কলম, কালির খরচা পর্য্যন্ত নেই। সেই বঞ্চিত হতভাগ্যদের বুকভাঙা রক্তে কলমটা একবার ডুবিয়ে নিতে পারলেই হ'ল, সাদা কাগজ আপনিই রেঙে উঠবে। কে কত বীভৎসতা ফুটিয়ে তুলতে পারে, কে কত নোংরামির সৃষ্টি করতে পারে—লেখক মহলে তারই তুমুল প্রতিযোগিতা। মেলার বাজারের পাপর ভাজার মত পড়তে পাচ্ছে না, বাদাম তেলেই ভাজুন আর রেড়ির তেলেই ভাজুন, চলে ঠিকই যাচ্ছে।

—তা হলে আপনি বলতে চান এসব লেখা ঠিক নয়?

—কে বলেছে ঠিক নয়? ঠিকই তো, শুধু আমি পারিনে, আমার অক্ষমতা।

—কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সাহিত্যিকরাই তো দেশকে বাঁচিয়ে তুলেছে জাগিয়ে তুলেছে, জাতিকে দিয়েছে নতুন প্রেরণা নতুন আলো—ফুলের মধু চাঁদের আলোর দিন তো আর নেই। এখনো কি লোকে প্রেমের স্বপ্ন দেখবে?

আলগোছে শিথিল খোঁপাটাকে একটু চাঙ্গা করে দেন বলাকা দেবী দুটি বাহুর আলস্যমন্থর লীলায়িত ভঙ্গীতে। শিথিল কবরী পীঠ ও ঘাড়ের ঠিক সন্ধিস্থলে যাতে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় আটকে থাকে—স্থানচ্যুত না হয়।

মিহির ডাক্তার হয় তো এইখানেই একটু মুচকে হেসে থেমে যেতেন, কিন্তু বলাকা দেবীর উচ্চাঙ্গের কথাগুলো কানে যেতেই বোধকরি অন্যমনা নিখিল চকিত হয়ে উঠেছিল, তাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় ডাক্তারের মুখের পানে উত্তরের আশায়।

ডাক্তার এবার একটু গম্ভীর হয়ে ওঠেন পরিহাসের ভঙ্গী ত্যাগ করে, ঈষৎ চড়া গলায় বলেন—হ্যাঁ জাতিকে গড়ে তোলবার ভার সাহিত্যিকেরই বটে, কিন্তু তারও তো একটা অধিকার থাকা চাই? উড়তে শিখলেই আরশোলা পাখী হয় না। কলম ধরলেই সাহিত্যিক হয় না। আমার কলমে হাল্কা প্রেমের গল্পের বেশী যদি না ফোটে তা'তে হাত পা ছুঁড়বার কি আছে? একটা ভাল গল্প গড়ে তুলতে পারি তাই ঢের, জাতি গড়বার বায়না নেব কোন সাহসে? আর গড়া কাকে বলে? আমরা যে কত বঞ্চিত কত অধঃপতিত, কত লোভী কত শয়তান, কত দীনদুঃখী কঙ্কালসার, তারই বিশদ ছবি আঁকার নাম জাতিগঠন? পেটের দায়ে ভদ্রঘরের মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে নেমেছে, কাপড়ের অভাবে মানুষ কবরের কফিন খুঁড়ছে—এই খবরটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে রং দিয়ে চড়াদামে বাজারে ছাড়তে পারার নাম নতুন আলো আনা? ……………বাঙালী ছাড়া আর কেউ বাংলা পড়ে না এই রক্ষে। ভেবে দেখুন দিকিন, আমাদের আজকের সাহিত্য যদি পৃথিবীর অন্য সভ্যদেশে অনুবাদ হ'তো, কি পেতো তারা? ইনিয়ে বিনিয়ে দুর্দ্দশার কাঁদুনী গাইতে লজ্জা করে না? যে দুর্দ্দশার মূল আমাদের নিজের লোভ আর নিজের পাপ?

—আর বিদেশীদের অত্যাচারটা বুঝি কিছু নয়?

—কিছু তো বটেই, কিন্তু 'কিছু'ই সম্পূর্ণ নয়।—যাদের অত্যাচারে এই মন্বন্তর, তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করবার জন্যে যদি কলম ধরতে চান সেটা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। আর যাইহোক—বাংলা গল্প উপন্যাস তা'রা পড়ে না, আমি হলফ্ করে বলতে পারি। লাভের মধ্যে কি হচ্ছে জানেন? এই একঘেয়ে বীভৎসতার কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয়বৃত্তিগুলো ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যাচ্ছে আমাদের। চাঁদের আলো পাখীর গানের কথা দূরে থাক, প্রেম ভালবাসাও যেন হাস্যাস্পদ বস্তুর মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমান তো গেছে—ভবিষ্যতও নেই, সেখানে কোটি কোটি অর্দ্ধনগ্ন কঙ্কালসার নরনারী কালো কালো ছায়া মেলে চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষুধার তাড়নায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে।…আত্মিক ক্ষুধা মানসিক ক্ষুধার মত সূক্ষ্মবস্তুতে আর কুলোচ্ছেনা লেখকদের, স্রেফ্ পেটের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধা।

ফাঁপরে পড়ে যান বলাকা দেবী, সত্যিই কিছু আর সাহিত্যিক সমস্যা নিয়ে তর্ক করার ভূতে ধরেনি তাঁকে, গল্প চালাবার জন্যেই দু' একটা কথা বলা, বড় বড় কথা নিয়ে একটু বাহাদুরী নেওয়ার সখ, এই—কিন্তু মিহির ডাক্তারের কথাগুলো যেন আরো বড় বড়।

বাগিয়ে উত্তর দেওয়া মুস্কিল।

তাই বলে তো আর রণে ভঙ্গ দেওয়া যায় না?

ভেবেচিন্তে আর একটা কূট প্রশ্ন করেন—কিন্তু এ সবও তো আছে সংসারে? এই স্থূল ক্ষুধা? এই অদম্য পিপাসা? একে তো আর চোখ বুজে অস্বীকার করা যায় না?

—হয় তো যায় না। কিন্তু আছে বলে সেইটাই সবচেয়ে বড় সত্য, তার উর্দ্ধে কি আর কিছুই নেই? গাছের শিকড়টা আছে বলেই তার ফুল ফল সব মিথ্যে? শিকড়টাই আঁকড়ে পড়ে থাকতে হবে? রাস্তার নীচে ড্রেনের ময়লাও তো আছে—তাই বলে কি তা'কে ঘুলিয়ে তুলে, চলার পথ পঙ্কিল করে তুলবো? আপনারা বাস্তববাদীরা হয় তো বলবেন —'আমাদের তাই ভালো'। বলুন। আমি সেই রবীন্দ্রযুগের রঙিন চশমা দিয়েই পৃথিবীটাকে দেখবো।

—মানে—শুধু সেই পুঁজিবাদী ধনিকসম্প্রদায়কে নিয়েই লিখবেন? দেশের নগ্ন নিরন্ন বুভুক্ষুদের দিকে ফিরে চাইবেন না?

আলগোছে একবার মুখের ঘাম মোছার ছলে পাউডারে ডোবানো রুমালখানা মুখে গলায় ঘসে নিয়ে, বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে থাকেন মিসেস—বোধকরি সেই নিরন্নদের জন্য একটু করুণা ভিক্ষার আশায়।

হঠাৎ রীতিমত হেসে ওঠেন ডাক্তার—নাই বা চাইলাম? আপনারাই তো রয়েছেন চাইতে।...কিন্তু আমাকে যে এবার উঠতে হয় নিখিল বাবু, গোটাকতক রোগী মরেও মরছেনা—দেখে আসি একবার, কবে নাগাদ রেহাই দেবে।

এরকম স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পর সত্যিই কিছু আর বসে থাকা চলে না। নিখিল উঠে পড়ে, অগত্যা বলাকা দেবীও। কিন্তু অনিচ্ছা-মন্থর গতিতে। গিয়েই তো সেই শৈলদির মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে হবে? এ তবু কিছুক্ষণ কাটানো গেল মন্দ নয়। ডাক্তার লোকটা খাসা, কথাগুলো একটু ধারাল বটে কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

আবার একবার দেখা করবার জোরালো ইচ্ছে নিয়ে উঠে আসতে হয়।

এ বাড়ীর চৌকাঠের কাছে এসে মিসেস চ্যাটার্জ্জি হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে বলে ওঠেন—ডাক্তার বাবু লোকটা কি রকম বল দিকিন, এদিকে তো খুব লম্বা লম্বা কথা কইলেন—কিন্তু আসলে বোধ হয় একেবারে হার্টলেস্? পেসেণ্টদের উপর যে রকম অবহেলা—

—অবহেলা?—নিখিল কি একটা বলতে গিয়ে একটু হেসে থেমে গেল।

দুপুরবেলা নিখিলকে ধরে নিয়ে গেলেন নৃপেনবাবু অফিস-ঘরে। জরুরী কথাবার্ত্তা পরামর্শের ব্যাপার।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রত্যেক বিভাগ দেখে ঘুরে বেড়ান। লীলা বেলা মাধবী যোগমায়া উমাশশী অনেকের সঙ্গেই দু'চারটী বাক্য বিনিময় করেন—জেনে নেন মিহিরগুপ্তর যাবতীয় তথ্য। কখন উপস্থিত থাকেন কোয়ার্টার্সে, কখন দেখেন আশ্রম-হাঁসপাতাল বা 'স্বাস্থ্যভবনে'র রোগীর দল, কখন বাইরের।

বৈকালিক চা পানটাও তাঁর আড্ডায় হ'লে আবহাওয়াটা কি রকম করে তোলা যাবে মনে মনে তার খসড়া ভাঁজতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন শাড়ীটার সঙ্গে কোন ব্লাউসটা ম্যাচ্ করবে তারও হিসাব কষা হয়।

অনেক রাত্রে...হ্যারিকেন লণ্ঠনের শিখাটা উজ্জ্বলতর করে দিয়ে বুকের নীচে বালিশ রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে স্বামীকে চিঠি লেখেন।...

দীর্ঘ চিঠি।

লেখেন...তোমায় ছেড়ে এসে কিন্তু ভয়ানক মন কেমন করছে, মনে হচ্ছে ছুটে চলে যাই। কী মুস্কিল বল তো? কেন যে এলাম! আশ্রম দেখলাম...নিখিল যতটা বলেছিল ততটা না হলেও বেশ। শৈলদির—অর্থাৎ সুপারভাইজারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না আমায়, অথচ আমার করছে তোমার জন্যে মন কেমন—কি করি?

বাধ্য হয়ে আরো দু' চারদিন থাকতে হবে...তারপর নিখিলের জমিদারী ও দেশের বাড়ীঘর না দেখিয়ে কি ছাড়বে নিখিল? তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন থাকছি। পত্রপাঠ উত্তর দেবে ও সাবধানে থাকবে। নিয়মিত চিঠি না দেওয়া মানেই আমায় শাস্তি দেওয়া...বুঝবো ঝগড়া করে চলে এসেছি বলে... ইতি তোমার...।

আরো একটা ঘরে আলো জ্বলছিল—মোমবাতির মৃদুস্নিগ্ধ আলো। বাতি জ্বালিয়ে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে চিঠি লিখছিল নিখিল।

ছোট্ট চিঠি।

"তুমি ভাবছো কলকাতা থেকে চলে এসে খুব মন কেমন করছে তোমার জন্যে? বয়ে গেছে। বরং স্বস্তিতে আছি—হপ্তায় তিন দিন করে হ্যারিসন রোড থেকে ভবানীপুর ছুটতে হবে না এই ভেবে। থাকলেই তো সেই টেলিফোনে ডেকে ডেকে অস্থির করতে? বেশ আছি।...ইতি 'শ্রীযুক্ত আমার আমি'।"

সুরকী ফেলা লাল রাস্তাটা শেষ হয়ে যেখানে ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, তা'র ঠিক কোণটায় দাঁড়িয়ে থাকলে সুদূরাগত সাইকেল-আরোহীটীকে বেশ কিছুক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। নিজেকেও দ্রষ্টব্য করে তোলা যায় পারিপাট্যে ও অপারিপাট্যে, উড়ন্তচুলে ও উদাস ভঙ্গীতে।

কাছাকাছি এসেই আগন্তুক ব্যক্তি 'ঝড়াং' করে সাইকেলটা থামিয়ে নেমে পড়ে আশ্চর্য্য প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার। এখানে দাঁড়িয়ে ?

—এমনি। আপনাদের আশ্রমের আবহাওয়ায় একলা একলা প্রাণ হাঁফিয়ে আসে যেন। আলাপ করবার মত একটা লোকই দেখলাম না।

—কেন শৈলদেবীর সঙ্গে আলাপ হয়নি আপনার ?

সাইকেলটার উপর কনুয়ের ভর দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ান ডাক্তার! লম্বা পাতলা চেহারা, সাদা পায়জামা ও অ্যাস্‌কালার পপ্‌লিনের হাফসার্ট পরা। প্রতিকূল বাতাসের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আসার জন্যে আঁচড়ানো চুল বিপর্য্যস্ত। উজ্জ্বল যৌবনদীপ্ত মুখ।

এই সজীব প্রাণবন্ত দৃপ্ত যৌবনশ্রীর সঙ্গে তুলনা না করে পারেন না বলাকা দেবী প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির সুবিস্তৃত টাকের নীচে বালকসুলভ কমনীয় মুখ আর সন্দেশের পুতুলের মত থস্‌থসে গড়নের।

কিন্তু সংসারে এত লোক থাকতে প্রফেসরের সঙ্গেই বা ডাক্তারের তুলনা করবার হেতু কি? তবু তুলনার ফলে মুহূর্ত্তের জন্য বিমনা হয়ে যান মিসেস চ্যাটার্জ্জি। বয়সের তফাৎ খুব বেশী কি? চ্যাটার্জ্জির কতই বা বয়স সত্যি? আটত্রিশ পূর্ণ হয়নি এখনো।

আর মিহির গুপ্ত? দশবছর ধরে যে ডাক্তারী করে আসছে—সত্যিই কিছু আর খোকা নয় সে? এই তো—সেদিন নিজ মুখেই বললে—"মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেরিয়ে দু'চার বছর এলোমেলো করেই কেটে গেল—তারপর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চাকরী নিয়ে এলাম এখানে—ঝগড়াঝাঁটি করে বছর দুই পর্য্যন্ত টেনেছিলাম কাজটা—শেষ পর্য্যন্ত পোষাল না ছেড়ে দিলাম। অবশেষে এই 'সেবাশ্রম'। তিন বছর ধরে এখানে শিকড় গেড়ে বসে আছি দেখে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে এক এক সময়। হয় তো কোন দিন কেটে পড়বো।"

ভাগ্যিস্ তারপরে আসেন নি বলাকা দেবী!

ডাক্তার বাবু আর একবার বলেন—চমৎকার মানুষ এই শৈল দেবী। ভাল করে আলাপ করে দেখলে বুঝতে পারবেন।

আবার সেই শৈল দেবী!

ভারী বিরক্ত হয়ে ওঠেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

কালো গুঁট্‌কো এক বুড়ি তা'কে নিয়ে এত নাচানাচি কেন রে বাবা? পদমর্য্যাদা তো কতো—আশ্রম পরিচর্য্যাকারিণী! নিখিলের সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়াতে এসেছেন বলে বলাকা দেবী কি ঐ শৈল ফৈলর সমপর্য্যায়ে পড়ে গেছেন না কি? রূপে আর রঙে ঝিলিক্ মেরে বলাকা দেবী যখন ব্যারিষ্টার বিরাম সেনের সম্ভ্রান্ত চেহারার সিডানবডি খানা থেকে ঠিকরে নেমে, পাক্‌খেয়ে ঢোকেন—মেট্রো, লাইট হাউসে, বিলিতি কফিখানায় বসে অসংখ্য শ্বেতবর্ণের মাঝখানে সরু ছুঁচলো গলায় 'ব্যেরা' বলে ডাক দেন, তখন ওই শৈল যদি দেখে, দশ হাতের কাছাকাছি আসতে সাহস করবে?……

দুঃখের বিষয় বলাকা দেবীর সে ঐশ্বর্য্য এদের দেখাবার উপায় নেই, আর কবেই বা দেখাবেন? বিরাম সেন এখন নতুন বিয়ের নেশায় মস্‌গুল। ছেলেগুলো যতদিন আইবুড়ো থাকে বেশ থাকে, বিয়ে হলেই অভদ্র হয়ে গেল।……

এই নিখিলই কি আর পুঁছবে? যে রকম ঘন ঘন ভবানীপুরে যাতায়াত করছে—কে জানে কোথায় প্রেমে পড়ে গেছে কি না। বলে 'কাজ আছে'। 'প্রেমকরা' ছাড়া এসব বয়সের ছেলের অত জরুরী কাজ আর কি থাকতে পারে? নিশ্বাস পড়ল একটা!

অবশ্য এত কথা ভাবতে খুব বেশী সময় লাগে না বলাকা দেবীর, দীর্ঘনিশ্বাসটা প্রায় মিহির ডাক্তারের কথার পিঠেই পড়ে।

—কী হল? দীর্ঘনিশ্বাস কিসের।

—শৈল দেবীদের সঙ্গে আমার ঠিক—মানে—মিশে সুখ হয় না। বড় বেশী গ্রাম্যভাবাপন্ন, বাইরের খবর কতটুকুই বা রাখেন ওঁরা, কি নিয়ে কথা চালাবো বলুন।

—কিন্তু উনিও একজন রীতিমত বিদুষী মহিলা, ডিগ্রির ছাপ হয় তো নেই কিন্তু যথার্থ বিদ্যা সত্যিই আছে। এত সব জানেন বোঝেন দেখলে অবাক লাগে।

—হবে হয় তো।—বলে অভিমানাহত করুণ মুখখানি ঈষৎ ফিরিয়ে ধরা গলায় বলেন—আপনার সঙ্গে গল্প করে একটু সুখ পাই, কিন্তু আপনাকে তো পাওয়াই শক্ত। কাজের লোক আপনারা।…ভালো লাগছে না, চলে যাবো কাল।

—কোথায় যাবেন? কলকাতায়? না নিখিলের—

চলে যাওয়ার সংবাদটা এত হালকাভাবে নেওয়ার জন্যে আরো মনঃক্ষুণ্ন হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা। একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে বলেন—কোথায় যাবো জানিনা, ভাগ্য যেখানে নিয়ে যাবে।

—বলেন, কি একেবারে ভাগ্যের হাতের পুতুল? আচ্ছা আপাতত ভাগ্য আপনাকে নিয়ে গিয়ে ফেলছে এই গরীবের আস্তানায়। চলুন আমাকে এক পেয়ালা চা তৈরী করে খাওয়াবেন। বড় টায়ার্ড হয়ে পড়েছি, নিজে নিজে ষ্টোভ জ্বালতে পারিনে আর।

মেঘ না চাইতে জল।

পুলক গোপন করে সমানভাবে উদাসভাব মুখে বজায় রেখে মিসেস চ্যাটার্জ্জি এইটুকু জানান, এ পরিশ্রমটুকু করতে তাঁর আপত্তি কিছুই নেই, তবে খাদ্যযোগ্য হবে কি না তার গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না, কারণ বাড়ীতে তিনি ষ্টোভে হাতই দেন না কখনো।

—বলেন কি? আপনার নিজের বাড়ীতে চাকরে চা তৈরী করে?

—চাকর নয়, বেয়ারা।—ভুল সংশোধন করে দেন বলাকা দেবী।

—ওই হ'ল। ভাত নয় অন্ন। কিন্তু কোন্ দুঃখে? বেচারা মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি! তাঁর দুঃখে বিগলিত হচ্ছি আমি।

—মজার কথা এই—তাঁর নিজের সুখ দুঃখ বোধের বালাই-ই নেই। তিনবেলা উপোস করিয়ে রাখলে বলবেন না—'খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না কেন'? নির্ব্বিকার পরমহংস।

—সত্যি নাকি? ডাক্তার প্রশ্ন করেন কৌতুহলাক্রান্ত স্বরে।—বেশ লোক তো?

—বেশ বটে। তবে শুনতেই বেশ, নিয়ে ঘর করতে হলে পাগল হয়ে যেতেন। যদি বলি···নাঃ থাক্, তাঁর কথা তুললে মেজাজের ঠিক থাকে না আমার। তার চেয়ে চলুন আপনাকে চা খাওয়াই।

—সে তো খাওয়াবেনই। তার সঙ্গে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির গল্প শোনাবেন চলুন। আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে—"স্মরণ মনন আর আলোচন"ই হ'ল বিরহের প্রধান ওষুধ।—ডাক্তার হেসে উঠে সাইকেল ঠেলতে সুরু করেন।

—ছাই। বিরহে একেবারে মরে যাচ্ছি আমি!

কথাবার্ত্তার সুর এত অন্তরঙ্গতায় এসে পড়ায় দস্তুর মত খুশী হয়ে ওঠেন বলাকা দেবী।

—সে আপনি চাপা দিতে চেষ্টা করলেই বা শুনবো কেন? 'তাঁর কথা তুললে মেজাজ বিগড়ে যায়'—এ যে নিদারুণ অবস্থা। উচিৎ ছিল তাঁকে শুদ্ধু টেনে আনা।

সাইকেলটা সিঁড়ির গায়ে ঠেসিয়ে রেখে বারান্দায় উঠে পড়েন ডাক্তার।

—এই দেখুন, এই মীটসেফের মধ্যে আমার যথাসর্ব্বস্ব। ওর ভেতর থেকে ঘর গেরস্থালীর সব পাবেন। তিন পেয়ালা চা করুন—দু' পেয়ালা আমার, এক পেয়ালা আপনার···কি হাসছেন যে? কী ভীষণ টায়ার্ড হয়ে পড়েছি জানেন? ছাব্বিশ মাইল রাস্তা সাইকেলে পাড়ি। হটওয়াটার ব্যাগ চাপাতে হবে পায়ে।

—আচ্ছা এত খাটেন কেন বলুন তো? কতই বা দিতে পারে এখানকার লোকে?

—দিতে? হো হো করে হেসে ওঠেন ডাক্তার—উল্টে আমাকেই দিতে হয়। ওষুধ তো দূরের কথা, পথ্যি পর্য্যন্ত না দিলে রক্ষে নেই। সাধ করে ব্যাটাদের ওপর চটে যাই? ভাত নেই, কাপড় নেই, ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, তবু বেঁচে থাকবার জন্যে ঝুলোঝুলি। পৃথিবীর জমি খানিকটা আগলে বসে থাকা ছাড়া পৃথিবীর কী কাজে লাগবে এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগারা বলুন? নাভিশ্বাস উঠেছে তবু মরতে চায় না, এত মরণের ভয়। যমের অরুচি।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি কেটলীটা চাপিয়ে এসে চেয়ারে বসলেন। রুমাল নিয়ে হাতের—ষ্টোভ থেকে না লাগা কল্পিত ভুষোটুকু ঘসে তুলতে তুলতে বলেন—আপনার কথাবার্ত্তাগুলো সবসময় বুঝে ওঠা শক্ত। মনে হয় যেন ঠাট্টা করছেন, অথচ—

—ঠাট্টা নয় ঠাট্টা নয়, জলজ্যান্ত সত্যি। কিন্তু থাকগে ওসব কথা, তার চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত সত্যের সন্ধান পাচ্ছি জঠরের মধ্যে। ঠিক না? আপনাদের মতে তো সার—সত্য ক্ষুধা?

—আপাততঃ আপনারও একই মত হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে—এই নিন।—বলে বিস্কুটের টিনটা এগিয়ে দেন বলাকা দেবী।

দু' পেয়ালা চায়ের সঙ্গে প্রায় আধটিন বিস্কুট সাবাড় করে তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে মিহির গুপ্ত গম্ভীর মুখে বলেন—এই জন্যেই বিভূতি বাবুর সঙ্গে আমার বনেনা। খিদে পেলে খাবোই আমি, এবং ভালো জিনিষই খাবো। আর সে ভদ্রলোকের মতে—, দেশের লোক না খেয়ে মরছে—সুখাদ্য খাবো কোন লজ্জায়? আরে বাপু—আমরাও যদি তাদের দেখা দেখি অখাদ্য খেয়ে মরতে সুরু করি, লাভটা কার হ'ল? মড়াগুলো ভাগাড়ে টেনে ফেলবার জন্যেও তো দু' পাঁচটা সুস্থ লোকের দরকার? দুঃখীর সেবা করতে গিয়ে নিজেও যদি দুঃখী হ'নে বসে থাকি, আমার সেবা করতে কোন সাগরপারের লোক আসবে?

—তা ছাড়া—বলাকা দেবী বলেন—অপরকে বঞ্চিত করার মত নিজেকে বঞ্চিত করাও তো একটা পাপ? এই বিভূতি বাবুর কথাই ধরুন না—এতদিন ধরে এত যে কৃচ্ছ্র সাধন করলেন, শেষ রক্ষা হল কি? প্রকৃতি তার বাকী খাজনার শোধ নিলে।

দরকারের সময় কাজে লাগ্‌তে পারে এমন অনেক দামী দামী কথা মুখস্থ করে রাখেন বলাকা দেবী। অবিশ্যি লাগসই জায়গায় লাগিয়ে দেওয়াটা তাঁর নিজস্ব বাহাদুরী।

—বুড়ো বয়সে প্রেমে পড়ার জন্যে বলছেন ?

—তাই তো বলছি, এটা কী বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে বলুন দেখি ? নিখিল নেই বলেই বলছি—দস্তুর মতো লোক হাসানো নয় ? অথচ ওই বাবার সম্বন্ধে নিখিলের এত উচ্চ ধারণা ছিল—

—ছিল ? এখন আর নেই নাকি ?

ডাক্তারের স্বরে বিদ্রূপের আভাস।

—ঈশ্বর জানেন আছে কি না। আমার হ'লে থাকতো না।

—ঈশ্বরের দয়া যে আপনি নয়। কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক্, আপনি বরং কলকাতার গল্প করুন, অনেক দিন গাঁয়ে পড়ে আছি, শুনেও সুখ পাই।

এই এক আশ্চর্য্য স্বভাব মিহির ডাক্তারের।

এলায়িত ভঙ্গীতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন মানুষ, টেবিলের তলায় পা ঠুকছেন, টেবিলের উপর ঠুকছেন সিগারেটের টিন। অলস স্তিমিত দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস। হঠাৎ সোজা হয়ে বসেন—হাসির আভাস যায় মিলিয়ে, স্তিমিত দৃষ্টি মুহূর্ত্তে জ্বলে ওঠে।

মনে হয়—খুসীর খেয়ালে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু কারণটা বোঝা ওঠা শক্ত।

—কলকাতার আবার গল্প ! গল্প করবার মত আর কিছু নেই কলকাতায়।

—শুনেও বাঁচলাম। আমাদের তো দস্তুরমত একটা ঈর্ষা আছে কলকাতার লোকের ওপর। স্বর্গের দেবতাদের ওপর মর্ত্তের জীবের যে রকম মনোভাব, অনেকটা সেই গোছের আর কি।

খুক্ খুক্ করে হেসে ওঠেন বলাকা দেবী।

কথার মোড়টা আবার সহজ পথ নিয়েছে দেখে আশ্বস্ত হয়ে ওঠেন তখনকার মত। সত্যি, লোকটার কী অদ্ভুত আকর্ষণ, কথা কইলে উঠতে ইচ্ছে করে না, তবু—মাঝে মাঝে যেন দিশে হারা হয়ে যেতে হয়। ওর আসল মতটা বোঝা শক্ত বলেই সব সময় সব কথার উত্তর দেওয়াও কঠিন হয়ে ওঠে।

—ওঃ আমাদের যে আর একটা মনোরম গল্প করবার ছিল—মিষ্টার চ্যাটার্জ্জির গল্প ?

—সেখানেও ওই একই উত্তর ডক্টর গুপ্ত, গল্প করবার কিছু নেই। পাথরের পুতুল দেখেছেন ? ধ্যানী বুদ্ধ ? ভাবের তারতম্য নেই—ধীর স্থির আত্মস্থ—কারুর কাছে কিছু চাইবার নেই, শুধু বিশ্বের উপর প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। আমার দয়াময় স্বামীটিকে কতকটা আন্দাজ করতে পারবেন।······

একটা ঘটনা শুনবেন শুধু—এই গত কয়েক দিনের কথা। আমার দাদার মেয়ের বিয়ে, চার বোনে গিয়েছি—দিন চারেক থেকে—তবে আসবার কথা। হঠাৎ দাদা বললেন—চল্ নতুন মেয়ে জামাই নিয়ে সকলে মিলে কয়েক দিন বেড়িয়ে আসা যাক। কোথায় ? কোথায় ? কাছেই আছে পুরী। এক ঘণ্টায় ঠিকঠাক, এ দিকে নিজেদের বাড়ীতে কারুরই খবর দেওয়া হয় নি। বললাম—সে কি দাদা, লোকগুলো ভাববে যে ? দাদা বললেন—'ভাবুক না, বেশ একটু অ্যাড-ভেন্চার হবে, আর কার কতটা টান বোঝা যাবে।'······

বললে বিশ্বাস করবেন না—যে দিন পৌছেছি তার পর দিনই আমার দুই ভগ্নাপতি পুরী গিয়ে হাজির, বলে কি না—"আমাদের বাদ দিয়ে মজা করবে, সেটী হচ্ছে না।" বড়দির স্বামীর কাণ্ড আবার আলাদা, পুরো এক পাতা টেলিগ্রাম—হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে। আর আমার ঘরের ধ্যানী বুদ্ধটী নির্ব্বাক পুতুল। এসে বললাম—'তিন দিনের জায়গায় তের দিন পরে এলাম—কারণ জানতে চাইলে না' ? বললেন—'জিগ্যেস আর কি করবো—যুক্তিসঙ্গত কারণ একটা আছেই নিশ্চয়।' শুনুন কথা! বললাম—'খবর পাওনি, ভাবনাও তো হয়?' স্বচ্ছন্দে বললেন—'বুঝতেই তো পেরেছিলাম খবর দেওয়া দরকার মনে করনি তাই দাওনি, খবর দেবার অবস্থা যদি না থাকতো অপরে দিত।'

—বাঃ চমৎকার লোক তো ?

—চমৎকার ?

—নিশ্চয়—দেখা করে আসতে ইচ্ছে করছে, নমস্য ব্যক্তি।

সত্যিই দুই হাত জোড় করে কপালের কাছ বরাবর এনেই ডাক্তার চমকে ওঠেন—কে রে ওখানে উঁকি মারছিস ?

—ডাক্তার বাবু, আমি অমূল্য।

—অমূল্য ? আবার এসেছিস মরতে ? যা বেরো, যাব না। তোদের জন্যে আমি ব্যাটা মরবো নাকি ? আবদার মন্দ নয়। এই মাত্তর "আমলাগোড়া" থেকে আসছি বুঝলি ? হরিহরের ভাইপো যায় যায়!

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, বৌটা যে—

—"বৌটা যে" যায় কেমন ?—বুঝলাম। কিন্তু তোর বৌটার জন্যে আমার কি মাথা ব্যথা রে—যে এই সন্ধ্যের মুখে সাত মাইল রাস্তা ভাঙবো ? কপালে আর দেখছি অন্ন নেই আজকে, ভাগ্যিস্ বিস্কুটগুলো ঢুকিয়ে রেখেছি পেটের মধ্যে—

ডাক্তার উঠে দাঁড়ান।

—ও কি, আপনি সত্যিই যাচ্ছেন না কি ?

—না গেলে ছাড়বে ?

ওষুদের বাক্সটা সাইকেলের হাতায় ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে নেন মিহির ডাক্তার।

—নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জ্জি। আবার দেখা হবে—ও না, আপনি তো কাল চলে যাচ্ছেন? আচ্ছা বিদায়।……এই অমূল্য, উঠে পড় না পিছনে।

—মাপ করবেন দেবতা।

—মাপ করবো কি রে হতভাগা? সাইকেলের সঙ্গে ছুটে হোঁচট খেয়ে মরে আরো কাজ বাড়া আমার? বিনি পয়সার ওষুধ, বস্তি—কেন রোগ করবি না? খুব করবি যত পারবি—কি বলিস?

ঝড়ের বেগে ডাক্তারের সাইকেল লাল সুরকির রাস্তা পার হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তায় গিয়ে পড়ে। ঋজু দীর্ঘ দেহের সতেজ ভঙ্গী চোখে পড়বার উপায় নেই, পিছনে বসে থাকা অমূল্যর ছেঁড়া ফতুয়া পরা পিঠটা যেন হত চকিত মিসেস চ্যাটার্জ্জিকে তীব্র ব্যঙ্গ করে চলে যায়।

গ্রাম থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা আঁকা বাঁকা লাইন ধরে বরাবর ষ্টেশনের দিকে চলে গেছে, তারই একটা বড় বাঁকের ধারে লাহিড়ীদের কাছারী বাড়ী।

দোতলা বাড়ী এ অঞ্চলে আর নেই, অবাধ উন্মুক্ত পট-ভূমিকায় ছবির মত সুন্দর একক বাড়ীখানি যেন সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—বনেদি জমিদার বংশের মর্য্যাদা স্মরণ করিয়ে দিতে।

দেউড়ীর দু'ধারে কেশর ফোলানো সিংহের মূর্ত্তি বসানো মাঝারি দুটি থাম—স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ হিসাবে না হোক, সাধারণের থেকে বৈশিষ্ট্য রক্ষা হিসাবে মৌন গাম্ভীর্য্যে দাঁড়িয়ে আছে।

তারই গা ঘেঁসে প্রকাণ্ড দুটি ইউক্যালিপটাস গাছ।

নিখিলের পিতামহ ভূপতি লাহিড়ীর রোপিত চারা আজ পত্রবহুল বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। সবটা মিলিয়ে ভূপতি লাহিড়ীর রুচি ও সৌন্দর্য্য বোধের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

নিজস্ব বিশাল জমিদারীর মধ্যে নদীর নিকটবর্ত্তী এই মনোরম স্থান-টুকু বেছে নিয়ে ভূপতি লাহিড়ী অনেক যত্নে আর অনেক অর্থ ব্যয়ে এই বাড়ীখানি করেছিলেন অবসর যাপনের আশ্রয়স্থল হিসাবে।

সময়ের স্রোতে সৌন্দর্য্যপিপাসু ভূপতি লাহিড়ীর "কানন কুঞ্জ" আজ "শালবনী কাছারী বাড়া"তে পরিণত হয়েছে। নীচের তলায় চলে—কাছারীর কাজকর্ম্ম, আসবাব পত্রে সাজানো উপর তলা থাকে তালা বন্ধ।

শ্রীপতি লাহিড়ী—নিখিলের ছোট ঠাকুর্দ্দা—কালে কস্মিনে তদারক তল্লাস করতে আসেন—নীচের তলায় বড় হল্-খানতেই থেকে যান, দু' চার দিনের জন্যে আর তালা খোলার বা সিঁড়ি ওঠানামার কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হন না।

দীর্ঘ দিন পরে বিভূতি বাবু এই তালা খুলেছেন।

বিকেল বেলা পশ্চিমের জানালার সামনে নীচু বেতের মোড়া পেতে কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসে একটা ছোট ফ্রকে এমব্রয়ডারী করছিল। নেহাৎ সাদা সিধে মোটা লংক্লথের ফ্রক, এতে সূচি শিল্পের প্রয়োজন থাকবার কথা নয়, মনে হয় নিতান্তই যেন অবসর যাপনের উদ্দেশ্য।

ছাব্বিশ সাতাশ বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে, পাতলা নীটোল গড়ন, মুখশ্রী অনবদ্য না হলেও চিবুকের ডৌলটি চমৎকার, আর আশ্চর্য্য সুন্দর চোখ দুটি। দীর্ঘপল্লবছায়াচ্ছন্ন কাঁচের মত স্বচ্ছ দুটি চোখ যখন নীচের দিকে দৃষ্টি মেলে থাকে, মনে হয় ঘুমিয়ে আছে। বোঝা যায় না পাতার ওঠা পড়া।

কিন্তু নিমেষের জন্য যদি মুখ তুলে তাকালো তোমার চোখে চোখ রেখে, অবাক হয়ে যাবে। শুধুই ডাগর? শুধুই কালো? শুধুই গভীর? না তার উপরেও কিছু আছে, যা আছে সেটা হচ্ছে—নির্ম্মল প্রশান্তি, যা এ বয়সের মেয়ের খুব কমই থাকে।

সেই প্রশান্ত দুটি চোখের নির্ম্মল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যে সৌখিন কাজটুকু করছিল কল্যাণী, সেটা শেষ হ'তে অল্পই বাকী ছিল, বিকালের আলো ম্লান হবার আগেই সেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে হাতের ছুঁচ চলছিল তাড়াতাড়ি।

—অত মন দিয়ে কি কাজ হচ্ছে?

চমকে হাত কেঁপে গিয়ে চারুশিল্পের সরু যন্ত্রটি আঙুলের আগায় খোঁচা দিয়ে বসলো।

'উঃ'টা অস্ফুট হলেও ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না বিভূতি বাবুর। সস্নেহে কাছে এগিয়ে এসে বললেন—ফোটালে তো ছুঁচটা? কী আশ্চর্য্য, অত চমকে ওঠ কেন?

সেই ডাগর দুটি চোখ মেলে অল্প হেসে উঠে দাঁড়ালো কল্যাণী।

—থাক থাক উঠছো কেন? এই তো এতে বসছি আমি।

আর একটা বেতের মোড়া সংগ্রহ করে বসে পড়েন বিভূতি বাবু। কল্যাণী অসমাপ্ত কাজে ছুঁচটা বিঁধে রেখে জামাটা তুলে ফেলছিল—বিভূতি বাবু একটু আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলেন—কার জামা হচ্ছে?

—আশ্রমের—

—আশ্রমের? সেখানের কাজ এখন পাচ্ছো কোথায়?

কল্যাণী মৃদুস্বরে উত্তর করে—কতকগুলো হাতে নেওয়া ছিল, এখানে এসে তৈরি হয়ে গেছে, পাঠাবার সুবিধা পাচ্ছি না, তাই বসে বসে ফুল তুলছি।

বিভূতি বাবু হাত বাড়িয়ে ফ্রকটা তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আস্তে নামিয়ে রেখে বলেন—গরীবের ছেলেমেয়ের পোষাকে এত বাহারের দরকার কি কল্যাণী?

—এমনি সময় কাটছিল না—কিন্তু ক্ষতি কি?

—ক্ষতি? একেবারে নেই তাও বলা চলে না। সৌখিন জিনিস বাহারে জিনিস একবার ব্যবহার করতে শিখলে আর সাদাসিধেয় মন উঠবে না তাদের, বরাবর তো এমন সুন্দর জিনিস জোগানো যাবে না।

—এক আধবার ভালো জিনিস ব্যবহার করবার ইচ্ছে হওয়াও তো স্বাভাবিক। পেলে কত খুশী হবে—একটু খাটলেই যদি—

—খাটুনীর কথা নয়।…কিন্তু কত দ্রুত হাত চলে তোমার তাই দেখছিলাম আশ্চর্য্য হয়ে—

—দেখছিলেন?

—হ্যাঁ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম কিনা।

মুহূর্ত্তে কল্যাণীর শ্যামলমুখ রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা হয়ে ওঠে, ঘুমিয়ে পড়ার মত ভারী চোখের পাতা দুটি নেমে পড়ে।

—তাই দেখছিলাম—এ-তো তুমি ইচ্ছে করলে ঘণ্টায় একটা করে ফেলতে পারো—তার জন্যে নয়, শুধু বলছিলাম—লোভের কথা। দয়ার ছলে আমরা যেন ওদের মধ্যে লোভের সৃষ্টি না করি।

—আচ্ছা আর করবো না।

—না না দুঃখিত হয়ো না। আমার আইডিয়াটা বুঝতে পারছো তো?

—পারছি।

মনে মনে বলে—বুঝতে পারছি না আবার, শুধু গরীবের ছেলে-মেয়েদের বলে তো নয়, সকলের জন্যেই যে তোমার ঐ একই ব্যবস্থা। অপরকে লোভের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে তোমার দানের হাত রেখেছো গুটিয়ে।

হঠাৎ মুখ তুলে বলে—কিন্তু তা'তে বঞ্চিত হবে কে? তা'রা না আমি নিজে?

—তুমি?

—হ্যাঁ আমিই তো। দিতে না পারার ক্ষোভটা কি কিছু নয়?

চকিতের জন্য একবার চোখে চোখ তুলে ধরে আবার নামিয়ে নেয়।

বিভূতি বাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মৃদুগলায় বললেন—ঠিক বলেছ কল্যাণী, দিতে না পারার ক্ষোভও কম নয়। কিন্তু জোগাবার শক্তি যদি নিঃশেষ হয়ে যায়? যদি বরাবর দেবার ক্ষমতা না থাকে?

—তবে—না দেওয়াই ভালো।

বলে মুখ টিপে একটু বাঁকা হাসি গোপন করবার চেষ্টা করলে কল্যাণী।

কিন্তু গোপন হল না।

অপরাহ্ণের শেষ উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। বিভূতি বাবু চমকে উঠলেন—আশ্চর্য্য! এ হাসি কল্যাণী কোথায় পেলে? শান্ত নম্র কৃতজ্ঞতায় বিগলিত যে মেয়েকে এতদিন দেখে এসেছেন বিভূতি বাবু, তার সঙ্গে তো এর মিল নেই? বিদ্রূপে বাঁকানো ঠোঁটের ছোট্ট একটু হাসি যে অনেক কিছু গোপন তথ্য প্রকাশ করে ফেলে।

কল্যাণীর শান্ত সমাহিত স্বভাবের অন্তরালে কি লুকোনো ছিল বয়সের চাপল্য? না কৃতজ্ঞতার জায়গায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে অসন্তোষ?

কিন্তু অপূর্ব্ব এই হাসিটুকু। আবার দেখতে ইচ্ছা হয়।

কাটলো কিছুক্ষণ। কল্যাণী নাড়াচাড়া করছে ওর সেলাইয়ের টুকিটাকি, বিভূতি বাবু জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন আকাশে—যেখানে সন্ধ্যামেঘের সমারোহ শেষ হয়ে নামছে রাত্রির ছায়া।

তাঁর জীবনেও কি এমনি অন্ধকার নেমে আসছে—সমস্ত বর্ণ সমারোহের সমাপ্তি ঘটিয়ে? রাত্রির হাতে করতে হবে আত্মসমর্পণ?

কিন্তু অন্ধকার কি আসেই নি?

যখনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন নির্ব্বাসন দণ্ড, ত্যাগ করেছেন "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র সম্পর্ক, তখনি তো অবসান হয়েছে সমস্ত আলো, সমস্ত ঔজ্জ্বল্যের। "মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমে"র "দেবতা"র ভূতকে দেখে হেসে উঠবে না তো মৃণ্ময়ী, নক্ষত্রের পাশে বসে?

আর "দেবতা"র ভক্তরা? ডাক্তার? শৈলমাসী? নিখিল?

হঠাৎ যেন সমস্ত স্নায়ুশিরায় টান ধরে। কঠিন পৌরুষের দৃপ্তভঙ্গী ফুটে ওঠে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে, অনতিপূর্ব্বের ক্ষীণ দুর্ব্বলতা কোথায় মিলিয়ে যায় কে জানে?

দুর্ব্বলতার ইতিহাস কল্যাণীর জানা নেই।…কল্যাণী শোনে—

—হ্যাঁ বলতে এসেছিলাম—নিখিলের চিঠি এসেছে—ও আশ্রমে এসেছে, সঙ্গে ওর কোন প্রফেসারের স্ত্রী। হয়তো—অবুঝের মত এখানেই এসে পড়বে হঠাৎ, কিন্তু আমি তা' চাই না।

দৃঢ়বদ্ধ দুই বাহু বুকের উপর রেখে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারী করতে থাকেন বিভূতি বাবু—না আমি চাই না

নিখিলের সঙ্গে দেখা করতে, চাই না আর কেউ, অপর কেউ এখানে আসুক। আমি কয়েকদিনের জন্যে ঝাড়গ্রামে চলে যাবো।

—পালিয়ে যাবেন?

—হ্যাঁ তাই, নিখিলকে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই।

তবে কেন আপনি—

হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ে কল্যাণী—যে চাপাকান্না এতক্ষণ সঞ্চারিত হচ্ছিল তার দেহে মনে সমস্ত শিরায়!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন বিভূতি বাবু ওর ক্রন্দনরত মূর্ত্তির পানে চেয়ে। আবেগে ফুলে উঠছে কল্যাণীর কোমল দেহ।

কোথায় গেল কল্যাণীর সেই নির্ম্মল প্রশান্তি?

আরো একদিন কেঁদেছিল এমনি করে সেবাশ্রমের বাড়ীতে…চুরি করে বিভূতির ছবি নিতে গিয়ে ধরা প'ড়ে। সেদিন অবাক হয়েছিলেন, মর্ম্মাহত হয়েছিলেন। আজ কেমন একটা অদ্ভুত তৃপ্তি, সাধু ব্যক্তির মধ্যে যা নিতান্তই বেমানান তেমনি একটা হিংস্র আনন্দ—তাই বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করেন এই দৃশ্য।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় এই কঠোরতা, স্নেহশীল চিত্ত ভরে আসে অপূর্ব্ব মমতায়, কাছে এসে ওর চুলের ওপর ডান হাতখানি রেখে কোমল স্বরে বলেন—কল্যাণী চুপ করো।

কিন্তু চুপ করবে কে? এইটুকু স্নেহ কোমল স্পর্শে বঞ্চিত হৃদয়ের অভিমান উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, শতধা হয়ে ভেঙে পড়তে চায়। কিন্তু একি স্বামীর স্পর্শ?

নিজেকে সংবরণ করে উঠে বসে কল্যাণী।

—চল কল্যাণী, তুমিও চলো।

—না।

—এখানেই থাকবে?

—না।

—তবে?

—আমি আপনাকে মুক্তি দিয়ে যাবো। ভেবেছিলাম—আপনি অনেক বড় অনেক মহান, এতটুকুতে ক্ষতি হবেনা আপনার, আমাকে দিয়েও অন্যের কমে যাবে না।…দেখলাম ভুল বুঝেছি—নিজেরও লাভ হ'ল না, আপনারও ক্ষতি করলাম, কিন্তু এইবেলা ফিরে যান। দু'দিন পরে ভুলে যাবে লোকে, ভুলে যাবে এই সামান্য কলঙ্কের স্মৃতি।

—পাগল।

—আর এই নিজেকে নিয়ে পালিয়ে বেড়ানোটাই কি সুস্থতার লক্ষণ? কিন্তু থাক্ অনেক বাচালতা করলাম ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা করবেন—আপনার শান্তির জীবনে আমার এই অনধিকার প্রবেশের অপরাধ।

কিন্তু কি উত্তর দেবেন বিভূতি? মুক্তিটাই কি যথার্থ কাম্য?

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘর ভরে গিয়েছিল।

উঠে আলো জ্বালবার কথা কারুর মনে পড়েনি, হঠাৎ এক সময় বাইরে থেকে—'বড়বাবু' ডাক শুনে চমকে দাঁড়িয়ে ওঠেন বিভূতি বাবু!

—কেরে?

—আজ্ঞে আমি কেষ্ট।

—কি বলছিস?

—"আছ্রম" থেকে একটা বাবু আর একটা মেয়েলোক এসে আপনাকে খুঁজছে।

—দিদি শুনছিস? এই দিদি, কালা নাকি? এই দিদি, ভাল চাস্ তো শোন্…বেশ বয়ে গেল, যা দিতে এসেছিলাম নিয়ে চললাম।

'নিয়ে চললাম,' শুনে বোধ করি দিদির অটল গাম্ভীর্য্যের কোণ খসে, তবু মুখে অবহেলার ভাব বজায় না রাখলে মান থাকে কোথায়?—কী এনেছিস হাতি ঘোড়া? তাই সব কাজ ফেলে দেখতে যেতে হবে? দেখছিস এখন অঙ্ক কষছি, বিরক্ত করতে এলো।

—বেশ বিরক্ত করবোনা, পরে কিন্তু কিছু বলতে পাবি না দিদি?

—বলব না—যা পালা বক্‌বক্ করিস না 'মলু'।

—ইঃ ভারী তেজ, এদিকে তো ছট্‌ফট্ করে মরছিলেন—

গাম্ভীর্য্যের চূড়া খসে পড়ে।—'ডেভিড্ কপারফীল্ডটা' খুঁজে পেয়েছিস বুঝি? দেনা ভাই। পর্শু থেকে খুঁজছি—

—ইঃ এখন দেনা ভাই। আর তখন গ্রাহ্যই হচ্ছিল না? বই না কচু, এই দেখ্,—চললাম মাকে দিতে।

একটা সুদৃশ্য নীল খামের চিঠি তুলে ধরেই ছুটে পালিয়ে যায় মল্লিনাথ।

সর্ব্বনাশ!

নিশ্চয়ই নিখিলের! এখন উপায়? অঙ্ককষা শিকেয় তুলে রেখে শ্রীমান মল্লিনাথের খোসামোদ করতে ছুটতে হয়।

—এই 'মলু', দে ভাই দে, লক্ষ্মীটী মাকে দিস না, তোর পায়ে পড়ি ভাই, দিবিনা? বেশ দিসনি, অথচ সেই নীল খাতাখানা তোকে দেবার জন্যে তুলে রেখেছি আমি।

—তাই বই কি, 'দেবার জন্যে তুলে রেখেছেন' আরো কিছু না? সেদিন কত চাইলাম, দিলি?

—সে তো মজা করবার জন্যে। নইলে তোকে আর একটা সামান্য খাতা দিতে পারি না?

—এই নে যাঃ। দিবি তো খাতা?

—ঠিক দেব ভাই লক্ষ্মী ছেলে, মাকে বলিসনি কিন্তু চিঠির কথা।

—আমি অত বোকা নই মশাই, মাকে বললেই এখন তোর ফাঁসি আর আমার জেল।

নিখিলের সেই ছোট্ট চিঠি।

ভবানীপুরের এই সাদা রঙের ছোটখাটো বাড়ীখানিতেই তা'র ঘন ঘন 'জরুরী কাজ' পড়ে।

বাড়ীর কর্ত্তা উকিল হ'লেও লোক ভালো।

গৃহিণীকেও মন্দ লোক বলবার হেতু নেই, তবে ছেলে-মেয়ের উপর শাসন কিছু কড়া। মেয়ে মণি ওরফে 'তর্কচূড়ামণি' ম্যাট্রিক পড়ে, ছেলে 'মল্লিনাথ' এইবার ক্লাশ 'নাইনে' উঠেছে। ছেলেবেলা থেকে দুটি ছেলেমেয়ের কথার বহরে তরুবালা এই নাম বাহাল করেছেন।

অবশ্য তরুবালা নিজেও কিছু কম যান না, তাঁ'র বাপ মা তেমন রসিক হলে বোধ করি 'বাক্যবারিধি' নাম দিতেন।

নিখিলকে তাঁরা—স্বামী স্ত্রী নিজেরা—দুজনেই যথেষ্ট ভালোবাসেন, মল্লিনাথের ভালবাসাতেও তাঁদের আপত্তি দেখা যায় না, শুধু মেয়ের সম্বন্ধেই ঘোরতর আপত্তি।

বড়লোকের ছেলে, চেহারা ভালো, লেখাপড়ায় চমৎকার, তার উপর—সাদাসিধে স্বভাব, এতে কে ভাল না বেসে থাকতে পারে? তরুবালা নিজেই স্বীকার করেন। দু'চার দিন না এলে অনুযোগ করতেও ছাড়েন না, কিন্তু তাই বলে মণি?

সেখানে তরুবালার কড়া পাহারা।

হ্যাঁ আশা করবার কিছু থাকতো, সে আলাদা কথা। বামন হয়ে তো আর চাঁদে হাত দেবার স্বপ্ন দেখতে পারেন না?

কিন্তু কথায় আছে 'সমুদ্রে বালির বাঁধ'। তর্কচূড়ামণিরও হঠাৎ উমা নামক এক প্রিয় বান্ধবীর বাড়ী ঘন ঘন জরুরী কাজ পড়ে যায়, দু'জনে একসঙ্গে না পড়লে পরীক্ষার পড়া তৈরী হয় না এমনি নাকি নিদারুণ পড়া ম্যাট্রিক ক্লাশের। বান্ধবীটী একটি পশারওয়ালা ডাক্তার দুহিতা।

অখ্যাত উকিলের টেবিলে টেলিফোন রিসিভার না থাকলে চলে বলে তো আর পশারওয়ালা ডাক্তারের চলে না? ডাক্তারের অনুপস্থিতির সুযোগে সুযোগের অপব্যবহার করে না তর্কচূড়ামণি।

ছোট্ট চিঠি, কয়েকটী লাইনের সমষ্টিমাত্র—এত ভালো লাগে কেন?

কে দিতে পারে এই কেনর উত্তর? প্রেম যখন প্রথম পল্লবিত হয়ে ওঠে কৈশোর যৌবনের অপূর্ব্ব সন্ধিক্ষণে, কেন ভালো লাগে সমস্ত পৃথিবী? কেন ভালো লাগে আকাশ বাতাস দিনরাত্রি, নিত্যদিনের দেখা অতি পরিচিত পটভূমি?

কেন এত ভালো লাগে নিজেকে নিজের?

যে মেয়ে—কৈশোরের সোনার দিনে একবার প্রেমে পড়ল না সে ফুটল কই? প্রখর দিনের আলোয় যার ঘুম ভাঙে, সে বুঝবে কি করে ভোরের আলোয় কী যাদু?

অধিকাংশ মায়েরাই ছেলেমেয়েদের সাপ বাঘ আর ভূত প্রেতদের কাছ থেকে সামলে বেড়ানোর চাইতেও বেশী দুর্দ্দান্তভাবে সামলে বেড়ান প্রেমের কাছ থেকে। ও যেন কুৎসিত ব্যাধি, ও যেন প্রচণ্ড পাপ।

কুড়ি বাইশ পঁচিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত যতদিন না তাঁরা মেয়ের জন্য একটী বৈধ প্রণয়ী সংগ্রহ করে উঠতে পারেন ততদিন তা'রা—সেই নবযৌবনারা—সরল শিশুর মনোহর ভঙ্গীতে শুধু হেসে খেলে নেচে গান গেয়ে মা বাপের মনোরঞ্জন করুক এই তাঁরা চান।

আরো দরিদ্র মধ্যবিত্ততায় নেমে আসুন।

যুবতী অনূঢ়া মেয়ে—সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তা'র মাথায়। সে রাঁধবে বাড়বে, বাসন মাজবে, সাবান কাচবে, রোগীর সেবা, শিশুর পরিচর্য্যা, সব কিছু ঝঞ্ঝাটের ভার নিয়ে প্রৌঢ় মা বাপকে অখণ্ড প্রেম চর্চ্চার অবসর দেবে, আর বৎসরান্তে একবার করে 'আঁতুড় তোলা'র ঝক্কি পোহাবে। কারণ সে "বুড়োধাড়ী মাগী, বয়সে বে' হলে সাত ছেলের মা হতো"।

কিন্তু চোখ তুলে তাকাক দিকিন সে একবার পৃথিবীর আলো বাতাসের দিকে? তাকাক দিকিন নতুন আলো লাগা চোখে পুরুষের মুগ্ধ চোখের দিকে? তাকাক আপনার নব জাগ্রত হৃদয়ের দিকে? ব্যস্ আর রক্ষা নেই। গেল সৃষ্টি রসাতলে।

তবু সৃষ্টি রসাতলে যাবার চেষ্টা করলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকে না।

তরুবালার কী সাধ্য কিশোরী মেয়ের মনের গতিকে আটকে রাখতে?

ছোট্ট চিঠির উত্তরটা খুব যে ছোট হয় এমন নয়, কিন্তু পোষ্ট করতে হলেও আবার উমার বাড়ীই দরকার পড়াতে হয়। যতই হোক—মানে যত 'পাকা পক্কান্ন' ছেলেই হোক—মল্লিনাথ ছেলেমানুষ, তাকে বিশ্বাস করা কঠিন, যদিই বেফাঁস বলে বসে চিঠির কথা?

ও কি ভেবেছিল নিখিল ওকে চিঠি দেবে? কল্পনা করেছিল কোনদিন চৌকো নীল খামের মধ্যে একমুঠো স্বর্গ ভরে কেউ পাঠাবে তাকে? একান্তভাবে তাকেই?

সত্যি বলতে বাড়ীতে কতটুকু অবসর সে পায় নিখিলের সঙ্গে কথা কইতে, চোখে চোখে চাইতে? বাৎসল্য স্নেহে

ভরপুর তরুবালা নড়তে চাননা যতক্ষণ সে থাকে। হয়তো চুরি করে একবার চোখোচোখি একটু হেসে ফেলা। নিতান্ত সাধারণ দু'চারটে কথা এই পর্য্যন্ত।

ভাব যেটুকু এগিয়েছে তার জন্যে টেলিফোনের তারের কাছে করতে হয় ঋণ স্বীকার। অবিশ্যি প্রেমের কথা নয়, গোছানো কথা নয়, নিতান্তই অর্থহীন এলোমেলো সে সব কথা, শুধু দুজনের কণ্ঠস্বর দু'জনের কাণে বাজে সেই সুখ।

সকালবেলা।

তরুবালা মোচার ঘন্ট রান্না সম্বন্ধে বামুনঠাকুরের সঙ্গে বিশদ আলোচনা চালাচ্ছিলেন, পিছন থেকে 'মণি'র সপ্রতিভ কণ্ঠ বেজে উঠলো।

—উমাদের বাড়ী একবার যাচ্ছি মা, ভীষণ দরকার।

মুখ ফিরিয়ে তরুবালা বিরক্ত কণ্ঠে বলেন—চব্বিশ ঘণ্টাই তোর উমার বাড়ী 'ভীষণ দরকার'! ইস্কুল নেই?

—ইস্কুল তো আছেই, একটা বই খুঁজে পাচ্ছিনা যে—জেনে নেব ওর কাছে—

—নিত্যি তোমার বই হারানো মা, ধন্যি বটে। মন মাথা কোথায় থাকে শুনি?

.মনের অবস্থান সম্বন্ধে কিছুদিন থেকেই তরুবালার কিছু কিছু সন্দেহ জেগেছে। যতই 'ইনোসেণ্ট' ভাব দেখাক মণি তবু মার চোখ কি এড়াতে পারবে?

পরীক্ষার বইয়ের মধ্যে হঠাৎ কি এমন রস পেলো সে, যে ক্ষণে ক্ষণে এমন অকারণ খুসিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে? কালো চোখে জ্বলে ওঠে আলোর বিদ্যুৎ? লাবণ্যে টলটল মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে অজানা আশঙ্কায় কেমন যেন ভয় ভয় করে তরুবালার।

তাই শাসনের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়াতে থাকেন।

—গোবিন্দকে পাঠিয়ে দেনা, কী বইয়ের দরকার নিয়ে আসুক।

—ও বাবা, গোবিন্দ! তবেই হয়েছে, কি বলতে যে কি বলবে—হয়তো একখানা টাইমটেবলই এনে বসে থাকবে।

কিন্তু তরুবালাও নাছোড়বান্দা, উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন—হ্যাঁ ওই তোদের এক কথা, চিরকূট লিখে দেনা একটু।

—সে ঠিক হবে না মা, সে সব অনেক জিনিস জেনে নেবার আছে, তুমি বুঝবে না—

—তা' বুঝবো কেন? তরুবালা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—পাশের পড়া পড়িনি বলে সাদাকথাও বুঝতে পারবো না? যখন তখন তোর ওদের বাড়ী যাবার কী দরকার শুনি? ও আসে? ওরা বড়লোক—

—বাঃ বড়লোকের মতন কিছু দেমাক আছে নাকি ওদের? কী রকম ভালো উমার মা—

—হ্যাঁ গো বাছা হ্যাঁ, সকলের মা-ই খুব ভালো, যত মন্দ তোমার মা। কি করবে বল, এরকম দজ্জাল মার পেটে জন্মে ফেলেছ যখন, উপায় কি?

—বারে তাই বুঝি বললাম? ভালোকে ভালো বললে কি হয়? এই যে তুমি বল 'সতীশবাবু বেশ লোক', তা'র মানে বুঝি বাবা ভয়ানক খারাপ?

রাগের মধ্যে হঠাৎ হেসে ফেলেন তরুবালা।

—দূর হ, পোড়ার মুখো মেয়ের কথা শোন। এই আজ যাচ্ছো যাও, কিন্তু নিত্যি নিত্যি ওরকম যাওয়া চলবেনা তা' বলে দিচ্ছি। সাধে নাম রেখেছি "তর্কচূড়ামণি"।

উত্তর দেবার আগেই তর্কচূড়ামণি উধাও। পরের কথা পরে বোঝা যাবে, কিন্তু আজ একবার না যেতে পেলে তার জীবন মিথ্যে। ঠিক সময় উত্তর না পেলে বলবে কি নিখিল? বুড়ো হয়ে গিয়েও মা বাবারা সব এত চালাক থাকে কি করে, এই আশ্চর্য্য। চোখে ধূলো দেওয়া দায়।

উমাই যা তার ব্যথার ব্যথী, বুঝুক না বুঝুক, বলে দেয় না। তা ছাড়া ওর মার অত অনুসন্ধিৎসা নেই। একটা পশমের গোলা আর গোটা দুই লোহার কাঁটা হাতে পড়লেই পৃথিবীর দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে। যেখানে যা নতুন প্যাটার্ণ দেখছেন তুলে আনছেন তার নমুনা, নিজেই আবিষ্কার করছেন নতুন প্যাটার্ণ, আর নিতান্ত অবশ্য কর্ত্তব্যগুলো সারা হলেই গোলা হাতে নেমে পড়ছেন যুদ্ধে। নয়তো ছুটছেন কমলা পিসির বাড়ী, যেখানে হাতের কাজ চালাতে চালাতে রসনাও চালানো চলে।

উমা যে বড় হয়েছে—উমাকে যে আগলে বেড়ান দরকার, সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ—এত সুবিধা সত্ত্বেও হাঁদা উমি, সময় পেলেই রান্না শিখতে ব্যস্ত। সন্ধ্যা মেঘে যে রঙিন আলো পশ্চিমের আকাশে সোণার ছবি আঁকে তার দিকে একবার চেয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই ওর, বামুন ঠাকুরের কাছে মাংসর কোর্ম্মা শিখতে বসেছে হয়তো সে সময়।

মণি যদি উমার মার মেয়ে হ'ত!

সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন ব্যথায় টন্‌টন্ করে আসে · বাবা? মল্লি? নাঃ তার চেয়ে তরুবালাই যদি উমার মার মত হ'তেন।

উমা খালি হাসে, বলে—এতও পারিস তুই চুড়ো? বসে বসে ছ'পাতা ভর্ত্তি চিঠি লিখেছিস? তোদের মোটা বাসন্তীদি' স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন এ আবার জানাবার মত এমন কি কথা, তাই লিখেছিস? দেখিস, পড়ে হাসবেন নিখিলবাবু।

—যাকগে যাক্, যেখানে হাসবেন হাসুন দেখতে পাবো না তো? যা মনে এলো লিখে দিলাম।

লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে মণি। সত্যি, হাতের লেখা এত ভালো করে এত যত্নের সঙ্গে এবং এত রিস্ক্ নিয়ে যে পত্র রচনা, তা'র বিষয়-বস্তুটা তেমন জোরালো হয়নি তো?

নিখিল এতদিন না আসায় মল্লিনাথ কি বলে সে কথা এত বিস্তারিত লেখবার কি ছিল? মণি কি ভাবে, সে কথা জানানো হল কই? কিন্তু কী সাধ্য মণির—যে সেই অগাধ সমুদ্রকে ভাষার বন্ধনে বন্দী করবে?

কলম ধরার সঙ্গে সঙ্গেই যে সমস্ত হৃদয় পূর্ণিমার সমুদ্রের মত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। হিমশীতল কম্পমান আঙুলের ডগা কটি দিয়ে কলম ধরে সাদা কথা লেখাই অসম্ভব হয়ে ওঠে যে! কতবার ছিঁড়ে ফেলে, কতবার খসড়া করে, তবে তো এই তুচ্ছ চিঠি। কিন্তু নিখিল কি তুচ্ছ করবে?

কিন্তু চিঠির মূল্য কি সবাই রাখে?

প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির টেবিলে মূল্যবান কাগজে লেখা যে চিঠিখানি চৌকো সাইজের পুরু দামী খামের মধ্যে আত্মগোপন করে গতকাল থেকে পড়ে আছে, তাকে খুলে পড়বার পর্য্যন্ত সময় হয়নি প্রফেসরের। চিঠি জিনিসটা কী এতই তুচ্ছ?

টেবিল গোছাতে এসে নির্ম্মলা দেখে বাইশ ঘণ্টা ধরে একই অবস্থায় পড়ে আছে চিঠিখানা। দেখে অবাক হয়ে গেল।

বিধবা মেয়ে—মামার আশ্রয়ে থাকে, সংসারের যা কিছু দায়িত্ব আর মাথা পাগলা মামাটীর ভার তার উপর।

মামীর আচার আচরণে খুব যে সন্তুষ্ট তা নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করবার স্বভাবও তার নয়। তবু চিঠিখানা দেখে একটু মনঃক্ষুণ্ন হ'ল, ভাবলে—সত্যি বাবু, মামী রাগ করে আর না করে! চিঠিখানা এসে পড়ে আছে কাল থেকে—পড়বার ফুরসৎ হয়নি?

কাছে থাকতে তো অষ্টপ্রহর মামীর মেজাজের ঠ্যালায় অস্থির। রাগ, অভিমান, তর্ক, জেদ, হাঙ্গার ষ্ট্রাইক, 'ফিট্' হয়ে পড়া—কত কি কাণ্ড, কিন্তু দূরে গিয়ে সেই মানুষ আছেন কেমন? কোন ভাষায় জানিয়েছেন মনের কথা? চিঠিতেও খানিকটা ঝগড়া ভরে পাঠান নি তো?

আপনার মনে হেসে ফেলে নির্ম্মলা।

আর মামাকে খুব একচোট বকে নেবে বলে ঠিক করে রাখে।

ভাত খাবার সময় ছাড়া মামার পাত্তা পাওয়া শক্ত। তাই—খাওয়ার টেবিলের একপাশে চিঠিখানা বেশ দৃশ্যগোচর করে রেখে দেয়। প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি চিরদিনই আসন পেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আহারের পক্ষপাতী, কিন্তু বলাকার সাধে আর সাধনায় বাড়ীতে টেবিলের প্রবর্ত্তন।

তবে শুধুই চেয়ার টেবিল, যন্ত্রপাতির চলনটা আর কিছুতেই করে উঠতে পারেন নি।

প্রফেসর খামখানার দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে, চিরঅভ্যাসমত প্রথমেই জলের গ্লাসটা মুখে তুলে ধরলেন আহারের গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে।

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—এঁঠো হাত করে ফেলোনা মামা, চিঠিটা—

—পড়লেই হবে'খন ধীরে সুস্থে, খাই আগে।

নির্ম্মলা ব'কে ওঠে—তোমার ধীরে সুস্থে হ'তে ক'দিন লাগে মামা? কাল সকাল থেকে পড়ে আছে চিঠিটা, পড়বার সময় হয় না? মামী কি সাধে তোমার ওপর চটা?

—তা যা বলেছিস, তাড়াতাড়ি কিছু করা আমার দ্বারা হয় না।

—হবেনা কেন? খুব হয়। কারুর যদি সর্দ্দিজ্বর হয় তাড়াতাড়ি গিয়ে বিধান রায়কে ডেকে আনতে পারো তুমি।

—সর্দ্দিজ্বর কি সোজা জিনিস হ'লরে নির্ম্মলা? কী না হ'তে পারে ও থেকে? ব্রঙ্কাইটীস্, নিউমনিয়া, প্লুরিসি, থাইসিস—

—তোমার শাশুড়ীর মাথা।—নির্ম্মলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

শক্ত শক্ত রোগের নাম করলেই কোন অজ্ঞাত কারণে বলা যায় না—নির্ম্মলা সাংঘাতিক চটে ওঠে, কাজেই তাকে ক্ষেপাবার এই এক অমোঘ অস্ত্র। ইচ্ছে হলেই প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি কোন না কোন ছলে সুরু করবেন—খাবার জলটা ভালো করে ঢাকা দিয়েছিস্ তো নির্ম্মলা? জানিস তো—জল থেকেই টাইফয়েড, ডিসেন্ট্রি, কলেরা—

নির্ম্মলা দুইকাণে হাত চাপা দিয়ে বকতে থাকবে—ভালো হবে না বলছি মামা, চুপ করো শিগগির।

বলাকা দেবী এসব আদিখ্যেতা সহ্য করতে পারেন না, হাড় জ্বলে যায় তাঁর। বিশেষতো যখনি দেখেন অন্যের সঙ্গে কথা কইতে গেলে দিব্যি সহজ হাসির সুর ফোটে স্বামীর কণ্ঠে, আর তাঁর কাছে এলেই ভিন্নমূর্ত্তি, তখনই ব্রহ্মাণ্ডে আগুন ধরে যায়। আর নির্ম্মলাই কি কচি খুকী? মামীর চাইতে কতোই বা ছোটো?

অনেক সময়—মুখের সামনেই—"অসহ্য" "বিরক্তিকর" "ন্যাকামী" বলে ঠোঁট উল্টে উঠে চলে যান।

বলাকার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর কর্ত্তা থেকে চাকর বামুন গয়লা ধোবা সকলেই সহজ স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

নির্ম্মলার মুখে "শাশুড়ীর মাথা" শুনে প্রফেসর হো হো করে হেসে ওঠেন—সে ভদ্রমহিলাকে আর স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনা কেন?

—তোমাকে শাসন করতে—আর কেন।

—আমাকে শাসন? সে তো তুইই রয়েছিস্?

—উঁহু ঠিক জব্দ হচ্ছনা তুমি আমার মত ভালমানুষ খাশুড়ীর শাসনে। জবরদস্ত লোক চাই।

—তার জন্যে তো খাশুড়ীর মেয়েটাই রয়েছেন—নেহাৎ কম নয় বোধ হয়।

দুষ্টুমীর হাসি হাসতে থাকেন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি।

আশ্চর্য্য! বলাকার অসাক্ষাতে তার মেজাজের ওজন নিয়ে হাস্য পরিহাসও করা চলে, কিন্তু চারিদিকের আবহাওয়াটা গুমট করে তোলবার কী অদ্ভুত ক্ষমতাই না বলাকার আছে! নিঃশব্দে দুবেলা দুটি খেয়ে নিয়ে কেটে পড়তে পারলেই যেন বাঁচা যায়।

অথচ বাইরেরলোকের কাছে বলাকা? সে আর একজন।

রাত্রে বিছানায় শুতে এসে দেখলেন—বালিশের উপর চিঠিখানা রেখে গেছে নির্ম্মলা। না পড়িয়ে ছাড়বে না।

অল্প হেসে খামের পাশটা ছিঁড়লেন।

বলাকার সেই উচ্ছাসপূর্ণ দীর্ঘ চিঠি।

খানিকটা পড়ে ভাঁজ করে ফেলে রেখে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। বেড সুইচ্ অফ্ করার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ম্মল চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেল।

কিন্তু এমন সময়ও আসতে পারে যখন চাঁদের আলোও অরুচিকর।

চোখের উপর হাত চাপা দিয়ে পড়ে থাকেন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি।

...বলাকা কেন স্বাভাবিক হ'তে পারে না? কেন পারেনা তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করতে? পাদপ্রদীপের সামনে অভিনয় করেই সারাজীবনটা কাটলো তার?

নিজেকে ফুটিয়ে তোলবার আর কোনো পথই খুঁজে পেলেনা সে? এই গ্লানিকর অরুচিকর অভিনেত্রীর জীবনই তার কাম্য হ'ল?

—অবাক হয়ে গেলাম নিখিল, যখন দেখলাম—আমাকেও কারুর প্রয়োজন হ'তে পারে—

অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না বলেই হয়তো কথা বলা যায়।

খোলা ছাদে জ্যোৎস্নাহীন আকাশের নীচে দুই বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়েছিলেন বিভূতিবাবু, নিখিল কখন এসে নিঃশব্দে বসে আছে খেয়াল নেই। যখন টের পেলেন, যেন প্রস্তুত করে নিলেন নিজেকে, সাহস সঞ্চয় করে নিলেন অন্ধকার থেকে।

কিন্তু কি এ?

যুবক পুত্রের কাছে বয়স্ক পিতার পদস্খলনের স্বীকারোক্তি? না নিজের মুখোমুখি বসে নিজেকে বিশ্লেষণ করা?

—সেই রাত্রে—যখন আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করলাম— এত রাত্রে একলা আমার ঘরে আসবার সাহস তার কি করে হ'ল, উত্তর দিলে না—শুধু কেঁদে ভাসিয়ে দিলে আমার ঘরের মেঝে—আমার দুই পা।

হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিভূতি বাবু, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন - হ্যাঁ কী অদ্ভুত দেখ নিখিল, প্রায় তোমার বয়সের মেয়ে সে—ছেলেমানুষ বৈ তো নয়—আমাকে তার দরকার হতে গেল কেন? ভাবতাম—আমি 'দেবতা' আমি 'গুরুদেব'—এই বুঝি আমার শেষ পরিচয়। এর বাইরে আমার—শুধু 'আমি' বলে আলাদা কোনো মূল্য আছে এ তো কোনোদিন খেয়াল করিনি। তাকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সারারাত্রি ঘুম হ'ল না। অনেক ভাবলাম, ভেবে আর কূলকিনারা পাইনে। কল্যাণীর মত মেয়ে আশ্রমের রত্ন বললেই হ'ল, ধীর স্থির শান্ত নম্র, অদ্ভুতকর্ম্মা, চমৎকার স্বভাব—কোনোদিন কাণে আসেনি ওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, ও হঠাৎ এমন করলে?...এ কি আমারই অসাবধানতার ফল? তার সদ্‌গুণের জন্যে যদি বিশেষ কোনো প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখে থাকি তা'কে, সে কি অন্যায় করেছি? কার দোষ? কার ভুল? কিছু ঠিক করতে পারলাম না। সারারাত্রি শুধু নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলাম।...পরদিন শৈল মাসী এসে বললেন—"কল্যাণী চলে যাবে।" চমকে গেলাম—চলে যাবে—একথা তো ভাবিনি। জানতে চাইলাম—'কেন'?

আবার এক মুহূর্ত্ত চুপ করে যান বিভূতিবাবু। পরক্ষণেই—যেন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে সহজ গলায় বলেন—শৈলমাসী বললেন—'ও তোমায় ভালবাসে'। নিজেকে তৈরী করেছি বলে ভারী গর্ব্ব ছিল নিখিল, কিন্তু তবু পরের মুখে এরকম স্পষ্ট কথা শুনে একটু কেঁপে উঠলাম বৈকি।...তবু বললাম—যা বলা উচিত—বললাম—'আমাকে তো সব্বাই ভালবাসে শৈলমাসী, এটা আবার ঘটা করে শোনাবার মত কী একটা কথা?' শৈলমাসী রেগে উঠলেন—বললেন 'নিজেকে নিজে ঠকাসনে বিভূতি, ভালো তো তুইও সব্বাইকে বাসিস্, তবু কি কল্যাণীর মতন? কল্যাণী চলে গেলে তোর আশ্রম শূন্য হয়ে যাবে না? মহালক্ষ্মী চলে যাওয়ার মত সহজ মনে অনায়াসে নিতে পারবি?'—উত্তর দিতে পারলাম না।...তারপর আশ্রমের সংস্রব ত্যাগ করে চলে এলাম কল্যাণীকে নিয়ে। সবাই জেনেছিল আমার অধঃপতনের ইতিহাস, শুধু তোমার কাছেই কী যে এক সঙ্কোচ—

বিভূতি বাবু চুপ করে গেলেন।

এতক্ষণ পরে নিখিল কথা বললে—কিন্তু হঠাৎ এভাবে চলে গেলেন কেন তিনি?

—হয় তো আমারই দোষ।

চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের গভীর ব্যথার সুর গোপন করতে পারলেন না বিভূতি বাবু।

—তাকে নিয়ে এলাম—কিন্তু মেনে নিতে পারলাম না—দীর্ঘকালের শিক্ষা, সংস্কার, অভ্যাস, মৃণ্ময়ীর কাছে অপরাধ বোধ, অনবরত বাধা দিতে লাগলো। সেটা যে তাকে এত আঘাত করতো বুঝতে পারিনি। তোমরা যেদিন এলে—এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে—সামান্য কথা। হঠাৎ তেমনি করে—সেই প্রথম রাত্রের মত সে কী কান্না! ওই এক অদ্ভুত স্বভাব তা'র—বেশ আছে—ধীর স্থির শান্ত নিজেকে নিয়ে নিজে আছে—হঠাৎ কী যে হয়।···হ্যাঁ কি বলছিলাম—তোমার আসার খবরে নীচে নেমে গেলাম—কত রাত হয়ে গেল কেবা তার খোঁজ করেছে—সকালে কত বেলায় কেষ্ট বললে—

—আমি খুঁজে বার করবোই বাবা।

বাবার পায়ের উপর একটা হাত রাখলো নিখিল।

হঠাৎ বাবার উপর একটা সকরুণ মমতায় সমস্ত হৃদয় ভরে ওঠে নিখিলের—ছোটরা দুঃখ পেলে যেমন হয় বড়দের—সন্তানের জন্য হয় পিতার। বাবার উপর তার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, ভালবাসা ছিল অগাধ, শুধু সাহস ছিল না স্নেহ করবার। কাছে থেকেও যেন অনেক দূরের মানুষ, অনেক উঁচুর, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাবার মত নয়।

বাবার জন্য সমবেদনা এ একটা নতুন অনুভূতি। ইচ্ছে করছে গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়, আদর করে।

ঘৃণা? লজ্জা? রাগ? কিছুই তো খুঁজে পাচ্ছে না মনের মধ্যে।

কল্যাণীর উপর বিরাগ? তাই বা কই? দু'টি আত্মবঞ্চিত নরনারীর প্রেমের ব্যথা যেন নিজের অন্তরে অনুভব করতে থাকে সে।

নিমীলিত দুই চোখের প্রান্ত বেয়ে দুই বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, সে কার? সে কি কঠোর সংযমী দৃঢ় চরিত্র বিভূতির? অন্ধকার তাই। নইলে—মিহির ডাক্তার শুনলে কি বলতো? কি বলতো ম্যানেজার নৃপেনবাবু—গোঁফের ফাঁকে একটু মুচ্‌কি হেসে?

আস্তে আস্তে রাত্রি গভীর হয়ে আসে, কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ উঁকি মারে আকাশের কোণে, অন্ধকার পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

—চল, ঠাণ্ডা লাগছে তোমার—বলে উঠে বসলেন বিভূতি বাবু। চুলের মধ্যে কয়েকবার আঙুল চালিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—কিন্তু খোঁজ করবার দরকার কি সত্যিই আছে নিখিল? হারিয়ে নষ্ট হয়ে যাবার মত মেয়ে সে নয়। হয়তো এর চেয়ে ভালো পরিণতি আসবে তার জীবনে, সার্থক করে তুলবে নিজেকে।

—আর আপনি?

আচমকা মুখ দিয়ে বার হয়ে যায় কথাটা।

—আমি? ভাবছি—আশ্রমেই ফিরে যাবো আবার।

—কক্ষনো না। আমার মা চাই, খুঁজে আনতেই হবে তাঁকে।

'অবাঞ্ছিত অতিথি' বলে যে কথা আছে একটা, এটা বলাকা দেবীর সম্বন্ধে যেমন খাটছে, অন্যক্ষেত্রেই তেমন হয়। বলাকা দেবী নিজেও যে সেটা একেবারে না বোঝেন তা' নয়, তবু কেন যে কলকাতায় ফিরে যেতে চাননা এই এক আশ্চর্য্য রহস্য।

সকালবেলা বাড়ীর পিছনের বাগানে উপাসনার ভঙ্গীতে বসেছিলেন বিভূতিবাবু নিত্যকার মতই। দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ গড়ন, খদ্দরের চাদর জড়ানো খালি গা, বুকের একাংশ খোলা, পড়েছে সকালের আলো—বুকে মুখে ললাটে, নিমীলিত দুটি চোখের পাতায়।

ভোরবেলা বেড়ানো অভ্যাস বলাকা দেবীর। বেড়িয়ে ফিরে আসবার মুখে বাগানের পথে আসতে গিয়ে হঠাৎ যেন স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।······

পুরুষমানুষের এত রূপ? এত রং? রৌদ্রের আভায় আর্শির মত জ্বলে? মনে পড়লো নিখিলের সেই প্রথম দিনকার সগর্ব্ব উক্তি—বাবার রূপের হিসাব নিয়ে—নিজেদের বংশগত সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিয়ে।

তবু এতটা অনুমান করতে পারেননি বলাকা দেবী। দু'দিন এসেছেন, ভালো করে দেখাই হয়নি ভদ্রলোকের সঙ্গে, সেই প্রথম দিন রাত্রে যা দু'একটা মামুলি অভ্যর্থনার কথা, আর মোমবাতির মৃদু আলোকে দেখা।

এই অগাধ রূপ, অপরূপ সৌন্দর্য্য অবহেলা করে চলে গেছে কল্যাণী? মেয়েমানুষ হয়ে? এর চাইতে বেশী আকর্ষণের বস্তু সে পেলে কোথায়? যে যাই বলুক, কল্যাণীর গৃহত্যাগের অন্য কোন অর্থ স্বীকার করেন না বলাকা দেবী।

যে মেয়ে একবার ব্রহ্মচারীর তপোভঙ্গ করে নীচে নামিয়ে আনতে পারে, সে যে আবার একবার অন্যায় খেয়াল চরিতার্থ করতে নিজেকে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারবেনা পাপের পথে, একথা বিশ্বাস করবে কে?

বলাকা দেবী এত বোকা নয়, যে বিশ্বাস করে সন্তুষ্ট হবেন—অভিমানভরে পালিয়ে গেছে কল্যাণী। মেয়েমানুষকে তাঁর জানা আছে।

দু'চার বার বাগানে পাক্ দিয়ে বেড়ান—বিভূতিবাবুর ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষায়। সত্যিই তো, ভদ্রলোকের এই মনঃকষ্টের সময় সান্ত্বনা দেওয়া দরকার নয় কি? সব মেয়েমানুষই তো আর কল্যাণীর মত হৃদয়হীন নয়? তাদের মায়া মমতা আছে, হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে।

আলগোছে স্থানভ্রষ্ট দু'চারটী চুল কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে পাউডারমণ্ডিত রুমাল খানি ঘাড়ে গলায় বাহুতে বুলিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নেন।

মানুষের উপস্থিতিই ধ্যান ভঙ্গের পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে। বিভূতিবাবু ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে উঠে পড়লেন।

আর সঙ্গে সঙ্গেই বলাকা দেবীর কলকণ্ঠ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো—এই যে—পূজো পাঠ সারা হল?

বলা বাহুল্য বিভূতিবাবুর মনোভাবটা এই সব "প্রজাপতি মার্কা"র উপর কোনো কালেই অনুকূল নয়, এখনকার মনের অবস্থায় তো আরোই নয়। নিখিলের উপর বরং একটু অসন্তুষ্টই হচ্ছিলেন এই রকম উপদ্রব জোটানোর জন্যে। তবু—ভদ্রতার খাতিরে সামান্য হেসে বললেন—বেড়িয়ে ফিরলেন?

—হ্যাঁ, ঘুরে এলাম খানিকটা, সুন্দর জায়গা, বেশ আছেন আপনারা। আমাদের মত ধোঁয়া ধুলো আর লোকের ভীড়ের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠতে হয় না।

অবশ্য কলকাতায় ফিরে গেলে সহরে সভ্য ব্যক্তিদের কাছে উল্টো কথাই বলবেন।—'আর বোলোনা, কলকাতার বাইরে আবার মানুষে থাকে? আমাদের তো ভাই পল্লীগ্রামে দু'দিন থাকলেই প্রাণ হাঁফিয়ে আসে'।

এসব ছেঁদো কথা বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব বিভূতিবাবুর নেই। উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলেন—বেশ, শুনে খুসী হলাম, চলুন বাড়ীর মধ্যে যাওয়া যাক।

—যাচ্ছেন বুঝি আপনি? চমৎকার জায়গাটী কিন্তু, উপভোগ করবার মত। একটু বসলে খুসী হতাম। অবশ্য প্রয়োজন থাকে যদি আপনার—

—না প্রয়োজন আর এমন কি, নিখিল উঠেছে কিনা দেখি—

—নিখিল? সে তো ভোরবেলা উঠে চলে গেছে কোথায়।

—চলে গেছে?

হঠাৎ চুপ করে যান বিভূতিবাবু···আজকে থেকেই তা'হলে অন্বেষণ সুরু হ'ল? পাগলা ছেলে। যে ইচ্ছে করে হারিয়ে যায়, তাকে খুঁজে বার করা কি এতই সোজা? তা ছাড়া জীবনে যাকে চাক্ষুষ দেখেনি কোনোদিন, তাকে চিনবে সে কোন্ চিহ্নের সূত্রে?

এইটী বুঝি আপনার উপাসনার জায়গা?

—কি বললেন?···ও না, উপাসনা আর কি, এমনি বসে থাকি চুপচাপ।

—কিন্তু রীতিমত ধ্যানস্থ হয়েছিলেন আপনি, ঠিক ষ্ট্যাচুর মত, যেন শ্বেত পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্ত্তি।

নিজস্ব বালিকাসুলভ ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে হেসে ওঠেন মিসেস চ্যাটার্জ্জি।

হয়তো 'সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা' "ঠাকুর মশাই"কে দেখলে কিছুটা সমীহ করতেন—কিছুটা ভয়, কিন্তু বিভূতি লাহিড়ীকে ভয় কি? যে পুরুষ একবার স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে ইহকাল পরকাল জলাঞ্জলী দিতে পারে তা'কে ভয় পাবার কিছু নেই। তা'ও একটা সাধারণ চেহারার দুঃখী অনাথ মেয়ে। কল্যাণীর রূপের বিবরণ আশ্রম বাড়ীর দু'একটী মেয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন বলাকা দেবী।

প্রগলভ স্বভাব একেই তো বিভূতিবাবুর দু'চক্ষের বিষ, তার উপর মেয়েদের। বিরক্ত হয়ে ওঠেন, ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন—চলুন যাওয়া যাক্ রোদ উঠে পড়েছে।

কাজলপরা কালো চোখের আলো হঠাৎ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে যেন।

তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া সেরে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা হয়ে আসা একটী পাতলা দীর্ঘ ছায়া। চমকে ওঠাই উচিৎ, কারণ এটুকু শৈলবালার নিজস্ব এলাকা, বড় কেউ এখানে পদার্পণ করে না। তবে ভয় পাবারও কিছু নেই, নিশ্চয়ই কোন প্রার্থী নিরালায় জানাতে এসেছে গোপন প্রার্থনা।

—কে ওখানে?

—আমি।

—কল্যাণী?

চমকে ওঠেন শৈলবালা, এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিখিলের পিতৃ সন্দর্শনের সঙ্গে কল্যাণীর চলে আসার কিছু একটা যোগসূত্র অনুমান করে নিয়ে নরম গলায় বলেন—আয়। একলা এলি বুঝি?

—পালিয়ে এলাম মাসীমা।

—পালিয়ে এলি? কেন বল্‌তো কল্যাণী?

সহজ হবার চেষ্টা করলেও কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ চাপা পড়ল না শৈলবালার।

—রাণীগিরি পোষাল না মাসীমা।

সামান্য একটু হাসির শব্দ শোনা যায়।

—ঘরে আয় কল্যাণী, বোস আমার কাছে দেখি।

—দাঁড়াও মাসীমা, তোমায় প্রণাম করে নিই আগে।

—ব্যাপারটা খুলে বলতো আমাকে, নিখিল কি কিছু বললে? কিন্তু সে তো তেমন ছেলে নয়—

—তাঁকে তো আমি দেখিনি মাসীমা।

—দেখিস নি? তা'হলে? এখান থেকে তো গেল তোদের ওখানে যাবে বলেই। সঙ্গে সেই এক ধিঙ্গি মাষ্টার গিন্নী—ছেলেটার একটু ইচ্ছে নয় যে তা'কে সঙ্গে নেয়, বার বার বললে—"দুদিন এখানে থাকুন আমি ঘুরে আসি"—শুনলে না। পৌঁছয়নি সেখানে?

—আমি কাউকেই দেখিনি মাসীমা, তবে শুনলাম গেছেন দু'জন।

—শুনেই ভয় পেয়ে পালিয়ে এলি? আচ্ছা মেয়ে তো? এলি কি করে?

—এলাম যা হোক করে, তবে ভয় পেয়ে নয় মাসীমা, হেরে গিয়ে। যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে চলে এলাম। যাবার আগে তোমাকে একবার দেখে যাবার বড় ইচ্ছে হ'ল। কাল চলে যাবো।

—কি সব গোলমেলে কথা বলছিস কল্যাণী, বিভূতিকে ছেড়ে চলে এসেছিস নাকি?

—যদি তাই বল তো তাই।

মৃদু হাসলো কল্যাণী।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওর পিঠের উপর একখানি হাত রেখে শৈলবালা ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন—ভালো করোনি মা, কাল ভোর বেলাই বিপিনের গাড়ীতে চলে যেও। এ কি ছেলেমানুষী হয়েছে বলতো? তোমার মত বুদ্ধিমতীর কাছে এ রকম কাজ আশা করিনি আমি।

—কি করবো মাসীমা, পারলাম না। এতদিন ধরে অহরহ বুদ্ধির কাছে প্রশ্ন করেছি, উত্তর দিতে পারে না, চুপ করে থাকে। দেখছি ভুল করেছিলাম মাসীমা। তখন ভেবেছিলাম—দয়া পেলেই বেঁচে যাই, এখন দেখছি দয়া সহ্য করা বড় কঠিন। আমায় ক্ষমা করো মাসীমা, তোমাদের কাছে হঠাৎ যেন শনিগ্রহের মত এসেছিলাম—সকলের ক্ষতি করে গেলাম।—আর তাঁর? সে আর বলবো কোন মুখে? নিজের ধৃষ্টতায় দেবতাকে মন্দির থেকে নামিয়ে নিয়ে গেলাম কিন্তু অত বড় জিনিষ সামলাবার সামর্থ্য হলো না। সেই অক্ষমতার লজ্জায় লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি।

শৈলবালা ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আস্তে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—কথাটা খুব মিথ্যে নয় কল্যাণী, ক্ষতি অনেক হল বৈকি। যখন দেখতাম—তোমার নাম শুনলে বিভূতির চোখে আলো জ্বলে ওঠে, তোমার কাজের প্রশংসায় বুক ভরে যায় ওর, দেখতাম চিরদিনের নিয়মী মানুষের গভীর রাত্রি জেগে বাগানে ঘুরে বেড়ানো—তখন মনে হ'য়েছিল এ কি খাল কেটে কুমীর আনলাম। খুব রাগ হল তোর ওপর, ঘৃণা করতে চেষ্টা করলাম—নিজে হাতে করে যখন শুধু তোর জন্যে তাকে বিদায় দিলায় তখন বার বার ভগবানকে জিগ্যেস করেছি—একি করলাম? একি করলাম? তবু এইটুকু সান্ত্বনা ছিল—ওর নিঃসঙ্গ জীবন ভরে উঠেছে, একটু আরামের আশ্রয় পেয়েছে। সকলের মাঝখানে থেকেও সকলের নাগালের বাইরে বড় একলা জীবন ছিল ওর। কিন্তু একি হ'ল বল্ তো? হেরে পালিয়ে এলি?

—আমার অক্ষমতা ক্ষমা করো মাসীমা।

—তা হলে এখন কি করবি ঠিক করেছিস?

—আবার দাদার কাছেই ফিরে যাবো কলকাতায়।

—দাদার কাছে? যেতে লজ্জা করবে না?

—লজ্জা তো করবেই মাসীমা। কিন্তু লজ্জার কাজ করবো আর তার গ্লানিটা এড়িয়ে যাবো, একি হয়? আশীর্ব্বাদ করো আর যেন লজ্জায় পড়বার কাজ না করি।

—আবার সেই মাষ্টারী করবি?

—অন্য কিছু কাজ তো শিখিনি মাসীমা।

—কিন্তু কেনই বা তুই খেটে খাবি কল্যাণী? সিঁদুর যখন পরেছিস্, তখন বিভূতি অন্ততঃ তোকে ভাত দিতে বাধ্য। তোর কলকাতার ঠিকানা—

—ছিঃ মাসীমা।

'ছিঃ'। সে কথা শৈলবালাও উচ্চারণ করেই অনুভব করেছিলেন, তবু কল্যাণীর এই অসহায় ম্লান মুখ এত পীড়িত করতে থাকে যে এমন অসম্মানকর প্রস্তাবও মুখে এসে পড়ে।

—তাহলে কার সঙ্গে যাবি কলকাতায়? ডাক্তার বাবু শুনছি পশু—

—তুমি এক পাগলা মেয়ে শৈলমাসি, কার সঙ্গে আবার যাবো? একলাই তো এসেছিলাম।

মল্লিনাথ ক'দিন ধরে দারুণ চটে আছে। দিদির যে কী হয়েছে, কিছুতেই আর দিদির নাগাল পাচ্ছেনা সে।

খুনসুড়ি করে করে ঝগড়া বাধাবার এত চেষ্টা করছে—কিছুতেই সুবিধা করে উঠতে পারছে না। হঠাৎ এত উদার পরমহংস হয়ে ওঠবার কারণ কি? এমনি থেকেই নিজের খাতা পেনসিল বিলিয়ে দিচ্ছে, ফাউণ্টেন পেনে হাত দিলে চুলের মুঠি ধরছেনা, এমন কি লুকিয়ে 'কুপথ্যি' জোগাড় করে আনবার জন্যে মল্লিনাথের হাতে পায়ে পড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সেদিন নিজে থেকেই 'ঝালবড়া' নিয়ে এসে সেধে দিতে গেল মল্লিনাথ, স্বচ্ছন্দে বলে বসলো—'তুই খেয়ে নে ভাই, আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না'।

বেড়ালের মাছে অরুচি! দেখে কেমন যেন ভয় ভয় করে।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধে যথার্থ বোধ না থাকলেও দিদির এই ভাবান্তরের সঙ্গে নিখিলবাবুর যে কিছু একটা যোগাযোগ আছে এইটা আন্দাজ করে, পরম প্রিয়পাত্র নিখিলবাবুর উপর সুদ্ধ রীতিমত বিরক্ত হয়ে ওঠে মল্লিনাথ।

দিদি 'বড়' হয়ে গেলে তার আর রইল কি?

সত্যি, মণিরও দোষ আছে বৈকি। কি দরকার ছিল ওর প্রেমে পড়তে যাবার? এখন নিজেকেই যে নিজে সামলাতে পারছে না। পরীক্ষা আসন্ন, পড়া তৈরি হয়ে ওঠে না, অঙ্ক কষতে বসে হঠাৎ সমস্ত সংখ্যাগুলো অর্থহীন একাকার হয়ে যায়, রচনা করতে গিয়ে সাদা কাগজের পিঠে লিখতে ইচ্ছে করে সম্পূর্ণ অবান্তর কথা, ইংরাজি বই খুলে মানেগুলো বোধগম্য হয় না।

এদিকে তরুবালা সাতবার ডেকে সাড়া পাচ্ছেন না, সুরেশবাবু কোর্টে যাবার সময় দেখেন কাগজপত্র গোছানো নেই, পানের ডিবে খালি। মেয়েটাই যে কোথায় থাকে, দেখতে পাওয়া দায়।

কেন এত ভুল?

শৈশব ছন্দে গাঁথা সাজানো দিনগুলি যেন ভেঙে চুরে ছড়িয়ে পড়েছে অকস্মাৎ যৌবনের দমকা হাওয়ায়। তরুবালার হাতে গড়া এই ছোট সংসারের খাঁজকাটা খুপ্‌রিতে যেন ওকে আর আঁটছে না।

প্রতি পদে ধরা পড়ছে সেই অসঙ্গতি।

আজকে মল্লিনাথ শেষ চেষ্টা দেখবে। দিদি বড় হয়ে যেতে পারে, ও পারেনা? দাদার মত গুরুগম্ভীর চালে এসে বললে—এই দিদি, আজকাল তোর কি হয়েছে বলতে পারিস?

—হবে আবার কি?

মণি চকিত হয়ে ওঠে।

—হরদম কিসের ভাবে বিভোর হয়ে থাকিস?

—ভাবে বিভোর আবার কিরে অসভ্য ছেলে!

—তা'হলে আগে মাকে বলগে যা—'অসভ্য মেয়ে'! মা নিজেই বলছিলেন বাবার কাছে।

—বাবার কাছে?

লজ্জায় রক্তিম হয়ে ওঠে মণি—বাবার কাছে আবার কি বলতে গেলেন? মার যত সব ইয়ে—বাবাঃ।

—মার তো সবই 'ইয়ে', আর তোর নিজের কিরে? সকাল থেকে পড়তে বসেছিস? পড়তে তো ছুট দিয়েছে ইস্কুলে—

—এই তো এবার পড়বো রে, সব ঠিকঠাক করে নিচ্ছি—বলেই মণি অকস্মাৎ বই খাতা কাগজ কলম টানাটানি করে রীতিমত কর্ম্মব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—থাক্ হয়েছে, যা পড়বি সে তো মা সরস্বতীই জানছেন। বই খুলে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেই যদি পরীক্ষার পড়া তৈরি হ'ত তা'হলে আর ভাবনা ছিল না। কষ্টকরে আর কেউ পড়তো না তা'হলে।

—আকাশে আবার কি দেখি তাই শুনিয়ে দুষ্টু ছেলে? একদিন কবে একটা ঘুড়ির লড়াই দেখছিলাম—

—আজকেও বুঝি সারা সকাল ঘুড়ির লড়াই দেখছিলি? মা গঙ্গা নাইতে যাবার সময় কি বলে গিয়েছিলেন মনে আছে?

—মা? কই কিছু তো বলেন নি—অ্যাঁ? ওই যাঃ বিশ্রী হয়ে গেছে না? আমড়ার আচার—

ছুটন্ত দিদিকে ধরে ফেলে মল্লিনাথ।

—এখন আবার কি তুলবি? সে সব আমড়ার আচার ভিজে গোমড়া হয়ে বসে আছে। মা এসে দেখে রেগে আগুন একেবারে। বাবাকে গিয়ে খুব বকে দিলেন।

—বাবাকে কেন? বাবা কি করলেন?

ভারী মুসড়ে পড়ে বেচারা 'তর্কচূড়ামণি'—তর্কের স্পৃহা পর্য্যন্ত ঘুচে যায় তার।

—'বাবা তোর বিয়ে দিচ্ছেন না, পাশ করাচ্ছেন। ম্যাট্রিক পাশ করেননি বলে মার বিয়ে হয়নি নাকি' এই সব। যেমন না ধিঙ্গি মেয়ে তুমি!

—বাঃ রে বা, কি করেছি আমি? একবার একটু ভুলে গিয়েছি বলে—

অবাধ্য অশ্রু আর লজ্জা সরমের ধার ধারেনা, ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে।

শুধুই তো আর অপদস্থ হওয়ার লজ্জা নয়?

নাম-না-জানা যে 'মনকেমনে'র ভার জমাট মেঘের মত থমকে ছিল ছোট্ট মনটুকুর ভেতর, বাইরের একটু আঘাতের অপেক্ষাই করছিল যে সে। নইলে—অতটুকু মানুষ এত ভার বইবে কেমন করে?

'একমুঠো স্বর্গের' আস্বাদ পাইয়ে দিয়ে যে হৃদয়হীন মানুষটা একেবারে 'নিডুবি' হয়ে বসে আছে, তার নামটাও যে বাড়ীতে একবার উচ্চারিত হতে শোনেনা, কোন্ সূত্রে কেমন করে পাওয়া যাবে তার বার্ত্তা?

অমূল্যকে পিঠে বেঁধে সাইকেল চড়ে উধাও হয়ে যাওয়ার পর থেকে মিহির ডাক্তারকে আর দেখতে পাইনি আমরা, হঠাৎ দেখা গেল কলেজ ষ্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে।

আচমকা আকাশ থেকে পড়েননি অবশ্য, ট্রেনে চড়ে ভদ্রভাবেই এসেছেন, দেখাটা অপ্রত্যাশিত এই যা।

পাতলা ধুতি পাঞ্জাবী পরা পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ, হাতে একটা বইয়ের প্যাকেট। নীল ফিতে বাঁধা ব্রাউন পেপারের

মোড়কের উপর "বসন্ত পাবলিশিং হাউসে"র ছাপমারা। মোড়ক খুললে দেখা যেত আলাদা আলাদা বই নয়, একই উপন্যাসের একাধিক কপি।

কয়েকটা জরুরী ওষুধ কিনতে আর 'বসন্ত পাবলিশিং হাউসে'র গহ্বর থেকে "বিক্রমাদিত্য"র সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস "ছায়াছবি"খানা উদ্ধার করতে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছেন মিহির ডাক্তার।

এই এক সৃষ্টিছাড়া গাফিলি এদের। বইটা বার করে বাজারে ছাড়বার তাড়া একতিল নেই। 'হচ্ছে হবে' ভাব কর্ত্তা থেকে দপ্তরীটীর পর্য্যন্ত। যা কিছু গরজ লেখকদের।

বইটা ছাপা শেষ হয়েছে—এ খবর পেয়েছেন মাস দুই আগে, অথচ একবার দপ্তরী সাহেবের হাত ঘুরিয়ে বাজারে ছেড়ে ফেলবার ফুরসৎ এঁদের এখনো হচ্ছিল না। "বাহির হইতেছে" বলে যে আরো কতদিন বিজ্ঞাপন চালাবার ইচ্ছা ছিল কে জানে? চিঠি লিখে লিখে হায়রাণ হয়ে অবশেষে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'তেই হ'ল। এই তিন দিনের তাগাদায় অনেক কষ্টে এই কয়খানা বই টেনে বার করতে পেরেছেন। 'বিক্রমাদিত্যে'র নিজের ভাষায় "ঔপহারিক সংখ্যা"।

দু'চারখানা ট্রাম ছেড়ে দিয়ে একখানায় চড়ে বসতে সক্ষম হলেন—অনেক যুদ্ধ অনেক কসরতের জোরে। বাসের চাইতে অপেক্ষাকৃত সহনীয় হলেও ট্রামও অসহ্য হয়ে উঠেছে আজকাল। বিশেষ করে যারা বাইরে থেকে আসে তাদের কাছে।

নিজেকে কোনো রকমে একটু প্রতিষ্ঠিত করে বইয়ের প্যাকেটটা কোলে নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখেন নিত্য পরিবর্ত্তনশীল কলকাতার দিকে।

পাঁচবছর হ'ল মিহির ডাক্তার কলকাতা ছেড়েছেন, কিন্তু এই পাঁচ বছরের ইতিহাস কী অদ্ভুত ঘটনাবহুল! বছরে দু'একবার করে আসেন, প্রত্যেকবারই দেখেন এক এক নতুন লীলা। অবশ্য বাইরে থেকে যতটা শুনে আসেন ততটা মারাত্মক নয়, তবু ভয়াবহ বৈ কি।

চলন্ত গাড়ীর দুপাশের দৃশ্য বদলাচ্ছে···ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু চোখে পড়ছেনা কিছু, পাল্লা দিয়ে চলছে নিজের মনের গতি।···

ইভ্যাকুয়েশন! ইভ্যাকুয়েশন! অশ্রুতপূর্ব্ব এই শব্দ যখন প্রথম শুনলো লোকে, কম ভয়াবহ সেই দিন?

এতবড় সহরটাকে কে যেন শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিলে। সেই তখন ছেড়েছিলেন কলকাতা—তারপর আবার এসেছিলেন। তখনো আতঙ্কগ্রস্তের দল ফিরে আসেনি, শূন্য প্রেতপুরীর মত খাঁ খাঁ করছে কলকাতার সহর, শাড়ীহীন বাড়ীগুলো ন্যাড়া শিমূল গাছের মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে—সমস্ত শোভা সৌন্দর্য্য হারিয়ে। আকাশে বোমা, বাতাসে সাইরেণ, পথে দুরন্ত দৈত্য। জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে শুধু মৃত্যুর ষড়যন্ত্র চলছে।

* * * *

সে দৃশ্য বদলালো······এসে দেখলেন লোক ধরেনা কলকাতায়। পথে ঘাটে যানে বাহনে প্রাসাদে বস্তীতে শুধু ঠেলাঠেলি আর গুঁতোগুঁতি। যেখানে বিশ লক্ষ লোককে কুলোচ্ছিল না, সেখানে বেয়াল্লিশ লক্ষ এসে আস্তানা নিয়েছে, আরো বাড়ছে।

জলস্রোতের মত যে বিপুল জনস্রোত ভুতুড়ে দেশটাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার চতুর্গুণ এসে গেছে। দেশ রক্ষা করবার ছুতোয় যাদের আনা হয়েছে তাদের রক্ষিত করা হয়েছে সারা দেশটা জুড়ে—আর খাদ্যবস্তু বলতে যা বোঝায় তার সবটুকুই রক্ষা করা হচ্ছে তাঁদের সেবার উদ্দেশ্যে।

পরের বার এলেন কণ্ট্রোলের দৃশ্য দেখতে। অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য!

শেষ এসেছিলেন সেই বিখ্যাত মন্বন্তরের সময়।

সেই বীভৎস নাটকীয় দৃশ্য দেখে যাবার পর আর আসবার ইচ্ছা ছিল না, তবু আসতে হ'ল। আস্তে আস্তে সেই জোরালো বিতৃষ্ণাটা কখন নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাই সামান্য ছুতোতেই আসাটা যেন অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

যতই হো'ক তবু কলকাতা! ইচ্ছে করলেই তুমি পারো ফুটপাথে পড়ে থাকা মড়াটাকে ডিঙিয়ে যে কোন একটা সিনেমায় ঢুকে পড়তে। সামান্য কিছু মূল্যের বিনিময়ে—গদি আঁটা চেয়ারে বসে "পোটেটো চিপ্‌স্" চিবোতে চিবোতে আর আইসক্রীমের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মিলনান্তক একখানি প্রেমের দৃশ্য দেখে ভুলতে পারো পৃথিবীর নারকীয় লীলা।

রাস্তার দুধারে অসংখ্য কাপড়ের দোকানে রঙে রূপে বিকশিত শাড়ীর সমারোহের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছিলেন ডাক্তার—খবরের কাগজের হেডিংগুলোর কথা ······"বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা", "বস্ত্রলোভে কুলনারীর পতিতাবৃত্তি", "লজ্জা নিবারণার্থে নারীর লজ্জাত্যাগ"—কোন্ বাংলাদেশের কাহিনী এ সব? কলকাতা কি সেই বাংলাদেশের অন্তর্গত নাকি?

একটানা চিন্তার স্রোত ধাক্কা খেয়ে ভেঙে গেল, এসপ্ল্যানেড্ এসে গেছে।

নামতে হবে এখানে।

আবার তীর্থের কাকের মত 'হা পিত্যেস' করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে প্রত্যাশিত গাড়ীখানির আশায়। আবার সেই যুদ্ধ আর কসরত। 'জান্' আর জামা কাপড়, দুটো রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা।

বাবুলোক তো দূরের কথা, ছোটলোকেরাও আর এক ছটাক হাঁটতে রাজী নয়—চারটে ছ'টা পয়সা খরচ করলেই যদি পায়ের খরচটা কিছু বেঁচে যায়, কেন করবে না? তা'র জন্যে যদি দু'চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ক্ষতি কি? বরং মারামারি ঠেলাঠেলি লাঠালাঠি ফাটাফাটি সব করতে রাজী আছে, তবু দু'চার পা হেঁটে চলে যেতে রাজী নয়।

এটা যুদ্ধের বাজার, পয়সার চেয়ে মানুষ দামী।

দক্ষিণ কলিকাতাগামী একখানা ট্রামে উঠে বসলেন ডাক্তার।

দিদির বাড়ী একবার না গেলেই নয়। এতদিন পরে এসে দেখা না করে যাওয়াটা বিবেকেও বাধে, দিদিও শুনলে আস্ত রাখবেন না, তা ছাড়া—নতুন বইও একখানা প্রেজেন্ট করতে হবে জামাইবাবুকে।

চিন্তার ধারা ঘুরে যায়।......

ভাবতে থাকেন নিজেরই নতুন বই খানার কথা। ধনিক শ্রমিক সমস্যা, রাজনৈতিক তর্কের কচকচি, আর 'বুর্জোয়া' 'কমরেড' প্রভৃতি বাজার চলতি শব্দবর্জ্জিত নেহাৎই হৃদয়দ্বন্দ্বমূলক এই উপন্যাসখানি সমাজে আদর পাবে কি? কে পড়ে এসব বই? কার কাছে আছে সত্যিকার ভালো জিনিসের কদর? শেষ পর্য্যন্ত দুর্গতিই হবে না তো? পূর্ব্বে প্রকাশিত বইগুলো অবশ্য চলছে, কিন্তু আশানুরূপ নয়। কিন্তু কেন?

সাহিত্যের আসরে হঠাৎ হৃদয়দ্বন্দ্বের হিসাবটা তুচ্ছ হয়ে বাইরের দ্বন্দ্বের হিসাবটাই এমন প্রবল হয়ে উঠলো কেন? পাঠকের চাহিদা বুঝেই কি লিখতে হবে? না লেখকের নিজের ভিতরকার তাগিদে?...

আচ্ছা নির্ম্মলা এখন কোথায়? সে কি কোন দিন পড়েছে "নীলজ্যোৎস্না", "চিরাচরিত", "ক্ষণ বিদ্যুৎ"? পড়লেই বা কি? 'বিক্রমাদিত্য'কে কি সে চেনে?...কখনো কখনো ইচ্ছে হয় আর একবার দেখতে...এই তো এবারেই দেখে গেলে কি হয়? কোথায় আছে সে? বাইশ নম্বরের সেই বাড়ীটায় গেলেই দেখতে পাওয়া যায় কি? যদিই যায়, লাভ কি?

সেই নির্ম্মলা তো আর জেগে বসে নেই? বিধবা বঙ্গনারী—হয়তো এই বয়সেই গীতা ভাগবত গোবর গঙ্গাজলের সাহায্যে পরকালের পথ পরিষ্কার করছে বসে বসে।......

কিন্তু বেঁচেই যে আছে তার কি মানে? হাজার হাজার লোক মরছে প্রতিদিন, নির্ম্মলাও তো মরতে পারে? হয়তো দেখা করতে গিয়ে শুনবে নির্ম্মলা মারা গেছে।......কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাইনী বুড়ির মত জ্যেঠিটা কপাট খুলেই চোখে আঁচল দিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠে বলবে—"আর কাকে দেখতে এসেছ বাবা? নির্ম্মলা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে...তখন যদি তোমার হাতে দিতাম, তা হলে মা আমার আজ রাজরাণী হয়ে—"......

হঠাৎ নিজের মনে হেসে ওঠেন মিহির গুপ্ত। নিজেরই একখানা উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ যে এটা! স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি? নির্ম্মলা কে? মিহির গুপ্তর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?

কাছারি বাড়ীতেই বেশ কয়েকদিন কেটে গেল নিখিলের।

কল্যাণীকে খুঁজে বার করবার ভার নেবার সময় নিখিল বুঝতে পারে নি কাজটা এত দুরূহ। কোথায় খুঁজবে তাকে? কোন চিহ্ন ধরে? শৈলদির কাছে খবর পেয়েছিলো এক রাত্রি আশ্রমে থেকে কলকাতায় দাদার কাছে চলে গেছে। কিন্তু কি তার দাদার ঠিকানা? নাম কি? হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে কলকাতার মত জায়গা আর কোথায় আছে? পাশের বাড়ীতে থাকলেও তো চিনে বার করবার উপায় নেই। তা ছাড়া যাকে চেনে না তাকে চিনে বার করবার মন্ত্র কি?

তবু কলকাতায় যাওয়া দরকার, কিন্তু বাবাকে একলা ফেলে রেখে আর যেতে ইচ্ছে করে না তা'র। নিখিলকে কাছে পেলে কত তৃপ্তিতে থাকেন বিভূতিবাবু এতো তার অজানা নয়।

এদিকে কলেজও খুলে এল যে।

বিভূতিবাবু নিজেই তুললেন কথাটা। উপাসনার শেষে ঘরে এসে বসেছেন, সদ্য নিদ্রাভঙ্গের শিথিল আলস্য নিয়ে নিখিল উঠে এল। ছেলের সুকুমার অথচ বলিষ্ঠ গঠনভঙ্গীর পানে স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—তোদের কলেজ খুলতে আর কদিন আছে রে?

—এই তো কদিন, নভেম্বরের তেসরা খুলবে।

—তা'হলে এইবার কলকাতায় যাবার ঠিক কর, তা ছাড়া ওই ভদ্র মহিলাটিরও যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছে—

—তা হয়তো হচ্ছে, কিন্তু উনি যে আবার এক বায়না ধরেছেন, মুখের ওপর 'না' বলতেও পারি না—,

—কি বায়না আবার?

বিরক্ত ভাব গোপন করেন না বিভূতি বাবু।

—বলছেন—কাজলাগড়ে যাবেন আমাদের বাড়ী দেখতে, তা'ছাড়া এখানে একদিন হিজলী জেল দেখতে যেতে চাইছিলেন।

—না। নিষেধ করে দিও।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে নিখিল প্রশ্ন করলে—আপনি কি এখন এখানেই থাকছেন?

—ভাবছি একবার বেরোবো। মাঝে মাঝে তীর্থ যাত্রা না করলে মনটা বদ্ধ জলের মত পঙ্কিল হয়ে পড়ে।

অনেক রাত্রে পিছনের সেই বাগানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন বিভূতি বাবু। রাত্রে আহারের পর কিছুক্ষণ খোলা হাওয়ায় বেড়ানো তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। অন্যমনস্কতার অবসরে 'কিছুক্ষণ' যে কখন 'অনেকক্ষণে' গিয়ে ঠেকেছে তার হিসাব ছিল না।

চলতে চলতে একবার মুখ তুলে উপরকার ঘরের খোলা জানলার দিকে তাকালেন, মৃদু আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে জানলার পথে।—বাতি কমানো আছে···নিখিল বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ!······কল্যাণীও ছেলেমানুষ ছিল, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তো না। অনেক দিন লক্ষ্য করেছেন বিভূতিবাবু, ঠিক ওইখানে জানালার গরাদে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো অনেক রাত পর্য্যন্ত। চোখ মুখ শাড়ী জামা আলাদা করে কিছু বোঝা যেত না—শুধু দীর্ঘ একটা ছায়া।

অনেকক্ষণ বেড়িয়ে কেমন শ্রান্তি এসে যায়। বসলে হ'ত।

বসবার উপযুক্ত জায়গার অভাব অবশ্য নেই। বকুল গাছের গোড়ায় মার্ব্বেল পাথরে বাঁধানো বড় বেদীটাই তো আছে বসবার জন্যে—যেখানে ভূপতি লাহিড়ী জ্যোৎস্নারাত্রে মল্লিকার 'গোড়ে' গলায় দিয়ে, কাণে আতরের তুলো গুঁজে, রূপোর গড়গড়া আর সোনার 'তাম্বূল করঙ্ক' নিয়ে বসে গানের গলা সাধতেন—আর বিভূতি লাহিড়ী রাত্রিশেষের অখণ্ড নিস্তব্ধতায় বসে উপাসনা করেন।

বেদীর কাছে গিয়ে বেশ নিঃশঙ্ক চিত্তেই বসতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চোখে পড়ল কে যেন শুয়ে আছে।···নারীমূর্ত্তি না?

মুহূর্ত্তের জন্য হৃৎপিণ্ডটা দুলে উঠেই স্থির হয়ে গেল। অসম্ভবও সম্ভব হয় নাকি? না হয় না। সংসারটা বইয়ের গল্প নয়।

কিন্তু কে এখানে? সেই বেহায়া বাচাল মেয়েটা নয় তো? তাছাড়া আর কে? দাসদাসীর পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার নেই এখানে।

—কে—কে এখানে?

উত্তর নেই।

—এখানে শুয়ে কে?

উত্তর নেই।

—উত্তর দাও···কে এখানে?

অস্ফুট একটা কাতরোক্তি—নিদ্রাভঙ্গের গৌরচন্দ্রিকা গোছ।

—নিখিল, জেগে আছো? টর্চ্চটা নিয়ে একবার বাগানে এসো তো?

নিদ্রাতুরের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। আর একটা অস্ফুট কাতরোক্তি!

—এটা কি বাগান? আমি এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না কি? কি আশ্চর্য্য! কটা বেজেছে বলুন তো?

—বারোটা।

—কী সাংঘাতিক! মরে গিয়েছিলাম না কি? ভীষণ গরম হচ্ছিল—ঘরে টিঁকতে না পেরে নেমে এসেছিলাম মনে পড়ছে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লাম কখন বলুন তো?

—বলা যাবে না, কারণ—ঘুমিয়ে পড়েন নি।

উত্তর শুনে প্রশ্নকর্ত্রী একটু থমকে যান।

একমিনিট স্তব্ধতা।

—আপনার কথা বোঝা বড়ো কঠিন।···এখানে বসতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—বসুন না, চমৎকার হাওয়া হচ্ছে!

—যথেষ্ট রাত হয়েছে—বাড়ীর ভিতর যান আপনি, বাইরের লোক দেখলে সন্তুষ্ট হবে না।

ঈষৎ আদেশের সুর ধ্বনিত হ'ল কণ্ঠস্বরে।

—বাজে লোককে আমি কেয়ার করি না—বাড়ীর মধ্যে যা গরম! শীতকাল পর্য্যন্ত আমার ঘরে সারারাত পাখা চলে।

কথার সুরে বেপরোয়া অহঙ্কার ধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—সেই ঘরটা ছেড়ে আসাই ভুল হয়েছে আপনার। নিজের জায়গায় থাকলে, কার্ত্তিকের হিমে গরমে ছটফট করতেন না।

—ঘরেও শান্তি নেই আমার বিভূতিবাবু!

করুণ সুরের সঙ্গে একটা বিলম্বিত দীর্ঘনিঃশ্বাস।

একটা রাতচরা পাখীর তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ শনশন করে উঠলো গাছের মাথায় মাথায়। কার্ত্তিকের নতুন হিম জানান দিচ্ছে, শির শির করে উঠছে বুকের ভিতর।

—ওকি আপনি চলে যাচ্ছেন বুঝি? বা রে—

—আপনি না গেলে আমাকেই যেতে হবে বাধ্য হয়ে।

—উঃ কী সাংঘাতিক লোক আপনি? আমাকে এই অন্ধকারে সাপখোপের মুখে একলা ফেলে চলে যাবেন? যা সাপ আপনাদের দেশে! নিন্দে করছি বলে রাগ করবেন

না—জায়গাটী কিন্তু সুন্দর। আর আপনার এই বাগান! মার্ভেলাস! বাস্তবিক রুচিজ্ঞান আছে আপনার।

—হ্যাঁ আছে। বাস্তবিকই আছে। সেই রুচিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি আপনাকে, দয়া করে এত বেশী পীড়ন করবেন না তার উপর। অত্যন্ত অরুচিকর ব্যবহার আপনার।

স্থির গম্ভীর কণ্ঠের শেষ রেশ মিলোবার আগেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শ্বেত পাথরে গড়া দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ বিভূত লাহিড়ীর।

আর বলাকা দেবী?

বোধ করি সর্পবহুল দেশের একটা বিষাক্ত সর্পের তীব্র দংশনের প্রার্থনাই করতে লাগলেন বসে বসে।

সকাল বেলা।

নিখিলকে ডেকে বললেন—প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে হচ্ছে নিখিল, আজই কলকাতায় যাচ্ছি আমি।

বিস্মিত নিখিলের প্রশ্নসূচক দৃষ্টির উত্তরে মুচকি হেসে বলেন—আর ভালো লাগছে না, বেজায় মন কেমন করছে তোমাদের প্রফেসর সাহেবের জন্যে।...

তরুণীর চটুল হাসি বলাকা দেবীর মুখে।

পরিহাসের ভঙ্গীতে লজ্জিত হলেও ভারী কৃতজ্ঞতা বোধ করে নিখিল। আজ সকালেই বিভূতিবাবু ছেলেকে ডেকে আদেশ দিয়েছেন বলাকা দেবীকে বিদায় দিতে। এর আগে বাবাকে কখনো এতো বিরক্ত হ'তে দেখেনি নিখিল।

অপ্রিয় কর্ত্তব্যটা করতে হ'ল না বলে মিসেস চ্যাটার্জ্জির উপর কৃতজ্ঞতার বশে বরং অতিমাত্রায় ভদ্র হয়ে ওঠে নিখিল। যা শুনলে ভাল লাগা উচিত সেই মামুলি ভদ্রতার কথাই বলে—আপনাকে এনে শুধু কষ্ট দেওয়া হ'ল। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন অসম্ভব অবস্থা পড়ে গেল আমাদের, আপনার খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত দেখে উঠতে পারিনি—যথেষ্ট অসুবিধে ভোগ করলেন এ ক'দিন।

বিলোল দৃষ্টি তুলে একটু হাসলেন বলাকা দেবী।

—তার জন্যে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ো না—আবার হয়তো কোন-দিন এসে উপস্থিত হবো তোমাদের জ্বালাতন করতে। হাঁ ভালো কথা—ডাক্তার বাবুর ঠিকানা কি বল তো—একটা চিঠি দিতে বলেছিলেন ভদ্রলোক, কলকাতার কয়েকটা খবর দিয়ে।

—ঠিকানা? ডাক্তার মিহির গুপ্ত, মৃন্ময়ী সেবাশ্রম, ঈশ্বরপুর, বললেই চলে যাবে। কিন্তু ডাক্তার বাবু নিজেই তো কয়েক দিন হ'ল কলকাতা গেছেন।

কলকাতায়! মুহূর্ত্তে জ্বলে ওঠে বলাকা দেবীর বিলোল চোখ দুটি।

এমন কি খবর, যা জানবার জন্য ডাক্তার গুপ্ত বলাকা দেবীর শরণাপন্ন হবেন। বুঝে উঠতে পারে না নিখিল।

—কলকাতায় গেছেন? তাই না কি? কোন দিকে উঠেছেন? উত্তর? দক্ষিণ? মধ্য?...জানোনা? হোপ্‌লেস!

যাবার সময় বিভূতি বাবুর ঘরের সামনে বিদায় নিতে এসে দুই হাত কপালে ঠেকানোর ভঙ্গীতে অর্দ্ধ পথে রেখে মধুর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন বলাকা দেবী—নমস্কার বিভূতি বাবু, অনেক জ্বালিয়ে গেলাম আপনাদের, নিষ্কণ্টক হলেন এবার, বিদায়।

প্রত্যুত্তরে বিভূতিবাবু শুধু দুই হাত তুলে নমস্কার করলেন।

গাড়ীতে উঠবার পরমুহূর্ত্তেই কেষ্টর মা ঝি মুখখানা বাঁকিয়ে স্বগতোক্তি করে—দণ্ডবৎ তুমি করবে কেন মা, তোমারই ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ। খুব 'নীলে খেলাটা' দেখালে বটে, মনে থাকবে 'চেরকাল'। আশা করেছিল—কলকেতার কেতাদুরস্ত মানুষ, দিলদরিয়া মেজাজ, হাতও দরাজ হবে, যাত্রাকালে মোটা বখশিস মিলবে। ক'দিন কি কম খাটুনী খাটিয়েছে তাকে মাগী? বলাকা দেবী হয়তো শুনলে মূর্চ্ছা যেতেন যে তাঁর সম্বন্ধে 'মাগী' নামক অশ্লীল অভব্য বিশেষণটী প্রয়োগ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করল না কেষ্টর মা।

—ঘেন্নায় কোথা যাবো মা, এতদিন ধরে খেয়ে মেখে চলে গেল উপুড় হস্তটী করল না। কোন চুলো থেকে যে অপয়া মাগী এলো, ওকে দেখেই তো আমাদের সোণার পিতিমে বৌমা অভিমানে নিরুদ্দিশ হ'ল।

মুখে যতই 'মুখ সাপোর্ট' করুন, ভিতরে ভিতরে একটা সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালায় জর্জ্জরিত হচ্ছিলেন বলাকা দেবী। তাঁর এই চলে আসার মধ্যে যে তাড়িয়ে দেওয়ার আভাষ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সেটা আর কারো কাছে না হলেও তাঁর নিজের কাছে বিলক্ষণ ধরা পড়ছিল।

'অসভ্য চাষা' 'গেঁয়ো ভূত' 'পয়সা থাকলে কি হবে, মেদ্‌নিপুরী বৈত্যে নয়'—বলে যতই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করুন নিজেকে, তবু সেই 'অপমানের মৌনদাহে চিত্ত দহে তুষানলে' গোছ ভাবটা রয়েই গেল। এমন কি নিখিলের সঙ্গেও ভালো করে কথা কইতে পারলেন না। একলাই আসতে চেয়ে-ছিলেন, কিন্তু নিখিল রাজী হয়নি। প্রফেসরের কাছে একটা দায়িত্ব আছে তো তার। তা' ছাড়া কল্যাণীকে যে খুঁজে আনতেই হবে তা'কে। কলেজ খোলার আগেই কলকাতায় যাওয়া ভালো।

সমস্ত অপমান অবহেলার জ্বালা শীতল প্রলেপে ঠাণ্ডা হয়ে গেল বলাকা দেবীর ষ্টেশনে এসে।

ষ্টেশনে বিরাম!

ব্যারিষ্টার বিরাম সেন। ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সিগার ফুঁকছে।

উপযাচিকা হয়ে সম্ভাষণ করতে হল না, ব্যারিষ্টার নিজেই হৈ চৈ বাধিয়ে দিল।

—মাই গড, স্বপ্ন দেখছিনা তো? আপনি কোথা থেকে? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পার্ছিনা এখনো। সত্যিই আপনি তো? না ছায়া মূর্ত্তি?……আমি? আমাদের কথা ছেড়ে দিন…পৃথিবীর কোথায় না আমরা? এসেছিলাম একটা জরুরী কেসের তদন্ত করতে—আজ ফিরছি। আসুন আসুন উঠে পড়ুন, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বইলেন'— ট্রেনে মোটে ঘুম আসেনা আমার, অথচ সঙ্গের বই ফুরিয়ে গেছে। ভাবছিলাম—কি করি! ভগবান নিঃসঙ্গ হত-ভাগ্যের সঙ্গিনী জুটিয়ে দিলেন।……ও ভদ্রলোকটা কে? আপনার বাহন নাকি? আশা করি আমাদের কামরায় উঠে রসভঙ্গ করবেন না?

রসভঙ্গের আশঙ্কায় বলাকা দেবীকে নিজের কামরায় তুলে নিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দেন ব্যারিষ্টার সাহেব।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ডগমগ ব্যারিষ্টার সাহেবের পার্শ্বলীনা বলাকা দেবী নিখিলের দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এই কথা ক'টা ছুঁড়ে দিলেন :—

—আচ্ছা, হাওড়ায় দেখা হবে আবার। পাশের গাড়ীতে আছো তো? আমার মালপত্রগুলো দেখো।

আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল নিখিল, হঠাৎ যেন একেবারে গৌণ হয়ে গেল বেচারা।

গুছিয়ে গাছিয়ে বসে আরামে আর আনন্দে বিগলিত বলাকা দেবী উচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠেন—একলা যে? বৌ কোথায়—

—বৌ? কি মুস্কিল, বৌকে কি আমি পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্ছি? কেন, একলা ভয় করছে নাকি আপনার? ভয় নেই, সাদা চোখে আছি এখনো। নিস্পৃলি একটা সিগার— আশা করি আপত্তি নেই? মাথা ধরে উঠবে না তো? আমার শ্রীমতীটী তো সিগার ধরালেই সরে বসেন।

হাওড়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিল বিরাম সেনের আলো-পিছলে-পড়া সম্ভ্রান্ত চেহারার সিডানখানা। ব্যারিষ্টার অধ্যাপকজায়ার হাত ধরে তুলে দেয় তাতে। বোধ করি সামান্য ইতস্ততঃ করছিলেন বলাকা দেবী নিখিলের প্রত্যাশায়। এক ফুৎকারে সমস্ত দ্বিধা দূর করে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ে বিরাম বললে—তার জন্যে ভাববার কি আছে? দুগ্ধপোষ্য শিশু তো নয়, নিজের সদ্গতি করে নেবে।……আশা করি রাগ করেন নি আমার উপর?

—না, রাগের কি আছে?

বলাকা দেবীর ফুল্ল স্বরটা একটু স্তিমিত শোনালো।

—মনে হচ্ছে যেন চটেছেন। আচ্ছা সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি গত রাত্রের বাচালতার জন্যে, হাতটা জোড়া না থাকলে করজোড়ে ভিক্ষা করতাম।

গাড়ীর গতিটা আর একটু বাড়িয়ে দেয় বিরাম।

প্রফেসর প্রস্তুত ছিলেন না—স্ত্রীর এরকম আকস্মিক আবির্ভাবে একটু উল্লসিত না হয়ে পারলেন না।

—এসে পড়েছ? বেশ বেশ, আমিও ভাবছিলাম—শীত পড়ে গেছে, পাড়াগাঁয়ের ঠাণ্ডা সহ্য হবে কিনা তোমার—

—ছাই ভাবছিলে—আমার জন্যে তো তোমার ভাবনার শেষ নেই, বরং ভাবছিলে বাঁচা গেছে, আপদের শান্তি হয়েছে—

কাজলপরা কালো চোখ ছলছল করে আসে। সত্যি, দেখলে মায়া না করে উপায় থাকে না যেন।

প্রফেসর সস্নেহে কাছে টেনে একটু আদর করে বললেন —বদ্ধ পাগল!

—পাগলই তো, নইলে তোমার মতন নির্মায়িক লোকের জন্যে মন কেমন করে? জোর করেই নয় চলে গিয়াছিলাম, আসতে বলতে নেই বুঝি?

—বাঃ তোমার বাড়ীতে তুমি আসবে তার আবার বলবো কি?

—হ্যাঁ বলবে, কেন বলবে না? আমার বুঝি ইচ্ছে করেনা কেউ আমার বিরহে দিনরাত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলুক— আমার আসাপথ চেয়ে দিন গুণুক!

এত কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা প্রফেসরের নেই। চকচকে টাকে একটি হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—সেতো বটেই' সেতো বটেই, আমিও তো ভাবি—তোমার ইচ্ছে মত চলবো, কি যে হয় সব গুলিয়ে যায়।

—মামীর রণমূর্ত্তি দেখলে তো তোমার মাথাটাই গুলিয়ে যায় মামা!

চায়ের পেয়ালা হাতে করে সহাস্য মুখে নির্ম্মলা ঘরে ঢোকে। ট্রেন থেকেই নেমে এক পেয়ালা চা না হ'লে যে মামীর মেজাজ সপ্তমে উঠবে এতো তার অজানা নেই।

পরিহাসটুকু করতে সাহস করলো—নেহাৎ অনেকদিনের অদর্শনের ভরসায়। এসেই কি আর মেজাজ দেখাবে?

কথার শেষাংশটুকুই শুনেছে—না আরো কিছু শুনেছে এই ভেবে লজ্জিত হয়ে পড়েন প্রফেসর। আর বিরক্ত হন বলাকা দেবী···এই জন্যেই তো দু'চক্ষে দেখতে পারেন না ওকে। মামার সোহাগে ডগডগ একেবারে। কেনরে বাপু, বিধবা আছিস বিধবার মত একপাশে পড়ে থাক্, তা নয় সর্ব্বত্র থাকা চাই। কোনচুলোয় যে ছিলেন আগে, বিধবা হয়ে কেঁদে এসে পড়বার আর জায়গা পেলেন না।·········নির্ম্মলা আশ্রিতা, নির্ম্মলা দুঃখিনী বিধবা মাত্র, তবু নির্ম্মলার হিংসেয় মন বিষ হয়ে ওঠে। অথচ এই প্রায় সমবয়সী মেয়েটাকে অবজ্ঞা করা ছাড়া শাস্তি দেবার আর কিছু খুঁজে পান না। তাড়াবার কথা তুললে যে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপটুকুও ঘুচবে, তাও তো জানতে বাকী নেই।

কাজেই—কুশলপ্রশ্ন মাত্র না করে গম্ভীর মুখে চায়ের পেয়ালাটি তুলে নেন।

কোর্ট থেকে ফিরেই সুরেশবাবু প্রবলকণ্ঠে ডাক দিলেন—মণি। কইরে মণি, নীচে আয় শিগ্গির।

—যাই বাবা—বলে দুড় দুড় করে নীচে নেমে এসে মণি থমকে দাঁড়িয়ে গেল—বাবা একা নন, পিছনে একটি ভদ্র মহিলা। আন্দাজ করলে তারই শিক্ষয়িত্রী।

অবশ্য বেশীক্ষণ সন্দেহ-দোলায় দুলতে হ'লনা। সুরেশ বাবুর উদাত্ত স্বর গমগম করে উঠলো—এই নিয়ে এলাম তোমার জন্যে, যতো পারো পড়ো এঁর কাছে, আর জ্বালাতন কোরতে এসোনা আমায় 'অঙ্ক বুঝিয়ে দাও' বলে—বুঝলে তো? খুব ভালো মেয়ে ইনি, যত্ন করে দেখাশোনা করবেন তোমাকে। রেজাল্ট ভালো হওয়া চাই কিন্তু।

কিছুদিন ধরে একজন প্রাইভেট টিউটর রাখার কথা হচ্ছিল, কিন্তু তরুবালার 'দাদাবাবু'তে ভীষণ আপত্তি, 'দিদিমণি' না হলেই নয়। এতদিনে এই দিদিমণিটিকে সংগ্রহ করে এনেছেন সুরেশবাবু।

—এই রইল আপনার ছাত্রী, আর রইলেন আপনি, এখন করুন বোঝাপড়া। টেষ্ট তো এসে গেল।

এতক্ষণে ভেবেচিন্তে ছোট্ট একটা নমস্কার করলো মণি। খুব লজ্জা করলেও ভারী ভালো লেগেছে তার ভদ্রমহিলাটিকে। বয়স কম, পাতলা লম্বা গড়ন, শ্যামল রং হ'লেও মুখশ্রী চমৎকার, আর চমৎকার—প্রশস্ত প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি।

—আপনাকে কি বলে ডাকবো আমি?

—কি বলে? মমতাদি বলে ডেকো।—তারপর নিজেই সামান্য ইতস্ততঃ করে বললে—তোমার নাম কি?

—আমার নাম মণি।

—শুধুই 'মণি' বলছিস যে বড়?···দিদির নাম 'তর্ক-চূড়ামণি' বুঝলেন?

মল্লিনাথকে দেখা গেল না, কিন্তু চাঁচাছোলা গলাটা স্পষ্ট শোনা গেল।

বাইরের লোক বা নতুন লোকের কাছে দিদিকে একটু অপদস্থ করবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারেনা সে—যতই ভালোবাসুক দিদিকে।

মমতারও ভারী ভালো লেগে গেছে এই দুষ্টু চঞ্চল কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে দুটিকে। নিজের মনমরা মন যেন ওদের প্রাণের প্রাচুর্য্যে ভরে ওঠে। পড়াবার কথা একলা মণিকে, মমতা দুজনকেই পড়ায়। আসবার কথা সপ্তাহে তিনদিন, মমতা প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এসে হাজির হয়।

বেশীর ভাগই একতলায় পড়ার ঘরে মল্লি বসে থাকে, মমতার সাড়া পেলেই তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দিদি' ডাক হুইস্লের মত বেজে ওঠে। মণি ছুটে আসে বই পত্তর নিয়ে—বসে একটু হাঁফিয়ে নেয়। তবে পড়া আরম্ভ করে।

মমতা রোজই অনুযোগ করে—আচ্ছা এত ছুটে আসো কেন বলো তো? আমি তো এসেই পালিয়ে যাচ্ছিনা?

—ছুটিনি তো, এমনি এলাম—বলে মণি মুখের ঘাম মোছে। হয়তো মায়ের কাজের সাহায্য করছিল রান্না-ভাঁড়ার ঘরে। নয়তো পালিয়ে গিয়ে ছাদে বেড়াচ্ছিল একটু।

ওরা পড়ে। মাঝে মাঝে তরুবালা এসে উঁকি দিয়ে যান দেখতে—অবান্তর কথা হচ্ছে, না দস্তুর মত অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলছে? এক জনের বদলে দু'জনকে পড়ালে বা তিন দিনের জায়গায় সাতদিন পড়ালে আপত্তি করবেন, এমন সঙ্কীর্ণচিত্ত মেয়েমানুষ তরুবালা নন, তবে পড়ানোতে ফাঁকী দেওয়াটা তো সত্যি বরদাস্ত করা যায় না।···

না, অভিযোগযোগ্য কিছু নেই, মেয়েটা সত্যিই ভালো। সন্ধ্যাবেলা নিজের মেয়েটাকে একটা কাজে আট্কা দেখে তাঁর ভারী স্বস্তি হয়, বিকেল হলেই কি যে উন্মনা হয়ে বেড়াতো।

আজকাল যেন মেয়ের মনটা একটু বসেছে।

বসেছে সত্যিই, পড়া নেওয়া দেওয়া, তৈরী করে রাখা এবং ঘাড়ের উপর এসে পড়া পরীক্ষার চাপে মাথা তুলবার সময়ও পাচ্ছে না বেচারা মন। তবু—প্রথম শীতের মৃদু হিমেল হাওয়ায় যখন সর্ব্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে, ভয় ভয় করে বুকের ভিতরটা, অবশ আঙ্গুলের ডগা থেকে খসে পড়তে চায় পেন্সিলটা, পড়তে পড়তে আনমনা হয়ে যায়।···তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে কুয়াসাচ্ছন্ন ম্লান আকাশের দিকে, ম্লান হয়ে আসে মনটা। অনিচ্ছুক মনকে টেনে এনে বসাতে চায় নীরস পাঠ্য পুস্তকে, বারে বারে ভুল হয়।

আজও সন্ধ্যাবেলা—কিছুক্ষণ ধরে ওর এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে মমতা মৃদু হেসে প্রশ্ন করলে—

—তোমার কি হয়েছে আজ, শরীর ভাল নেই ?

—শরীর ভালো আছে তো।

রক্তিম মুখে বইটা আরো কাছে টেনে নেয় মণি।

—থাক না হয় আজ। যদি খারাপ লাগে সে পড়া মাথায় ঢুকবে না।

—মাথায় আর ছাই ঢোকে—মল্লিনাথ টিপ্পনি কেটে ওঠে হঠাৎ—মাথার মধ্যে তো খালি নিখিলবাবুর চিঠির ভাবনা! হুঁ:।

বিস্মিত মমতা মণির প্রায় টেবিলের সঙ্গে ঠেকে যাওয়া নত মুখের পানে তাকিয়ে বলে—নিখিলবাবু কে ?

—দিদির বন্ধু। অবশ্য আমারও বন্ধু, তবে আমাকে তো আর চিঠি দেন না যে দিনরাত উত্তুর ভাববো?···দিদি—আ: চিম্‌টি কাটছিস যে—

কিছুদিন ধরে মমতাকে দেখে এটুকু বোধ জন্মেছে যে মার মতন ভয়াবহ লোক নয়, কাজেই দিদিকে অপদস্থ করবার এই লোভটুকু সংবরণ করা তার পক্ষে দুরূহ হলো।

নিখিল! নিখিল! নামটী বড্ডো শ্রুতিমধুর! মমতাও লোভ সামলাতে পারে না আর একটু প্রশ্ন করবার। স্বভাব বহির্ভূত কৌতূহলের স্বরে বলে—তোমাকে চিঠি দেন না? তবে তো বড্ডই বন্ধু তোমার! কিন্তু থাকেন কোথায় তিনি ?

—থাকেন তো হ্যারিসন রোডে—এখন যে দেশে গেছেন ছাই···ওকি উঃ—আবার চিম্‌টি কাটছিস্ দিদি? বললে কি হয়েছে কি? সেই মিদ্‌নাপুরের কোন খানে যেন ঈশ্বরপুরে ওঁর বাবার তৈরী একটা আশ্রম আছে সেইখানে গেছেন। দুটো চিঠি দিয়ে ব্যস্ আর উচ্চ বাচ্য নেই। কে দিতে বলেছিল? না দিলেই হ'ত, কি বলুন মমতা দি? শুধু শুধু মানুষের কষ্ট বাড়ানো ছাড়া কিছু নয় তো? সত্যি কিনা বলুন—

কিন্তু মমতাই বা কি বলে? বালকের দুষ্টুমীভরা কথার মধ্য থেকে যে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো মণির হৃদয়খানি। তাই অনেক কষ্টে সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—নিশ্চয় তো। চিঠি নিয়মিত লেখা উচিৎ বই কি, নইলে ভাবনা হবে যে মানুষের···আরে আরে ওকি কান্না কেন?

আর কেন! চড়া সুরে বাঁধা যন্ত্র সামান্য আঘাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠবে না ?

অপ্রতিভ মল্লি হঠাৎ চেয়ার টেবিল উল্টে ছুটে পালিয়ে যায়। নিজের অপরাধের গুরুত্বটা যেন হঠাৎ চোখে পড়ে গেছে।

অবশ্য দিদির ওপর আর তিলার্দ্ধ ভক্তি নেই তার। একটা সহজ মানুষ হঠাৎ এমন কিম্ভূত হয়ে যায় কি করে, এটা বেচারার অবোধ্য।

পরদিন। মল্লিনাথের কি যেন একটা আশঙ্কা ছিল মমতাদি হয়তো আর আসবেন না। দিদির কাছেও ভালো করে সপ্রতিভ হয়ে কথা বলতে পারেনি সারাদিন। কিন্তু যেই দেখলে অন্য দিনের চেয়ে আগেই মমতাদি এসে হাজির, সমস্ত অপরাধী ভাব ত্যাগ করে চীৎকার করে উঠলো—দিদি!

লজ্জিত মণি আজ আস্তে আস্তে এলো।

কতই বা বয়সের তফাৎ, তবু ওর এই লজ্জিত ম্লান মুখের দিকে চেয়ে বাৎসল্য স্নেহের মত একটা মিষ্ট স্নেহে মন ভরে ওঠে মমতার। মণির পিঠের উপর একটা হাত দিয়ে কোমল স্বরে বলে—মন খারাপ করছো কেন মণি? স্ফূর্ত্তি করে না পড়লে পরীক্ষা খারাপ হবে যে।

মল্লিনাথ আজ আর কথাবার্ত্তা বলে না, গম্ভীর হয়ে বই খুলে বসে।

কিন্তু পড়া আর কিছুতেই এগোয় না। লজ্জিত অন্যমনস্ক ছাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিক্ষয়িত্রীর মন কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে!

সদ্য জাগা প্রেমের ছাপ কী উজ্জ্বল কী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে মণির মুখে! সকলের কেন এমন হয় না?···নাকি হয়—হৃদয় যখন উপছে ওঠে মুখে চোখে তার ছাপ পড়বেই যে, শুধু দেখে বুঝবার চোখ সবসময় সামনে থাকে না।

—মণি!

ভীরু কম্পিত চোখ দুটি তুলে তাকায় মণি। দিদিমণির ডাকটা যেন বিশেষ অর্থপূর্ণ, কণ্ঠস্বর কেমন যেন ভাবগম্ভীর। তিরস্কার করবেন? নাকি মৃদু অনুযোগ? আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা সরিয়ে রেখে সে বাজে একজন লোকের—যে তার আত্মীয় টাত্মীয় কিছুই নয় তার—চিঠির কথা ভাবছে বলে? মল্লি হতভাগা কেন যে অমন! আর কেনই বা মণি কাল কেঁদে কেটে অমন অপদস্থ হয়ে গেল!

—মণি! মন দিয়ে পরীক্ষাটা দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো!

সব ঠিক! কিসের ঠিক হয়ে যাবে ?

মণি অবাক হয়ে তাকায়।

মমতা ওর একখানি হাতের ওপর হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলে—আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভেবোনা। তোমার ভাবনার ভার আমি নিলাম।

মল্লিনাথ আর চুপ থাকতে পারে না, সকৌতুকে বলে ওঠে—তার মানে? 'প্রক্সি' দিয়ে একজামিন দিয়ে আসবেন না কি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই।—মমতা হেসে ওঠে—কিন্তু ওই যা:, সব ফন্দী যে ফাঁস হয়ে গেলো! খুব চালাক তো তুমি? দেখো বাপু কাউকে যেন বলে টলে দিওনা!···হ্যাঁ এই যে—কালকে কি যেন পড়া হচ্ছিল মণি? দেখি—

—আর দেখা—হঠাৎ মল্লি চেয়ার ঠেলে একরকম লাফিয়ে ওঠে—আর বই দেখা! আজ আর পড়াটড়া হয়েছে!···এই যে নিখিল বাবু? খুব লোক তো আপনি? খবর টবর কিছু নেই, কলেজ ফলেজ কামাই করে কি করছিলেন দেশে? খুব পিঠে পায়েস খাচ্ছিলেন বোধ হয়? আমাদের ছাই একটা দেশও নেই।···ওকি দরজায় দাঁড়িয়েই থাকবেন নাকি? আসুন?···মা—ওমা নিখিল বাবু এসেছেন—

হঠাৎ উধাও হয়ে যায় মল্লি। বোধকরি মাকে খবরটা জানাতে।

আর নতনয়না দুটি মেয়ের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে নিখিল বোকার মতো!

পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে চিঠিখানা পকেট থেকে বার করলেন মিহির ডাক্তার। বলাকা দেবীর চিঠি, রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছে ঈশ্বরপুর থেকে। চিঠি খু'লে প্রেরকের ঠিকানা দেখেই একচোট হেসে নিলেন ডাক্তার। যে বন্ধুর বাড়ী এসে উঠেছেন, তারই কয়েকখানা বাড়ীর পরের নম্বর।

ধরা ছোঁওয়া যায় না এমন ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে যে নিরামিষ প্রেমপত্রখানি লিখেছেন ভদ্রমহিলা, সেখানি আগাগোড়া পড়বার ধৈর্য্য ডাক্তারের মত ব্যস্তবাগীশ লোকের পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। ভাবলেন একবা'র দেখা করে এলে হয়, খুশী হয়ে যাবেন চ্যাটার্জ্জি-গিন্নি।···

নাকি কর্ত্তা লাঠ্যৌষধির ব্যবস্থা করবেন? বলা যায় না—পতিব্রতা পত্নীর প্রেমপত্তরের টানে ছুটে-আসা বন্ধুকে ঠিক বন্ধুভাবে না দেখতেও পারেন। আপন মনে হেসে ওঠেন ডাক্তার।···

মিসেসকে না হোক মিষ্টারটীকে একবার দেখলে মন্দ হ'ত না, দেখা যেতো কি ত্রুটি আছে লোকটার? কিসের অভাবে বলাকা দেবী ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছেন?

কয়েক দিনের জন্য এসে কেন যে মাসখানেক ধরে কলকাতায় আটকে আছেন ডাক্তার কে জানে। নিজেই জানেন কিনা সন্দেহ। দিদি ভয় পেয়ে বলেন—কিরে তোর চাকরীটা আছে তো? ভগ্নীপতি সহাস্য প্রশ্ন করেন—বৃদ্ধবয়সে কোনো 'প্রলয়কাণ্ডের' নায়ক হয়ে বসোনি তো ডাক্তার, এখানে যে 'চিটেগুড়ে'র মত আটকে গেলে দেখছি?

বন্ধুরা মাঝে মাঝে ভালো চাকরীর সন্ধান দিচ্ছে—মিহির গুপ্তর মত দামী ছেলেটা একটা অনাথাশ্রমে পড়ে থেকে জীবন মাটি করবে এই বা কি কথা?

সত্যি, লোভও হয়। এই কলকাতা, যুদ্ধের খেসারৎ যোগাতে যোগাতে যতই শ্রীহীন সম্পদহীন হয়ে থাকুক, তবু চিত্তাকর্ষক, তবু এর আকাশে বাতাসে তীব্র মাদকতা!

ধুলো ধোঁয়া আর জনতার চাপে লোকে ছটফট্ করবে, খুঁৎ খুঁৎ করবে, 'গেলাম' 'গেলাম' করবে, তবু যাবে না। এক পা নড়বে না—একবার যে আস্বাদ পেয়েছে এই নির্জ্জলা মদের। একে ছেড়ে, এর সমস্ত সুখ সুবিধা ছেড়ে কি করে প্রবাসী হয়ে গেছেন তাই ভেবে হঠাৎ ভারী আশ্চর্য্য ঠেকে ডাক্তারের।···

চোখের বাইরে চলে গেলেই কি আকর্ষণের তীব্রতা কমে যায়?

যায় বৈ কি!

সেবাশ্রমের নীচু বাংলোয় থাকতে—কবার মনে পড়তো নির্ম্মলাকে? কবার ইচ্ছে করতো দেখতে?

অথচ এখানে এসে এ কী পাগলামীর ভূত ঘাড়ে চেপেছে! বাইশ নম্বরের বাড়ীখানায় মাদ্রাজি ভাড়াটে বাস করছে দেখেও বারে বারে সেই পাড়ায় 'চক্কর' দিয়ে আসতে ইচ্ছে করে কেন? পৃথিবীর কোন প্রান্তে কোথায় এতটুকু আশ্রয় মিলেছে তা'র, সে কথা জানতে ইচ্ছে হয় কেন? এতদিন ধরে সে মিহির গুপ্তকে মনে রাখবার শ্রমটুকু স্বীকার করে নিয়েছে কিনা জেনে লাভ কি?···

তবু জানতে ইচ্ছা হয়।

সেই অদৃশ্য ইচ্ছার শিকলে বাঁধা পড়ে আছেন ডাক্তার।···

হরিহর? অমূল্য? পঞ্চুর মা? কে তা'রা? 'ছায়াছবির' মত অস্পষ্ট হয়ে গেছে তারাই না? মৃণ্ময়ী সেবাশ্রমের সেই মেটে বাংলোয় মিহির গুপ্তকে কুলিয়েছিল কি করে এতদিন?···

বসে থাকতে থাকতে ইচ্ছে হ'ল—ঘুরেই আসি একবার বলাকা দেবীর বাড়ী। কি আর বলবে প্রফেসর? কতই বা বলতে পারবে? তাঁকে কেউ অপ্রতিভ করে ফেলতে পারবে এ আশঙ্কা অবশ্য নেই।

ডাক্তার বাবুকে দেখে যেন আহ্লাদে হাঁসফাঁস করে ওঠেন বলাকা দেবী। উচ্ছ্বসিত দ্রুতভঙ্গীতে প্রশ্ন করেন—

—ব্যাপার কি? ডাক্তার বাবু যে—কলকাতায় রয়েছেন না কি?

—কি মনে হচ্ছে? নেই?

—নাঃ নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কি করে? বসুন বসুন। হঠাৎ মনে পড়লো যে?

—মনে না পড়িয়ে ছাড়লেন কই? কিন্তু গৃহকর্ত্তা কই? সেই নমস্য ব্যক্তিটী? তাঁর সঙ্গে আলাপ করতেই এলাম যে—

—আর আমরা বুঝি 'ফাউ'?

—আপনারা তো চিরদিনই 'ফাউ'। মিসেস্' না জুড়লে পরিচয় হয় না আপনাদের ; তাছাড়া তিনি এসব অনধিকার প্রবেশ পছন্দ করেন কিনা না জেনে—বসি কি করে ?

—অনধিকার প্রবেশ কিসে ? আমার বন্ধু আমার বাড়ীতে আসতে পারে না ?

—অবশ্যই পারে, যদি 'আপনার' বাড়ী হয়। কিন্তু এটা হ'ল আপনাদের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতার যুগ। অপরের উপার্জ্জিত সম্পত্তিকে নিজের বলে গ্রহণ না ও করতে পারেন।

—তা' বলে নিজের স্বামীর উপার্জ্জনেও না ?

বলাকা দেবী হেসে ফেলেন।

—আসুন নেমে। 'স্বামী' বলে স্বীকার করলে তো কোন গোলই নেই, কিন্তু করছেন কই ? 'স্বামী' শব্দটাই যে আপনাদের 'অরুচিকর'। ওই শব্দটার মধ্যেই যে দাসত্বের গন্ধ। কিন্তু—তিনি আপনার স্বাধিকার বোধের ওপর একবিন্দু হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না—আর আপনি তাঁর সমস্ত কিছুতে হস্তক্ষেপ—শুধু ক্ষেপ্ নয়, একেবারে হস্তগত করে বসে থাকবেন এটা যে দস্তুরমত জুলুমবাজী। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই যদি কাম্য হয়—বেশ থাকুন মেস বাড়ীর দুই 'রুম মেটের' মত ? কারুর ওপর কারুর কোনো দাবী দাওয়া থাকবে না। বন্ধনও থাকবে না কিছু। কেউ কারো ইচ্ছের উপর হস্তক্ষেপ করবে না—কেউ কাউকে চোখ রাঙাবে না—

—'ঘর সংসার' কথাটার তো কোনো অর্থই থাকে না তাহলে ডাক্তার গুপ্ত।

—'ঘর সংসার' ? হা হা করে হেসে ওঠেন ডাক্তার।—কথাটার সত্যিই কোনো অর্থ আছে না কি আপনাদের কাছে ? একপেয়ালা চায়ের জন্যে যাদের চাকর খানসামার দ্বারস্থ হ'তে হয়, একবেলা হাঁড়ির ভার নিতে হ'লে যাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, তাঁদের আবার ঘর সংসার কি ? রাগ করবেন না, শুধু আপনাকে বলছি না,—ঘর আপনাদের কোথায় ? ঘর ভেঙে আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনারা, কিন্তু পথ চলবার পাথেয় নেই। অপর দেশের উদাহরণ দেখে ফ্যাসানের হাওয়ায় ভেসে যাওয়াই তো স্বাধীনতা নয় ?

—তা'লে আপনার মত কি ? প্রত্যেকের নিজের নিজের জীবিকার সংস্থান করা ? স্বামী স্ত্রীর আলাদা ক্যাস, আলাদা হিসেবের খাতা ?

—একশো বার—যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলে সত্যিই কিছু মানেন। এটা না মেনে উপায় নেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি, অন্নবস্ত্রের জন্যে যদি কারুর দরজায় হাত পাততে হয়—কিছুটা বশ্যতা স্বীকার করতেই হবে তার কাছে। কেন নয় ? দাতা তা'র নিজের উদারতায় যদিই বা সে গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে—গ্রহীতা করবে কোন মুখে ? 'সমান সমান' কোনদিনই হবে না, সমান অসমানই থেকে যাবে।

—আশ্চর্য্য মানুষ আপনি ডাক্তার বাবু। শুধু অন্নবস্ত্রের মোটা হিসেবটাই আপনার চোখে পড়ল ? বন্ধনটা কিছুই নয় ? স্বামী কি স্ত্রীর কাছে কিছুই পায় না ?

—পায় বৈকি মিসেস চ্যাটার্জ্জি। যদি না পেত তা'হলে—বিবাহ প্রথাটাই কবে উঠে যেত যে—যুগযুগান্তর ধরে কেবলমাত্র একপক্ষের উদারতার জোরে একটা লোকসানের ব্যবসা টিঁকে থাকতে পারে না।···পুরুষ পায় 'ঘর'। কিন্তু সে ঘর ভেঙে ফেলবার জন্যে আপনারা আজ উঠে পড়ে লেগেছেন, তাই না এত সমস্যা, এত তর্ক, এত আফশোস।

—কিন্তু যুগযুগান্তর ধরে একটা জাত আর একটা জাতের অধীনতা মেনে চলতে থাকবে এটাই কি ন্যায় ধর্ম্মের কথা ?

—অধীনতা ভেবেই বা এত কষ্ট পান কেন ? 'অন্ন-বস্ত্রের মোটা হিসেবে' তো আপনাদের আপত্তি, ভালবাসার বন্ধনের দোহাই দেন, এক্ষেত্রেই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন ? শিশুও তো বয়স্কদের অধীন থাকে, সেটা কি অপমান ? শক্তি সামর্থ্যে, বুদ্ধি বিবেচনায়, মেয়েরা যে পুরুষের চেয়ে অনেক খাটো সে কথা অস্বীকার করতে পারেন ?

বলাকা দেবী ক্রমশঃই যেন কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন—তর্ক 'ফর্ক' দু' চক্ষের বিষ তাঁর। দুটো সরস পরিহাস, দুটো মুখরোচক আলোচনা, ফ্যাসানের খাতিরে দুটো লাগসই কথাবার্ত্তা—এই পর্য্যন্তই ভাল লাগে। তার ওপরে উঠলেই যে দস্তুরমত বিপদ।···এই দোষ লোকটার, তর্কটা সিরিয়স না করে ছাড়বেনা।

লেখক কিনা, কথা জোগাতে দেরী হয় না। অথচ কিসের এত আকর্ষণ আছে ওর মধ্যে কে জানে। ওর সঙ্গে কথা চালাতে রীতিমত পরিশ্রম বোধ হলেও বিরক্ত হবার উপায় নেই।···ভেবে চিন্তে বলেন—শক্তি সামর্থ্যে কম হতে পারে—ভগবানের মার, কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যায় কম—এ স্বীকার করবো কেন ?

—কম না হ'লে সাদা কথা বুঝতে এত সময় লাগে ?

ডাক্তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উচ্চহাস্য করে ওঠেন।

—আচ্ছা বেশ কমই—বলাকা দেবী হতাশ ভঙ্গীতে বলেন—এতদিন পরে দেখা হ'ল কি তর্ক করে সময় নষ্ট করতে ?

—আমার তো মনে হয় সময়ের সার্থকতা এর চেয়ে বেশী কোনো কিছুতেই হয় না। তর্ক করার কি একটা উপকারিতা নেই ?

—উপকারিতা আছে বৈকি, শেষ পর্য্যন্ত ঝগড়া।

—ওটা বোকাদের পক্ষে। তর্কে হেরে গিয়ে যারা রেগে ঝগড়া বাধায় তারা তো একের নম্বর বোকা। উপকারিতা—ভোঁতা বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ শান পড়ানো—যেটা

বিশেষ দরকার আপনার পক্ষে।—বলে আরো একবার রীতিমত হেসে ওঠেন ডাক্তার।

এই হাসিই 'কাল' করেছে, চটে ওঠবার মত কথাতেও চটে ওঠার জো নেই।

—তার মানে পাকে প্রকারে আমায় বোকা বললেন?

—ওই তো—'পাকে প্রকারে' কোথা? স্পষ্টই বলছি তো, বোকা না হ'লে এতক্ষণ অতিথির জন্যে এক পেয়ালা চায়ের হুকুম করেন না? দেখছেন না ব'কে ব'কে গলা শুকিয়ে গেছে।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার এই এক চমৎকার কৌশল ডাক্তারের। কোনো সময় কোনো আলোচনাকেই তিক্ত করে তুলবেন না তিনি। তা ছাড়া—তর্ক করার কোনো মানে আছে নাকি এই রকম ভোঁতা বুদ্ধি আর নীরেট মগজওয়ালা মানুষের সঙ্গে? মাঝে মাঝে এক আধটা চমক লাগাবার মত কথা বলে ফেলে—কিন্তু পরক্ষণেই ধরা পড়ে বুদ্ধির ফাঁকী।......এর চেয়ে—ডাক্তার মনে মনে বলেন—পঞ্চুর মা—মাণিকের মাসীর সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে। ওদের বোকামীটাও উপভোগ্য। কারণ সেটা নির্ভেজাল। চমক লাগাবার দুরূহ চেষ্টা নেই বলেই মাঝে মাঝে ওদের মধ্যেও সামান্য একটু সহজবুদ্ধির বিকাশ দেখলে চমক লাগে।

বলাকা দেবী উঠে গিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে 'বয় বয়' শব্দে পাড়া সচকিত করে চায়ের অর্ডার দিয়ে দ্বিতীয় আদেশ দেন—"যাও আভি সাহাবকো সেলাম দেও।"

'বয়' অর্থাৎ চাকর শ্রীপতি নিতান্তই বাঙালী। তার ঊর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো 'সাহাবকো সেলাম' দিয়েছে কি না সন্দেহ। দিতে শিখেছে—এ বাড়ীতে কাজে লেগেই। নেহাৎ হাসি পেলেও—ডাক শুনলেই 'জী হুজুর' বলে আভূমি সেলাম করতে বাধ্য হয়। নইলে চাকরী বজায় রাখা কঠিন হ'ত।

আদেশ পেয়ে "জী হুজুর" বলে চলে গেল এবং মিনিট কতক পরেই—আদেশ পালনের প্রমাণ স্বরূপ খদ্দরের পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাতে গলাতে ও চটিজুতা ফট্‌ফট্ করতে করতে রঙ্গমঞ্চে 'সাহাবে'র প্রবেশ।

বলাকা দেবীর—বন্ধু সম্মিলনের মাঝখানে স্বামীকে আমন্ত্রণ করে আনাটা নিতান্তই চক্ষু লজ্জার দায়ে। বাড়ীতে উপস্থিত না থাকলেই বাঁচতেন। অথচ বাড়ী থাকলে উপায় কি? কিন্তু কে জানতো যে খাল কেটে কুমীর আনছেন।

প্রফেসরের সঙ্গে ডাক্তারের এমন জমে গেল—যে বলাকা দেবী আর কল্কে পাননা। বেচারা!

কি দুঃখে যে পুরুষ মানুষরা এই সব বাজে বাজে নীরস তত্ত্ব আলোচনা করে? শুধু করে? মেতে ওঠে একেবারে! রাষ্ট্র নেতাদের শাসন তন্ত্রের কোথায় কি অনাচার আছে কি দুর্নীতি আছে, রণনীতির কোন ফাঁকে কি গলদ আছে—সে সব কথায় তোদের কি দরকার রে বাপু? সারারাত ধরে ওই নিয়ে বাক্যব্যয় করলেই কি কিছু মীমাংসা হবে?

লাভের মধ্যে বলাকা দেবীকে বসে থাকতে হচ্ছে মুখে কুলুপ এঁটে। ঝুনো নারকেলে দাঁত ফোটাবার মত জোরালো দাঁত তো আর নেই তার? বড় জোর—বলতে পারেন "হলদে মুখো'দের হ'ল কি? একেবারে যে ঠাণ্ডা মেরে গেল।......ইনকামট্যাক্সটা আবার বাড়িয়ে দিলে? নাঃ আর পারা যায় না বাবু।......রাও বিলটা পাশ না হলে আর চলছে না বাবা"।

একবার উঠলেন—ফুলদানীতে সাজানো কাগজের ফুলগুলো ঠিক করলেন, টেবিলে দু'একখানা বই পড়েছিল তুলে রাখলেন সেলফে, আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে অন্যের অলক্ষ্যে চুলটা ঠিক করে নিলেন দু'বার, শাড়ীর পাড়টাকে টেনে টেনে চোস্ত করে সাবধানে বসিয়ে দেন বুকের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়—ব্লাউসের শিল্প সৌন্দর্য্য, হারের পেনডেন্টটা অযথা ঢাকা না পড়ে!

কানে এল কথা পড়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়ে—নিজের স্বাধীন মতটুকু জানাবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্রূপহাস্যে বলেন—

—আপনি ডাইভোর্স ল'র বিপক্ষে নাকি?

—কেন আপনিই কি সপক্ষে নাকি?

—দরকার বুঝলে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু দরকার বোঝার তো কোন একটা লিমিট নেই মিসেস চ্যাটার্জ্জি। আমাদের গ্রামে একটা বাগ্‌দী বৌ আছে, বরের কাছে মার খেয়ে খেয়ে তার হাড় চূর্ণ। প্রায়ই আসে—আমার কাছে ওষুধ খেতে আর আইডিন নিতে—তবু বিবাহ বিচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে না। অথচ—ওদের সমাজে ও প্রথা আছে। কিন্তু ধরুন আপনি—প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি স্যুট্ না পরে খদ্দর ব্যবহার করেন বলে হয়তো—ডাইভোর্সের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন।, তবে?

—কিন্তু—এই তো রাওবিলের মধ্যে সাতটা বিশেষ কারণ দেখাবার আইন বেঁধে দিয়েছে।

—দিয়েছে—নতুন কিছুই নয়। সেই মনুর আমলের "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" গোছেরই, কিন্তু সত্যিই যদি তাতে সমাজ-ব্যবস্থার কিছু সুরাহা হ'ত, তা' হলে মনুর আইনই

চালু থাকতো। সমাজের অকল্যাণকর কোনো আইনই টিঁকে থাকতে পারে না বুঝলেন? দেয়াল তুলে দাঁড়ায় "লোকাচার"—আইনের চাইতেও যা দুর্লঙ্ঘ্য, শাস্ত্রর চাইতেও যা অমোঘ। বিবাহ পদ্ধতিও তো আট রকম আছে শুনতে পাই—চলেনি কেন?

—সে তো পড়েই আছে কথা। শাস্ত্রকার পুরুষ, কাজেই পুরুষের সুবিধে বুঝে ব্যবস্থা।

—আর এতে কি আপনাদেরই খুব সুবিধের আশা করছেন?

—কেন নয়? বাঙ্‌লাদেশের কত মেয়ে কত অত্যাচার সহ্য করে মুখ বুজে স্বামীর ঘরে দাস্যবৃত্তি করে জীবন কাটাচ্ছে—

—এটা আপনার কাছে তো—নিছক শোনা কথা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি? কারণ যথার্থ অত্যাচারের স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই নেই আপনাদের। ড্রইংরুমে বসে গল্প করবার জিনিস সে নয়। কিন্তু তাদের দুঃখের কোনো উপশম হবে আপনাদের নতুন আইনে? গ্যারান্টি দিতে পারেন তার? নির্য্যাতন সহ্য করে কারা জানেন? নিতান্ত নিরুপায় যারা তারাই। সেই সব সহায়-সম্বলহীন, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, হয়তো রূপযৌবনহীন মেয়েরা কিসের জোরে আইনের সাহায্য নিতে যাবে? কোন্ সাহসে? কে লড়তে যাবে তা'দের হয়ে? মেয়েদের ভরসার মধ্যে তো বাপের বাড়ী? কিন্তু তারাই বা কে চাইছে—অনেক কষ্টে গোত্রছাড়া করে ফেলা মেয়ে আবার ফিরে আসুক তাদের নিরুপদ্রব সংসারে? হয়তো একা নয়—দু'চারটী শিশুবাহিনী নিয়ে? আর যদিই আসে—লাঞ্ছনার কিছু কসুর কি সেখানেই হবে? দুঃখী দরিদ্র নিরন্নের দেশে ভাত কাপড়ের দামটাও কম নয় মিসেস চ্যাটার্জ্জি! আমরা যাকে 'ছোটলোক' বলি—তাদের সমাজে বিচ্ছেদ প্রথা আছে কেন জানেন? তাদের মেয়েরা উপার্জ্জনক্ষম বলে। দরকার হলে 'গতর খাটিয়ে খেতে পারবে' বলে। অবশ্য আপনারাও আজ প্রায় সকলেই শিক্ষিতা হয়ে উঠছেন উপার্জ্জনের আশায়, কিন্তু পথ কই—যেদেশে বেকারের সংখ্যা ভয়াবহ?' অপর পক্ষে দেখুন—সাহস বেড়ে গেল আপনাদের পরম শত্রু পুরুষদেরই। মিথ্যে বদনাম দিয়েও স্ত্রী ত্যাগ করা চলতে থাকবে। তবে সত্যিই যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তারা আইনের সাহায্য না নিয়েও পৃথক থাকতে পারে বুঝলেন? কেউ আটকাতে পারে না। কোন আইনই নয়।

—আবার বিয়ে করতে পারে না তো?

—রুচি থাকলে পারে বই কি। অবশ্য হিন্দু আইনে পুরুষেরাই পারে, মেয়েরা নয়। কিন্তু পারলেই বা পাচ্ছে কোথা? যে দেশে কুমারী মেয়েকে চালাবার জন্যেও মোটা ঘুষ দিতে হয়—সে দেশে স্বামিত্যাগিনী স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী জুটবে বলে আশা করেন? হয়তো একটা দৈবাৎ। তাও পুত্রকন্যা থাকলে হয় কিনা বলা শক্ত।

—সেই জন্যেই তো পিতৃসম্পত্তির অংশ পাওয়া দরকার ডাক্তার গুপ্ত। মেয়েদের তাহলে—

—হাসালেন আপনি মিসেস চ্যাটার্জ্জি। পিতৃসম্পত্তি! পিতৃসম্পত্তি! যে দেশে—গড়ে মাথা পিছু সাড়ে পাঁচ আনা মাসিক আয়—তাদের আবার পিতৃসম্পত্তির বড়াই! বড়-লোকের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়। তাদের নিয়ে বিচার করলে চলবে কেন? বেশীর ভাগ কারবার তো সেই সাড়ে পাঁচ আনা নিয়েই। ক'জন ভাগ্যবান পিতা—ছেলেমেয়েদের ভাগ করে নেবার মত সম্পত্তি রেখে মরতে পারে? সম্পত্তির মধ্যে তো বুড়ো মা, বিধবা স্ত্রী, নাবালক সন্তান, আর মহাজনের ধার। মেয়েরা নেবে এ সম্পত্তির অংশ? তার বেলায় তো আইন বোবা।

—কিন্তু ভদ্র ঘরের মেয়েরা কি আজকাল নিজেদের জীবিকার্জ্জন করছেনা?

—হাঁ, যতদিন সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টটা আছে।

প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি এতক্ষণ নীরবে একখানি বাসি খবরের কাগজের পাতা উল্টোচ্ছিলেন—এবার গম্ভীর ভাবে বললেন—বিবাহবিচ্ছেদের প্রচলন হলে তোমার আগে যে আমাকেই যেতে হবে আদালতে, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব আশা করি নেই তোমার? কিন্তু তার আগে—যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ 'ঘর সংসার' দেখ।

এই প্রফেসরের পরিহাসের ধরণ। এত গম্ভীর ভাবে বললেন, মনে হবে সত্যিই বা। এটা হ'ল আতিথ্য-সৎকারের দিকে মন দেবার ইঙ্গিত—এই ঘর-সংসার দেখার অনুরোধ।

এতক্ষণে—খেয়াল হয় বলাকা দেবীর যে অনেক আগেই অর্ডার দিয়েছেন চায়ের, এখনো এসে পৌঁছয়নি। রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। এইসব চাকর বাকর দিয়ে যদি কোনো কাজ সময়ে হয়! চাপরাস আঁটা মুসলমান 'বয়' বাবুর্চ্চির স্বপ্ন—স্বপ্নই রয়ে গেল বলাকা দেবীর জীবনে। সত্যি, ইচ্ছামত অর্থস্বাচ্ছল্য না থাকলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

আর নির্ম্মলাই বা কি করছে? বুড়োধিঙ্গি মেয়ে কোনো কাজে যদি লাগবে। কেন, বাইরে ভদ্রলোক এসেছে জানলে চা জলখাবার পাঠিয়ে দেবার বুদ্ধি হয় না কেন?

উঠে গিয়ে দরজার পর্দ্দাটা ঈষৎ সরিয়ে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে ডাক দেন—

—বয়! বয়! কাঁহা গিয়া থা তোম উল্লু!

হিন্দি না বলে ছাড়বেন না বলাকা দেবী। ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করেও বলবেনই।

—'বয়' ডাকটা ও একটু দেশীতে শোনে বলাকা! কেন, শ্রীপতি নামটা তো মন্দ নয়?

নিরীহভাবে কথাটা বলে আবার কাগজ উল্টোতে থাকেন প্রফেসর।

—ওই জন্যেই তো চাকর বাকর এরকম বে-সায়েস্তা হয়ে উঠেছে—বলাকা দেবী ফিরে দাঁড়িয়ে বোধ করি শ্রীপতির পাওনাটাই স্বামীর উপর বর্ষণ করেন—তোমার এই গিইয়ে পড়া স্বভাবের জন্যে। চাকর ঠিক রাখতে হয় ধমকের ওপর। আজই সব ক'টাকে দূর করে দেব আমি।

—ক'টার মধ্যে তো একটাকেই শুধু দেখতে পাচ্ছি বলাকা, শ্রীপতি। আর কই?—আমি নয় তো?—প্রফেসর করুণ মুখ-ভঙ্গী করেন।

আপাদমস্তক জ্বলে যাবার পক্ষে কি এইটুকুই যথেষ্ট নয়? চাকর যে মাত্র একটাই সেটা জাহির করে বেড়াবার কি আছে? বাইরের লোকের কাছে হাঁড়ির খবর সব বলতে হবে? সৌষ্ঠব বলে জিনিস নেই সংসারে? অথচ বরাবর লক্ষ্য করেছেন বলাকা দেবী, যখনি তিনি বাইরের লোকের কাছে সৌষ্ঠব রাখবার জন্যে অনেক বুদ্ধি খরচ করে—অনেক প্ল্যান খাটিয়ে একটা কথা বলবেন—তখনি কর্তার পরিহাস-স্পৃহা চেগে উঠবে। পরিহাসের ছলে স্ত্রীকে অপদস্থ করাটাই তাঁর প্রধান সুখ বোধ হয়। কেন কি ক্ষতি হ'ত—বাড়ীতে দ্বিতীয় চাকর নেই একথাটা অভ্যাগতকে না জানালে?

দুই চোখে ক্রোধ অভিমান অপমানের জ্বালা সবকিছুর জলন্ত আগুন ফুটিয়ে তুলে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই না শোনার ভাণে পর্দা সরিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যান।

কিন্তু শ্রীপতি বেচারারই বা দোষ কি? নির্মলা তাকে বাজারে পাঠিয়েছে ডিম আর মাখন আনতে।

পাশের ঘর থেকে বলাকা দেবীর বিস্মিত কণ্ঠের প্রশ্নে ধরা পড়ে সে ইতিহাস—"কী আশ্চর্য্য ডিম নেই? ফুরিয়ে গেছে? ফুরোবার আগে আনিয়ে রাখতে পারো না? কী করো সারাদিন? কাজের মধ্যে তো কিচেন রুমের তদারক করা, তা'ও হয়ে ওঠে না আশ্চর্য্য! বাটার কি আজকাল গায়ে মাখা হচ্ছে? দৈনিক একটা করে টিন উড়ে যাচ্ছে··· হাসছো? হাসতে লজ্জা করে না তোমার? আশ্চর্য্য!" উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটী যে কে, সে কথা মিহির গুপ্ত না বুঝলেও প্রফেসর বোঝেন। তিনিও ভাবেন—আশ্চর্য্য। নির্মলাকে গড়বার সময় রাগ জিনিসটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন না কি বিধাতাপুরুষ?

অপ্রতিভ হওয়ার অভ্যাস ডাক্তারের কোষ্ঠীতে নেই, তবু তিনিও যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ বোধ করেন। একপেয়ালা চা, যেটা তাঁর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, তার জন্যে বাড়ীশুদ্ধ লোক ধমক খাবে এটা সত্যিই সহ্য করা কঠিন।

তিনিও ভাবেন আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য এই বলাকা দেবী! শালীনতার অভাব যে কতদূর পীড়াদায়ক সেটা যেন এঁকে দেখে নতুন করে উপলব্ধি করা যায়।

কিছুক্ষণ আগে যে তিনি নিজেই চায়ের কথা তুলেছিলেন সে কথা ভুলে গিয়ে, বলাকা দেবীকে ফিরতে দেখে বলেন—দেখুন আমার জন্যে আর চা বলবেন না, এসময় আমার অভ্যাস নেই।

—বা রে, তাই বলে আপনাকে অমনি ছেড়ে দেব বুঝি?

আবদারে কণ্ঠস্বর তরল হয়ে আসে। কে বলবে এই কণ্ঠই বিষ উদ্গীরণ করছিল এতক্ষণ।

হঠাৎ প্রফেসরের পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হয় ডাক্তারের, তবে সেটা নাকি নাটুকেপণা দেখায় তাই চুপ করে থাকেন।

—কত ভাগ্যে পাওয়া গেছে আপনাকে—বলাকা দেবী পূর্ব্বকথার জের টানেন—আমি তো ভেবেছিলাম—ভুলেই গেছেন।

—আপনাকে ভুলবো? জীবনে নয়।

প্রফেসরের সামনেই এই সরল প্রেমোক্তিটুকু করেন ডাক্তার।

পর্দার ফাঁকে শ্রীপতির মুখ দেখা গেল। বোধ হয় কিছু বলতে চায়।

কী ভাগ্যি আর বেশী কিছু বকাবকি না করে বলাকা দেবী ভারীক্কি গলায় বলেন "যাও জলদী তিন পেয়ালা চা, আউর টোষ্ট ডিম। একঠো ডবল, দোঠো সিঙ্গল—সমঝাতা? হাঁ। আউর নির্মলা দিদিকো পুছো কুছ মিঠাই হ্যায় কি নেই?"

বাঙালী ভৃত্যের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর অযথা এরকম 'হিন্দুস্থানী রন্ধার' অত্যাচার দেখে মনে মনে ভারী কৌতুক বোধ করছিলেন ডাক্তার, সহসা চমকে সোজা হয়ে বসেন।

নির্মলা দিদি? নির্মলা দিদি কে? ঠিক শুনেছেন তো? নির্মলা এখানে এল কি সূত্রে? কে সে এই অদ্ভুত খিচুড়ি পরিবারের? কিন্তু নির্মলারা তো ঘোরতর হিন্দু ছিল, যার জন্যে ব্রাহ্মণ কন্যার মর্য্যাদার কাছে খাটো হয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল মিহির গুপ্তকে। কিন্তু—এ আবেষ্টনটা কেমন?··· অবশ্য প্রফেসরগিন্নি যতটা বেপরোয়া ভাব দেখাতে চান, প্রফেসর নিজে তেমন নয়। হয়তো কর্তারই কোনো আত্মীয়া, হয়তো শ্বশুরবাড়ীর কেউ। বিধবা মেয়ে একজন কারুর

গলগ্রহ তো হবেই। তাকেই ধমক লাগাচ্ছিলেন না তো গিন্নি?···চা টোষ্ট নিয়ে সে নিজেই আসবে না কি? কেমন দেখতে আছে সে? কত বুড়ো হয়ে গেছে?···বাঙালীর মেয়ে তো বিধবা হলেই বুড়ি! সত্যিই যদি নির্ম্মলা এসে দাঁড়ায় এখানে?

কি বলবেন মিহির গুপ্ত?—হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলেন ডাক্তার। মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি তাঁর—'নির্ম্মলা' 'নির্ম্মলা' জপ করে? এযে আকাশে, অন্তরীক্ষে নির্ম্মলার ছবি দেখছেন! নির্ম্মলা নামটা কি পথে ঘাটে হাজারটা ছড়ানো নেই? পঞ্চুর মার সেই পীলেপেটা শুঁটকি ভাইঝিটার নামই যে নির্ম্মলা।

শ্রীপতির হাত থেকে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলেন—হ্যাঁ কি বলছিলেন-প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি, আপনাদের কলেজে অবিনাশ সিংহী এখনো আছেন?

পাশের ঘরে—ষ্টোভ নিভিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো চায়ের সরঞ্জাম গুলোর সামনে বসে নির্ম্মলা অবাক হয়ে ভাবছিল··· কোথায় যেন শুনেছে—কতদিন যেন শোনেনি—এই উদাত্ত কণ্ঠস্বর, এই প্রাণখোলা হাসি, কিন্তু অসম্ভব কি সম্ভব হয়? একটা দেওয়ালের ব্যবধান কী অলঙ্ঘ্য!

অসম্ভবের আশা করবার মত বাজে সেন্টিমেণ্টাল মেয়ে নির্ম্মলা নয়, তবু কেন যে দোতলার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায়, এই আশ্চর্য্য। শুধু মাথার চাঁদিটুকু দেখলেই কি আর চেনা যায় লোককে? পাঁচ সাত বছর পরে? কোঁকড়ানো চুলে টাক ধরাও তো বিচিত্র নয়।

মিহির ডাক্তার পথে বেরিয়ে ভাবছিলেন আর এক কথা—ধর জীবনটা যদি উপন্যাস হ'ত! ঠিক এই সময়ে 'অধীর আকাঙ্ক্ষায় নায়ক হাঁ করে তাকাতো উর্দ্ধপানে, আর প্রাসাদবর্ত্তিনী নায়িকা চাইতেন পথ পানে"—ব্যস্। মিটে গেল সব ঝঞ্ঝাট—নায়কের, নায়িকার, এবং লেখকেরও! বাকী পৃষ্ঠাগুলি মিলনানন্দে ভরপুর। কিন্তু জীবনটা উপন্যাস নয়, কাজেই ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোকের জানলার দিকে হাঁ করে তাকাতে পারে না। তাই মাথা নীচু করেই চলে যেতে হয়।

দূর ছাই, হতভাগা কলকাতাকে ত্যাগ করাই ভালো।

'এখানে নির্ম্মলা আছে' এই চিন্তাটাই হয়েছে ভারী অস্বস্তিকর। যেখানে নির্ম্মলার ছায়ামাত্র নেই, সেখানে ফিরে গেলেই আপদ চুকে যায়।

বোকা ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে নিখিল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—তারপর তর্কচূড়ামণির খবর কি? সাড়া শব্দ নেই যে? খুব পড়া হচ্ছে বুঝি?···কিছু মনে করবেন না, নমস্কার। আপনিই বোধ হয় একে পরীক্ষাসাগর পার করাবার ভার নিয়েছেন? খাটুনীটা কি রকম মনে হচ্ছে? খুব ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্রীটী আপনার না?

এরপর চুপ করে থাকা মণির পক্ষে সম্ভব নয়, পুরনো স্বভাব ফিরে আসে—আচ্ছা নিজে তো খুব বিদ্বান্ তা'হলেই হ'ল—বলে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে।

—শুধু মগজটাই নয়—মেজাজটাও আপনার ছাত্রীর বেশ ওজনে ভারী, কি বলেন? কিছু কিছু প্রমাণ পাচ্ছেন তো?

অনেকদিন পরে পরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখলে যেমন সারা হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তেমনি একটা অব্যক্ত আনন্দে ভরে ওঠে মমতার মন। প্রসন্ন হাসির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্যামল মুখ। কী চমৎকার ছেলেটা! কী সুন্দর হাসি!

সাধারণতঃ অপরিচিতের কাছে লজ্জাটা তার বেশী, কথা কয় কম, তবু নিখিলের কথায় হেসে উত্তর না দিয়ে পারেনা।

—কই আমি তো এখনো মেজাজের প্রমাণ কিছু পাইনি, আপনি যদি পেয়ে থাকেন—

—ধারে কাছে যে আসবে সেই পাবে, ভয় নেই। আপনি যদি—না না থাক্ এক্খুনি কেঁদে ফেলবে হয়তো—

না রাগালে কথা আদায় হয় না যে, কাজেই রাগিয়ে দিতে হয়।

মণি আর কতো সহ্য করবে? এতো দিন পরে দেখা, এমনিতেই তো—কান্নাপেয়ে যাচ্ছে তার কেন কে জানে, তার ওপর আবার এই ঠাট্টা!—বেশ বেশ কাঁদি কাঁদবো, আপনার কি? আপনাকে তো আর ভোলাতে হবে না— বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—ভোলাতে হবে না তা'র বিশ্বাস কি?—বলে চাপা হাসি হেসে মমতা ওকে হাত ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

আর মমতার এই চাপা হাসি দেখেই নিখিলের সমস্ত বাচালতা স্তব্ধ হয়ে যায়। নিশ্চয়ই মণি বলেছে তা'দের গোপন তথ্য, শিক্ষয়িত্রী বলে সম্মান রেখেছে বলে মনে হচ্ছে না, নইলে ও হাসির অর্থ কি? আচ্ছা—সুরেশ বাবুরই বা কী আক্কেল! এতটুকু মেয়েকে মাষ্টারণী রাখা কেন? করবেই তো ফাজলামী, জবরদস্ত একজন বাঘা মাষ্টার রাখলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

এর সামনে এখন সপ্রতিভ হওয়া যায় কি করে?

মমতা এই অবসরে ভালো করে চেয়ে দেখছিল নিখিলকে। কবে কোথায় একে দেখেছে মমতা? মনে হচ্ছে যেন কতো-বার দেখা। কেন এমন অদ্ভুত ধারণা? তবে কি সত্যিই? বাংলা দেশে 'ঈশ্বরপুর' নামক গ্রাম আর দ্বিতীয় নেই? "আশ্রম" কি শুধু একটাই আছে?

ইত্যবসরে নিখিল প্রশ্ন সুরু করে—

—তারপর, মাসীমা কোথায়, মেসোমশায় কোথায়? মল্লিটা পালালো আর এলো না যে?

—এই এলো! চলুন মা আপনাকে ডাকছেন।—বলে মল্লি এসে দাঁড়ালো।

—আমিও আজ উঠি, বন্ধুর সঙ্গে গল্পসল্প করো তুমি—বলে মণির হাতে মৃদু একটু চাপ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মমতা।

মমতা চলে গেল, কিন্তু নিখিল অত চট্ করে উঠবে কি করে? একবার মাসীমার কবলে পড়ে গেলে তো আর রক্ষা নেই! অথচ এতদিন পরে মণির সামনে দিয়ে চলে যাবে একটাও কথার বিনিময় না করে?

মণি কিন্তু বলে মিথ্যে নয়, সাংঘাতিক "পাকা পক্কায়" ছেলে এই মল্লিনাথটা। ঠিক এই সময়ে উধাও হয়ে যেতে কে বলেছিল তা'কে?

অগত্যা একটা কথা না বল্লে হয়?

—চিঠির উত্তর না পেয়ে রাগ হয়েছে?

—রাগ হবে কেন?

—হবে কেন তা'তো জানতে চাইনি, হয়েছে কিনা—

—হয়েছে—খুব হয়েছে! কি করবেন?

—যা ইচ্ছে হচ্ছে, তা' করতে পারবোনা, কাজেই ক্ষমা চাইবো। কি হল—মাথাটা ঠুকে গেল যে টেবিলে? চিঠিতে কত কথা কইতে—সামনে এত লজ্জা কেন মণি!

—আপনি এত দুষ্টু কেন?

—দুষ্টু না হলে তর্কচূড়ামণির সঙ্গে পেরে উঠবো কি করে?

—আহা!

—মণি! শুনছো—মুখটা অতো নীচু করলে দেখা যায়? অতএব মুখ তুলে চাইতেই হয় মণিকে।

—মন কেমন করতো?

—আপনার জন্যে আমার মন কেমন করতে দায়।

—খালি খালি 'আপনি' বলতে ভাল লাগে তোমার?

—কি বলবো তবে?

—'তুমি' বলতে পারোনা? বলনা একবারটী—

—আপনি তা'হলে 'তুই' বলুন।...বলুন—'এই মণি'—বলেই—দুষ্টুমীর হাসি হেসে ছুটে পালিয়ে যায় মণি।

ঠিক এই সময়ে নিখিলের দেরী দেখে তরুবালা নীচে নেমে আসছিলেন—উচ্ছ্বসিত আনন্দে চঞ্চল ছুটন্ত মেয়ের সঙ্গে খেলেন ধাক্কা।

ধাক্কা যে শুধু শরীরেই খেলেন তা নয়, খেলেন মনেও। এ আনন্দের স্বরূপ চিনতে ভুল হয় না, অন্ততঃ মেয়েমানুষের হয় না। হঠাৎ দুরন্ত রাগে আপাদমস্তক জলে ওঠে তরুবালার। আর এগোতে পারেন না, অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

...না কিছুতেই না, তাঁর শান্তির সংসারে অশান্তির চারা গজাতে দেবেন না তিনি। এই বেলা—এখুনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে।...কি করবেন? এই দণ্ডে গিয়ে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে আসবেন ছেলেটাকে, না কি মেয়েকেই কসে দু'ঘা চড়িয়ে দেবেন?...বড় হয়েছে? হোক, মেয়েকে অত ভয় করে চলবার দরকার নেই। তরুবালার সংসারে তরুবালার শাসন মাথা পেতে নিতে হবে সকলকেই।

চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল সুরেশবাবুর বিস্মিত প্রশ্নে। তিনি বেরিয়ে এসেছেন স্নানের ঘর থেকে।

—একি তুমি এখানে এমন ভূতে পাওয়ার মত দাঁড়িয়ে আছ যে?

—ভূত? হ্যাঁ ভূতেই পেয়েছে আমায়।

—একটা ভূতে তো পেয়েই বসে আছে—আবার নতুন কে এল?

—সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না বুঝলে?—তরুবালা ঝেঁজে ওঠেন।

—কি হ'ল? মেজাজ অত খাপ্পা কেন?

—কেন আবার! যার জ্বালা পোহাতে হয় সেই বোঝে। নিজে তো কিছু তাকিয়ে দেখবে না—চিনেছ খালি মক্কেল আর নথী। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখেছ কোন দিন?

—কেন? অসুখ করেছে বুঝি? তাকিয়ে দেখিনি মানে? এই তো কালই বলছিলাম 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন'?

—ওই 'কেন'টাই যে সর্ব্বনাশের মূল। মেয়ে যে 'লভ্' করতে শিখেছেন তার খোঁজ রাখো?

—ছিঃ তরু, ও রকম বেআব্রু কথাবার্ত্তা বোলোনা।

সুরেশ বাবু গম্ভীর হয়ে ওঠেন।

—তবে থাক, তোমার সংসার তুমি বুঝো—তরুবালা অভিমানে 'গোঁজ' হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

—রাগের কথা নয় তরু, নিজেদের সম্ভ্রমের কথা। ছেলেমেয়েরা যদি আমাদের কাছে সৎশিক্ষা না পায় তবে আমাদের শ্রদ্ধা করবে কেন?

—আর এই যে তুমি এতদিন সৎশিক্ষা দিয়ে এলে, কি ফল পেলে? ছেলেটা তো দুষ্টুমীতে ডাকাত হয়ে উঠছে দিন দিন, আবার মিছে কথাও শিখেছেন। এই তো সেদিন—

সুরেশ বাবুকে যতটা 'উদোমাদা' মনে করা যায় ঠিক ততটা নয় দেখা যাচ্ছে। তরুবালার কথায় বাধা দিয়ে আরো একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—ছেলেরা কেন মিছে কথা বলতে শেখে জানো তরু? অন্যায় শাসনে। অহেতুক ভয়ে তা'দের স্বাভাবিক বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। আত্মরক্ষা—যা

মানুষের স্বভাব ধর্ম—তারই তাড়নায় মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হয়।

—ও! তা'হলে আমার অন্যায় শাসনেই তোমার ছেলেমেয়ে বিগড়ে গেছে? তা বেশ। কিন্তু এই যে—মেয়েটা? সদা সর্ব্বদা অত উড়ু উড়ু মন কিসের জন্তে? আমাদের কাছে আর তেমন করে সরল ভাবে গল্প নেই, কাছে বসা নেই কেন? তবেই না তদন্ত করতে হয় আমায়। মায়ের যে কী জ্বালা সে মায়েরাই জানে।···আমি বলছি এ সব ওই বয়াটে ছোঁড়ার সঙ্গে মেশার ফল।

তরুবালা আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

—বয়াটে ছোঁড়া?—সুরেশবাবু আকাশ থেকে পড়েন—সে আবার কে?

—কেন তোমার ওই আদরের নিখিল। 'ভালো ছেলে' বলে বাড়ীর ভেতর আসা যাওয়া করতে দিয়েছি, তা—এই কি ভালো ছেলের কাজ? ভদ্দর লোকের ঘরের মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে আসার কি দরকার তোর? তুই বড় লোকের ছেলে আছিস আছিস—দু'পাঁচলাখ টাকার জমিদারী আছে, তোদের আছে। আমরা তার কি ধার ধারি? গরীবের মেয়েটাকে কি বিয়ে করতে আসবি?—তাই 'লভ্' করতে এসেছিস? 'মাসী' বলে ডাকিস—বোনপোর মত যত্নআত্তি করি, চুকে গেল। আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার আস্পদ্দা হয় কিসের জন্তে? ও সব রাজপুত্তুর বলে কেয়ার করবোনা আমি। আর দু'দিন দেখি—আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব বাছাধনকে।

তরুবালার বক্তৃতায় বিরক্ত হয়ে সুরেশ বাবু চটে মটে বলে ওঠেন—তিলকে তাল কোরোনা বাবু, দুটো হাঁসি গল্প করলেই 'লভ্' হয়ে গেল? বাড়ীতে তো সঙ্গীর মধ্যে এই বুড়ো মা বাপ, সমবয়সী পেলে ভাব করবেনা?

—সমবয়সী?

তরুবালা অবাক হয়ে গালে হাত দেন।

—আঃ সমবয়সী মানে আর কি—ইয়ে—সমশ্রেণী ধরো। মেয়েরা বয়সের চেয়ে আগে বাড়ে কিনা! এই তোমার কথাই মনে করোনা—কী সাংঘাতিক দুষ্টু ছিলে? ঠাট্টা তামাসা ছাড়া কথাই কইতে না। তোমারই তো মেয়ে!

তরুবালা চোখ পাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন—আমি কার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করে বেড়াতাম শুনি?

—কেন আমার সঙ্গে!

—সেই তুলনা দিচ্ছ তুমি? বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়।

—আহা বুঝতে পারছোনা, হাতের কাছে লোক পেয়েছিলে তাই, নইলে তো হাতড়ে বেড়াতে?

—তার আগে গলায় দড়ি দিতাম।

অতঃপর সুরেশবাবু এসে অতিথির কাছে ভদ্রতা রক্ষা করতে বসেন, আর মিনিট কয়েক পরেই অতিথি উঠে পড়ে কাজ থাকার ছুতোয়। ঠিক আগের অবস্থাটা যে আর নেই, এটা যেন ধরা পড়ে গেলো তার চোখে।

পথে বেরিয়ে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে যায় নিখিল।

কেন এমন হলো?

স্পষ্ট কোনো নির্দ্দেশ না পেলেও স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—এ বাড়ীতে—তার পুরনো জায়গাটা গেছে হারিয়ে। তবে কি করবে নিখিল? নিজের আত্মসম্মান নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যাবে? মণির সঙ্গে আর দেখা হবে না?

হঠাৎ যেন সমস্ত মনটা একটা তীব্র ক্ষতির বেদনায় হায় হায় করে ওঠে। কিন্তু কেন? কতোটুকুই বা সম্পর্ক? কদিন সে পেরেছে মণির সঙ্গে একলা একটা কথা বলতে? সকলের মাঝখানে—হয়তো একটুকরো হাসি, তুচ্ছ একটা কথা, অকারণ একটু সম্বোধন। কি আসে যায় সেটুকুর অভাবে?

নাঃ মনকে সান্ত্বনা দেওয়া অতো সোজা নয়। তার কাছে যুক্তির বালাই নেই তাই বোবা একটা বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকে।

বাসায় ফিরে ঠাকুরের কাছে ক্ষুধাহীনতার ছুতো দেখিয়ে চলে গেলো ছাদে। আর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো—না মণির কথা নয়—বাবার কথা। কি করছেন তিনি একাকী নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বোঝা নিয়ে?

কে সান্ত্বনা দেবে সেই চির গম্ভীর মানুষটাকে?

নিখিল যদি কাছে থাকতে পেতো!

অথচ উপায় নেই, নিজেই চলে এসেছে সে এক দুরূহ ব্রতের ভার নিয়ে। কে জানে সে ব্রত উদযাপন হবে কিনা, হওয়া সম্ভব কিনা।···

ছোট্ট মণি, কতোটুকু তার আকর্ষণ, সেইটুকুই যদি এতো তীব্র হয়, এতো দুঃসহ হয়ে ওঠে তার বেদনা, তবে কি দিয়ে পরিমাপ করা যাবে কেন্দ্রচ্যুত বিভূতিবাবুর দুর্ব্বিসহ বেদনার বোঝা?

কিন্তু কোথায় সেই অপরূপ রহস্যময়ী! যে বন্যার জলের মতো হঠাৎ এসে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো, আদর্শনিষ্ঠ মহাপুরুষের সারাজীবনের সঞ্চিত গৌরবকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে!

তবু রাগ করা যায় না তার উপর।

তাকে খুঁজে আনবার জন্তে কঠিন পণ করতে হয়।

আচ্ছা, আগে হলে কি এতো উদার হতে পারতো নিখিল? এমন করুণ মমতাময়?

ছোট্ট মণি!

তবু সেই নিখিলের জীবনে বয়ে এনেছে এই উদারতার হাওয়া।

কিন্তু মানুষ কতো অসহায়, অর্থহীন আত্মসম্মানের কাছে? প্রাণ যাক, তবু—নিখিলের উপায় নেই মণির অভিভাবকদের কাছে হীনতা স্বীকার করবার। বিভূতিবাবুর উপায় ছিলনা—আপন সন্তানের কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াবার। তাই তিনি হারিয়েছেন তাঁর মানসী প্রিয়াকে, হয়তো—নিখিলকেও হারাতে হবে তার প্রথম প্রেমের আলোটুকু।

নাঃ এতো অনায়াসে কি হারানো চলে? না এতো সহজে হার মানা যায়? সকাল থেকে প্রতিজ্ঞার পাঠ সুরু হয়—'নাঃ আজ আর নয়। আজ আর যাবোনা। নানা কাজের ভীড়ে সারাদিনটা কেটেও যায় একরকমে, কিন্তু বিকেলের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিজ্ঞার জোরটা কেমন যেন ঢিলে হয়ে আসে। লক্ষ্যহীন ভাবে খানিকটা ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একেবারে স্তিমিত হয়ে আসে সে প্রতিজ্ঞা! অবশেষে যখন ফাল্গুন অপরাহ্নের সোনালি আলো সন্ধ্যার আঁচলের আড়ালে মিলিয়ে যায়, তখন সমস্ত প্রাণটা 'হায়' 'হায়' করে ওঠে। তখন বিশেষ একটা রাস্তা দুরন্তবেগে আকর্ষণ করতে থাকে, তৃষিত হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। তুচ্ছ মনে হয় সম্মান অসম্মানের সূক্ষ্ম বিচারবোধ।

কী আসে যায়—তরুবালা যদি নিতান্ত প্রসন্ন হাস্যে অভ্যর্থনা না করেন? এমন কি ক্ষতি যদি সুরেশবাবু সস্নেহে আলোচনার মাঝে বারবার মনে পাড়িয়ে দেন নিখিলকে অদূরবর্ত্তী এম, এস, সি পরীক্ষার ভয়াবহতা?

অবুঝের ভান করলেই চলে যায়। ব্যস্ততার ভাব বজায় রেখে একটীবার সুধু ঢুকে পড়া। কয়েকটা মিনিটের জন্যে।

ধরো—এই পথেই যদি "বিশেষ কোনো দরকারি" কাজ থাকে, যেতে যেতে পরিচিত বাড়ীটাতে একবার ঢুকে কুশল সংবাদ নিয়ে যাবেনা? আর নীচেরতলার ঘরেই যখন মণিকে পাওয়া যায়? আর তো কিছুই নয়—তরুবালার অম্লশূলের ব্যথাটা আর চাগলো কি না, সুরেশবাবুর দাঁত তোলানোর কি হলো—অথবা মল্লিনাথের সর্দ্দিকাশীটা ভালোভাবে সেরেছে কি না, এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নেওয়া।

মণিই পারে খবরগুলো দিয়ে দিতে।

আর তাই যখন পারে, তখন কেন আর মিথ্যে দোতলায় উঠে তরুবালাকে ব্যস্ত করা? বেশীক্ষণের জন্য তো আসা নয়—দু'দশ মিনিট।

অবশ্য এসে পড়লে—সত্যিই কি আর মানুষ পোষ্টকার্ডের চিঠির মত কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান করে চলে আসতে পারে? হয়েই যায় দেরী। "বিশেষ দরকারি" কাজটা সেদিন আর হয়ে ওঠে না, পরের দিনের জন্যে তোলা থাকে।

কিন্তু তা'তে কি?

মণি কি একলা বসে থাকে অবাধ প্রেমালাপের সুযোগ দিতে? থাকে মল্লিনাথ, থাকেন ওদের সেই মমতা দি না কে!

তা লোকটোক থাকাই ভালো। বুকে তবু একটু সাহস থাকে। তাদের আড়ালে কথাবার্ত্তা সহজ হয়। একেবারে একলা মুখোমুখি হলে একটা কথাও কি মুখ দিয়ে বেরোতো?

মমতাদি মানুষটাও যে ভারী চমৎকার।

এতো সুন্দর কথাবার্ত্তা, ব্যবহার কী মিষ্ট। তা'ছাড়া—শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত কেমন একটা মর্য্যাদাপূর্ণ গম্ভীর ভাব। নিখিলের চাইতে কতোই বা বেশী বয়সে, কিন্তু কথার ধরণে যেন মনে হয় কত বড়ো। নিখিলেরও ইচ্ছে হয়—মমতাদি বলে ডাকতে।

সত্যি বলতে কি—বেশীর ভাগ কথা তো ওঁর সঙ্গেই হয়। পরিচিত আত্মীয়ের মতো মানুষটা।

আজও হঠাৎ ভবানীপুরে 'বিশেষ দরকার' পড়ায়, এবাড়ী ঢুকতে হলো নিখিলকে।

প্রসন্ন হাস্যে অভ্যর্থনা করলেন মমতাদি'ই।

মণি আর মল্লিনাথ মায়ের সঙ্গে গিয়েছে পাশের বাড়ীতে 'সত্যনারায়ণের শিন্নি' উপলক্ষ্যে। অবশ্য আশ্বাস দিয়ে গেছে—একখুনি আসবে।

মমতা মণিরই একখানা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, নিখিলকে দেখেই স্নিগ্ধহাসি হেসে বলে—এই যে আসুন।

—একা যে? ছাত্র ছাত্রী পলাতক না কি? —বলে নিখিলও মৃদুহেসে বসে পড়ে একটা চেয়ার টেনে।

—হ্যাঁ ছাত্র ছাত্রী পলাতকই বটে, পাশের বাড়ীতে ব্রতকথা শুনতে গেছে।

—ব্রতকথা? ধর্ম্মে মতি হলো বুঝি?

—তাই তো দেখছি।...তা'পর আপনার খবর কি?

—ভালোই। ছাত্রী কি রকম পড়াশুনা করছে?

—মন্দ না। আপনার ও তো পরীক্ষার দুশ্চিন্তা।

—তা বটে। কিন্তু পরীক্ষার পড়া ছাড়াও—দুশ্চিন্তা যে কতো রকমের থাকে মানুষের।

দীর্ঘ একটা নিশ্বাস পড়ে নিখিলের।

মমতা মনে মনে হাসে। আহা বেচারা। কিন্তু এমনি বয়সে সন্তোষিত্রির তরুণ হৃদয়ে প্রেম কী সুন্দর। এর যন্ত্রণাও দেখতে মধুর। তাই সকৌতুক হাস্যে বলে—কেন আপনার আবার এতো দুশ্চিন্তা জুটলো কোথা থেকে?

—ভাগ্যের ভাঁড়ার থেকে। বুঝলেন মমতা দি—'দিদি' সম্বোধনটা করেই ফেলে সে, চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে—আমাকে দেখে যতো সুখী আর নিশ্চিন্ত ভাবেন ঠিক তা' নয়।

এই মেয়েটীর কাছে আপন হৃদয়ভার লাঘব করতে ইচ্ছে হয় কেন? কেন নিতান্ত অন্তরঙ্গ সুরে একান্ত প্রাণের কথা ব্যক্ত করতে মন চায়? অথচ এমন স্বভাব তো নিখিলের নয়।

কে জানে—'পূর্ব্বজন্মের' থিয়োরিটা মানতেই হয় বুঝি।

মমতা কৌতুকভাব ছেড়ে কোমল কণ্ঠে বলে—তা সত্যি, বাইরে থেকে কতোটুকুই বা বোঝা যায় বলুন। তা ছাড়া লোকব্যবহার জিনিসটা এমনি মারাত্মক, ভিতরে হয়তো যখন প্রলয়ের ঝড় বইছে, তখন হালকা হয়ে হেসে কথা কইতে হয় অপরের সঙ্গে।

—ঠিক বলেছেন—হঠাৎ একান্ত আগ্রহে মমতার হাতের ওপর একটা হাত রাখে নিখিল, বোধ করি অজ্ঞাতসারেই রাখে—ব্যগ্র কণ্ঠে বলে- ঠিক বলেছেন, আপনি মানুষের মনের কথা এতো সহজে বুঝতে পারেন, সেই জন্যেই বোধ হয় এতো ভালো লাগে আপনাকে।

মমতা একটু বিপন্ন বোধ করলেও—হাতটা কিন্তু সরিয়ে নেয় না, তেমনি সহজভাবেই বলে—মনের কথা বোঝা আর শক্ত কি? একটু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলেই তো—

—সেই তো মুস্কিল। সেই বিচার বুদ্ধিটুকু যদি সকলের থাকতো—

কথা শেষ হবার আগেই পিছন থেকে একটী সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য উচ্চারিত হয়—সে থাকলে তো সংসারের লোক বাঁচতো বাবা। থাকে আর ক'জনের?

তরুবালা এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে।

তাঁর পিছনে মেয়ে ছেলে।

অপ্রতিভ অপরাধী দু'জন কোনো কিছু উত্তর দেবার আগেই তরুবালা আবার বলে ওঠেন—এই যে বাছা তোমাকেই বলি—পড়াতে এসেছ মন দিয়ে পড়াবে, তা' নয় আমার বাড়ীতে যে আসছে যাচ্ছে তার সঙ্গে গল্পগাছা করে সময় নষ্ট করা। এটাই কি ন্যায্য? 'বলবো বলবো' করেও বলতে পারিনে, কিন্তু আর তো চুপ করে থাকা চলে না। নেহাৎ মেয়ের একজামিন সামনে তাই—না হলে—কিন্তু থাক, একটু বুঝে সুঝে চলো তাই বলছি।—

চারটী প্রাণীকে নির্ব্বাক করে দিয়ে সশব্দে উপরে উঠে যান তরুবালা।

অতঃপর আর কি করবে নিখিল?

সম্মান অসম্মানের বোধ যখন নিতান্ত স্থূল হয়ে দেখা দেয়, তখনও কি মানুষ হৃদয়বৃত্তির দাসত্ব করবে? শিক্ষিত ভদ্র পুরুষ মানুষ?

আর মমতা?

তাকে বোঝা যায় না কেন?

অপমানের কালি তেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে কই তার মুখে? বড়ো বেশী অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে যেন। কিসের এতো অন্যমনস্কতা যে, অপমানটাও তেমন তীব্র হয়ে গায়ে বাজেনা?

সেই সন্ধ্যার পর থেকে আর আসেনি নিখিল।

এদিকে পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে মণির।

কিন্তু কোন্ মনটা নিয়ে পরীক্ষা দেবে বেচারা? শুধু শুধুই যদি আসা বন্ধ করে দিতো লোকটা, তা' হলেও বরং কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেতো। কিন্তু এযে নিতান্তই মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে।...

যখনি মণি মায়ের সেই ভীষণ কণ্ঠের শ্লেষ বাক্য আর নিখিলের আরক্ত অপমানাহত মুখচ্ছবি কল্পনা করে, তখনি যে প্রাণটা আছাড় খেয়ে মরতে চায়।

পরে—মণিকে শুনিয়ে শুনিয়ে মমতার নামের সঙ্গে নিখিলের নাম জড়িয়ে অনেক বাঁকা বাঁকা কথাই বলেছেন তরুবালা, কিন্তু মণির কাছে সে সব কথা অর্থহীন।

একবার যদি কেউ কারুর হাত ধরে, ক্ষয়ে যায় মানুষ? এতো আর সে স্পর্শ নয়? যে স্পর্শে আলগোছে একবার ছোঁওয়া গেলেই সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, বুকটা হিম হয়ে যায়, ছুঁয়ে যাওয়া জায়গাটুকুতে স্পর্শের একটা শরীরী অনুভূতি স্থায়ী হয়ে থাকে। এ তো এমনি কথা কইতে কইতে হঠাৎ একটু হাত ধরা। এতে দোষ ধরে না মণি।

তাই যদি ধরবে—তবে তরুবালার সঙ্গে মনের তফাৎটা কোথায় তার?

দোষ ধরেনা বটে, তবে ধৈর্য্য ধরেও থাকতে পারছেনা আর। তারপর আর একবারটী যদি দেখা হতো।

অবশেষে কোনো প্রকারে একবার বন্ধুর বাড়ী গিয়ে একটুকরো চিঠির দূত পাঠিয়ে না দিয়ে পারে না।

একটীবার শুধু—যে কোনো ছুতোয়—

জগতের কোনোখানে কোথাও কি শূলবেদনার ভালো ওষুধ পাওয়া যায় না? তেমনি একটা কিছু সংগ্রহ করা কি নিখিলের পক্ষে এতোই কঠিন?

তরুবালার যন্ত্রণা উপশমের জন্যে যদি ভালোমত একটা শূলবেদনার ওষুধ জোগাড় করে আনতে পারে নিখিল, আসবার একটা উপলক্ষ্য তো হয়?

কি আর ক্ষতি—শুধু এইটুকু বলা এসে—"মাসীমা, আপনি এতো কষ্ট পান, একবার এটা ব্যবহার করে দেখুন। শুনেছি বেশ উপকারী—"

তাতে কিছু আর তাড়িয়ে দেবেন না তরুবালা?

আর—বাড়ীতে এসে গেলে একটীবারও কি চোখোচোখি হবে না? ব্যস তা'হলেই তো হলো!

তা হলেই তো সব বোঝা যাবে। সহজ হয়ে যাবে সব।

এতো বুদ্ধি অবশ্য চিঠির মধ্যে দিয়ে দিতে পারেনা মণি, শুধু মনের মধ্যে ভীড় করতে থাকে—এই সব সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনা।

বাইরের ঘর থেকে বদলী হয়ে—ভিতরের দিকে একটা ঘরে পঠন পাঠনের আসর বসছে আজকাল। অন্য সময় বোধকরি এ ঘরটায় ভাঁড়ারের কাজ চলে—শুধু সন্ধ্যাবেলা সভ্যতা করে একটা ছোট টেবিল আর খানতিনেক বেতের চেয়ার পাতা হয়।

মেয়েকে পড়তে বসিয়ে দিয়ে, দরজার বাইরে দালানে থাবা ধরা বাঘের মতো বসে থাকেন তরুবালা—হয়তো সুপুরি কাটার ছল করে, হয়তো বা আর কিছুর ছলে।

পড়তে পড়তে অস্থির হয়ে পড়ছে মণি। চাঞ্চল্য ধরা পড়ছে স্পষ্ট।...যদি চিঠিটা পেয়ে আজকেই আসে নিখিল। যদি বাইরের দিকে কাউকে না দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়?... দূত পাঠিয়ে যে নিমন্ত্রণ করতে পেরেছে, সে যে অভ্যর্থনার খাতিরে এক পা এগিয়ে আসতে পারবেনা একথা কি বিশ্বাস করবে সে?

মণি কি করে জানিয়ে দেবে এ নির্বাসন তার স্বেচ্ছাকৃত নয়? একবারটী একমিনিটের জন্যে যদি বাইরের ঘরটা ঘুরে আসতে পেতো সে, নিখিল আসছে কি না দেখতে!

—মমতাদি, আজ আর পড়তে পাচ্ছিনা, বড়ো মাথা ধরেছে।

মাথাটা কে ধরেছে সেটা অনুমান করতে দেরী হয়না মমতার। অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছে ছাত্রীর চঞ্চল অস্থিরতা। সামান্য হেসে বলে—মাথা ধরা আশ্চর্য্য নয় সারাদিন 'হল'এর গরমে! অবিশ্যি পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেলে—আর বেশী না পড়াই ভালো, তা'তে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। যাও বরং খোলা ছাদে চলে গিয়ে একটু হাওয়া লাগাওগে। আমি উঠি। তা'ছাড়া—আমারও একটু দরকার ছিলো—

সহসা তরুবালা জাঁতির শব্দ থামিয়ে ভারীগলায় গম্‌গম্‌ করে ওঠেন—দরকার মানে তো—পার্কের বেঞ্চিতে বসে ওই রাঙামুলোর সঙ্গে গালগল্প করা? সে খবর আমি পেয়েছি।

মমতা অবাক বিস্ময়ে বলে—কার কথা বলছেন মাসীমা? কিসের খবর পেয়েছেন?

—সে আর বিশদ করে বলতে হবে কেন বাপু, মনে মনে কি আর না বুঝেছো? এখানে সুবিধে হয় না, তাই পার্কে গিয়ে আড্ডা জমাও—এ আমার শুনতে বাকী নেই। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—দেখতে ভালোমানুষটী হলেও ছেলেটার স্বভাব ভালো নয়। তা'ছাড়া—ওর বাবা পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক, জমিদারের ছেলে, ওর কাছে কিছু আশা করতে যেওনা।

মমতা স্তম্ভিত বিস্ময়ে বলে—আমি তো আপনার কথা বুঝতে পারছিনা মাসীমা?

—জেগে যে ঘুমোয়, তার ঘুম ভাঙানো শক্ত—তরুবালা আবার একটা সুপুরিকে জাঁতির 'জাঁতিকলে' পুরে দু'খণ্ড করতে করতে বলেন—স্পষ্ট করেই বলি—এই নিখিলের কথা বলছি। তাকে ধরতে যাওয়া—তোমার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাওয়া!

মমতা আরক্ত মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, কম্পিত কণ্ঠে বলে—ছি ছি কাকে কি বলছেন আপনি? সমস্ত সংসারটাকে আপনার নিজের মন দিয়ে বিচার করতে যাবেন না।

তরুবালা একটী বিবতিক্ত হাসি হেসে বলেন—তা' কোন স্বর্গ থেকে আর মন ধার করতে যাবো বলো? তবে তোমার বিষয়ে অনেক কথাই জেনেছি কিনা, তাই ভক্তি বিশ্বাস আর রাখতে পাচ্ছিনে।

মমতা স্খলিত কণ্ঠে বলে—আমার বিষয়ে? কি শুনলেন হঠাৎ?

—সব কথা বলে লাভ নেই, তবে বুকে হাত দিয়ে বলো দিকিন্ তুমি এখানে নাম ভাঁড়িয়ে পড়াতে এসেছো কিনা? তোমার নাম মমতা না কল্যাণী?...আমরা বলি—বুঝি আইবুড়ো! ও মা একবারের বিধবা, আবার কোন 'সেবাশ্রম' না কি মুণ্ডু আশ্রমে গিয়ে তার কর্তার সঙ্গে ভাব ভালোবাসা করে, বিয়ে করে আবার পালিয়ে এসে এই করে বেড়াচ্ছো! জগতে আর কাউকে বিশ্বাস নেই!...

যাকৃগে তোমার যা খুসি করোগে আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু কথাটা যখন উঠলোই, তখন চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করে বলি—কাল থেকে আর এসোনা তুমি।

—এখন যে ওর পরীক্ষা চলছে মাসীমা?

প্রায় আর্তস্বরে কথাটা উচ্চারণ করে মমতা।

—সে আমি বুঝবো। আমার মেয়ের ভালোমন্দ বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে।

—আচ্ছা—বলে ক্ষুদ্র একটী নমস্কার করে চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মমতা। স্থির স্বরে বলে—একটা কথা শুনে রাখবেন মাসীমা, নিখিল বাবু আমার বিশেষ স্নেহভাজন আত্মীয়—বলে ধীরে ধীরে চলে যায়। বোধ হয় ছাত্র ছাত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখবার—খেয়াল থাকে না।

ছাত্রটী যদি বা অশ্রু সজল চক্ষুকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পরিণত করে এবং আর একটু বড়ো হলে মাকে কি ভাবে 'দেখে নেবে', তা'র কল্পনা করতে গিয়ে এ অবহেলার জ্বালাটা ভোলে, ছাত্রী বেচারি পারেনা। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে প্রচলিত ভাষায় যাকে 'হাপুস নয়নে' বলে—সেই পদ্ধতিতে কাঁদতে বসে।......

ছোট্ট মণির জন্যে ভগবানের এতোগুলো কঠোর আয়োজন কেন? কেন আর সকলের মার মতো মা নয় তার? কেন—তাদের ক্লাশের আর সব মেয়ের মতো—ম্যাট্রিক পরীক্ষার মতো তুচ্ছ চিন্তাটাই একমাত্র চিন্তা হয়ে রইল না তার? কেন সে আপন হৃদয়ভারে কম্পিত কাতর? অপরাধের বোঝায় পীড়িত?

আর কেনই বা মমতাদির মতো এমন মমতাময়ীর স্নেহস্পর্শ তার ভাগ্যে বেশীদিন সইলো না?

সবটাই মণির ভাগ্যের দোষ।

কিন্তু—কিন্তু—নিখিলেরই কি দোষ নেই? সে কেন তুচ্ছ মণিকে ভালোবাসতে এলো? মণি কি জানতো ভালোবাসা কি? ভালোবাসার বেদনা কি?

চাকরী গেল তবু খুব বেশী দুঃখ হচ্ছেনা তো। কল্যাণী অবাক হয়ে ভাবে—অকারণে মনটা এত হাল্কা হয়ে গেল কেন? মণির মার অতবড় অপমানের কথাও গায়ে লাগলো কই? বরং হাসি পাচ্ছিলো—লোকে কেমন করে জানবে কি সম্পর্ক তা'র নিখিলের সঙ্গে। অভিমান করে চলে এসেছে বলেই না কল্যাণী অজ্ঞাত অপরিচিত।

যে সংসারে আশ্রয় পেয়েছিলো—সে আশ্রয় যদি আঁকড়ে ধরতে পারতো। স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে না গিয়ে ডুবে যেতে পারতো জলের তলায়, সকলের মাঝখানে রাখতে পারতো নিজের জায়গা।

দেবতা না হয় নিজের পাষাণতার নিয়ে সরেই থাকতেন, এদের তো পেতে পারতো? তরুণ কন্দর্পের মত সোণার ছেলেটা সখের খাতিরেও একবার ছোট্ট মাটাকে 'মা' বলে ডাকতো না কি? জগতের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ডাক।

হয়তো আগে দেখা হলে—কল্যাণীর জীবনের ইতিহাস যেতো বদলে।

প্রায় সমবয়সী এই ছেলেটাকে যুবক বলে সমীহ আসে না, ছোটর মত করে ভালো বাসতে ইচ্ছে করে—সে কি বিভূতিবাবুর আত্মজ বলেই? ওর নুতন প্রেমের আলোয় ঝল্‌সে ওঠা তরুণ মুখের দীপ্তিতে কল্যাণীর জমাট বাঁধা বুকটা যেন হাল্কা হয়ে আসে, চিরদিনের গম্ভীর স্বভাব চঞ্চল হয়ে ওঠে আনন্দে।...

"আমার ছেলে", "আমাদের ছেলে",—চুপি চুপি একবার উচ্চারণ করতে দোষ কি?...

ভেঙে যাওয়া ঘরকে আবার বাঁধতে ইচ্ছে করে কেন? এদের কাছে একটু ঠাঁই পাবার লোভ দুরন্ত হয়ে উঠছে যে।

আর মণির বিয়ের ঘটকালী।

সে ভার নিতেই হবে কল্যাণীকে। মানুষের অসাবধানে ভগবানের দেওয়া সম্পদটুকু নষ্ট হয়ে যেতে দেবে না।

মণির চিঠি।

মণি সকাতর অনুরোধ জানিয়েছে একটী বারের জন্যে আসতে।

কি করবে নিখিল?

কি করে পারবে—না এসে থাকতে?

সেদিন নয়, পরদিন মণিদের বাড়ী এলো। অবিশ্যি শূলব্যথার ওষুধ নিয়ে নয়। এমনিই এলো।

মণি ম্লানমুখে বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ে বসে আছে, আর শ্রীমান মল্লিনাথ মাত্র এক টুকরো কাগজের সাহায্যে কি করে ছুটো পালতোলা নৌকো গড়া যেতে পারে তারই এক্সপেরিমেণ্ট করছে। তরুবালা অনুপস্থিত।

—কই তোমাদের মমতাদি আসেননি? কর্ণধারহীন হয়ে বসে আছো যে?

—"ইচ্ছে করলে আপনিও কর্ণধারণ করতে পারেন—মমতাদি আর আসবেন না।"—মল্লিনাথের টীকা।

কিন্তু মল্লিনাথের টীকায় নিখিলের বিশেষ জ্ঞান সঞ্চার হ'লনা। বললে—আসবেন না? অসুখ করেছে?

—না, মা ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

—এই অসভ্য ছেলে, ওরকম বলতে আছে?

মণির তাড়ায় কুণ্ঠিত মল্লি ব্যস্ত হয়ে ভ্রম সংশোধন করে নেয়—তাড়িয়ে দেননি, মানে—আসতে বারণ করে দিয়েছেন।

—কেন বলতো মণি?

—জানিনা।

নিখিলের চোখের দিকে একটীবার চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নিলে মণি, আর ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়লো বইয়ের পাতার উপর।

মল্লি যা বলে মিথ্যে নয়—'দিদিটা একটা ছিঁচ্‌কাঁদুনে'। তাই নিজেই সে গম্ভীরভাবে বলে—রাগ! রাগ! আর কেন? দিদির এই পরীক্ষা চলছে—আর এখন মার এই রাগ ফলানো! কি যে হবে?

বিজ্ঞভাবে নিজের দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করে মল্লিনাথ।

—হঠাৎ এত রাগের কারণ?

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল নিখিল, হঠাৎ পিছন থেকে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন তরুবালা। যথাসম্ভব গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন—কারণটা তুমিই কি আর কিছু জানোনা বাছা? তবে যদি জেনে শুনে ন্যাকা সাজো।

—কি বলছেন মাসীমা?

নিখিল উত্তেজনার মুখে উঠে দাঁড়ায়।

—বোসো উঠোন', দু'চারটী কথা বলবো—তোমার বাপ জমিদার, তুমি যা খুসী করে বেড়াতে পারো—আমার মেয়ে তো তা নয়? ওকে গেরস্থ ঘরের বৌ হয়ে সংসার করতে হবে। এটা তো বোঝো?

নিখিল অবাক হয়ে বলে—তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি?

—না থাকলে কি আর বলছি? তবে বারণ করে দিচ্ছি তুমি আর "মণি" "মণি" করে আদিখ্যেতা করতে এসোনা। মণি আর ছোটটী নেই।

লজ্জায় অপমানে সর্ব্বশরীর 'রি রি' করে উঠলেও সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে নিখিল ধীরস্বরে বলে—আর আমি যদি মণিকে আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নিই মাসীমা?

—থাক্‌ বাছা, ওসব নভেলি কথা শুনে গলে যাবার মেয়ে আমি নই। তুমি আজ আমার মেয়েকে চাইবে, কাল তার মাষ্টারনীর সঙ্গে ভাব করতে যাবে—তোমার ধরণধারণ বুঝতে বাকী নেই আমার।

তরুবালার উত্তেজনা দেখে মনে হয় মণির সঙ্গে প্রেম করাটা যদি বা একদিনও বরদাস্ত করতে পারতেন, ওর মাষ্টারনীর সম্বন্ধে সন্দেহে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

আশা করবার যে কিছুই থাকছেনা আর।

নিখিল কিন্তু চমৎকার মাথা ঠাণ্ডা রেখে শান্ত ভাবেই বলে—আপনি বড্ড ভুল ধারণা করে ফেলছেন মাসীমা, ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।

—করো ভালোই করো। কিন্তু তোমাদের—এখনকার ছেলেদের—ছেদ্দাভক্তি ভালবাসা কিছুতেই আমার রুচি নেই। তুমি বলছো 'শ্রদ্ধা করি'—তিনি বললেন—নিখিল বাবু আমার বিশেষ আত্মীয়। আত্মীয়তা হঠাৎ গজালো! কতই শুনবো।

—নিখিলবাবু, এখনো আপনি শুনছেন বসে বসে? যান একখুনি চলে যান, যান শিগগির—

মণির অস্বাভাবিক উত্তেজনায় উপস্থিত তিনজনেই চমকে ওঠে।

—লজ্জার কথা বলছো মা? লজ্জা কি তোমারই আছে? বয়সে বড় হলেই ছোটদের যা খুসী বলা যায়—তাই না? কিন্তু জেনো পৃথিবীতে সকলেই তোমারমতো নয়।

ছুটে চলে গিয়ে পাশের ঘরে উপুড় হয়ে পড়া ছাড়া আর কি করতে পারে অতটুকু মণি?

নিতান্ত মরিয়া হয়েই না এত কথা কইতে হল তা'কে।

নিখিল যখন পথে বেরিয়ে পড়লো তখন যেন মাতালের মত টলছে। দু'টো অপ্রত্যাশিত আঘাতের বেদনা বইবে কেমন করে?...মণি! মণিকে আর দেখতে পাবে না? তরুবালার অসঙ্গত খেয়ালের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে? যদি বা নিখিল সইতে পারে, মণি সইবে কি করে? হয়তো দুর্ভাষিণী মার কাছে কতই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'চ্ছে তাকে! কিন্তু নিখিল কি তাকে এই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে চুপ করে থাকবে? নিজের মানের হিসেবটাই এত বড় হয়ে উঠবে? আহা বেচারা মণি! ওকে উদ্ধার করতেই হবে তরুবালার কবল থেকে।

মোড়ের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেলো—মল্লিনাথ আসছে হাঁপাতে হাঁপাতে! তার হাতে দু'খানা মলাট ছেঁড়া ইংরেজি পত্রিকা—নিখিলবাবু, আপনার এই বই দুটো—

বই দুটো দেখে হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারেনা নিখিল। এই 'ইলাষ্ট্রেটেড্‌ উইক্‌লি' দু'খানা বোধহয় মাস ছয়েক আগে সুরেশবাবুকে দিয়েছিল নিখিল, কেন তা' আর মনে নেই। পড়া হলে ফেরৎ নেবে এমন দুঃস্থ কল্পনা ছিলোনা।

সেই বই দুটো ফেরৎ দিতে এসেছে মল্লিনাথ।

সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে?

না। মল্লিনাথের কথা শুনেই বোঝা গেলো—বই দুটো ছুতো মাত্র, মণির দূত হয়েই এসেছে সে।

—নিখিল বাবু, মমতাদির সঙ্গে আপনার দেখা হয়তো? তা' এবার যখন দেখা হবে, আমাদের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

এতো দ্রুত কথা বলে মল্লিনাথ, যে তার কথার মাঝখানে প্রশ্নের চেষ্টা বৃথা।

শেষ হলে প্রশ্ন করে নিখিল—আমার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়?

সার্টের হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে মল্লিনাথ বলে—কেন পার্কে?

—পার্কে?—নিখিল বিরক্ত বিস্ময়ে বলে—সে একদিন হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তাই বলে—রোজই হবে না কি? কিন্তু সে কথা তুমি কি করে জানলে?

—আমি আবার কি করে জানবো?—মা! মা যে কোথা থেকে কি-খবর পান! ওই জন্যেই তো মার অতো রাগ মমতাদির ওপর।

—কি পার্কে যাওয়ার জন্যে?

মল্লিনাথ গম্ভীর ভাবে বলে—পার্কের জন্যে—ছদ্মবেশের জন্যে—

—ছদ্মবেশের জন্যে?

অবাক হয়ে বাধা না দিয়ে পারেনা নিখিল—ছদ্মবেশ মানে?

—ওই যে—কথার দ্রুতভঙ্গী ত্যাগ করে যেন আত্মস্থ-ভাব গ্রহণ করে মল্লিনাথ—মমতাদির আসল নাম তো মমতা ঘোষ নয়? নাম হচ্ছে কল্যাণী লাহিড়ী। মা তো বাবাকে বলছিলেন—"উনি আগে বিধবা ছিলেন—তারপর সধবা হয়েছিলেন, আবার এখন আইবুড়ো হয়েছেন?" এগুলো তো ভালো নয়?

কল্যাণী লাহিড়ী! কল্যাণী লাহিড়ী! এ কোন নাম!

দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে নিখিল বলে—মমতাদির ঠিকানা জানো মল্লি?

—না তো!

—কেউ জানেনা? তুমি? দিদি? কি কাকাবাবু?

—তা তো জানিনা? জিগ্যেস করে আসবো?

নিখিল অন্যমনা ভাবে বলে—না থাক। খোঁজ খবর করতে গিয়ে গোলমালের সৃষ্টি করে লাভ কি? বরং কোর্টে গিয়ে সুরেশবাবুর কাছে জেনে নিলেই তো চলে। কিন্তু সত্যিই কি কিছু লাভ হবে? জীবন কি রূপকথা?

কিন্তু···কল্যাণী লাহিড়ী। কল্যাণী লাহিড়ী।

মণির চিন্তা ভেসে গেলো এই নতুন জোয়ারে।

* * * *

দেশ থেকে ফিরে নিখিল যদিও অহরহ চিন্তা করেছে কল্যাণীর কথা, কিন্তু ঠিক কোন ভাবে যে খোঁজা সুরু করবে সেইটা বুঝে উঠতে পারেনি। এতোদিনে তবু যেন একটা সূত্র পেলো।

কিন্তু বিধাতা পুরুষ কি ঔপন্যাসিক?

অন্তত নিখিলের ভাগ্যে?

ঘটনাচক্রের অদ্ভুত যোগাযোগ?

সুদুর্লভ আকাঙ্খিত বস্তুকে কে কবে পেয়েছে এমন অপ্রত্যাশিত মহিমায়? জীবন উপন্যাসে এমন অদ্ভুত ঘটনাচক্র ঘটে?

অনেক খোঁজ খবর নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে অবশেষে একদিন সে কল্যাণীর বাড়ীর ঠিকানায় হাজির হলো এসে।

আগে আসেনি। আসেনি এই ভেবে—এসে কি বলবে?

কোন অদ্ভুত প্রশ্নের আঘাতে কৌতুহল মেটাবে? কোন কোন প্রশ্ন দিয়ে মমতার কাছ থেকে সংগ্রহ করবে মমতার জীবনের গোপন তথ্য?

একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েই যাওয়া ভালো।

যদি নিখিলের সৃষ্টিছাড়া আশাটা নিখিলকে তীব্র ব্যঙ্গ করে চলে যায়, তবে কি লাভ 'মমতা ঘোষকে খুঁজে বার করে দেখবার?

অবশ্য মনে পড়লেই দেখতে ইচ্ছে হয় সত্যি, কিন্তু লাভ কি? অসম্ভব আশা যদি সফল হয় তবেই গিয়ে সোজাসুজি জানাবে দাবী।

অনুনয় নয়, অনুরোধ নয়—পরিষ্কার দাবী।

সুরেশবাবুর কাছ থেকে তাঁর বন্ধুর ঠিকানা—তাঁর কাছ থেকে তস্য বন্ধুর। অনেক দরজায় ধর্ণা দিয়ে কল্যাণীর ঠিকানা সংগ্রহ হয়েছে, সংগ্রহ হয়েছে তার জীবন ইতিহাস।

মমতা ঘোষ নয়···কল্যাণী লাহিড়ী!

'মৃন্ময়ী সেবাশ্রমের' অধ্যক্ষ বিভূতি লাহিড়ীর স্ত্রী!

ঠিকানা দেখে এসে তো হাজির হলো নিখিল, কিন্তু বাড়ী দেখে বিশ্বাস হয় না যে। এতো বড়ো লোহার ফটকওয়ালা গ্যারেজ বসানো প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ীখানা যে কল্যাণীর বাসস্থান হ'তে পারে, এটা বিশ্বাস করা দস্তুরমত শক্ত। হয়তো—ধনী আত্মীয়ের আশ্রয়ে একটু ঠাঁই নিয়ে আছে।

আজই নিয়ে যাবে নিখিল কল্যাণীকে তার নিজের জায়গায়—গৌরবের আর দাবীর আসনে।

নিখিলের বাড়ীতে, নিখিলের মাকে।···

বাবার কাছে এইবার বড় মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারবে নিখিল, প্রতিজ্ঞা পালনের গৌরবে।

ফটকের কাছে ঘোরাঘুরি করাটা অবিশ্যি ভদ্রতা নয়। এ সব জায়গায় কার্ড পাঠিয়ে দিলেই মানায় ভালো, কিন্তু 'বড়লোকের ছেলের' মত চাল চলন যে কিছুই শেখেনি ছেলেটা। যতই হোক মেদিনীপুরী বৈ তো নয়।

এক টুকরো কাগজে নিজের নাম লিখে, ছোকরা একটা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ভিতরে। আর একটু পরেই কল্যাণী এসে হাসি মুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল।

নিঃসঙ্কোচেই কাছে এলো। মণিদের বাড়ী তাকে না দেখেই যে খোঁজ নিতে এসেছে এটা নিশ্চিত।

খুব ভাগ্যি যে তরুবালা নিখিলের সামনে প্রকাশ করে বসেন নি তাঁর মনের গলদ।······নিশ্চয়ই না। নইলে কি নিখিল আসতে পারতো হাসি মুখে?—তরুবালার ওপর সামান্য কৃতজ্ঞতা বোধ করে কল্যাণী।

—কি খবর? ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এসেছেন দেখছি। বসুন।

নিখিল একখানা চেয়ার দখল করে বসলো। বললো—আপনার খবর কি বলুন। আছেন কেমন?

—ভালোই। মণি কেমন পরীক্ষা দিলে?

—মণিই জানে।

—বাঃ? আপনি খবর রাখেন না?

—কই আর রাখলাম।

—কেন? যাননা না কি আর?

আশঙ্কা সত্ত্বেও প্রশ্ন করে কল্যাণী।

—ঠিক তাই। যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন বলুন তো?

নিখিল বেশ গম্ভীর ভাবে বলে—মাসীমা বললেন 'আমি না কি ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে ঢোকবার অনুপযুক্ত'।

কথা বলার ধরণে কল্যাণী হেসে ফেলে।

—হাসছেন যে? বলা অসম্ভব?

—আপনাদের মাসীমার মাথা খারাপ।

—মাথা মোটেই খারাপ নয় বুঝলেন। খারাপ ওঁদের চোখ। অধিকাংশ মাসীপিসীরই। লোকে ন্‌ডিস্ হ'লে যেমন যথাসর্ব্বস্ব হলদে দেখে, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মসীবর্ণ দেখছেন ওঁরা—চোখের কালিপড়া দৃষ্টি দিয়ে।

—মেয়ে ছেলে দুটি কিন্তু বড় চমৎকার, ভারী ভালো লাগে আমার। প্রতিদিন মন কেমন করে।

নিখিলের রসনায় প্রায় এসে গিয়েছিল—'আমারও।' খুব সামলে নিয়ে বলে—হ্যাঁ। এদিকে বেশ ইন্‌টেলিজেন্ট, আছে। তাছাড়া—

'তাছাড়া' দিয়ে কি বলবে ঠিক ভেবে উঠতে না পেরে নিখিল একটু থেমে যায়—আর সেই সুযোগে কল্যাণী ওর গম্ভীর স্বভাবের অন্তরালে লুকানো চাপাহাসিটুকু হেসে বলে—তাছাড়া ভারী সুন্দর। ওকে আমার ছেলের বৌ করে নেব ভাবছি।

—ভাবছেন না কি? তা বেশ। কিন্তু সেই অনাগত সৌভাগ্যের আশায় মাথার চুলগুলো পাকিয়ে ফেলতে হবেতো বেচারাকে?

—তা কেন? আমার ভাবেন কি? দিব্যি উপযুক্ত ছেলে আছে আমার, দেখবেন যখন বিয়ে দেব, নেমন্তন্ন করবো।

—অনেক সৌভাগ্য আমার। কিন্তু তার আগে আমারও একটা মস্ত নেমন্তন্ন করবার আছে—

—কাকে?—কল্যাণী বিস্মিত প্রশ্ন করে—কিসের?

—তোমাকে। বৌ বরণ করে ঘরে তোলবার—

বড় বড় প্রশান্ত দুটি চোখ মুহূর্ত্তের জন্য একবার তুলে ধরেই নামিয়ে নেয় কল্যাণী।···পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেছে তবে? "কল্যাণী"কে আড়াল করা গেলোনা "মমতা"র ছদ্মবেশে? যাক। নিখিলকে দূরে সরিয়ে রেখে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল কল্যাণীর পক্ষে।···নিখিল, মণি, এদের নিয়েই কি রচনা করা যায় না একটুখানি শান্তির নীড়? পাথরের দেবতা না হয় নাগালের বাইরে উঁচুতেই থাকলেন নিজের কাঠিন্য নিয়ে।

—চলো—তোমায় নিতে এসেছি।

—আচ্ছা পাগল তো—যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে কল্যাণীর স্বর—'নিতে এসেছি' কি?

—বাঃ নিতে আসবো না? বাবা বাউণ্ডুলে হয়ে তীর্থে ঘুরে বেড়াবেন—মা রাজকন্যের মতন নিজের মান নিয়ে বসে থাকবেন—আর আমি বুঝি বানের জলে ভেসে যাবো? দেখে শুনে কে আমার বিয়ে দেবে শুনি?

বড় বড় চোখ দুটির কানায় কানায় উপছে ওঠে উচ্ছ্বসিত অশ্রুর বন্যা।···এত সম্মানের ভার বইবে কি করে কল্যাণী? এর দাম দেবার মত ঐশ্বর্য্য তার আছে তো?

হ্যারিসন রোডে নিখিলের নিজের বাসায় সকালবেলা দোতলার বারান্দায় নিখিল হাতের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল। অদূরে কল্যাণী ষ্টোভ জেলে চায়ের জল চাপিয়ে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করছিল। জল ফুটে গেলে নিখিলকে তাড়া দিয়ে বলে ওঠে—আবার তুমি শুয়ে পড়লে যে? চা হয়ে গেল কিন্তু।

—হ'তে দাওনা বাছা। কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে আমার শরীর খারাপ হ'লে কি তোমার চা দায়ী হবে?

—কাঁচা ঘুমই বটে? কল্যাণী হেসে ওঠে—সাতটা বেজে গেছে। ওঠ ওঠ শিগগির।···এই মাটি করেছে আবার পাশ ফিরছো? নাঃ জমিদারী চাল বটে!

—নাঃ। তুমি আমার বাবার উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী বটে। এইটাই শুধু শিখে নিয়েছিলে বুঝি? নিখিল বেচারার বড় সাধের ঘুমটুকুর অকালমৃত্যু ঘটানো? এই ভোরবেলা এখন উঠতে হবে?—বেশ ছিলাম বাবা, এই এক আলাতন ইচ্ছে করে এনেছি—বলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ে।

অদ্ভুত ছেলে। ওর সংস্পর্শে এসে কল্যাণীর মুদু স্বভাব বদলে যাচ্ছে যেন।···কিন্তু এ যে বালুচরে বাসা বাঁধা। এর মূল কই? শিকড় কই? তাছাড়া—সমাজই কি দাম দেবে

ওদের নির্ম্মল ভালবাসার? ধরে বেঁধে নিয়ে তো এসেছে তাকে—কিন্তু থাকা চলবে কি করে? অথচ—'চলবে না' সে কথাই বা বলবে কোন মুখে—এই শৈশব সারল্যে ভরা যুবকের কাছে?

তবু বলতেই হয়।

—আজ আমায় রেখে আসবে তো?

—রেখে? কোথায়?

—যেখান থেকে এনেছিলে। আবার কোথায়?

—কি তোমার সেই কণ্ঠীতেলকধারী দাদাটীর কাছে? মুখে এনো না মা জননী, মুখে এনোনা ও কথা। তাঁর সামনে যেতে হবে মনে করলে আমার পীলে লিভার লাংস হার্ট সমস্ত শিউরে ওঠে। উঃ। নেহাৎ নাকি প্রাণের দায় ছিল তাই কালকে বাঘের খাঁচায় ঢুকেছিলাম—আবার? কেটে ফেললেও না।

—খুব যে নিন্দে করা হচ্ছে আমার দাদার। কি করেছেন তোমার শুনি?

—করেছেন? কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চোরকে যা করে। জেরা—জেরা। বাপ্‌স্ সে কী জেরা, যেন খুনি আসামী আমি। ভয় হচ্ছিল জোচ্চোর বলে হাজতে পাঠিয়ে না দেন।

—বা রে, জেরা করবেন না? টপ্ করে আমাকে দিয়ে দেবেন? 'তুমি কে', তার হিসেব নেবেন না?

—'আমি কে'? কপট গাম্ভীর্য্যে মুখটা ভারী করে মাথাটা চুলকে নিখিল বলে—তাই তো—"আমি কে?" ভাববার মতন কথা বটে। "রামপেসাদ" ভেবেছিল—শঙ্করাচার্য্য ঠাকুর ভেবেছিল—আর কে কে যেন ভেবেছিল বলো তো?···'আমি কে?'···নাঃ ভাবিয়ে তুললে।

—বাবাঃ তোমার সঙ্গে কথায় কে পারে?

—বোঝো তা'হলে। সেই আমি—তোমার দাদার সামনে যেন—বেতসপত্র। হাঁসতে যে কোনদিন শিখেছিলাম ভুলেই গেলাম সে কথা। মনে মনে খালি ওই কণ্ঠীদের ইষ্ট, শ্রীকেষ্টর কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করছি—হে ঠাকুর!—আমার প্রাণে ভরসা দাও আর বুড়োকে সুমতি দাও। উঃ তাঁর কবল থেকে বেরিয়ে এসে বুকে হাত দিয়ে বার বার দেখলাম হার্টফেল করেছি কিনা। আবার যাবো সেখানে?

—তবে আমায় ছেড়ে দাও? একলাই যাই?

—খালি খালি যাই যাই করছো কেন বলতে পারো? ছেলেকে একবেলা এক পেয়ালা চা খাইয়েই কর্ত্তব্য সাঙ্গ হ'ল? ভালো ভালো। হবে না কেন? সৎমা বৈতো নয়?···আজ আমার নিজের মা থাকলে? এবেলা ওবেলা 'কনে' দেখে বেড়াতো।

—হরি বল। সেই খেদ—কল্যাণী হেসে ফেলে।—তা' সত্যি, কিন্তু 'কনে' দেখে বেড়াতে হবে কেন? বৌ তো আমার ঠিক করাই আছে—চলো তবে।

—আমি যেতে টেতে পারবো না বাবা।

তা'হলে—আমি একলা যাবো নাকি? বাবা! তোমার মাসীমাটীর কাছে একলা যেতে সাহস হয় না আমার—

—ঠিক তোমার দাদার মতন। আমার মামা মাসী ভাগ্যটাই দেখছি উৎকৃষ্ট। তোমার ওই দাদার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকো কি করে বলো তো?

—বাঃ যে বাড়ীতে জন্মালাম—

—উনি তোমার নিজের দাদা নাকি?

—কেন, বিশ্বাস হয় না?

—বিশ্বাসযোগ্য নয় বটে—ও বাড়ীটা তা'হলে তোমার বাবার?

—আগে ছিল। এখন দাদার।

—তা' জানি। কিন্তু এত বড়লোকের মেয়ে হয়ে তুমি সেবাশ্রমে চাকরী নিতে গিয়েছিলে কেন বলো তো? দাদার সঙ্গে বনতো না বোধ হয়?

—বনাবনি আর কি! বিয়ে দিয়েই বাবা মারা গেলেন। তারপরই দুর্ভাগ্য নিয়ে ফিরে এলাম দাদা বৌদির কাছে। বৌদি উঠে পড়ে লাগলেন আমাকে মোক্ষপথে এগিয়ে দিতে। কৃচ্ছ্রসাধনের ঠ্যালায় দমবন্ধ হবার জোগাড়। একাহার সহ্য হয়, একবস্ত্র সওয়া সোজা নয়। তার ওপর মস্তক মুণ্ডনের হুকুম। ভেতরে ভেতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। যেদিন বললেন—কাল গুরুদেব এসে 'কণ্ঠী' দেবেন, সেই রাত্রেই নিজের পথ দেখলাম।···ওঁরা তখন নর্ত্তন কৃষ্ণপ্রাপ্তির ভাবে বিভোর—দাদা বৌদি, বৌদির বাপের বাড়ীসুদ্ধ লোক সব খোল করতালের আওয়াজে 'দশা' পাচ্ছেন। বাড়ীতে রোজ 'মচ্ছোব'। কোন ফাঁক দিয়ে যে গলে বেরিয়ে গেলাম কেউ টেরও পেলে না।···কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম শিক্ষয়িত্রীর আবশ্যক। গিয়ে উঠলাম সেবাশ্রমে।—যেখান থেকে খবর দিলাম।

কল্যাণীকে চুপ করতে দেখে নিখিল বলে—চিঠি পেয়ে ফিরে আসতে বললেন না যে বড়?

—না। লিখলেন—'যে মেয়ে এমন পুণ্যের আবহাওয়া ছেড়ে পাপের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই আমাদের।'

—আবার তুমি সেই দাদার কাছে এলে?

—এলাম বৈ কি। তবু তো দাদা! চুপি চুপি বললেন—'এসেছিস বেশ করেছিস, তোর বৌদির দিকে বেশী যাসনে, ভারী ক্ষেপে আছে।' ক্ষেপে তো ছিলেনই—তার ওপর আবার মাথায় সিঁদুর।

কল্যাণী একটু হেসে চুপ করলো।

এই সামান্য হাসিটুকুর মধ্যে ধরা পড়লো—অনেক লাঞ্ছনা বেদনার প্রচ্ছন্ন ইতিহাস।

—মেয়েমানুষ মেয়েমানুষকে যত কষ্ট দিতে পারে, এমন বোধকরি কেউ পারে না, কি বল?

—যার যা ভাগ্য নিখিল, শৈলদির মতন মেয়েও তো আছে সংসারে।

—তাই জন্যেই এখনো টিঁকে আছে সংসার।...সত্যি শৈলদিকে দেখতে ইচ্ছা করছে—চল না?

—যাবো। যাবোই ঠিক করছি। কিন্তু তার আগে একবার মণিকে দেখে যাবো।

নিখিল ও কল্যাণীকে তাড়ানোর পর সুরেশবাবুর কাছে অনেক তিরস্কার হজম করে রীতিমত অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন তরুবালা।...সত্যি, নিখিলের সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করা উচিৎ হয়নি তাঁর।—সে তো মুখ ফুটে বিবাহের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করেছিল—কি যে অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালায় ছটফট করলেন তখন? গোপন মনের অন্তরালে যে আকাশকুসুম রচনা করছিলেন—কল্যাণীকে তার প্রতিবন্ধক ভেবেই না অত জ্বালা ধরেছিল তখন—ভেতরে যে এত ব্যাপার কে জানে বাবা।

ভালমানুষ তরুবালা কি করেই বা জানবেন মাষ্টারনীটা আবার ওর সৎমা! বনাবনতি যদি নাই হবে তবে আবার দ্বিতীয় পক্ষে বিয়েই বা করা কেন নিখিলের বাপের? অতবড় ছেলে থাকতে? জমিদারগিন্নী এলেন—টিউশনি করতে! কালে কালে কত ফ্যাসানই হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই মানুষ যদি আপনার লোকের সঙ্গে সম্পর্কের 'কাটান ছেঁড়ান' করে, তাহলে তো আর পৃথিবী চলে না। নির্জীব দুটো ঘটি বাটিও কাছাকাছি থাকলে ঠোকাঠুকি হয়—আর এতো দুটো জলজ্যান্ত মানুষ! ঠোকাঠুকি হবে না? তাই বলে তেজ করে চলে এসে মাষ্টারী করে খেতে হবে?... তবে হ্যাঁ, তেজী মেয়েমানুষের স্বভাব চরিত্তির মন্দ হয় না। সে কথা সত্যি।

স্বামীর সঙ্গে বেশী আর ঝগড়া করেন না তরুবালা, মণির ম্লান মুখের পানে চেয়ে নিজের দোষটা যেন কিছু হৃদয়ঙ্গম করেন। থাক্‌গে সৎ শাশুড়ী, তবু তো মণি রাজরাণী হতে পারতো? তাছাড়া—মেয়ের মন পড়েছিল!

এখন—শত চেষ্টাতেই কি অমন ঘর বর জোটাতে পারবেন?

এমনি মনের অবস্থায় হঠাৎ একদিন আশাতীত ভাবে কল্যাণী আর নিখিলের আবির্ভাব।

—আপনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবু এলাম মাসীমা।—নিখিল হেঁট হয়ে প্রণাম করলো।

—আর লজ্জা দিওনা বাবা। মাথার বেঠিকে কা'কে কি বলে বসেছি সেই থেকে লজ্জায় মরে আছি।

কল্যাণী এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললে—তার শাস্তি স্বরূপ আপনার মেয়েটাকে আমরা 'মায়ে পোয়ে' বাজেয়াপ্ত করে নেব।

নিখিলের সঙ্গে মিশে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে কল্যাণী। ঠাট্টা তামাসাও শিখেছে। ছেলেবেলা থেকে ভাগ্যের মার খেয়ে খেয়ে যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল ওর মনটা, তরুণ বয়সেই এসে যাচ্ছিল মানসিক জরা। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে আবার।

হাত ধরে বসিয়ে তরুবালা বলেন—মণি তো তোমাদেরই ভাই, ওকে জোর করে আমি আটকে রাখলে কি হবে—ওর মন পড়ে আছে তোমাদেরই কাছে।

মল্লিনাথ ছুটে গিয়ে বলে—এই দিদি, ছুট্টে নীচে যা, দেখগে কে এসেছে। ছুট্টে—ছুট্টে—শিগগির—

মণি হতভম্ব হয়ে হাতের সেলাইয়ের কাজটা হাতে করেই ছুটে নেমে এসে স্তম্ভিত। না পারে দাঁড়াতে, না পারে ফিরে যেতে।......আর দোতলার বারান্দা থেকে দুষ্টু মল্লির হুইস্লের মত তীক্ষ্ণ স্বর বেজে ওঠে—মা দেখছো দেখছো—দিদিটা কি বেহায়া হয়েছে? বললাম—তোর বর আর শাশুড়ী এসেছে—ছুটে দেখতে গেল।

বিভূতি বাবুর তীর্থ ভ্রমণটা প্রায় অজ্ঞাতবাসের মতই হয়ে উঠেছিল। কোথায় কদিন থাকেন তার স্থিরতা ছিল না বলে ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই নিখিলও পারেনি চিঠি পত্র দিতে। মাঝে একবার নৃপেন বাবুর কাছে খবর এসেছিল—'হরিদ্বারে আছি, কদিন থাকবো ঠিক নেই। আশ্রমের কিছু অভাব অভিযোগ থাকলে নিখিলকে জানাবেন—আর অর্থের প্রয়োজন হলে 'কাছারীবাড়ীতে' কারণ জানিয়ে লোক পাঠাবেন। এ বিষয়ে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে নায়েব হরিশঙ্কর আইচকে।' এই সব।

এইটুকু মাঝখানের খবর।

ছ'মাস পরে—শৈলবালা পেলেন দীর্ঘ চিঠি।......লিখেছেন—"শৈল মাসী, ভেবেছিলাম তীর্থ ভ্রমণের ছুতোয় মনটাকে আবার গড়ে নেব। ভাঙা গড়া যখন সারা জগতের লীলা, তখন মানুষের মনই বা একবার ভাঙলে আবার গড়ে উঠতে পারবেনা কেন? দেখছি—পাকা বনেদ গড়বার মাল মশলা আলাদা। বিশ বছর ধরে নিজেকে শুধু প্রবঞ্চনা করে এসেছি—অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি বলেই

ধরা পড়েনি কোথায় লুকোনো ছিল এত ফাঁকী এত দুর্ব্বলতা। আজ দেখছি—সারাজীবন শুধু ছেলেখেলা করে এলাম। তীর্থের পথে পথে, দেব-মন্দিরের দরজায় দরজায় আকাশ কুসুমের ছায়া দেখে চমকে উঠি—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে বলতো? ছ'মাস ধরে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে শুধু এইটুকু উন্নতি করলাম শৈলমাসি, মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছি। শিখেছি—জীবনকে সহজ ভাবে মেনে নেওয়াই মানুষের বড় কল্যাণ। লজ্জার বিকৃতিটাই বড় কথা নয়। হারিয়ে যাওয়া কল্যাণীকে যদি খুঁজে নাও পাই, খুঁজে বেড়াতে লজ্জা পাবোনা আর। নিখিল কি কোনো সন্ধানই পায়নি তার? শিগগির ফিরছি। কলকাতায় নাববো নিখিলের বাসায়, তারপর যাবো তোমাদের কাছে।…"

নিখিলের বাড়ীর সেই দোতলার বারান্দায় বসে কল্যাণী বঁটি পেতে ফল ছাড়াচ্ছিল—নিখিলের কে এক বিশিষ্ট বন্ধু আসবেন বিদেশ থেকে—তারই আয়োজন চলছে সারাদিন।

নানা কাজে ব্যস্ত নিখিল—এতক্ষণে এসে বসেছে। একটা রেকাবীতে কিছু ফল মিষ্টি সাজিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে কল্যাণী হেসে বললে—তোমার অতিথিসৎ-কারের বহরটা ভালো। এই 'রেটে' সংসার করলে তোমাদের 'পেল্লায়' জমিদারীটা ছোট করে আনতে বেগ পাবেনা। ভেবে ভেবে রোগাই হয়ে গেলে দেখছি কাল থেকে।

ঠাণ্ডা জলটা আগেই একটু খেয়ে নিয়ে জলের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নিখিল আরামে 'আঃ' করে ফলের রেকাবীটা টেনে নিয়ে বসলো—কথা বললে না।

—কি গো বাবাঠাকুর, উত্তুর নেই কেন?

—রোসো আগে পেট ঠাণ্ডা করি।…হ্যাঁ প্রশ্নটা কি, যে উত্তুর দেব?

—প্রশ্ন কিছুই নয়, তোমার সেই বিশিষ্ট বন্ধুটীর চারখানা হাত আর দুখানা ডানা আছে কিনা তাই জিগ্যেস করছি। নরলোকের বন্ধু হ'লে লোকে তার আবির্ভাবের আশায় এত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেনা। বোধ করি দেবলোকের?

নিখিল হেসে উঠে বলে—মা জননী যে আজকাল রীতিমত মানুষ হয়ে উঠছো দেখছি—উঃ আমিই মাঝে মাঝে কথায় হেরে যাই। আগে কিন্তু বড্ড 'হাঁড়িমুখী' ছিলে বাপু।

—কথা কি আর অমনি শিখেছি—তোমার জ্বালায়। এর পর আবার তর্কচুড়ামণির পাল্লায় পড়তে হবে। সে এক অদ্ভুত মেয়ে, আছে তো আছে এক এক সময় এমন চুপ যেন বোবা মেয়ে, আবার কথা ধরলে রক্ষে থাকবেনা। কত কথা কত প্রশ্ন। বকিয়ে বকিয়ে পাগল করে দেয়।

—ঠিক করে। তোমার মতো এতো ঠাণ্ডা মাথাদের তাই শাস্তি। কী আশ্চর্য্য ভাবো দিকিন যে আমাকে চিনেও পরিচয় লুকিয়ে রাখলে? উঃ। আমি তো ভাবতেই পারিনে।

—আর ভাবতে হবে না। এখন ভাবো দিকিন সুরেশ বাবু বিয়ের তারিখ করতে রাজী হচ্ছেন না কেন? পাজী কি আজকাল বিয়ে বয়কট্ করেছে নাকি? ভেবেছিলাম সব ঠিক করে একবার শৈলমাসীকে প্রণাম করে আসবো। তারপর—যাঁর দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে আমার বিদায়।

—বটে? ওই তালেই আছো বুঝি? দায়িত্ব তোমায়ই এই বলে রাখলাম। বাবাকে আমরা নেমন্তন্ন করে আনছি।

—তার মানে? কোথায়? কোথায় আনছো?

—কোথায় আবার? এখানেই। রীতিমত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলে যে দেখছি? তুমি কি আশা করছিলে বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করেছেন? তা' ভাববে বৈ কি, 'সুরুচি' জননী কিনা! ও আশা ছাড়ো মা লক্ষ্মী, এ ধ্রুব পুত্তুরটীকে তিনি ত্যাগ করতে রাজী হবেন না।

—আহা, আমি যেন তাই বলছি—কল্যাণী বড় বেশী মিইয়ে পড়ে—কিন্তু আসার আগে আমায় পাঠিয়ে দিও লক্ষ্মীটী।

—কোথায়? তোমার সেই কন্ঠিধারী দাদাটীর কাছে?

—তা' ছাড়া আর কোথায়?

—কেন আমার বাবা কি পুলিশের দারোগা? আর তুমি দাগী আসামী? আসবেন শুনে হাত পা এলিয়ে এল?

—আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝবে না নিখিল। দিব্যি করো আমার কাছে, তাঁর আসার সম্ভাবনা দেখলেই আমায় পাঠিয়ে দেবে।

কল্যাণীর ব্যাকুল স্বর নিখিলের সহজ পরিহাসপ্রবণ চিত্তে আঘাত দিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর করে তোলে। ধীর স্বরে বলে—

—আচ্ছা, তোমরা—মেয়েরা—এত ভীরু এত অক্ষম কেন বলতো? তোমার প্রাপ্য তুমি যদি সহজে না পাও, আদায় করে নেবার চেষ্টা না করে ফেলে ছড়িয়ে সরে দাঁড়াও কোন হিসেবে?

—আমার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি নিখিল।

—কিন্তু আমি যদি স্বীকার না করি? বৌ ছেলে নিয়ে সংসার করার সাধ তোমার হতে পারে—আমার বুঝি মেয়ে জামাই নিয়ে সংসার করার সাধ হয় না?

কল্যাণী কি উত্তর দেবে? এতবড় স্নেহকে অবহেলা করবে এত বড়লোক তো সে নয়? স্নেহের সঞ্চয় কতটুকু আছে তার জীবনে? তবু—এ যে জীবন মরণের সমস্যা। কল্যাণীর জীবনেই বা বারবার এত সমস্যা দেখা দেয় কেন?

বড় বড় চোখের কোল বেয়ে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে হাতের কাছে বঁটিটার ওপর।

—হয়েছে সয়ো, বঁটি ছাড়ো—শেষে হাত কেটে দুখানা করবে? মেয়েরা যে কেন এত ছিঁচকাঁদুনে হয় তাই ভাবি। ওঠ বাছা ওঠ। যেন ফাঁসির হুকুম হয়েছে ওনার।···থাকগে ষ্টেশনে ফোন্ করে দিই—বাবা যেন এখানে এসে না ওঠেন। কিন্তু তারই কি সময় আছে? ত্রৈলোক্য গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গেছে—গেতো দুঘণ্টা।

—ষ্টেশনে?—শুধু এইটুকু প্রশ্ন করতে পারে কল্যাণী।

—ষ্টেশনে নয় তো কি? হাওড়া ষ্টেশনে গেলো না ত্রৈলোক্য?

—তবে যে বললে তোমার বন্ধু আসবেন।

—ভুল বলেছি? বাবা কি বন্ধু নয়? দ্বিতীয়ভাগ পড়োনি বুঝি—"মাতা পিতাই সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধু—"।

—তা'হলে তাঁকেই আনতে গাড়ী গেছে? এখুনি এসে পড়বেন?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কতবার বলবো? বাংলা ভাষা ভুলে যাচ্ছো নাকি?

—নিখিল দোহাই তোমার, আমায় ক্ষমা করো।

নিখিল এবার সত্যিই গম্ভীর হয়ে যায়। কাছে সরে এসে ছোট মেয়ের মত কল্যাণীর মাথায় হাত রেখে আস্তে বলে—অত ভয় পাচ্ছো কেন? দেখো, দেখা হলেই সব সহজ হয়ে যাবে। শুধু একটু চক্ষুলজ্জা, শুধু একটু অভিমান, এর জন্যে এতবড় জীবনটা মাটি করবে কেন? এতই সস্তা জিনিস এটা? এতটুকু যদি জোর নেই, অতবড় মানুষটাকে ভালোবাসতে সাহস হ'ল কি করে? তা যদি পেয়েছো, তবে নিজের দাবী নিয়ে এগিয়ে যাও। বিভূতি লাহিড়ীর স্ত্রী বলে সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পাও—নিখিলের মা বলে দাঁড়িও। দেখবে কোথাও আটকাবেনা।—বলেই হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে হেসে উঠে বলে—তখন হয়তো ছেলের বৌয়ের গয়না পছন্দ হলনা বলে, নয়তো বিয়েতে রসুনচৌকী বাজলোনা বলে, কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে লেগে যাবে আমার ভালমানুষ বাবাটির সঙ্গে।

কয়েক ফোঁটা অশ্রুতে আর কুলোয় না। রুদ্ধ বন্যার বেগ কূল ছাপিয়ে ওঠে।···নগণ্য কল্যাণী। তাকে এত মর্য্যাদা কেন দিতে এল নিখিল? এই বিরাট স্নেহের দাবী ষোলো আনা মেটাবার সাধ্য কি কল্যাণীর আছে? এই দুরূহ সৌভাগ্য বইতে পারবে তো?

বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

—ওই এলেন বাবা—

গমনোন্মুখ নিখিল ঘুরে দাঁড়িয়ে কল্যাণীকে উদ্দেশ করে বলে—দেখো বাছা আবার যেন পালিও না—বলে ছুটে নীচে নেমে যায়।

পালিয়ে যাবার পথ থাকলে নিখিলের কথা মানতো কি কল্যাণী? কিন্তু এটা শালবনীর বাগানবাড়ী নয়—কলকাতার সহরের চারখানা দেয়াল ঘেরা ইঁটের খাঁচার ওই একটা মাত্র পথ, যে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছেন নিখিল আর বিভূতি বাবু।

পৃথিবী দ্বিধা হ'ল না—কল্যাণী মন্ত্রবলে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল না—অসম্ভব একটা, ভয়ঙ্কর একটা, কিছু ঘটবার পূর্ব্বেই বিভূতি বাবু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন উপরতলাটা অবাধ শূন্য ভেবেই। ত্রৈলোক্যকে নিষেধ করা ছিল কল্যাণীর উপস্থিতি জানাতে। আর নিখিল? বাবাকে প্রণাম করেই হঠাৎ তার বাইরে যাবার বিশেষ একটা প্রয়োজন পড়ে গেল।···একটু অবাক হলেন বিভূতি বাবু, কি আর করবেন। একাই উঠে আসলেন নীচে থেকে, উঠেই সিঁড়ির সামনে ফলের ঝুড়ি আর বঁটির সামনে নতমুখী স্ত্রীলোকটীকে দেখে দু' পা পিছিয়ে গেলেন। নিখিলের একক বাসায় স্ত্রীলোক! কেন?···দাসী? বেশের পরিচ্ছন্নতা তো সে কথা বলছে না? কে এ? কে?

এগুলেন আর এক পা।

ঠিক সেই সময়ে সমস্ত সঙ্কোচ ঠেলে ফেলে দিয়ে কল্যাণী উঠে দাঁড়ালো।

—কল্যাণী?

—হ্যাঁ আমিই। অবাক হচ্ছ?

—কল্যাণী!

আগুনের মত উজ্জ্বল উত্তপ্ত দৃঢ় মুষ্টির ভিতর একখানি নরম শ্যামল করপল্লব আশ্রয় পেলো। হিমশীতল ক'টি আঙুলের ডগা উত্তেজনায় থর থর।···কাটলো কয়েকটী মুহূর্ত্ত।···

—প্রণাম করা হয়নি তোমায়—

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করে মুখ তুলে চাইলে কল্যাণী কাঁচের মত স্বচ্ছ বড় বড় দুটি চোখ মেলে।

—কল্যাণী! আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে তুমি?

—অপেক্ষা কোথায় করলাম? তুমি আসবার আগেই তো তোমার ঘর সংসার ছেলে সব দখল করে বসে আছি। ভারী বেহায়া না?

বলিষ্ঠ দুই বাহুর মধ্যে আশ্রয় পেলো শুধু একখানি হাত নয়—সমস্ত মানুষটা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ খুব বেহায়া হয়েছো—খুব দুষ্টু হয়েছো। অনেক শাস্তি পাওনা আছে তোমার। এতদিন এত কষ্ট দেওয়ার শাস্তি।

—আমায় মাপ করো।

—তোমায় মাপ করবো এতো বড়ো ধৃষ্টতা নেই কল্যাণী। এতোদিন ধরে শুধু নিজেকে মাপছিলাম। মেপে দেখছিলাম নিজের বোকামী, নিজের অহঙ্কার।

আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কল্যাণী মুখ তুলে বলে—আমি কিন্তু তোমার অপেক্ষা না করেই নিখিলের বিয়ের ঠিক করেছি। রাগ করবে না তো?

—করবোই তো। আমার ছেলেটাকে বেদখল করে নিয়েছো।

—ঠাট্টা করছো? দেখো, ও তোমার চাইতে আমাকে বেশী ভালবাসে কিনা।

—কল্যাণী।

—কি?

—চলো নিখিলের বিয়ে দিয়ে আমরা একবার যাই আমাদের বাসর ঘরে।

অস্ফুট একটা স্বর—কোথায়?

—শালবনীর কাছারীবাড়ীতে। যেখানে তোমায় হারিয়ে ফেলেছিলাম আবার সেইখানেই খুঁজে নেবো তোমাকে।

সূর্য্যমুখী ফুলের মত ঊর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে সেই দুটী কালো চোখ—কাঁচের মত উজ্জ্বল নয়, অভিমানের বাষ্পে আচ্ছন্ন।

—তুমি তো আমাকে খোঁজনি?

—খুঁজেছি কল্যাণী খুঁজেছি! প্রতিটি মুহূর্ত্তে তোমাকে খুঁজেছি ভিতরে বাইরে।······

কাটলো কয়েকটা মুহূর্ত্ত!

এই অনির্ব্বচনীয় মুহূর্ত্ত কটা স্থির হয়ে থাকতে পারেনা অনন্ত কালের গায়ে?

নীচে নিখিলের সাড়া পাওয়া গেলো। উচ্চ কণ্ঠ।

—ত্রৈলোক্য, ত্রৈলোক্য, বাবা ওপরে গেছেন নাকি?

ত্রৈলোক্যর সাড়া পাওয়া যায় না···নিজেই সে সিঁড়িতে উঠে আসে সশব্দ পদক্ষেপে।···'ত্রৈলোক্য'টা ছল, সাড়াটাই উদ্দেশ্য।

কে জানে সৃষ্টিছাড়া কল্যাণী এখন পালাবার পথ না পেয়ে কাঁদতে বসেছে কিনা।

বলাকা দেবীকে আবার একবার দেখা গেলো নিখিলের বিবাহ-উৎসবে।

বিশেষ করে এই নিমন্ত্রণে আসার জন্যে নতুন কেনা গাঢ় সবুজ শিফন্ শাড়ী আর সোনালি রেশমী ব্লাউজে সেজে, কাঁচের টুকরো বসানো অদ্ভুত রঙচঙা 'বটুয়া'-আকৃতি ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে করে খুটখুট করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সকৌতুহল দৃষ্টির ওপর চেষ্টাকৃত তাচ্ছীল্যের প্রলেপ লাগিয়ে।

ঘুরবেন না তো বসবেনই বা কোথায়? হলঘরের মেজের বিছোনো বিরাট ফরাসটার এককোণে বোকার মতো পা মুড়ে? তাও কাদের সঙ্গে? না এক গাদা নেহাৎ বাজেমার্কা মেয়েদের সঙ্গে? সাজসজ্জা দেখলে হাসিচাপা দায় হয়। অথচ রাশি রাশি সোনা আছে গায়ে চাপানো। পয়সা খরচ করে এতো কুশ্রীও হতে পারে লোকে।

গাড়ী থেকে নামতে না নামতে তাঁকে একেবারে ঠেলে ঠেলে তুলে দিয়ে গেলো অন্তঃপুরের এলাকায়, যেন বলাকা দেবীও নিখিলের মেদিনীপুরী মাসী পিসীর মতো পর্দ্দানসীনা!

এদিকে খরচ তো করেছে বিস্তর, দেখে দেখে গা জ্বালা করছে যেন। যাদের রুচিপ্রবৃত্তি এতো গ্রাম্য, তাদের যে ঈশ্বর কেন এতো পয়সা দেন! "বেণা বনে মুক্তো ছড়ানো" আর কি!

বলাকা দেবীর এ রকম অনুসন্ধিৎসু ভাব দেখেই বোধ করি একটী বর্ষীয়সী মহিলা এগিয়ে এসে বলেন—কাকে খুঁজছো মা?

সম্বোধনের ভাষা এবং ধরণ শুনে বলাকা দেবী চটে না উঠে মুচকি হাসেন। সত্যি, চটবেনই বা কি? এরা কি রাগেরও যোগ্য?

কাজেই মুচকি হেসে বলেন—নিখিল কোথায় বলতে পারেন? নিখিল—মানে—যার বিয়ে।

—ওমা তা আর জানিনা, কার বিয়ে? নিখিল আমার নাতি হয় যে। বিভূতি আমার আপন ভাসুর-পো। তা' সে কোথায় বাইরে বাইরে আছে। কত লোকজন আসছে, তা'দের মান্যিমান্ত করা—একা বিভূতি কদিক সামলাবে?

—আহা বেচারা বর!—বলাকা দেবী যেন বিগলিত হয়ে ওঠেন তার দুঃখে—আজকের দিনেও তার ডিউটি! কিন্তু ওই যে কি একটা বললেন?···'মান্যিমান্ত'! অদ্ভুত ভাষা বটে, বাঙলা নাকি ঈশ্বর জানেন। তা' ওই 'মান্যিমান্ত'টা বুঝি কেবল বাইরের জন্যে? বেচারি ভদ্র মহিলাদের ভাগে কিছুই পড়বে না?

বর্ষীয়সী মহিলাটী আর যাই হোন বোকা নন, প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝতে দেরী হয় না তাঁর। অমায়িক হাস্যে বলেন—ওমা সে কি কথা? 'নিমন্ত্রিং' সবাই সমান আদরের! কতো ভাগ্যে মানুষের পায়ের ধুলো পড়ে বাড়ীতে। তা'

এদিকে আমরা সবাই রয়েছি দেখাশোনার জন্যে। তা'ছাড়া —নতুন বৌমা চরকিপাক ঘুরে বেড়াচ্ছে .কাথায়, কে কি পেলো, না পেলো, কে কি চাইছে না চাইছে, এই 'রাজসূয়যগ্যি' তার মাথায়। ধন্য সাধ্যি!

বলাকা দেবী অবাক বিস্ময়ে বলেন—নতুন কণে এতো সব করছে? আশ্চর্য্য! তা' সে তো শুনেছিলাম খুব বাচ্চা!

ভদ্রমহিলা এবার বলাকা দেবীর অজ্ঞতায় একগাল হেসে ফেলেন—আ আমার কপাল! তুমি বুঝি কাউকে চেনোনা? তা' কি সুবাদে এসেছো তুমি? আগে কখনো দেখিনি তো?

অপমানাহত রক্তমুখে বলাকাদেবী উত্তর দেন—বিনা সুবাদে যেচে সেধে আসিনি আমি, নিখিল নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছে। যাক্ যথেষ্ট হয়েছে। সরুন দয়া করে, যেতে দিন আমাকে।

বিভূতিবাবুর খুড়িটী একটু বেশী বাক্যবাগীশ বটে, কিন্তু হঠাৎ যে এহেন অবস্থায় পড়তে হবে, কথা বলার সময়ে তেমন খেয়াল করেননি। ক্রুদ্ধ বলাকাদেবীর আরক্ত মুখ দেখে ভয়ে লজ্জায় অপ্রতিভের একশেষ হয়ে বলেন—ওমা সে কি কথা, ছি ছি যেতে দেবো কি? আমরা বাছা পাড়া-গেঁয়ে মানুষ, কি বলতে কি বলি বুঝিও না। তা কিছু মনে কোরোনা মা। বলছিলাম—নতুন বৌমা বলছি আমাদের বিভূতির এপক্ষেব বৌকে। আমাদের সন্নিসী ছেলেকে ঘরবাসী করেছে, এমন গুণের মেয়ে হয় না।···ওই যে···অ নতুন বৌমা, ইদিকে এসো তো মা। এই দেখো—ইনি নিখিলকে খুঁজছিলেন—

টুকটুকে লালপাড় দুধে গরদশাড়ী পরা লম্বা ছিপ্ ছিপে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বৌটি কাছে এসে দুই হাত তুলে নমস্কার করে শান্তহাস্যে বলে—আমি বোধ হয় মিসেস চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে যান বলাকাদেবী। এই কল্যাণী! বহুবার বহুভাবে কল্পনা করেছেন, কিন্তু ঠিক এরকমটী তো কখনো করেননি! নিজেকে হঠাৎ কেন ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে, বয়সে ছোট একটা কালো মেয়ের সামনে? ···সামলে নিয়ে বলেন—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য কে জানে। আপনিই বোধকরি সেই বিখ্যাত কল্যাণীদেবী?

—বিখ্যাত?···মৃদু একটু হাসির আভা খেলে যায় কল্যাণীর মুখে।—তা বলতে পারেন। যে কোনো উপায়ে বিখ্যাত হওয়া নিয়ে কথা। তাছাড়া—আমার বুদ্ধিমান ছেলেটীর জালায় বিখ্যাত না হয়ে উপায় আছে? কিন্তু চলুন, বসবেন চলুন?

অকারণ একটা ঈর্ষার জালায় জর্জ্জরিত হতে থাকেন বলাকাদেবী। কিন্তু কেন? কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর ঈর্ষার সম্পর্ক কি? উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মেয়েটা এই বিরাট ঐশ্চর্য্যের মালিক হযে বসেছে ভেবেই কি? না বিভূতিবাবুর পাশে তা'কে যতোটা বেমান'ন কল্পনা করে রেখেছিলেন, কিছুতেই ততোটা বেমানান মনে করা যাচ্ছেনা বলে?

—নাঃ বসবোনা, আমাকে এখুনি ফিরতে হবে, আর একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে—বলে একটী অর্দ্ধ নমস্কার গোছ করে বাইরের দিকে এগিয়ে যান বলাকাদেবী জুতোর খুটখুট আওয়াজ তুলে।

আর কোনো প্রকারেই নিজের চলে যাওয়াটাকে 'শো' করে তুলতে না পেরে যখন হতাশচিত্তে—ভীড়ের সংস্রব বাঁচিয়ে, অথচ ভীড়ের মধ্যে লক্ষ্য বস্তু হয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একগ্লাস ঘোলের সরবৎ খাচ্ছেন, তখন চোখোচোখি-হয়ে যায় মিহির ডাক্তারের সঙ্গে।

ধূলিসাৎ হলো বৈরাগ্য।

মুছে গেলো অকারণ অপমানের সূক্ষ্মদাহ।

ছুটে এলেন কিশোরীর চপল ভঙ্গীতে।—ওঃ মার্ভেলাস! আপনি? ঈশ্বর এখনো আছেন তা'হলে? উঃ মারা যাচ্ছিলাম একেবারে! গৃহকর্ত্তারা যে কোথায় উধাও হয়ে গেছেন তা' জানিনা, যতো সব সেকেলে কাণ্ডর মধ্যে গিয়ে পড়ে—হার্টফেল কচ্ছিলাম প্রায়। আপনাকে আমার জীবন-দাতা বলতে পারা যায়। চলুন চলুন, কোথাও বসা যাক একটু। এসে অবধি কি যে অবস্থা!

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তাটা ছেড়ে সাইকেল রিকশখানা 'সেবাশ্রমে'র সুরকি ফেলা লাল রাস্তায় পড়তেই প্রায় চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লেন ডাক্তার।

—কি রে তোরা এখানে কেন? অমূল্য, হরিহর, অনুকূল, পঞ্চুর মা, নিতাইচাঁদ সদলবলে এখানে বসে জটলা করছিস যে? ব্যাপার কি?

—আঁগ্যে ডাকৃতার বাবু আপনি আসবেন বলে বটে।

পায়ের ধুলো নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, যেন দেবদর্শন-প্রত্যাশী যাত্রীর দল দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে মন্দিরের দরজা খোলা পেয়েছে।

—হয়েছে হয়েছে বাবা, রোস জুতো দুটো খুলে দিই—একমণ ধুলো পাবি, যত ইচ্ছে মাথায় মাখ।···তা'পর আছিস কেমন?

কোলাহলের মাঝখানে গোটা কয়েক কথা শোনা যায়—"আছি আর কই ডাকৃতার বাবু, মরে আছি—আপুনি ছিলে না, কী দুগ্ গতি গেছে আমাদের—"

—বটে বটে। তা' গোটাকতক কোন্ পটল তুললি? আমি কত আশা করে আসছি—আমার খাটুনী কিছু কমিয়ে রেখেছিস! হরি বল। ব্যাটাদের কাঠ বেড়ালীর প্রাণ,

মরবার নাম নেই। আমার কাজ বাড়াতে সব কটা টিকে আছিস এখনো?

আকর্ণ দন্তবিকাশ করে অনুকুল বলে—টিঁকে আছি মাস্তর।

—এইবার মরবি কেমন? বেরো বেরো চক্ষুশূলগুলো! এতদিন পরে এলাম—কোথায় একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচবো, তা' না আগে থেকে ওৎ পেতে বসে আছে। বল ব্যাটা বল তোদের রোগের ফিরিস্তি। কে "মরে যাচ্ছিলি", কার "পেরাণটা বেইরে যাচ্ছিলো", কার "দেহের মধ্যে জীবনটা আর থাকছিল না"—বল্, সব শুনে আমার পেরাণটা শীতল করি।

—আমরা চিকিচ্ছে করাতে আসিনি আঁগ্যে। আপনারে দেখবার লেগে এইছি বটে।

—'বটে'? এবার থেকে তোরাই আমাকে দেখবি তা'হলে? বেশ বেশ, খুব লায়েক হয়েছিস যে? কিন্তু নিতাইচাঁদ, পীলেটা যে তোর পেটের চামড়ার মধ্যে আর থাকতে রাজী হচ্ছেনা দেখছি। করে তুলেছিস কি বাপ?

—আপুনি চলে গেলেন আঁগ্যে, আমরাও গেলাম। বলবো সব—হাতে মুখে জল দিন আঁগ্যে।

—উঁহু, রিপোর্ট না নিয়ে জলগ্রহণ করছি না। কলকাতা থেকে মোক্ষম ওষুধ নিয়ে এসেছি—বোতল বোতল বুঝলি? একটা একটা ফোঁটা—ব্যস। পীলে লিভার নাড়ি ভুঁড়ি সব সুদ্ধু লোপাট একেবারে!...অনুকুল তোর চোখ দুটো অমন ড্যাব্‌ড্যাব্ করছে কেনরে? জ্বর এসেছে বুঝি? দেখি হাতটা?

লাল ধুলোর রাস্তায় একখানা ভাঙা ইটের উপর উবু হয়ে বসে পড়েন ডাক্তার—প্লীহাগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক'টী মানব-সন্তানের মাঝখানে।...এই পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে বসে পড়ে চারিদিক তাকিয়ে যেন অবাক লাগে।...এদের ত্যাগ করে এতদিন ছিলেন কোথায়?

দুর্নিবার

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

দুর্নিবার

—:০:—

ক'দিনের খররৌদ্রের পর আকাশ কালো করে এলো মেঘ···নামলো বৃষ্টি।

মুষলধারে বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক ধরে চললো দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির মাতামাতি। ঘণ্টাখানেক, তবু কলকাতার লোক জানে এ বৃষ্টির পরিণাম কি! জল দাঁড়াবে—অলিতে গলিতে আর বড় রাস্তায় সর্ব্বত্র। কোথাও ইঞ্চিকয়েক, কোথাও এক হাঁটু, কোথাও বা বুকভোর। হয়তো বা কোনোখানে চৌমাথার মোড়টা চকচকে পীচ ঢালা পিঠটা নিয়ে জেগে থাকবে—মহাসমুদ্রের বুকে কচ্ছপের মতো।

জল! জল!

সারা সহরের আবর্জ্জনা-গোলা ঘোলা জল।

নীচু বনেদের বাড়ীর উঠান ছাপিয়ে সেই জল ঢুকবে গৃহস্থের রান্নাঘরে। এক হয়ে যাবে ভাতের হাঁড়ি আর ডাষ্টবীন। এক হয়ে যাবে সারা সহর।

জল নারায়ণ, তাই রক্ষা।

রুদ্র আকাশের অগ্নিবর্ষণের ওপর প্রথম যখন মেঘের ছায়া নামলো—জুড়িয়ে এলো সারা শরীর আর মন, কিন্তু কতোক্ষণের স্বস্তি? এলোমেলো বৃষ্টির ছাটের পথ বন্ধ করতে —বন্ধ করতে হ'ল জানলা দরজা।

আর অন্ধকার হয়ে উঠলো ঘর, গুমোট হয়ে উঠলো ঘরের হাওয়া।

কোথায় যেন একটা করোগেটেড্ ছাদের ওপর পড়ছে সেই মুষলের ধার। প্রচণ্ড শব্দের তাড়নায় 'ভয় ভয়' করছে। অসহায়ের মতো মাঝে মাঝে জানলার খড়খড়িটা উঁচু করে বাইরের জগৎটা এক একবার দেখে নিচ্ছিল মাধবী।

জল ক্রমশঃই বাড়ছে, ফুটপাথ ছাপিয়ে গোটা দুই সিঁড়ি ডুবিয়ে রোয়াকের ওপরটা 'ছুঁই ছুঁই' করছে—হয়তো আরো বাড়বে। কতোক্ষণ থাকবে এ বৃষ্টি কে জানে? পূরবী এখনো বাড়ী আসেনি।

কলেজ থেকে সোজাসুজি যদি বাড়ী ফিরতো, বৃষ্টির আগে এসে পৌঁছতে পারতো সন্দেহ নেই, কিন্তু শনিবারে কিছুতে যদি সোজা বাড়ী আসবে মেয়ে! · কিসের যে ওদের সভা আর সমিতি, কাজ আর অকাজ, ওরাই জানে। মাধবী বকলে হেসে উড়িয়ে দেয়, দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে—'রাগ করলে তোমাকে কী ফর্সা দেখায় দিদি।'

আচ্ছা কে রাগ করে থাকতে পারবে সে মেয়ের ওপর?

অথচ বাপের কাছে পূরবীর এই যথেচ্ছ গতিবিধির খবর লুকোবার চেষ্টার কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় মাধবীকে? মিথ্যা কথা তো এখন জিভে আটকায়ইনা।···পঙ্গুরোগগ্রস্ত নিরুপায় মানুষ। তাঁর কাছে এমন অনায়াসে মিথ্যা কথাগুলো বলতে প্রথম প্রথম সত্যিই ভারী কষ্ট হ'তো মাধবীর, কিন্তু উপায়টাই বা কি! আকস্মিক রোগের আক্রমণে সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে—ক্রোধটা যে তাঁর সীমাহীন মাত্রাজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে। পূরবীর স্বেচ্ছাচারিতার খবর জানতে পারলে কী রক্ষা থাকবে?

উঃ এখনো যদি বাড়ী আসে মেয়ে! ভিজে আমসত্ত্ব হয়ে হোক, জল সাঁতরে হোক, পূরবী এলেই এখন বাঁচে। এ সময় বাবার কাছে গিয়ে বসা উচিৎ ছিল নিশ্চয়, কিন্তু সাহস করে যেতে পারছে না মাধবী, মনের অস্থিরতা ধরা পড়ে যাবে—ধরা পড়ে যাবে পূরবীর অনুপস্থিতি।

—দিদিমণি, বাবু ডাকছে।

ভিতরের দালান দিয়ে ঘুরে দরজায় এসে উঁকি মারলো বিমলা।

—বাবা? বাবা জেগে আছেন?

প্রশ্নটা অবশ্য অর্থহীন, বিকেল পাঁচটার সময় ঘুমোবেন ব্রজবাবু, এ-রকম সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই।

বিমলা হেসে উঠলো, বললে—দিদিমণির এক কথা—ঘুম কি বাবুর চক্ষে আছে? রুগী মানুষ—একবার দেখলাম না খানিক ঘুমোচ্ছে! এই 'জল দে', এই 'বাতাস দে', এই 'জানলা খুলে দে', এই 'বন্ধ করে দে' দম ছুটিয়ে দেয় মানুষকে। বাবা!

মাধবী বিরক্তভাবে বলে—মানুষগুলো তা'হলে কি জন্যে আছে রে?

বিমলা অপ্রতিভভাবে বলে—তা' তো জানি, সেবার জন্যেই লোক রাখা—রুগী মানুষের অস্থিরপণার কথা বলছি।

এইতো ছোড়দিদিমণির কথা বলতে বারণ করে দিয়েছ? সেই অবধি চোদ্দবার শুধোচ্ছে। নাও, কি বলবে বলগে যাও।

মাধবী শঙ্কিতভাবে বলে—তুই কি বললি?

—বললাম—এসেছে ছুটোর সময়, মাথা ধরেছে, ঘুমোচ্ছে।

মাধবীরই শিক্ষা, তবু দাসীর মুখের এই স্পষ্ট মিথ্যাটা নিজের কানেই রূঢ় হয়ে বাজে। নিজের মনেই কুণ্ঠা আসে। তাই তাড়াতাড়ি বলে—নে সর, যাই, শুনিগে বাবা কি বলছেন।

—বলছেন ওই ছোড়দিদিমণির কথাই, 'সন্দ' হয়েছে কিছু। আর এও বলি দিদিমণি, তোমাদের কী সাহস! অতবড় মেয়েছেলে—এই একলা একলা হিল্লি দিল্লি করে বেড়াচ্ছে, শাসন নেই? আমার তো—যতক্ষণ না বাড়ী আসে ভয়ে বুক কাঁপে।

বুক কি মাধবীরই কাঁপে না?

তবু শাসন করতেই বা পারে কই?

অবলম্বনহীন মাধবীর অন্ধ স্নেহের সুযোগ নিতেই কি পুরবীর এই স্বেচ্ছাচার?···না না শাসন করা দরকার, এ চলবে না, এ চলতে পারে না।

কিন্তু বিমলার সামনে সে-ভাব প্রকাশ করাটা খেলোমি।

বিমলা অনেক দিনের লোক তাই এতো কথা কইবার সাহস তার, তবু দাসীমাত্র। ওর কাছে খেলো হবে কেন মাধবী? খেলো করবে কেন পুরবীকে? ধমকের সুরে বলে—ভয়টা কিসের? এতো বুক কাঁপাকাঁপিই বা কিসের? রাস্তায় কি বাঘ বসে আছে?

—বাঘ! হুঁঃ!—বিমলা মাধবীর অজ্ঞতাকে যেন টুকরো টুকরো করে দেয় বিজ্ঞ হাসির অস্ত্রে—বাঘ তো বরং ভালো জিনিস দিদিমণি, বড় জোর নয় প্রাণে মারবে, আর মানুষের খপ্পরে পড়লে?

মানুষের খর্পরে পড়লে যে কি হতে পারে—বোধকরি সেই অজ্ঞাত বিভীষিকাটা ভাবতে ভাবতেই অনিচ্ছার সঙ্গে তিনতলায় উঠে যায় মাধবী।

মেয়েকে দেখেই ব্রজমোহনের অভিমান উথলে উঠলো। সমস্ত দেহটাকে নিয়ে পাশ ফেরবার মতো ক্ষমতার অভাবে সুধু মুখটা ফিরিয়ে নিলেন।

মাধবী মৃদু হেসে বললে—বাবা ডাকছো?

—কেন ডাকবো কেন? আমার কা'কে কি দরকার?

ওদিক থেকেই জবাব দেন ব্রজমোহন।

—কি বলছিলে বল না?—শরীরটা এতো খারাপ লাগছিলো, গরমের পর হঠাৎ বৃষ্টি এসেছে আর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হরদমই এ ধরণের কথা বানিয়ে বলতে হয় মাধবীকে।

অভিমানের প্রাচীর ভেদ করে ঘুমন্ত স্নেহকে টেনে বার করবার এই এক সহজ কৌশল।

—শরীর খারাপ হবে না কেন—ব্রজমোহন দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নিলেন—শরীরকে অতো অযত্ন করলে আর—হুঁঃ। পর্শু তোমার জ্বর হয়েছিল না? আর আজ চান করেছ? অথচ এই বর্ষা!

বর্ষা কই বাবা? মাধবী হেসে উঠলো—এই তো বিষ্টি সুরু হ'ল। সকাল বেলা কী গরম! চান না করলে মারা যেতাম যে।

মেঘের মতো একরাশ চুলের মধ্যে আঙুলগুলো একবার চালিয়ে বোধকরি পরীক্ষা করে নেয় মাধবী, কতোটা ভিজে আছে এখনও।

আর ঠিক এই সময় বড়ো মেয়ের প্রসঙ্গ ভুলে ব্রজমোহন আচমকা প্রশ্ন করেন—রুবিকে দেখতে পাচ্ছি না যে? ফেরেনি এখনও?

তিনি অবশ্য যে রুবিকে খুব বেশী দেখতে পান তা নয়, বাপের কাছ ঘেঁসে সে কমই, রুগ্ন বাপকে সে দিদির দায়িত্ব হিসাবেই গণ্য করে। তবু কলেজ থেকে ফিরে কুশল প্রশ্ন করতে আসে একবার।

কিন্তু ক'দিন বা সে ন্যায্য সময়ে ফিরেছে আজকাল? অনিয়মের মাত্রা বেড়েই চলেছে দিন দিন।

—ফিরেছে তো!

নিজের মুখটা জানলার দিকে ফিরিয়ে উত্তরটা দিলে মাধবী।

—কি জানি। তিন ঘণ্টা এসেছেন মেয়ে অথচ বুড়ো রুগ্ন বাপকে দেখতে একবার আসবার সময় হ'ল না? ছি ছি। কলেজে পড়ে বিদ্যে করছেন!

—ওর যে বড্ডো মাথা ধরেছে বাবা। ছুটো সারিডন ট্যাবলেট্ খেয়ে শুয়ে পড়ে আছে।

—কি জানি। এখন যা তোমরা বোঝাবে তাই তো বুঝতে হবে আমাকে! তবে এই তোমায় বলে রাখছি মাধু, রুবির শিক্ষা দীক্ষা যা হচ্ছে তাতে পরে পস্তাতে হবে।

—না বাবা ওসব কিছু ভেবো না। বেজায় ছেলেমানুষ আছে এখনও, তাই—

—'ছেলেমানুষ'! বিরক্তিতে জ্বলে উঠলেন ব্রজমোহন—ছেলেমানুষ? ও বয়সে তোমার পাঁচ বছর বিয়ে হয়ে গেছে তা মনে আছে?

কথাটা বলেই হঠাৎ চুপ হয়ে যান ব্রজমোহন। নিতান্ত কম বয়সে বিয়ে দিয়ে কতোটা উপকার করেছেন মাধবীর, বোধ হয় সেইটাস্মরণ করেই চুপ করে যান।

—আমাদের কথা বাদ দাও বাবা, সেকেলে কাণ্ড যতো। ······রোসো তোমার ছানা আর চিনিটুকু নিয়ে আসি—বলে মাধবী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়।

নিষেধ করবার সুযোগ দেয় না।

নীচে যেন সে পূরবীর গলা পেয়েছে।

তাই এই ছানা চিনির ছুতো।

রোসো, আজ আর সে পূরবীকে কিছুতেই রেহাই দেবে না, উচিৎ মতো শিক্ষা দিয়ে দেবে। উচ্ছন্ন যেতে বসেছে মেয়ে, স্নেহের অজুহাতে চোখ বুজে সব সহ্য করে যাওয়া মানে ভালো করে গোল্লায় দেবার পথ।

বাড়ী ঢুকতে ঢুকতেই তিরস্কার করা দরকার।

অথচ এই জল ভেঙে এই প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে এলো কি অবস্থায় সে কথা মনে করেও উদ্বেগের সীমা নেই।···শুকনো তোয়ালে হাতে নিয়ে বকতে যাবে? না তার দুরবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করেই তীব্র তিরস্কার করবে?···

ভাবতে ভাবতেই নীচের তলায় নেমে এসেছে মাধবী, আর ঠিক তখুনি পূরবী আসছে খুসির জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হয়ে লাফাতে লাফাতে···

—দিদি গো দিদি! খুব বকবে তো? কিন্তু কিছু ভিজিনি আমি—

দিদিকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে উদ্যত হাত দুখানা বিরক্তিভরে সরিয়ে দিয়ে মাধবী তীক্ষ্ণস্বরে বললে—পূরবী!

—বাবা রে সত্যি রেগে গেছ যে—বললাম তো ভিজিনি, বাঃ।

অপ্রতিভ পূরবী কণ্ঠস্বরে অভিমানের খাদ মিশিয়ে নেয়।

কিন্তু মাধবী আজ কঠিন হ'বার জন্যে দৃঢ়সংকল্প, তাই তীক্ষ্ণস্বর বজায় রেখে বলে—

—ভেজনি বলে বাহাদুরী নেবার কথা হচ্ছে না, বিষ্টির আগে বাড়ী এলে না কেন? এতক্ষণ ছিলে কোথায়? যা খুসি করবার স্বাধীনতা তোমায় কে দিয়েছে?

ব্যস্, চোখ ছলছল করে আসে পূরবীর, দিদির কাছে এ-রকম তিরস্কার? তা'ও কিনা আজকেই? অন্যদিন হ'লে কেঁদে ভাসিয়ে দিত নিশ্চয়, কিন্তু আজ সেটা সম্ভব নয়, তাই মুখে হাসি টেনে এনে সপ্রতিভ হ'বার চেষ্টা করে বলে—বা রে তুমি কী ভীষণ বকছো? দেখছো সঙ্গে একজন ভদ্রলোক রয়েছেন, মান মর্য্যাদা আর রাখলে না দেখছি।

ভদ্রলোক!

মাধবী থতমত খেয়ে সিঁড়ির নীচের দিকে তাকাল।

গান্ধীটুপি আর খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরা লম্বা চৌড়া এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে!

কি সর্ব্বনাশ! এতক্ষণ বলতে হয় সে কথা, কী বিশ্রী চেঁচামেচিই করলো মাধবী! স্বভাব ছাড়া চীৎকার করেছে। কিন্তু পূরবীরই বা দোষ কি? বলবার সময় পেল কই বেচারা?

এবার অপ্রতিভ হবার পালা মাধবীর, কাজেই মুখে হাসি টেনে আনতে হয় তাকেও—বাঃ ভদ্রলোককে সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলে আসছিস যে? বকবো না তো কি? ঘরে বসাতে পারনি বোকা মেয়ে?

—বাবারে, তুমি যা বকতে সুরু করলে, আর একটু হ'লেই হার্টফেল করে বসতাম হয়তো।···ঘরে বসাবো কি, উনি তো বাড়ীতেই ঢুকতে চাইছিলেন না, নেহাৎ অনুরোধে পড়ে দয়া করে একবার পায়ের ধূলো—

—যা তা বলছেন যে—

সিঁড়ির নীচে অপেক্ষমান ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা কন। মানে 'ছেলেটি' না বলে যদি নেহাৎই 'ভদ্রলোক' বলতে হয়।

পূরবী চাপাহাসি মুখে বলে—

—দয়া ছাড়া আর কি? কম অনুরোধ করতে হয়েছে বলুন?···বুঝলে দিদি—ইনিই এঁর ষ্টিমলঞ্চে করে আমাকে এই দুস্তর সমুদ্র পার করে দিয়ে গেলেন।

—ষ্টীম লঞ্চ?

মাধবী অবাক হয়ে তাকায়।

—তা' একরকম ষ্টীমলঞ্চও বলতে পারেন, আজকের রাস্তায় গাড়ীর অবস্থা সেই রকমই।···কিন্তু আমি তাহ'লে যাই?

গান্ধীটুপীটা মাথা থেকে নামিয়ে লম্বা লম্বা চুলগুলো একবার রুমাল দিয়ে মুছে নেয় ছেলেটা, কিছুটা ভিজতে তাকে হয়েছে অবশ্যই।

মাধবী এতক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

নেমে এসে মৃদুহাসির সঙ্গে বলে—তাই কি হয়? বৃষ্টিটা ছাড়ুক—বসবেন চলুন।

অবশ্য পূরবীকে এতো সহজভাবে কথা কইতে দেখে সে একটু অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাসটা পরে জানলেও চলবে, ভদ্রতা রক্ষা আগে।

—না না। আমি—ইয়ে মানে কাজ রয়েছে আমার —আর বৃষ্টিতো থেমে এলো।

ছেলেটী ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

—দিদির হাতে পড়েছেন, অন্ততঃ চা না খেয়ে আপনার উদ্ধার নেই। মুচকে হেসে পূরবী দিদির কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

—বা রে চা আমি খাই-ই না মোটে।

—তবে কি খান? ঘোলের সরবৎ? বেশ তাও পেতে পারেন।

আঃ পুরবীর জালায় আর পারা যায় না। মাধবী অলক্ষ্যে ওকে একটা চিমটি কেটে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলে—আচ্ছা শুধুই বসলেন না হয় একটু? একটা বাড়ীর মধ্যে যখন এসে পড়েছেন তখন বৃষ্টিটা ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে ক্ষতি কি?

—বাঃ। দিদি তো আসল কথা কিছুই জানো না ছাই, উনি যে বৃষ্টিটা উপভোগ করতেই বেরিয়েছেন। কলকাতার লোকের পক্ষে যতটুকু এ্যাডভেঞ্চার সম্ভব…

—তুই থামতো ফাজিল-কেষ্ট!…

বোনকে ধমকে উঠে মাধবী বলে—সত্যিই কি একটু বসা চলে না? এভাবে চলে গেলে আমি কিন্তু ভারী দুঃখিত হবো।

—এই তো আপনি মুশকিলে ফেল্‌লেন দিদি,…আচ্ছা কথা দিচ্ছি আর একদিন আসবো।

টুপীটা আবার মাথায় তুলে নিয়ে দুইহাত জোড় করে নমস্কার করলে ছেলেটা। মাধবীকে - হয়তো পুরবীকেও।…

'দিদি!' 'দিদি!'

মাধবী প্রতি নমস্কার করবে কি না ভাবছে।…ভারী মিষ্টি ডাকটা কিন্তু।

পুরবী তাড়াতাড়ি নমস্কার করে বললে—কথা দিলেন—কিন্তু বাড়ী চিন্‌তে পারবেন তো?

চিনতে? একবার চিনে ভুলে যাবার মতো দুর্ব্বল স্মৃতি-শক্তি সকলের নাও হতে পারে।…

পরিষ্কার উজ্জ্বল চোখে বড় বেশী স্পষ্ট করে যেন তাকালো ছেলেটা।…

এক মুহূর্ত্তের জন্য।…

গাড়ীটা ছেড়ে দিল।…

দুই বোন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট খানেকের জন্য। কথা নেই কারো মুখেই।

অবশ্য মুখরা পুরবীই কথা কয়ে উঠলো আগে।—দেখলে তো? টীমলক্ষ বলা ঠিক হয় নি?

—তা তো বুঝলুম। কিন্তু ছেলেটি কে বল্ তো? নাম কি?

—আমি কি করে জানবো গো? ভদ্দর লোককে কখনও নাম জিজ্ঞেস করা যায়? না বলা যায়—মশাই আপনি কে?"

মাধবী অবাক হয়ে বলে—কেন তুই কি আগে চিনতিস না।

—মোটেই না। এই তো এখুনি চেনা হল! ক্লাব থেকে বেরিয়ে ট্রাম লাইনের কাছাকাছি এসেছি—আর ঝড়টা উঠলো। কি করি, বাধ্য হয়ে একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়াতে হল। ব্যস্ তার—পরে এই বিষ্টি! বাবারে বাবা, থামেই না থামেই না, একগাদা লোকের সঙ্গে গাদাগাদি করে গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে এতো বিশ্রী লাগছিলো। অথচ একখানা ট্যাক্সীর চিহ্নমাত্র নেই রাস্তায়। তবু ভালোর মধ্যে গোটা-তিনেক মেমও ছিল আমার পিছনে।…শেষকালে যখন রাস্তায় যতো ইচ্ছে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে হল কাঁদি।…সামনে দিয়ে এক আধখানা প্রাইভেট কার চলে গেল কাদা ছিটোতে ছিটোতে শাসিটার্সি এঁটে। খুব রাগ হচ্ছে ওদের ওপর…ওমা হঠাৎ দেখি এই গাড়ীখানা একবার সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো। মনে ভাবছি আর কিছু না, নিশ্চয় ওই মেমগুলো আমার নাকের সামনে দিয়ে 'ড্যাং ড্যাং' করে গাড়ীতে গিয়ে উঠবে—ওমা ঠিক উল্টো…ভদ্রলোক ফট্ করে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে সোজা আমার সামনে এসে বলে বসলো—'অনেকক্ষণ তো অপেক্ষা করলেন, আপনার গাড়ী যখন এসে পৌঁছল না, দয়াকরে আমার গাড়ীটায় উঠুন না।' দেখো মজা? আমি তো অবাক!…চটেমটে বলে দিলাম—আমি যে গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করছি—সে কথা কে বললে আপনাকে? বললে—'আমার তাই ধারণা, প্রায় আধঘণ্টা আগে দেখে গেছি কি না দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিন উঠুন।'…আচ্ছা দিদি কী মুশকিল বলো তো? যদিও আর দাঁড়াতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু গম্ভীর ভাবে বলে দিলাম—আপনার গাড়ীতে চড়বো মানে? চিনি না কিছু না।…এমন চালাক, তাড়াতাড়ি বলে দিল—চুপ চুপ—চিনি না—জানি না—ওসব বেশী চেঁচিয়ে বলবেন না, তাহ'লে এখানে যেসব ভদ্রমহোদয়রা দাঁড়িয়ে আছেন এঁরা আমায় আস্ত রাখবেন না। এমন ভাব দেখান যেন এই গাড়ীটার জন্যে অপেক্ষা করছেন আপনি। চলুন গাড়ীতে উঠে আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যতো ভালো ভালো যুক্তি আছে প্রয়োগ করবেন পরে।"…কি করি বলো? উঠে পড়তে হল।

মাধবী স্তম্ভিত হয়ে বললে—উঠে পড়লি? গাড়ীতে দ্বিতীয় লোক নেই—ভয় করলো না?

—ও মা ভয় আবার কি?…পুরবী হেসে ওঠে—খদ্দর-টদ্দর পরা ভদ্দরলোককে ভয় কিসের? নেহাৎ—একবার বলাতে উঠে বসলে হ্যাংলা ভাবতো—তাই গোড়ায় একটু মৌখিক আপত্তি দেখালাম।

—কিন্তু ধর যদি কোন বদলোক হ'ত।

—দিদি বুড়ি, এতো বুদ্ধিমান হয়েও হঠাৎ আজ এতো বোকা হতে যাচ্ছো কেন শুনি? মুখ দেখলে বুঝি বুঝতে পারা যায় না? কী ফার্স্টক্লাশ মুখ—ইয়ে—কি রকম ভালো-মানুষ ভালোমানুষ মুখ দেখলে না?…ছাড়ো আমি শাড়ী ব্লাউসগুলো বদলে আসি।…

ছাড়ো—যেন মাধবী ধরে আছে ওকে।

পূরবী চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মাধবী। মুখ দেখলে সকলকে বোঝা হয়তো সহজ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে বোঝা যায় বৈকি।···কী নির্মল মুখশ্রী···কী উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি! অতখানি লম্বা-চৌড়া গড়ন বটে কিন্তু মুখখানিতে কিশোরের সৌকুমার্য্য। 'কী ফার্ষ্টক্লাশ'—বলে কথা বদলে নিলে পূরবী। আচ্ছা কেন? লজ্জা হল কেন?··· কিন্তু সত্যিই কি এই প্রথম পরিচয়? না—দিদির কাছে এটা ছল পূরবীর? না না ছি ছি। মনে মনে নিজেকে নিজে তিরস্কার করে ওঠে মাধবী, পূরবীকে এতো সন্দেহ? ছি ছি। ···অবাধ্য হোক, ছেলেমানুষ হোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক, তবু মিথ্যাবাদী হতে পারে না কখনোই। কিছুতেই না। অবিশ্যি অদ্ভুত বটে। ছেলেটারও সাহস কম নয়।··· কিন্তু বিশেষ করে পূরবীর জন্যই বা ওর পরোপকার-প্রবৃত্তি জেগে উঠলো কেন? মমতা?···তবু—পূরবীর বুদ্ধিকে প্রশংসা করা চলে না।···বিমলার কথাটা মনে পড়লো।··· সত্যি যদি কোনো অসৎলোকের খর্পরে পড়তো।······

মুখ! সুন্দর মুখ! কিন্তু মমতালেশহীন নিষ্ঠুর লোকেরও কি সুন্দর মুখ হয় না?—সুকুমার-কোমল মুখ! মাধবী কি তেমন কোনো মুখ দেখেনি?

শাড়ী ব্লাউস বদলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে পূরবী এসে দাঁড়ালো।

—বাবা খুব রাগ করছেন দিদি?

—বাবার রাগকে তো তুমি ভারী কেয়ার করো। মাধবী গম্ভীরভাবে বলে।···শাসন করবার সংকল্পটা আবার ফিরে আসে।

—বাবারে দিদির রাগ এখনো যায়নি।—চিরুণী ফেলে দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পূরবী—আচ্ছা দিদি ভেবে দেখো—সমিতির কাজ কিছুই করি না, মীটিংগুলোয় উপস্থিত থাকা—তা'ও যদি না পেরে উঠি, গলায় দড়ি দিলেই হয়।

—আজ পর্য্যন্ত বুঝলাম না তোমাদের সমিতিই বা কিসের, কাজটাই বা কি।···আরো যারা আছে তারা কাজটা কি করে বলতো?

পূরবী ঈষৎ অপ্রতিভ সুরে বললে—কি জানি দিদি, সদাই বলে 'কাজ কাজ'। কি কাজ জানতে চাইলে বলে না।···আজকে আমি বলেছিলাম—আমাদেরও কিছু কাজের ভার দেওয়া হোক—সুরমাদি তো গ্রাহ্যই করলেন না। সবিতা, আমি, আর বাণী সেন, আমাদের যেন এঁরা নেহাৎ শিশুর দলে ফেলে রেখেছেন। কিন্তু ওসব চলবে না।··· তবে সীতেশদা বলেছেন—নতুন ছেলেমেয়েদের ছ'মাস ওয়াচ করার পর—সত্যিকার সাহসী আর বিশ্বস্ত কি না বিবেচনা করে কাজ দেওয়া হয়। খুব গোপনীয় কাজ কি না।

মাধবী বিরক্ত হয়ে বলে—দেশের কাজ করবি তার আবার অতো গোপনীয় কিসের রে বাপু?

পূরবী খিলখিল করে হেসে উঠলো—এ তোমাদের সেই চরকাকাটা, খদ্দর-পরা, সমুদ্রের জল রান্না করে নুন তৈরি করার মতো দেশের কাজ নয় গো—দিদি, অনেক বড়ো জিনিস।

—কোন্‌টা বড়ো আর কোন্‌টা ছোট, তার ওজন নিজের নিক্তিতে হয় না রুবি, সে বিচারের ভার সমস্ত দেশের। তবু আমার মনে হয় কোনো মহৎ কাজই গোপনীয় হ'তে পারে না।

—মহৎ তোমায় কে ব'ল্লে? আমি বলছি বৃহৎ।

—সেখানেও তোরা হেরে যাবি রুবি, কোনো মহৎ কাজ যেমন গোপনীয় হয় না, তেমনি কোনো বৃহৎ কাজও গোপন থাকে না। 'কাজ' একটা দৃশ্যমান জিনিস, দেশের ওপর তার প্রতিক্রিয়া আছে।

—সবুরে মেওয়া ফলবে মশাই। তবে ওই ছিঁচকাদুনে দেশের কাজে কিছু হয়নি, কিছু হবেও না বুঝলে। নতুন পথ খোলা চাই।

—নতুন পথ তো খোলাও হ'ল ঢের—ঘোপে টেঁকলো কোনটা?

—হয়তো টেঁকেনি, দেশ এখনো তৈরি হয়নি বলে। তবু কিছু তৈরি হচ্ছে বৈকি।

—কি জানি বাপু অতো বড় বড় কথা বুঝি না। তবু আমার মনে হয়—আমাদের মতো সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়ের ও-সব দলে মিশতে গেলে বিপদের ভয় আছে।

—বিপদের ভয়ও একটু থাকবে না?—পূরবী ঝরঝর করে হেসে ওঠে—এক জোড়া তকলি আনিয়ে রেখো দিদি, দুই বোনে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে বসে কাটবো। মানুষের মাথা নয় যে কাটলে ফাঁসির দায়ে পড়তে হবে—অথচ 'দেশের কাজ' করার গৌরবও বজায় থাকলো।···আচ্ছা ঠাট্টা থাক—বলো তো সাধারণ গেরস্থ ঘরের ছেলে মেয়েরা যদি 'আমরা সাধারণ অতএব আমাদের কিছু করবার নেই' এই ছুতোয় বসে থাকে, দুশো বছরেও কি কিছু এগোবে? অসাধারণ হবার সুযোগ গড়ে নিতে হবে তো? তুমি বাপু এতো সেকেলে—দিদি না হয়ে দিদিমা হওয়া উচিত ছিল তোমার।

মাধবী কি সত্যিই এতো সেকেলে?

ক্ষুণ্ণ হলেও প্রতিবাদ করে না সে—হয়তো সত্যিই। নিজের গণ্ডির বাইরে পা দিতে তার ভয় করে। এই বাড়ী এই ঘর—পঙ্গু অক্ষম বাপ—ছোট পূরবী—এইটুকু তার সীমানা···এর বাইরে আর কোনো জগৎ নেই তার। এর

বাইরের জগৎ যদি কোনোদিন কোনো অসতর্ক মুহূর্তে হাতছানি দেয় তাকে, ভয়ে ভয়ে চোখ বুজবে সে।

বিকলা আবার এসে ডাকলে—দিদিমণি, বাবু জিগ্যেস করছে ছোড়দিমণি ঘুম থেকে উঠেছে?

—ঘুম থেকে!—পূরবী অবাক হয়ে বলে—ঘুম থেকে কিরে?

—ওইতো—মাধবী ক্ষুব্ধস্বরে বলে—তোমরা বড়োবড়ো কাজ করো আর আমাদের জন্যে থাকে এই সব ছোট কাজ। ···বাড়ী আসোনি জানতে পারলে বাবা রক্ষে রাখবেন? বানিয়ে বানিয়ে হাজারটা মিথ্যে কথা বলতে হয়।

পূরবী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ভারী গলায় বললে—কিন্তু এতো ভয়ই বা কেন বলতে পারো? অহরহ শুনি "জানলে রক্ষে রাখবেন না" "শুনলে রক্ষে রাখবেন না"—রক্ষে না থাকাটা কি, তাই নয় একবার দেখ না? ওভালটীন্‌টা একটু বেশী গরম হয়ে গেলেও তো বাবা রক্ষে রাখেন না, গেলাস ছুঁড়ে মারেন, কতো সামলাবে? ভয়ের একটা সীমা থাকা উচিৎ।

উচিৎ।

হয়তো উচিৎ। কি স্বয়ং বিধাতাপুরুষেরই যে নেই উচিৎ-অনুচিত বোধ। ব্রজমোহনের এই অসহায় অবস্থার মধ্যে কি বিধাতাপুরুষের ঔচিত্যবোধের বালাইমাত্র আছে? চারদিক থেকে হাত পা বেঁধে রেখেছে কে মাধবীকে? এই যে ভয়, একি কেবলমাত্র বাপের রাগকে ভয়? অক্ষম অশক্ত মানুষকে যে ভয়, সেকি শুধুই ভয়? না করুণা, দয়া, কর্ত্তব্যবোধ।

এদের হাতেই কি নিরুপায় আত্মসমর্পণ নয় মাধবীর?

খানিকটা পরে তিনতলায় বাপের ঘরে উঠে এলো পূরবী।

ব্রজমোহন এখন আর মুখ ফিরিয়ে নিলেন না, তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন মেয়ের দিকে।

মাধবীর ওপর যে রাগ তা'তে মিশেল আছে অভিমানের, কিন্তু পূরবী যেন ওঁর প্রতিপক্ষ। মনের ঝাল ঝাড়বার জন্যে আশ্রয় নিতে হয় শ্লেষ আর ব্যঙ্গের।

মাধবীর মতো তিনবেলা—"বাবা কেমন আছেন?"—এ প্রশ্ন পূরবী কোনদিনই করে না, ওষুধপত্রের বিষয় দু'একটা খোঁজ হয়তো নিলে, খানিকটা চুপচাপ বসে থাকলো, খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিলো কিম্বা বন্ধ জানলাটা খুললো, তারপর টুপ্‌ করে এলো পালিয়ে।

আজকে এসেই নীরবে টেবিলের ওষুধগুলো একবার নাড়াচাড়া করলো, বিস্কুটের টিনটা নাড়া দিয়ে দেখলো আছে কি না, টাইমপীস্‌টায় দম দিলো, তারপর এসে বসলো সামনের চেয়ারটায়।

ব্রজমোহন তেমনি তীব্রদৃষ্টিতে মেয়ের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিলেন, বসতে দেখে শ্লেষের হাসি হেসে বললেন—মাথাধরা ছাড়লো? শুনলাম না কি বেলা দুটো থেকে ঘুমোচ্ছিলে?

—ভুল শুনেছেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে এলাম মোটে।

এই রকম একটা সন্দেহ যে ছিল না ব্রজমোহনের তা' নয়, তবু একেবারে এরকম স্পষ্ট জবাবের জন্যে বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না, একটু থেমে তীক্ষ্ণস্বরে বলেন—কি করে জানবো বলো, যে যা বলবে তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য। ·এতক্ষণ তা'হলে থাকা হয়েছিল কোথায়?

—রাস্তায়।—বিষ্টির জন্যে আটকে পড়েছিলাম।

—গাড়ী করে চলে আসতে পারোনি?

—গাড়ী ছিল না রাস্তায়।

—তা' থাকবে কেন! ইচ্ছে থাকলে ছলের অভাব হয় না। বৃষ্টি তো এলো চারটেয়, আগে কি হচ্ছিল? আজ শনিবার না?

—শনিবারে শনিবারে সমিতির মীটিঙ্‌ হয় সে তো আপনাকে বলেছি সেদিন।

পূরবী যদি ব্যঙ্গের উত্তরে উত্তেজিত হতো, হয়তো এতো উত্তেজিত ব্রজমোহন নিজে হ'তেন না।···ওর এই নির্লিপ্ত নিঃশঙ্ক কথাবার্ত্তায় হাড় জ্বলে যায় তাঁর। তাই যতোটা সম্ভব উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—মীটিঙে হপ্তায় হপ্তায় যাবার তোমার কী দরকার শুনি?···সমিতি! কী রাজকার্য্য হয় সেখানে? কী করো আমি শুনতে চাই।

পূরবী তেমনি তরলভাবে উত্তর দিলে—সে আপনাকে বোঝানো শক্ত, শুনে কী করবেন?

—তা বইকি, গণ্ডমূর্খ বইতো নয়, বুঝবো কেন? জানতে আর বুঝতে কিছু বাকী নেই আমার বুঝলে? বাড়ী বসে তে আড্ডা মারবার সুবিধে হয় না—তাই খুসীমতো আড্ডা দিয়ে আসা হয়! বাড়ীতে যে একটা রুগ্ন অথর্ব্ব বাপ পড়ে আছে, সেকথা চিন্তা করবার পর্য্যন্ত অবসর নেই!···দুর্বিনীত স্বার্থপর মেয়ে!

—স্বার্থপর কে নয় বলুন?—পূরবী হেসে উঠলো—আপনার কথাই ধরুন না? ষোল আনাই কি স্বার্থপরতা নয় আপনার?

—আমাকে বলছো? ব্রজমোহন চীৎকার করে ওঠেন—আমাকে তুমি এতোখানি অপমান করতে সাহস করো?···জানো আমি ইচ্ছে করলে—জব্দ করে দিতে পারি তোমায়?

—তা পারেন না।—পূরবী আবার হেসে উঠলো—বড় জোর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন—আপনার টাকাকড়ি থেকে বঞ্চিত করতে পারেন—অথচ জব্দ নাও হ'তে পারি।

ব্রজমোহন অশক্ত না হলে বয়স্কা মেয়েকে মেরে বসতেও পারতেন হয়তো, নিতান্ত ক্ষমতার অভাবেই দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, বেরিয়ে যাও এঘর থেকে, সরে যাও আমার সামনে থেকে, নির্লজ্জ বাচাল মেয়ে! কার সঙ্গে কিভাবে কথা কইতে হয়, সেটুকু শিক্ষা হয়নি তোমার?

—সে শিক্ষা আর দিলেন কই? কিন্তু ভেবে দেখুন আমি অন্যায় কিছু বলিনি। আপনার নিজের সেবার জন্য দিদিকে এভাবে এখানে আটকে রাখাটা স্বার্থপরতা ছাড়া কি? একটা সহজ সুস্থ মানুষের জীবন রুগ্ন করে রাখা হয়েছে একজন রোগীর সুখ-সুবিধের জন্যে। আমার তো এটা সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

ব্রজমোহন মেয়েকে তাড়াতে না পেরে ঝগড়াই সুরু করেন।...জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বললেন—তোমার আর তা' ছাড়া কি মনে হবে? সহানুভূতিহীন আত্মসর্বস্ব মেয়ে! তা'হলে বলতে চাও সবাই সুখ করুক, আর রুগী মরুক বিনা সেবা যত্নে?

—তা কেন? আপনার তো পয়সার অভাব নেই, ইচ্ছে করলেই নার্স রাখতে পারেন, সেবা যত্ন তা'তে ভালো ভিন্ন মন্দ হবে না।

—দুটো দুটো মেয়ে থাকতে নার্সের সেবা নিতে হবে আমায়?

—দুটো আর কই?—পূরবী সশব্দে হেসে ওঠে—আমি আর আপনার কি কাজে লাগছি—অন্ন-ধ্বংসানো ছাড়া? ...দিদির কথাই বলছি সুধু।...দিদির জীবনটা অকারণে নষ্ট করে দেবার সত্যিই কি কোন অধিকার আছে আপনার—তুচ্ছ একটা নার্সের দ্বারা যে কাজ হয় তার জন্যে চিরদিন আটকে রাখবেন দিদিকে?

—চিরদিন! চিরদিন!—রাগে ক্ষোভে ভাঙা গলায় চীৎকার করেন ব্রজমোহন।—চিরদিন এইভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবো আমি? তাই বলেছে ডাক্তার?

—ডাক্তারে রুগীকে সাহস দেবার জন্যে অনেক কিছুই তো বলে বাবা! কিন্তু সব সময় কি সত্যি হয়? সেরে যান সে ভাগ্যের কথা, তবু শিগ্‌গিরের মধ্যে তো নয়? অথচ দিদির আর জামাইবাবুর মধ্যে যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে, সে কি আর ফিরবে?

যুক্তিটা হয়তো অকাট্য, কিন্তু অপ্রতিভ হবার পাত্র ব্রজমোহন নয়। রুষ্টভাব বজায় রেখেই বলেন—আমি কি তোমার জামাইবাবুকে না আসতে মাথার দিব্যি দিয়েছি? •বাব সাহেব এলেই পারেন!

—ও কথাটা অর্থহীন। আসবেন কেন? সকলেরই আত্মসম্মান আছে।

ব্রজমোহন কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে বললেন—বেশ তোমার দিদি যেন আর আমার সেবার জন্যে জীবন নষ্ট না করেন, নার্সের বন্দোবস্ত করে নেব আমি।

পূরবী উঠে দাঁড়ালো...নরম গলায় বললে—রাগ না করে ভালভাবে বিবেচনা করে দেখলে বুঝতে পারবেন তাতে আপনার শান্তিই হবে।

পরদিনই ডাক্তারের সঙ্গে তোড়জোড় পরামর্শ করে নার্স ঠিক করে ফেললেন ব্রজমোহন। আধাবয়সী ভদ্রমহিলা—স্বাস্থ্যপুষ্ট আঁটসাট গড়ন, ভারিক্কে চাল। দেখলে সমীহ আসে।

মাধবী নিজের ঘরে এসে আকুলভাবে বললে—কী কাণ্ড করলি বল দেখি রুবি? বাবাকে যে মুখ দেখাতে পারছি না আমি!

নার্স রাখার কারণটা তো আর গোপন রাখেননি ব্রজমোহন, সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন।

পূরবী হেসে বললে—কেন তোমার অপরাধটা কি?

—জানি না। কি বিশ্রী যে লাগছে আমার। কি যে মতিচ্ছন্ন হ'ল তোর রুবি? বাবার ঘরের কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করবে এ আমি ভাবতেই পারছি না।

—ঘুমিয়ে বাঁচোনা বাবা। বহুদিন তো দিনরাত্তিরে ভালো করে ঘুমোওনি।

—আর ঘুম! ঘুম আর আমার হয়েছে।, আমি যখনই ওই মিসেস হালদারকে দেখছি আর মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—তাই বলো যে হিংসে হচ্ছে।

—বাজে বকিসনে রুবি!

—চিন্তা করে দেখো হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়। —ভাবছো তোমার দাম কমে গেল কেমন? কিন্তু ভালোই তো হ'ল দিদি, অনেকটা মুক্তি পেলে। নিজেকে বদ্ধ করে রেখে যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে—সেইটাতে ঘা খেয়ে এখন অতো মন খারাপ লাগছে, কিন্তু ওটা তো ফাঁকি ছাড়া আর কিছু নয়।...একটা চিররুগ্ন মানুষের সেবা করে জীবনটা কাটিয়ে দেব—ওসব বড় বড় কথা শুনতেই ভালো, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অচল।

—কিন্তু বাবা মনে কত আঘাত পেলেন বল দিকিন?

—পেলেই বা? ধরো যদি তুমি হঠাৎ মরে যাও, আঘাত পাবেন কিনা? অথচ সেটা প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা তোমার নেই। অসুস্থ মানুষ বলে ভাগ্য তো কখনো দয়া মায়া করে না?

—ভাগ্য করে না বলেই তো মানুষকে করতে হয় রে।

—একশো বার। কিন্তু তারও একটা লিমিট আছে। কারুর পা-টা খোঁড়া হয়েছে দেখে তুমি যদি নিজের পা-টা কেটে তাকে দান করো তার মধ্যে না আছে বাহাদুরী, না

আছে বুদ্ধির পরিচয়।…দুর্ভাগ্য-ব্যক্তির জন্যে সহানুভূতি ভালো কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে এনে নয়।

—তুই কি তা'হলে বলিস—মাধবী ক্ষুণ্নভাবে বলে—স্নেহ মমতা ভালোবাসা কিছুরই মূল্য নেই?

—নিশ্চয় আছে। অমন পাষণ্ডের মতো কথা বলতে পারি কখনো? মূল্য আছে বৈ কি, কিন্তু নিজের চাইতে নয়। এই তো তোমাকে কি আমি কিছু কম ভালোবাসি? তাই বলে—বিয়ের পর বর ছেড়ে তোমায় নিয়ে থাকবো সেটা মনে করো না।

খিল খিল করে হেসে দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে পূরবী।

মিসেস হালদারকে নিয়ে মাধবীর যে অশান্তি, পূরবীর তা নেই। কাজেই সারা বিকেলটা ও কাটালো গান গেয়ে, সন্ধ্যাবেলা দিদির কাছে আবদার করে নতুন নতুন সুখাদ্যের ফরমাস করে এলো, তারপর—পড়বার যখন আর খুব বেশী সময় নেই তখন পাঠ্য পুস্তকগুলো পেড়ে বিছানায় ছড়ালো। —আর তখুনি নামলো বৃষ্টি।

কালকের মতো বৃষ্টির অতো দুর্দান্ত মাতলামি না হোক, তবু এলোমেলো ছাট এসে ঢুকছে। তা হোক উঠে জানলার কপাট বন্ধ করলে না পূরবী। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে থাকলো জানলার বাইরে—যেখানে মেঘের দাক্ষিণ্য ঝরে পড়ছে অযাচিত অজস্র মহিমায়।

বৃষ্টি বৃষ্টি! এমন অদ্ভুত ভালো লাগছে কেন? বৃষ্টির সঙ্গে কি জড়ানো আছে কোন অননুভূত অনুভূতির ছায়া?

বৃষ্টির শব্দে বাজছে কার কণ্ঠস্বর?

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বেজেছিল কার কণ্ঠস্বর?…ষ্টিয়ারিঙ হুইলে হাত দিতেই যখন প্রথম বলে উঠলো—'খুব ঠকানো গেল ওদের', তখন কোনো উত্তর না দিয়ে অমন বোকার মতো সুধু একটু হেসেছিল কেন পূরবী? কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে?…

রাবিশ!

হঠাৎ নিজের মনে হেসে উঠলো পূরবী।…যত সব সৃষ্টিছাড়া বাজে চিন্তা! তবে হ্যাঁ লোকটার সঙ্গে আর একবার দেখা হলে মন্দ হত না, অন্তত পূরবী যে পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো নীরেট নয় সেটুকু বুঝিয়ে দেওয়া যেত।…সত্যি কাল যেন কি হয়েছিল। পূরবীর অমন যে বাক্‌পটুত্ব কোথায় যে হারিয়ে গেল! গাড়ীতে বসে অতক্ষণে ক'টা কথাই বা বলেছে পূরবী? তা'ছাড়া—বা ও বলেছে কেমন যেন ভোঁতা।

নাঃ আর একবার দেখা করতেই হবে।…ও যে বৃষ্টির ছুতোয় অপরিচিত তরুণীকে অনায়াস ভঙ্গীতে নিজের গাড়ীতে আমন্ত্রণ করার মতো স্মার্টনেস দেখিয়ে বাহাদুরী নেবে, আর পূরবী জড়ভরতের পার্ট প্লে করে ওর কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে থাকবে—ও সব চলবে না। বাড়ীতে এসে বরং ফিরে পাচ্ছিল পূরবী নিজের স্বাভাবিক বাক্‌চাতুর্য্য। কিন্তু দু'মিনিট দাঁড়াবার অবসর হ'ল না বাবুর।…আর কিছু না—'চাল'। কিন্তু আর একবার দেখা না হইলেই নয়। দিদির কাছে কথা দিয়ে গেছে আসবে। অবিশ্যি ও ধরণের মৌখিক ভদ্রতার কথার বিশেষ কিছু মূল্য আছে কি?…ভুলেই যাবে। ভুলে যাবে?

পূরবী উঠলো—জানলা বন্ধ করলো, আলো জ্বালালো। কি মনে করে মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ড্রেসিং টেবিলের সামনে—চুলের ওপর বারকতক চিরুণীটা চালিয়ে নিয়ে বিছানায় ফিরে এসে একখানা পাঠ্যপুস্তক খুলে বসলো… খুলে বসলো কিন্তু মন বসলো না।

এর চেয়ে অনেক ভালো "রবীন্দ্র কাব্য পরিচয়" ওলটানো। অথচ উঠে গিয়ে জোগাড় করে আনবে বইটা এমন ইচ্ছেও নেই, তার চেয়ে বরং এই-ই ভালো।…কিন্তু কোনো কিছুই পড়া হ'ল না। মাধবী ডাকতে এলো খাবার জন্যে।

—এখুনি খাবো কেন? বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে, আর চমকে গেল পূরবী। সাড়ে দশটা!…কখন বাজলো এতগুলো ঘণ্টা?…সরব ঘড়িটা নীরব হয়ে গিয়েছিল না কি এতক্ষণ?

মিসেস হালদারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাধবী সত্যিই যেন বেকার হয়ে গেল।…অথচ, গৃহিণীহীন সংসারে গৃহিণীপনার কাজও তো কম নয়!

ব্রজমোহনের অবিরত ফরমাসে যে সব কাজ নিখুঁৎ পরিপাটিভাবে হয়ে উঠতো না, সে গুলির ওপর অনেকটা সময় ঢালতে লাগলো মাধবী, নিজের হাতে নিত্যি নতুন সৌখীন রান্না করতে সুরু করে, নতুন করে সাজায় ভাঁড়ার ঘর, কিন্তু মনের শূন্যতা ভরে না।…

খানিকটা অনুর্ব্বর ফাঁকা মাঠ যেমন দুপুর রৌদ্রে খাঁ খাঁ করতে থাকে, তেমনি খাঁ খাঁ করতে থাকে তার মন।

কিন্তু কেন? সত্যিই কি পিতৃ-সেবা হ'তে বঞ্চিত হবে এতো মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছে মাধবী? সেই বিরাট শূন্যতা পূর্ণ করতে—ভাঁড়ারের আলমারি গোছানো অথবা "আনারসের পোলাও" রাঁধাই পর্য্যাপ্ত নয়?

এক হিসেবে হয়তো পূরবীর কথাই ঠিক। 'আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে'—'আমার উপস্থিতিটা অর্থহীন' এমনি একটা মনোভাব ভিতরে ভিতরে পীড়িত করছিল মাধবীকে।

মাধবীর মুক্তির সহায়তা করে কি উপকার করলো পূরবী? মাধবীর জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাই কি নষ্ট হয়ে যায় নি? পূরবী বলছিল—'বহুকাল তো ঘুমোও নি, ঘুমিয়ে বাঁচোনা বাবা'—

কিন্তু তেমন ভালো করে ঘুমই বা আসে কই? সজাগ সতর্ক হয়ে থাকার প্রয়োজন নেই, তবু বারেবারে ঘুম ভেঙে যায়।... দোতলায় নিজেদের ঘরে শুয়ে মাঝরাত্রে জেগে উঠে হঠাৎ যেন চমকে যায়, নতুন লাগে। এ ঘরটা মাধবীর মার ঘর। বালিকা কন্যাদের নিয়ে এই ঘরে শুয়েছিলেন নিবেদিতা শেষ জীবন অবধি।...অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যায়...রুগ্ন মার শোয়ার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত চোখের ওপর ভেসে ওঠে।... এতোদিন যেন স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল মাধবী, তলিয়ে চিন্তা করবারও অবসর পায়নি কোন দিন... এখন মাঝে মাঝে তাই ভাবতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠে পড়ে জানলায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে; পুরবীর ঘুম ভেঙে গেলে হয়তো ডাকে—"দিদি! দাঁড়িয়ে আছো কেন?"

মাধবী সহজ সুরে বলে—দাঁড়াইনি রে, জানলাটা বন্ধ করতে এসেছি, বড়ো ঠাণ্ডা।

নিশ্চিন্ত পুরবী ঘুমিয়ে পড়ে, মাধবী বিছানায় শুয়ে আবার ভাবতে থাকে।...মা মারা গেলেন মাধবীর বিয়ের বছর দুই আগে। বাড়ীর গৃহিণীর প্রতিনিধি হিসেবে মাধবীকেই করতে হল নতুন বরের আদর অভ্যর্থনার আয়োজন। রাত্রে স্বামী সম্ভাষণে যেতে কেশ বেশের উন্নতির ভারও নিতে হয়েছিল নিজেকে। সঙ্গতিপন্ন সংসার, তবু গৃহিণীর অভাবে পদে পদে ধরা পড়তো ব্যবস্থাপনার অসঙ্গতি। ষোলো বছরের মাধবী ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নিতে লাগলো সেই এলোমেলো সংসার।

কিন্তু এলোমেলো করে ফেললো নিজের জীবনকে।

এই সংসার ফেলে যে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব, সেই কথাটাই বোঝাতে পারলো না নিজেকে। তাই বারে বারে প্রত্যাখান করলো প্রিয়ের আহ্বানকে।...পুরবীকে রেখে যাবে কার কাছে?...বাবাকে দেখা শোনা করবে কে?... রান্না ঘর আর ভাঁড়ার ঘরের তদারকী করবার সাধ্য কার আছে মাধবী ছাড়া?...তবু তখনও ব্রজমোহান ছিলেন সুস্থ সবল কার্য্যক্ষম।...

আশ্চর্য্য! মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ব্রজমোহন ভাবেননি কেন? মাধবীর বুদ্ধি বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন? মেয়েকে ছেড়ে দেবার মতো ইচ্ছার অভাবে?... কে জানে—হয়তো বাপের সেই অদৃশ্য অনিচ্ছা বারবার ভুল পথে নিয়ে গেছে মাধবীকে।...হয়তো মাধবীর নিজের মনের বাধা অতো প্রবল ছিল না।

তারপর...অকস্মাৎ রোগগ্রস্ত হয়ে বিছানা নিলেন ব্রজমোহন।

উঃ কী ভয়ঙ্কর সেই দিনটা!

পাঁচ বছর হয়ে গেল—সেই বিছানায় পড়ে আছেন ব্রজমোহন।...

পাঁচ বছর ধরে জলের মতো অতো অর্থ ব্যয় করছেন সেই অবশ পা দু'খানার জন্যে, আর স্বপ্ন দেখছেন কর্মক্ষম সুস্থ জীবনের। আশা করছেন—চিকিৎসকদের আশ্বাসে।

এই বিজ্ঞ শিশুটীর সম্পূর্ণ ভার এতোদিন মাধবীর ওপর ছিল।

কখন অকারণে দোষ স্বীকার করে নত হতে হয়, কখন অভিমানের বদলে পাল্টা অভিমান করতে হয়, আর কখন বা ছেলেমানুষকে শাসন করার মতো শাসন করতে হয়, এসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেই সমস্ত অভ্যাসের মূলে হাত পড়েছে। কে যেন শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে দিয়েছে মাধবীকে।

নার্স রেখেও যে সেবা চলা সম্ভব, সে কথাটা এতোদিন কারো খেয়ালে আসেনি কেন? সম্ভব? কথাটা মনে করতেই মনটা কেমন করে উঠলো।...দূর তাই কি হয়? অসম্ভব।

সেবা করাটাই তো সমস্যা নয় সুধু, সেবা নেওয়াও যে একটা মস্ত সমস্যা।...হালকা হয়ে গেল মনটা। আপন মনে হেসে উঠলো মাধবী। কদিনই বা? পাততাড়ি গুটোতে হ'ল আর কি মিসেস হালদারকে।

মাধবী ভিন্ন আর কারো শুশ্রূষা পছন্দ হলে তো ব্রজমোহনের!

কিন্তু আর একজন?

সে কি সুধু জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো জেগে থাকবে মাধবীর জীবনে?

তা ছাড়া আর কি।...

মাধবীর বিরাট বাধাগুলোকে বরাবর সে কল্পিত বাধা বলেই উড়িয়ে দিয়েছে, তাই কখনো সহানুভূতির স্পর্শ পায়নি মাধবী।...মাধবী যে তা'র সঙ্গ পেলে ধন্য হয়ে যায়, তা'র ঘর যে মাধবীর কাছে কল্পনার স্বর্গ, কেবলমাত্র সাংসারিক এই সব ভয়ঙ্কর অসুবিধের জন্যেই যাবার উপায় হচ্ছে না, এই কথাটা কোনোদিন কি বুঝতে চেয়েছে?

সুধু ডেকেছে বারে বারে।...সে ডাকের উত্তর দিতে পারেনি মাধবী।

আজ আর তাই তাকে কোনোছলেই ডাকা যায় না। কি বলবে মাধবী?...বলবে—'এতোদিনে আমার কর্ত্তব্য শেষ হ'ল, মিলেছে ছুটি, এইবারে তুমি এসো আমার বোঝা বহন করতে!...'

বোঝা বৈ আর কি বলা যায়।...

ষোলো বছরের মেয়ের স্থান সঙ্কুলান হওয়া যতো সহজ, ছাব্বিশ বছরের যুবতীর জন্যে ততো নয়।...তা'র জন্যে থাকে অনেক চিন্তা অনেক বিবেচনা। শ্রীমন্তর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে

প্রায় তিন বছর আগে।...ব্রজমোহনের অবস্থা যখন নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেল, আশা করবার আর কিছু রইল না, তখন আর একবার শেষ চেষ্টা করেছিল বেচারা, কিন্তু মাধবী তখন কোন্ লজ্জায় স্বামীর ঘর করতে যাবে—রুগ্ন অপটু পক্ষাঘাতগ্রস্ত পিতা, আর তরুণী পুরবীকে কেবলমাত্র দাস-দাসীর ভরসায় ফেলে রেখে দিয়ে!

বরং স্বামীকে বেশ কিছু রূঢ় কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। রোগটা মাধবীর বাপের না হয়ে তার বাপের হ'লে কি হতে পারতো—এই ধরণের কি একটা কথা বোধ হয়।

আর আসেনি।...

চলে যাবার দিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। থাকবে না কেন! বিস্মৃতির ধূলোয় ঢাকা পড়বার অবসর দিলো কবে মাধবী? প্রতি দিন রাত্রির বিক্ষুব্ধ চিন্তায় সদ্য ক্ষতের মতো স্পষ্ট হ'য়ে আছে।

এই ঘর।

এই ঘরে—নতুন বিয়ের পর নিজের হাতে কুণ্ঠিত প্রসাদনে নিজেকে কিছুটা সাজিয়ে নিয়ে দয়িতের জন্যে প্রথম প্রতীক্ষা করেছে মাধবী। সোহাগে আবেগে মর্ম্মরিত হয়ে উঠেছে নিদ্রাহীন মিলন রাত্রে। আবার এই ঘরেই চিরদিনের জন্যে বিদায় দিয়েছে তা'কে।

অন্ধকারেও একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলে মাধবী। জ্যোৎস্না নেই, নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় শুধু বড়ো বড়ো ভারী ভারী জিনিসগুলো চোখে পড়ে। যা'র আমলের ফ্যাসানে সাজানো ঘর! হয় তো বা যা'র নিজের হাতেই সাজানো। বাড়ীর আর সব ঘরের আধুনিক আসবাব-পত্রের সঙ্গে এর মিল নেই।

তবু এই ঘরটা সব থেকে ভালো লাগে মাধবীর।...

এই সেকেলে আমলের অনেক কারুকার্য্য করা ভারী পালঙ্ক, ভারীক্কে ধরণের দামী দেরাজ, ষ্ট্যাণ্ডে বসানো প্রকাণ্ড আরশী, দেয়ালের গায়ে ঝোলানো অজস্র ফটো। (মাধবীর বিয়ের ফটোটাও আলমারীর পাশের দিকে কোথায় যেন টাঙানো আছে।) এই সবের মধ্যে একটু যেন কল্পনার অবকাশ আছে।

ঘুমের ঘোরে রুবি আস্তে আস্তে কি যেন বলছে—বরাবরের অভ্যাস ওর। তবু ডেকে জাগিয়ে দিতে হয়। মাধবী ওর গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে—এই রুবি, কি বলছিস?

রুবি চমকে জেগে উঠলো। জড়ানো স্বরে বললে—কি বলছি?

—তুই-ই জানিস কি বলছিস। তবে বকছিস তো কতো কি।...জল খাবি?

পুরবী সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। হেসে বলে—কি বলছিলাম জানো দিদি? তুমি এতো সুন্দর কেন? আর আমি কেন কালো? মা বুঝি আমায় দেখতে পারতেন না? শুধু মা কেন—কালোদের কেই বা দেখতে পারে বাবা!

—কেউ না। ওই জন্যেই তো তোকে দু'চক্ষে দেখতে পারিনে আমি।

অনুচ্চস্বরে একটু হেসে মাধবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা রুবি, সেই ছেলেটা তো কই আর এলো না?

পুরবী চমকে উঠে বললে—কোন ছেলেটা?

—সেই যে তোকে গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে গেল বিষ্টির সময়। বলেছিল আসবো।

—ওঃ! বাবা রাতদুপুরে দিদির আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—পরের ছেলের ভাবনা ভাবতে বসলেন। মৌখিক ভদ্রতা ক'রে বলে গেল বলে সত্যিই আসবে না কি?

মাধবী একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—বেশ ছেলেটি কিন্তু।

—পৃথিবীর সবাই বেশ, সুধু রুবি মুখপুড়ি বাদে। জানি তো তোমাদের পছন্দ। নাও এখন ঘুমোবে, না বকবক করবে?

বালিশটাকে উল্টে ঘাড়ের তলায় ভালো করে বসিয়ে পাশ ফিরলো পুরবী।

আর ঠিক তার পরদিনই আলোচ্য ব্যক্তিটী এসে হাজির হ'ল।

অবশ্য ওর একটা নাম ধাম আছে নিশ্চয়।

ধামটা বাংলা দেশের কোন এক সুদূর পল্লীতে হ'লেও বর্ত্তমানে কলকাতাই। নাম হচ্ছে বাসুদেব। পরম বৈষ্ণব বাড়ীর ছেলে, রথ-দোল রাস-ঝুলন বারোমাস লেগেই আছে দেশের বাড়ীতে। শ্রীকৃষ্ণের কোনো নাম ছাড়া ছেলেদের আর কিছু নাম রাখবার উপায় নেই ওদের সংসারে।...পাড়ায় আমিষরান্না হলে ওদের বাড়ীর সবাই নাকে কাপড় দেয়... বাড়ীর উঠানে একদিন মুরগীর পালক উড়ে এসে পড়েছিল বলে একযোগে স্নান করতে হয়েছিল সবাইকে।...

কিন্তু বাসুদেব যে কি—বলা শক্ত।

যে রকম সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়ায়, সব সার্কেলে মেশে, তাতে—শুচিবাইটা বজায় থাকে কি না ঘোরতর সন্দেহ হয়।... আবরণটা খদ্দরের, পেশা বছর তিনেক আগে পর্য্যন্ত ছিল অধ্যয়ন; এম-এ পাশ করার পর থেকে সাদা বাংলায় বেকার বলেই পরিচয় ও দেয় নিজের—কিন্তু বন্ধুরা বলে কংগ্রেস-কর্ম্মী। অবশ্য সেও বেকারের পর্য্যায়ভুক্ত ছাড়া আর কি?...ঘরে ভাত থাকলে দেশোদ্ধার করে বেড়ানো শক্ত নয়, বিচক্ষণ লোকেরা সেটাকে তো আর 'কাজ' বলবে না!

মাধবী ওর জন্যে খাবার সাজিয়ে এনে টেবিলে নামিয়ে রেখে বললে—ভারী খুশি হলাম ভাই, কথা রেখেছ দেখে। আমি কিন্তু কালই তোমার নিন্দে করছিলাম।

'তুমি' বলবে এটা ভেবেই এসেছিল সে। 'দিদি'র সঙ্গে আপনিটা খাপ খায় না।

—ঠিকই করছিলেন। যতো দেখবেন ততোই বুঝবেন ও ছাড়া আর কিছু করবার নেই আমার সম্বন্ধে।

—বিনয় প্রকাশেও আপনার জোড়া নেই তা বুঝছি।

পূরবী ঠাট্টা করে বলে ওঠে।—মাধবী ওকে দেখেই খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল, পূরবী এতক্ষণ বসেছিল চুপচাপ, সত্যি কথা বলতে গেলে—বোকার মতন। দিদির আবির্ভাবে তবু যেন মুখে কথা জোগালো।···

—পরে বুঝবেন—বিনয় নয়—নিছক সত্যবাদিতা।··· কিন্তু দিদি হঠাৎ আমার জন্যে এরকম বিরাট ব্যবস্থা করতে গেলেন কেন? কি ভাবলেন—সারাদিন না খেয়েদেয়ে পথে পথে ঘুরছি?

বিমূঢ় মাধবী কিছু বলবার আগেই পূরবী তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—তাই ভেবেই বুঝি মানুষ মানুষকে মিষ্টিমুখ করায়?

ওর রাগে যেন বাসুদেবের কৌতুক। মুখ টিপে হেসে বললে—সুধু মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা হ'লে তো এসব কথাই উঠতো না। এ যে একেবারে—মিষ্টি নোস্তা ঝাল মসলা সব কিছুর বাড়াবাড়ি আয়োজন।···কিন্তু মাপ করবেন দিদি, এ সবের কিছুই খেতে পারবো না আমি।

আহার্য্য বস্তুটা এক জনের পক্ষে যে অনেক বেশী, সেটা অবশ্য মাধবীও না বুঝে এনেছে এমন নয়, তবু মামুলি বাক্য-বিন্যাস প্রণালীর নমুনাস্বরূপ বলে—খেয়ে ফেল না। ছেলে-মানুষ—ও আর এমন কি বেশী? যা পারো খাও।

—কিন্তু কিছুই যে পারবার উপায় নেই দিদি।

মাধবী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলে—কেন বলো তো? খেয়ে অসুখ করবে ভাবছো? কিচ্ছু কিন্তু বাজারের জিনিস নয়, এই নিমকি, সিঙাড়া, চপ, ডিমের হালুয়া, সব আমার নিজের তৈরী। বাতিক-গ্রস্ত মানুষ—সারাদিন ওই করি বসে বসে।

বাসুদেব অপ্রতিভ ভাবে বলে—অসুখের ভয়ে নয়—কিন্তু কিছুতেই আমার খাওয়া সম্ভব হবে না দিদি, মাপ করবেন।

মাধবী ম্লানমুখে প্রশ্ন করলে—সামান্য কিছু খাবে না?

—আপনি এতো বেশী দুঃখিত হচ্ছেন যে দেখে মনে হচ্ছে অপরাধ করছি, কিন্তু সত্যিই আমার খাবার জো নেই, সামান্য কিছুও না।

ব্যাপারটা লঘু করে ফেলবার জন্যেই বোধকরি হেসে ওঠে বাসুদেব—আপনার আচ্ছা দুর্ভোগ।

—স্বেচ্ছায় দুর্ভোগ ঘটিয়ে অপরাধ স্বীকার করাটাও বুঝি বিশেষ কোনো ফ্যাশন?—পূরবী তীব্রভঙ্গীতে বলে—না খেতে পায়াটা বোধহয় আপনাদের দেশসেবার অঙ্গ? কৃচ্ছ্র সাধনা? 'দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না'—অতএব—

—ধরুন তাই—বাসুদেবের মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠে—আপনারাও তো দেশসেবার ভূমিকা নিয়েছেন—কৃচ্ছ্র-সাধনার ব্যবস্থা নেই?

—কে বললে আপনাকে—পূরবী সন্দিগ্ধভাবে বলে—আমার বিষয় আপনি কি জানেন?···

—কিছুই না। কে কার বিষয় জানে বলুন, নিজের কথাই বলা যায় না, তার অপরের। তবে—আপনার চশমার পাওয়ারটা যে অন্যায় রকম বেশী, আপনার পরিধেয় শাড়ীখানা যে অতিরিক্ত দামী, এটা বলতে যেমন বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না, তেমনি হয় না—যদি বলি—আপনাদের আড্ডায় লাঠি খেলতে গিয়ে প্রত্যেক দিনই আপনার 'চাল' ভুল হয়, আর —ছোরা খেলার ছোরাগুলো নেহাৎ খেলার নয় বলে, দেখলেই আপনার বুক কাঁপে।···

—আপনি কি স্পাই?

চোখ মুখ রাঙা করে প্রশ্ন করলে পূরবী।

বাসুদেব কিছু বলার আগে—মাধবী পাংশুমুখে বললে—তোদের ক্লাবে বুঝি এই সব হয়?

—হয়-ই তো, নিশ্চয় হয়। তবে কি তকলি কাটবো? —উদ্ধত উত্তর দেয় পূরবী।···

মাধবী পূরবীর উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করে আপোষসূচক কি একটা বলতে যাচ্ছিল···বিমলা দরজায় উঁকি মেরে ডাকলে —বড়দি, নার্স-মাসীমা আপনাকে ডাকছেন।···

নার্স মাসীমা!···

মাধবী বিরক্তভাবে বললে—'মাসীমা' বলতে কে বলেছে তোকে?

—বলবে আর কে?···বিমলা মুচকে হেসে বলে—ঘরের লোকের মতন হয়ে গেলে মানুষকে একটা কিছু বলতে হবে তো?

—আচ্ছা আচ্ছা বেশ। হঠাৎ কি দরকার পড়লো তাঁর?

জানিনে বাবা। রেগে তো কুরুক্ষেত্তর করছে, কি না কি আনতে বলেছিল, আসেনি—এই নিয়ে রসাতল।···

ঘরের কথা আরো বেশী প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে মাধবী বিমলাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে যায়—চল্ দেখি কি আবার আসেনি।···যত সব হয়েছে ভুলোর দল।···

মাধবী চলে যেতেই চেয়ারের পিঠে পিঠটা হেলান দিয়ে বেশ আয়েস করে বসে বাসুদেব হাসি-চাপা-গম্ভীর মুখে বললে —তকলির ওপর আপনার আক্রোশটা বেশ উপভোগ্য।

—আক্রোশের কি আছে?

তীক্ষ্ণ আর সতর্ক হয়ে ওঠে পূরবী।···বারে বারে কথায় হেরে যাবে না কি সে।—মুখ টিপে হেসে বলে—আক্রোশের উপযুক্ত প্রতিপক্ষ নয়। তবে এও জানবেন—সাম্রাজ্যবাদী

গলায় ফাঁসি দিতে—যদি ফাঁসির দড়ি বুনতে হয় তকলির সুতোয়, তাহ'লে আরো দু'শো বছরেও কুলোবে না। আপনারা চটলেও এই কথাই বলবো আমরা, দু'হাজার বার বলবো।

—বলুন না। ঈশ্বর তো সাম্রাজ্যবাদী নয়—সাম্যবাদী। তাই প্রত্যেককেই একটা করে বাক্‌যন্ত্র দিয়েছেন নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবার জন্যে।···কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের যে শেষ হয়ে এসেছে, এটা কি আপনারা অনুভব করেন না?

পূরবী বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে—কেন? 'ডোমিনিয়ান' লাভ হয়েছে বলে?

—নয় কেন?···বাসুদেব তেমনি কৌতুকোজ্জ্বল মুখে বলে —নয় কেন?

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে নিশ্চয় কিছু আর দাড়ি গোঁফ সম্বলিত ছ'ফুট দেহখানা নিয়ে জন্মায় না? তবু তো সেটা আনন্দের?···সূচনার আনন্দ।

ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির ঝিলিক খেলে যায় পূরবীর, বলে—শিশু যখন কাঠের ঘোড়া নিয়ে জল খাওয়ায়, সেই ঘোড়াই একদিন তাকে তেপান্তরের মাঠে নিয়ে যাবে কল্পনা করলেও তো আনন্দ কম নয়? মন্দ কি তেমন কল্পনা?

—সাধনার জোরে কাঠের ঘোড়াও জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এটা বিশ্বাস করেন? মন্ত্রের প্রভাবে জড় পদার্থেও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়?

—ন:।···পূরবী মাথা নাড়লো—মন্ত্র আর সাধনা, বাক্‌-চাতুরী আর বুজরুকি, ওসবে বিশ্বাসটা আমাদের কম।··· নেহাৎ প্র্যাক্‌টিকাল মানুষ আমরা, সোজাসুজি কাজ চাই।

—যেমন লাঠি? বাসুদেব হেসে ওঠে—এমন সরল আর সোজা জিনিস আর নেই জগতে।

—ঠাট্টা করছেন? কিন্তু এটা ঠিকই জানবেন—ডোমিনিয়ানের মাকাল ফল নয়—খাঁটি জিনিষ আদায় করতে হলে লাঠির জোরেই করতে হয়। আবহমান কাল থেকে এই প্রথাই চলে আসছে।

গলা খুলে কথা বলতে পারছে দেখে নিজের মনেই খুশি হয়ে ওঠে পূরবী।···

পিঠটাকে আরো একটু টান করে সর্ব্বাঙ্গে আয়েসের ভঙ্গীটা পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলে বাসুদেব মৃদুহাসির সঙ্গে বলে—কিন্তু অপর পক্ষ বড় বেশী কুটিল হলে সরলতাটা কি নেহাৎ বোকামী হয়ে ওঠে না?···ধরুন পরমাণু আর লাঠি। পরমাণুর কুটিলতার কাছে লাঠির সরলতাটা নেহাৎই নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি?

পূরবীর চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠে।···

—তা যদি বলেন—পথে হাঁটাও তো চরম নির্ব্বুদ্ধিতা। ···অনেকদিন আগেই তো জেনে নিয়েছে লোকে—"নৌকা কি সব ডুবছে, ভীষণ রেল কলিশন হয়—" অতএব আর পথে হাঁটা নয়, "বিছানায় শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে" থাকা যাক।·· বিপদের ভয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকলে পৃথিবীর কোনো কাজই কি হয়েছে কখনো?

—বেআন্দাজী বিপদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েও হয়েছে কি না সন্দেহ আছে।

—ওই তো। 'বুদ্ধি'—'বিবেচনা'—টাকা আনা পাই হুঁ:। ওতে আপনাদের ওই ডোমিনিয়ানই হয়, আর কিছুই হয় না।

এই ঘণ্টাকয়েক আগেই না কি সমিতির উত্তপ্ত বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসেছে পূরবী, তাই কথার মধ্যে রয়েছে তার উষ্ণতা।

বাসুদেব এবার সোজা হয়ে উঠে বসে।···মাথার টুপিটা নামিয়ে বড়ো বড়ো চুলের মধ্যে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—বেশ তো, মাকাল ফলটা না হয় থাক্ আমাদের জন্যে, বাকীটা আপনারা আদায় করুন।

—আমরা?—পূরবী তিক্ত হাসি হাসে—আমাদের আর করবার রইল কি? কংগ্রেস যা বিশ্বাসঘাতকতা করলো দেশের সঙ্গে—

—করুক না।···

আবার পিঠটা হেলিয়ে দেয় বাসুদেব—সর্ব্বাঙ্গে শুধু আয়েসের ভাবই ফুটে ওঠে না, ওঠে অবহেলারও।—করুক না বিশ্বাসঘাতকতা, আপনাদের কি এসে যাচ্ছে তা'তে? কংগ্রেস তো আপনাদের হাত-পা বেঁধে রাখেনি?

—তা, এক রকম বাঁধাই বৈকি। শত্রুর সঙ্গে আপোষ করে দেশের ভবিষ্যত ভাগ্যকে তো নিজেদের পকেটে পুরলেন আপনারা।

—নিজের পকেটভারী করবার প্রবৃত্তিটা জৈবধর্ম্ম—খোলা গলায় হেসে উঠলো বাসুদেব—তার বাইরে—তার বেশী—কিছুই করেনি কংগ্রেস, কিন্তু আপোষবিহীন সংগ্রামের জোর আপনারাও তো সেটা করতে পারতেন। আজই না হয় বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে দেশের সঙ্গে।···কিন্তু এমন দিনও তো ছিল—দেশের ভাগ্য যখন কারো পকেটে ওঠেনি। রাজ-রাস্তায় পড়েছিল।

উত্তেজিত পূরবীর মুখ আরক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, আর তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তীব্রস্বরে বলে—বিদ্রূপটা যুক্তি নয়। ওটা যুক্তিহীনের শেষ অস্ত্র। কিন্তু আপনি কি মনে করেন চেষ্টার ত্রুটী হয়েছিল? আগষ্ট-বিপ্লবের স্বরূপ জানবার সৌভাগ্য বোধকরি হয়নি আপনার। ওই ঘরে বসে চরকাই ঘুরিয়েছেন।

বাসুদেব হেসে উঠলো।

কিন্তু পূরবী হাসলো না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—থাকতে পারে—তবে আমাদের সেটা জানা নেই। অন্ততঃ দেখতে পাই না কিছু। কিন্তু বিপ্লবী সেনারা সেদিন যা দেখিয়ে গেছে, একটা পরাধীন নিরস্ত্র জাতির পক্ষে কম গৌরবের নয় সেটা। তবু নিরস্ত্র। চেঁচিয়ে একটা কথা বলবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত নেই, দেশকে 'মা' বললে ফাঁসি হয়, "জন্মভূমিতে আমাদের জন্মগত অধিকার" এইটুকু দাবী ঘোষণা করতে গেলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়।…তবু সেই বীর-সৈনিকরা—বেয়নেটের জোরে যাদের লোহারগারদে আটক রাখা হয়েছিল—

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তাঁরা আজ লোহার গারদের বাইরে এসে দেশকে 'মা' বলবার সুযোগ পেয়েছে।… "জন্মভূমিতে আমাদের জন্মগত অধিকার" এইটুকু উচ্চারণ করার অপরাধে অন্ততঃ ফাঁসির দড়ি তৈরী হবে না তাদের জন্যে। পায়ের তলার মাটিটা তো পেয়েছেন? এইবার রইল আপনাদের লাঠি…যার নীতিতে তোষণও নেই পোষণও নেই, স্রেফ্ শাসনের ব্যাপার। করুন তার সদ্ব্যবহার। আচ্ছা—নমস্কার।

পূরবী উপযুক্ত উত্তরের অভাবেই হোক অথবা বাসুদেবের অকস্মাৎ বিদায় গ্রহণের ভঙ্গীতেই হোক চঞ্চল হয়ে বলে—ওকি আপনি চলে যাচ্ছেন না কি?

—আর কতক্ষণ ঝগড়া করা যায় বলুন? দিদিকে নমস্কার দেবেন।…আচ্ছা।

পূরবী কেমন ফ্যাকাশে দুর্ব্বল গলায় বললে—চলে যাচ্ছেন? বাঃ। তর্কের শেষ হল না কিন্তু—

—তর্কের শেষ? পৃথিবীর ইতিহাসে ওর নজীর আছে না কি?

উদাত্ত উদার হাসির আওয়াজটা মিলিয়ে গেল গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দে।…

গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল।

নিজের অজ্ঞাতসারে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পূরবী…ফিরে এসে বাসুদেবের পরিত্যক্ত চেয়ারখানাতেই বসে পড়ল।

অদ্ভুত লোক বটে।

এক কথায় উঠে চলে গেল। ভদ্রতার বালাই মাত্র নেই। আর একদিন আসবার জন্যে অনুরোধের পর্য্যন্ত অবকাশ দিলে না। অবশ্য আসা না আসায় কার মাথাব্যথা পড়েছে—তবে তর্কটা শেষ হ'ল না।…আর কিছু না, ওই তর্কে কোণঠাসা হবার ভয়েই চম্পট দিয়েছে। পূরবীর ইকে যে-সব যুক্তি যে-সব জোরালো ভাবা আছে সেগুলো তো প্রয়োগ করবার সময়ই পাওয়া গেল না। অথচ এমন ভাব দেখিয়ে গেল যেন ওই জিতেছে। রাগে হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে পূরবীর, বেশ কিছু কঠিন আর কঠোর দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে পেলো না বলে।

কী অহঙ্কার! দিদির অতো যত্নের দেওয়া খাবারগুলোর কথাই ধরো—যতো দেমাকে লোকই হ'ক একটু কিছুও তুলে মুখে দেয়। এমন দেশোদ্ধারের বহর যে কারুর অনুরোধেও একটুকরো সন্দেশ দাঁতে কাটা যায় না? স্রেফ ভণ্ডামী। গরীবের গায়ে কাদা ছিটিয়ে মোটর চড়ে বেড়াতে তো আদর্শের হানি হয় না?…আচ্ছা, সুযোগ পেলে এইসব ভণ্ডামীর খোলোস খুলে হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য! পূরবীদের সমিতিতে যে লাঠি ছোরা এবং আরো অনেক কিছু নিষিদ্ধবস্তুর আমদানি হয় জানলো কি করে? পুলিশের চর নয় তো? খদ্দরের ছদ্মবেশে? বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, চেহারাখানা তো দিব্যি। মুখ দেখলে—গুপ্তচর-বৃত্তির অনুপযুক্ত চেহারাখানা এবং নির্ম্মল কমনীয় মুখশ্রীটুকু অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলো পূরবী—মুখ দেখলে বোঝবার জো নেই তা ঠিক।

আচ্ছা, আলোচনার ধারাটা এলো কোন্ সূত্রে? পূরবী নিজে কি কি বলেছিল? একটু অসঙ্গত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল না? ছি ছি ভারী বিশ্রী হয়ে গেছে। অথচ ও যেন কথা কইছিল নিতান্ত অবহেলায়। তর্ক! আজ পর্য্যন্ত পূরবীকে কেউ এমনভাবে তর্কে হারিয়ে দেয়নি, সমিতির অতি উদ্ধত 'সুরমাদি'ও নয়।…আর ছেলেরা? বিকাশ, সুখেন্দু, সত্যব্রত, চিরঞ্জীব, পরিমল?…ঠোঁটের কোণে একছিটে হাসির আভাস দেখা গেল পূরবীর—তর্কে হারবে পণ করেই ওরা তর্ক আরম্ভ করে।

আজ একজন তর্কে হারিয়ে গেল পূরবীকে।

কিন্তু ঠিক কি তর্ক? না উপহাস?

সমস্ত চৈতন্য দিয়ে অকস্মাৎ অনুভব করলো পূরবী, আগাগোড়াই উপহাস করে গেছে বাসুদেব—অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা মাথায়।

মিসেস হালদারকে এনে যখন এ সংসারের মাটিতে রোপণ করা হয়েছিল, তখন অন্ততঃ মাধবীর ধারণা ছিল এ চারা—চারাতেই নির্ম্মূল হবে।…কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল কোন ভোজবাজির প্রভাবে সেই সদ্যরোপিত চারা শাখাপ্রশাখা-মণ্ডিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

বেতনভোগী শুশ্রূষাকারিণীমাত্র—মিসেস হালদারকে দেখে একথা বোঝা শক্ত। তিনি বাস করেন মাননীয়া অতিথির মর্য্যাদায়, এবং হুকুম চালান কর্ত্তৃত্বের ভঙ্গীতে। বোধকরি কেবলমাত্র ভারী ব্রাশ নয়—ভারী গড়নও এরকম অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠার একটা কারণ। তাঁর পেঁচিয়ে শাড়ীপরা আঁটসাঁট নিটোল দেহভঙ্গিমা যেন অহরহ ঘোষণা করছে নিজেকে।

প্রথম দিন এসেই—রোগীর ঘরের সাজসরঞ্জামগুলি নিরীক্ষণ করে মাধবীকে ডেকে পাঠালেন তিনি। চৌকো ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে তীব্র দৃষ্টি হেনে প্রশ্ন করলেন—আগে কে নার্সিং করে গেছে?

কৃশতনু মাধবী কুণ্ঠিত হয়ে বললে—আগে—মানে বাইরের কেউ নয়, আমি—আমরাই—করেছি বরাবর।

—হুঁ। আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম। মানে, নার্সিঙের কিছুই করেননি, করেছেন—'আহা উহু।' পেসেন্টের আত্মীয়রা যা করে থাকেন।

ঘরে ঢুকেই কি কি ত্রুটি আবিষ্কার করলেন ভদ্রমহিলা, বুঝে উঠতে না পেরে মাধবী বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকায়।

—একখানামাত্র রবার ক্লথ! অপরিষ্কার হয়ে গেলে আমাকেই ধুয়ে নিতে হবে বলুন? ঘরের মধ্যে একটা 'বেসিনে'র বন্দোবস্ত নেই, সর্ব্বদা বাইরে গিয়ে হাত ধুতে হবে? হাত-ধোবার জন্যে কোনো লোশনের ব্যবস্থাও তো দেখছি না।

মাধবী কুণ্ঠা কাটিয়ে বলে···বাবার তো কোনো ছোঁয়াচে অসুখ নয়—শুধু—

—থামুন—আপনি—ধমকে ওঠেন মিসেস হালদার—রোগমাত্রেই সংক্রামক, এই বিছানাটার মধ্যে কতো রোগের ব্যাসিলি আছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণা আছে আপনাদের? দাঁড়ান—আমি একটা ফুল্‌লিস্ট করে দিচ্ছি, নিয়ে যান, এখুনি আনিয়ে দেবেন সমস্ত জিনিস।···আর শুনুন—একটা ডেক্-চেয়ার আর টেব্‌লল্যাম্প চাই আমার।···দাঁড়ান সবটা না শুনেই চলে যাচ্ছেন কেন—বাংলা উপন্যাস আনিয়ে দেবেন খানকতক।

—বাংলা উপন্যাস? বিস্ময়চকিত মাধবী বলে—পড়ে শোনাবেন? কিন্তু বাবা তো—

—থাক্, আপনার বাবার কি অভ্যাস আছে না আছে সে আমি বুঝে নেব, পেসেন্টকে রীতিমত ষ্টাডি করতে হয় আমাদের, বুঝলেন?···হ্যাঁ ও বই আমার জন্যে। মনে রাখবেন নার্স হ'লেও আমি একটা মানুষ। কেবলমাত্র মশা তাড়িয়ে আর হাই তুলে রাতজাগা আমার কর্ম্ম নয়।

—না না সে কি, এখুনি আনিয়ে দিচ্ছি।···আচ্ছা তারও একটা লিষ্ট দিন না।

—ওর আর লিষ্ট কি, দু'চারখানা চাটুকা ডিটেক্‌টিভ নভেল বলে দেবেন।

পেন্ নিয়ে খস্ খস্ করে অনেক কিছু জিনিসের লিষ্ট একটা লিখে মাধবীর হাতে দিয়ে মিসেস হালদার ঈষৎ হাসির আভাস মুখে ফুটিয়ে তুলে বলেন—কাগজের এপিঠে যেগুলো লেখা থাকলো—টুথপেষ্ট ব্রাস টাওয়েল সোপ ইত্যাদি—ওগুলো আমার জন্যে। জিনিসগুলো যেন ভালো হয়। মানে বাজে মার্কা জিনিস আমি কখনো ইউস্ করতে পারি না।

নীচে নেমে আসতে উদ্যত মাধবীর পিছন থেকে মিসেস হালদারের শেষের কথাগুলো ভেসে আসে—আর শুনুন রাত্রে ভাত খাওয়ার অভ্যাস নেই আমার, লুচিই করতে বলবেন আপনার কুককে। আর বেলা কতকগুলো হাবিজাবি শাকপাতা পাঠাবার দরকার নেই, মাংস বা মাছের কারি একটু, খানকয়েক আলুভাজা—ব্যস্। কিন্তু দিনের বেলা ভাতের সঙ্গে মাংসটা আমার চাই-ই, বসে বসে ডাল চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খাওয়া আমার পোষায় না।

নীচে এসে দেখলে বিমলা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে মরে যাচ্ছে।

এতক্ষণে যেন আত্মস্থ হ'ল মাধবী, তীক্ষ্ণ-বিরক্ত সুরে ধমকে উঠলো—হাসছিস কেন অতো?

—তোমাদের নার্স ঠাকরুণের খাওয়ার ফিরিস্তি শুনে বড়দিদিমণি, তবে যে বললে বিধবা? 'মাংস চাই-ই চাই'?

—তুই আর বকিসনে বিমলা, ওদের আবার অতো বিচার আচার কিসের? বামুনের বিধবা নাকি?

—ওমা হালদার তো বামুনই হয় বড়দি?

—খৃষ্টান হলে আবার বামুন থাকে নাকি? যতো সব অভব্যি কথা তোর, যা এখন, দেখতো ঠাকুরের হেঁসেলে কি আছে।

—আছে সবই, এখন ওনার রুচলে হয়। তবে আমি বলি কি—হোটেলের খানা আনিয়ে দিয়ে পাপ চুকিয়ে দাও বাবা।···আচ্ছা তাও বলি—বাবু ওই খেষ্টান মাগীর হাতে খাবে?

—আমাদের দ্বারা যদি না হয়ে ওঠে, বাধ্য হয়েই খেতে হবে, উপায় কি?—বলে ভারী মুখে সরে যায় মাধবী। আগাগোড়া ব্যাপারটাই বিশ্রী লাগে তার।

চারাগাছের নমুনা এই।

তারপর কেমন করে এবেলা ওবেলা শাখা বিস্তার করে মহীরুহের সৃষ্টি হ'ল সে লিখতে গেলে মহাভারত।

আপাততঃ দেখা যাচ্ছে 'খেষ্টান মাগী' এখন বিমলার 'নার্সমাসীমা'তে পরিণত হয়েছেন। অবসর পেলেই তিন তলায় উঠে যায় বিমলা, আর ঘর সংসারের যাবতীয় গল্প করতে বসে তাঁর সঙ্গে।

নার্স হলেও তো মানুষ ছাড়া আর কিছু নয় মিসেস হালদার। সর্ব্বদা কিছু আর রুগীর ঘরে বসে থাকতে পারেন না? বিকেলের দিকে প্রসাধনের পর ডেক্-চেয়ারখানি বারান্দায় এনে পাতেন, সেখানেই বিমলার

আবির্ভাব ঘটে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর সব বিষয়ে 'মেম' নীতি অনুসরণ করলেও দোক্তা সম্বলিত পানটা ছাড়তে পারেন নি ভদ্রমহিলা, অথচ মাধবীর কাছে সে আর্জি পেশ করা চলে না। প্রেষ্টিজে বাধে।

তাই বিমলাকে হাতে রাখা।

—বড় জামাই তা'হলে আর আসে না—লিপষ্টিক-আঁকা-ওষ্ঠাধর বাঁচিয়ে সাবধানে একটিপ দোক্তা মুখে ফেলে দিয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটা করেন মিসেস হালদার।

বিমলা মাথা নেড়ে ফিস ফিস করে বলে—না, এই তিন চার বছর আর এ পথ মাড়ায়নি। আগে মাঝে মাঝে আসতো। বড়দি যে মরতে মলে সোয়ামীর ঘর করতে গেল না কি না, বেটা ছেলে কতো আর খোসামোদ করবে? রাগ হয় না?

—আমার তো মনে হয়, না-যাওয়ার কিছু কারণ আছে।

মিসেস হালদার নিজের সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেন।

—কারণ ওই—বিমলা হাত উল্টে হতাশ ভাবের অভিনয় করে—বাপের অসুখ—সোমত্ত বোন—সংসার দেখবে কে—এইসব।

—ও সব ছেনালি বুঝতে বাকি নেই আমার, নিশ্চয় কারুর সঙ্গে প্রেম-ট্রেম হয়েছে।

কথাটা এত বড় মিথ্যা যে মিসেস হালদারের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের খবরেও সায় দিতে পারে না বিমলা, ঘাড় নেড়ে বলে —না সে দিকে ভালো আছে, উঁচু দিকে দিষ্টিটি নেই, সে বরং ছোটটি। মেয়ে নয় তো জাঁহাবাজ! এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, রাজ্যির ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশছে।...একটা ছোঁড়া তো নিত্যই আসছে বাড়ীতে। এলে তার রক্ষা নেই, দু'ঘণ্টা কেটে যাবে।

—ইনি কিছু বলেন না?—'সোমত্ত বোনের অভিভাবিকা' দিদি ঠাকরুণ?

—বলবে কি? যে পাহাড় মেয়ে! এদিকে ভাব দেখাবে খুকীর মতোন। এখনকার মেয়েদের কথা আর বলবেন না মাসীমা। খাবেন না কি আর পান? বলেন তো সাজি।

—সাজো দু'টো। কিন্তু এর একটা বিহিত করা দরকার তো?

—কিসের?—বিমলা অবাক হয়ে তাকায়। কর্ত্তার হিতের ভার নিয়েছেন বলে কি সংসারের বিহিতের ভারও নেবেন ইনি!

—এই বড়ো মেয়েটির কথা বলছি। এভাবে বাপের বাড়ীতে শেকড়গেড়ে বসে থাকলে পাঁচজনেই বা বলবে কি? ছোটটার তবু বিয়ে টিয়ে হয়ে যাবে, কিন্তু ইনি তো দেখছি চিরদিন বাপের স্কন্ধে থাকবেন।

মাধবী যদি নিজের বাপের স্কন্ধে থাকেই তাতে মিসেস হালদারের ক্ষতি বৃদ্ধি কি সেটা চট্ করে বুঝতে না পেরেই বোধ করি বিমলা অমায়িক মন্তব্য করে—তা সোয়ামীতে না নিলে বাপভাই ছাড়া আর কে দেখবে? মেয়ে মানুষ অপরের গলায়-কণ্টক বৈতো নয়।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে নিঃশব্দে নীচে নেমে যায় মাধবী। বাপের কুশল প্রশ্নটুকু করতে আসা কর্ত্তব্য হিসেবেই বিকেলের দিকে একবার তিনতলায় ওঠে সে—বাপের ঘরে মিসেস হালদারের অনুপস্থিতির সুযোগে।

আজ আর কুশল প্রশ্ন করা হল না...সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই যে বারান্দাবর্ত্তিনীদের আলাপ আলোচনার রেশ কানে না গিয়ে উপায় থাকে না।

বিমলাকে তাড়ানো অসম্ভবপর নয়, এখন হয়তো সেটুকু ক্ষমতা হাতে আছে। কিন্তু মিসেস হালদার?

মিসেস হালদারের বিষয় যে সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না, একথা আর এখন অস্বীকার করা মিথ্যা। বাড়ীর ঝি চাকররাও সে কথা বোঝে। পঙ্গুদেহ ব্রজমোহনের হৃদয়-বৃত্তিটা যে এখনো এতো সতেজ ছিল, সেই কথাটাই শুধু আগে বুঝতে পারিনি কেউ।

এখন আর প্রতিকারের উপায় নেই।

তা'ছাড়া—উপায় থাকলেই বা হাত আছে কার?

এতোদিন পরে হঠাৎ মায়ের জন্যে বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠে কয়েকফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে মাধবীর বড়ো বড়ো কালো দুটি চোখের কোল বেয়ে।

স্বামীকে কি তবে চিঠি দেবে মাধবী?

বলবে—'আমায় নিয়ে যাও এখান থেকে'। বলবে—'আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি'।...কিন্তু শ্রীমন্ত কি এখনো বসে আছে মাধবীর প্রত্যাশায়? মাধবীর কবে কাজ শেষ হবে সেই আশায় দিন গুণছে? ছি ছি...তার চেয়ে মরা ভালো—

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাস দেখা দিল মাধবীর।

এতোই বা ভাবনার কি আছে? মরণটা যখন এখনও পর্য্যন্ত ইচ্ছাধীন রয়েছে মানুষের।

বিমলা নেমে গেলে মিসেস হালদার ধীরে-সুস্থে তারী দেহখানি ছোট্ট ডেকচেয়ার থেকে টেনে তুলে কেশবেশের কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করে রোগীর ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললেন।

ব্রজমোহন চুপচাপ পড়েছিলেন এতক্ষণ, এবং মনে মনে বোধ করি বিমলাকে শাপ-শাপান্ত করছিলেন। মিসেস হালদারকে দেখে নিজস্ব অভিমান প্রকাশের ভঙ্গীতে মুখটা দেওয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

মিসেস হালদার মনে মনে হেসে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—মিষ্টার ঘোষাল, আপনার এবার জুস্‌টা খাওয়ার সময় হয়েছে।

—থাক্, পরে হবে। ব্রজমোহনও গম্ভীর ভাব প্রকাশ করেন।

—বেশ জুস্‌টা যদি এখন না খান তো একটু কোকো করে দিই?

—কিছু দরকার নেই।

—আজকে তা'হলে খিদে হয়নি?...কিন্তু কেন বলুন তো?

কণ্ঠস্বরে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করে মিসেস হালদার চেয়ারটাকে খাটের কাছে টেনে নিয়ে বসেন।

—কে বললে খিদে হয়নি? খাবো না আমার ইচ্ছে—ব্যস।

—তা'হলে তো আমার পক্ষে মুস্কিল। পেসেণ্ট নিজের ইচ্ছেয় চললে আমাদের করবার কিছুই থাকে না। অবশ্য আমাকে যদি কর্ত্তব্য থেকে অবসর দিতে চান সে আলাদা কথা।

—তাই বলেছি আমি?

দ্বিতীয়বার মুখ ফেরান ব্রজমোহন।

—বলেননি বটে। কিন্তু আমার কাজে যদি সন্তুষ্ট না হ'ন, কেন রাখবেন বলুন? টাকার বিনিময়ে কাজ নেবেন আপনি, যেখানে ভালো কাজ পাবেন—

—ফের ওই রকম কথা বলছো? জানো এরকম কথা বললে—

—কি করবো বলুন? আপনি বলাচ্ছেন যে। মানলাম আমার টোয়েন্‌টি ফোর আওয়ার্সের ডিউটি, কিন্তু একটা রক্তমাংসের মানুষ টোয়েন্‌টী ফোর আওয়াস কর্ত্তব্য পালন করতে পারে না নিশ্চয়? তারও কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।

অবশ্য প্রতিবাদের উপযুক্ত কথার অভাব ব্রজমোহনের ছিল না, কারণ রাত্রির নিরঙ্কুশ নিদ্রার সময়টুকু বাদ দিলেও দিনের বেলা দিবানিদ্রা, প্রসাধন, স্নান, আহার, ডিটেকটিভ নভেল প্রভৃতির ডিউটি সেরে ব্রজমোহনের প্রতি ডিউটি পালন করবার মতো সময় কমই উদ্বৃত্ত থাকে মিসেস হালদারের।

কিন্তু ব্রজমোহনের সে সাহস নেই, উপযুক্ত উত্তর দেবার। তাই ক্ষুব্ধস্বরে বলেন—আমি কি কেবল টাকার অঙ্কটাই দেখি, আর কাজের হিসেব কষি? দেনা পাওনা আর ব্যবসাদারীর সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নেই সংসারে?

চৌকো ফ্রেমের চশমার মধ্যে থেকে একটি বিলোল-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মিসেস হালদার উত্তর দেন—তা'ছাড়া আর 'কি সম্পর্ক মিষ্টার ঘোষাল? আপনি কাজের পরিবর্ত্তে টাকা দেবেন, পছন্দমত কাজ না হলে—

—আঃ লীলা, তুমি কি আমায় দগ্ধে মারতে চাও? আমি কতো দুঃখী কতো অসহায় দেখে তোমার দয়া হয় না? তখন থেকে যে অপেক্ষা করে রয়েছি তোমার জন্যে সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা কি সত্যিই নেই তোমার?

চেয়ারটাকে আরো একটু ঘনিষ্ঠ করে না আনলে, সুগন্ধি-সিক্তি ছোট্ট রুমালটুকু দিয়ে পেসেণ্টের কল্পিত অশ্রুর রেখা মুছিয়ে দেওয়া যায় না। ঘনিষ্ঠ হয়ে ব'সে প্রায় ব্রজমোহনের মতোই হতাশ করুণ সুরে নার্স বলেন—বুঝবো না কেন মিষ্টার ঘোষাল? বুঝি বৈ কি। মাইনে করা নার্স বলে তো সত্যি পাষাণ নই আমি, কিন্তু ভেবে দেখুন—আপনি আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখলেও বাড়ীর সকলে তো আর মাইনে করা লোকের চাইতে বেশী মর্য্যাদা দেবে না? বরং আপনি স্নেহ করেন বলে আরো বেশী করে—

—কে কি বলেছে তোমাকে? কে তোমার অমর্য্যাদা করেছে শুনতে চাই?—নিজস্ব পুরণো ভঙ্গীতে—যেটা মিসেস্ হালদারের অজ্ঞাত—রাগে ফুলে ওঠেন ব্রজমোহন—শুনতে চাই, কে তোমার অমর্য্যাদা করেছে? সে যেন জেনে রাখে এ বাড়ীতে তার স্থান হবে না।...

—আ ছি ছি, থামুন মিষ্টার ঘোষাল, থামুন। চেঁচাবেন না, এখুনি হয়তো হার্ট ট্রাবলস্ হবে।...সত্যিই তো আমি একটা বাইরের লোক, আমাকে সহ্য করতে নাও পারে সকলে—

—আলবাৎ সহ্য করতে হবে। সহ্য করতে বাধ্য।...যে না সহ্য করতে পারবে, তাকে পথ দেখতে হবে—আমার এই সাদা কথা।...যে যার আপন আপন সুখ নিয়ে মত্ত, একটা অক্ষম রুগী, তা'র দিকে দৃষ্টি মাত্র নেই কারুর, আবার সর্দ্দারী! তুমি না এলে আমি মারা যেতাম লীলা, নিশ্চয় মারা যেতাম। তুমি আমায় ছেড়ে গেলে—আমি বাঁচবো না।

সিঁড়িতে কার একটা লঘু পদশব্দ মিলিয়ে যায়।...

দিন সাতেক পরে নেহাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে বাপের তত্ত্ববার্ত্তা নিতে আসছিল পূরবী।

বাড়ী থেকে পরোয়ানা এসেছে—বাসুদেব পড়লো মুস্কিলে।

জন্মাষ্টমী এ বাড়ীর প্রধানতম উৎসব।

গত বৎসর এ সময় বাড়ী যায় নি বাসুদেব, তাই বিভাবতী এবারে মাথার দিব্য দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। বাড়ী না গেলে বাসুদেবকে তিনি আস্ত রাখবেন না, রসাতল করে ছাড়বেন।

গতবারে সময়টাতে ছিল বোলোই আগষ্টের বিভীষিকা, না যাওয়ার ছুতো ছিল, বা কারণ ছিল, কিন্তু এবারে—মাকে কি জবাব দেবে বাসুদেব? অথচ—ঠিক ওই দিনটাতেই পড়ছে ওদের কমিটির একটা বিশেষ অধিবেশন।

অবিশ্যি বাসুদেবের অনুপস্থিতিতে অধিবেশন বন্ধ থাকবে বা কমিটির কাজ অচল হয়ে পড়বে, এমন কথা ভাবে না বাসুদেব, কিন্তু ওর নিজের একটা দিক আছে তো? নিজের দিক থেকে ত্রুটি হ'তে দেবে কেন?

কমিটি সেদিন দেশের নতুন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কয়েকটা বিশেষ কার্য্যসূচি নির্দ্ধারণ করবে, কাজ ভাগ করে দেবে কর্ম্মীদের, কাজেই—অনুপস্থিত থাকাটা বাসুদেবের পক্ষে শুধু অস্বস্তিকর নয়, লোকসানও।

অথচ দ্বিতীয় কারণটাও তুচ্ছ নয়।

এতো শুধু 'নীলকান্তজীর' জন্মোৎসবে অনুপস্থিত থাকা নয়—বিভাবতীর ডাককে অগ্রাহ্য করা! পাছে না যায় তাই আগে থেকেই হাল ধরেছেন যে তিনি।

এ দাবীকে তুচ্ছ করবে কোন সাহসে? মাকে এতোটা মনঃক্ষুণ্ণ করতেও প্রাণ সায় দেয় কই?

একেই তো বিয়ের বিষয়ে মাকে যথেষ্ট হতাশ করে রেখেছে—তা'র ওপর আবার যদি প্রত্যেকটি ছোট ছোট বিষয়েও হতাশ করতে হয়, নিজেকেই বা ক্ষমা করবে কি করে?

বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা যতোই তীব্র হো'ক, মাকে বাদ দিয়ে—মার ইচ্ছে অনিচ্ছেকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে—কোন জীবনই কাম্য নয়। দেশ বৃহৎ, কিন্তু মা-ই কি ক্ষুদ্র?

শেষদিন পর্য্যন্ত ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির করলো বাসুদেব।

অনেক জায়গা ঘুরে অনেক বেলায় বাসায় ফিরেই বৃন্দাবনকে ডাক দিলে—বাবা বৃন্দাবন, চলো বাবা শ্রীধামে যাই। 'নীলকান্তজী' আমার বিরহে অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন, জন্মতিথির নেমন্তন্ন না খাইয়ে ছাড়বেন না।

বৃন্দাবন বাসুদেবের ছেলেবেলার চাকর। বিশ্বাস করে ওর হাতেই ছেলেকে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন বিভাবতী। অবিশ্যি বৃন্দাবন ওকে এঁটে উঠতে পারে না। নিয়মিত স্নানাহারের আশায় হতাশ হয়ে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে বেচারা। সারাদিনের মধ্যে যে কোনও সময় একবার এসে ও পাপটা চুকিয়ে গেলেই যথেষ্ট ভাগ্য মানে।

জন্মাষ্টমীর কথা বৃন্দাবন নিজেই আগে তুলেছিল—এবং বিরুদ্ধার্থক উত্তর শুনে তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে বেড়াচ্ছিল ক'দিন। এখন আশাজনক ভাষা শুনে ভিতরে কিছু উৎফুল্ল হলেও, বিশ্বাস করার চাইতে অবিশ্বাস করাটাই মর্য্যাদা-বর্দ্ধক, এই হিসেবে অগ্রাহ্য ভাবে বলে—'নীলকান্তজীর' তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তোমার জন্যে হেদিয়ে মরছেন। নাও চান-টান করে উদ্ধার করো দিকিন। এ ভাবে বেলা করলে বামুন-ঠাকুরকে আর টেঁকিয়ে রাখতে পারবো না তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।

—তোরা খাস্‌নি তো?

—হ্যাঁ বসে আছি খেয়ে দেয়ে—ব'লে বিরক্ত ভাব দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল বৃন্দাবন, বাসুদেব রাগ করে বলে—আছিস তো শুকিয়ে, আম্‌সি হয়ে? কেন, বলেছি না সেদিন—যে ফের যদি তোরা না খেয়ে বসে থাকবি, খাবোই না সেদিন।

—খেয়োই না—বয়েই গেল—বৃন্দাবন সতেজ ভঙ্গীতে বলে—উপোসের বিদ্যে তোমার একচেটে নয়। হাঁড়ি শুদ্ধু ভাত ঠাকুরকে গিলে নিতে বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবো—ব্যস্ মিটে গেল ল্যাঠা।

—তুমি যেমন জ্যাঠা—বাসুদেব হো হো করে হেসে উঠে বলে—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। দাও এখন আনো দিকিন তোয়ালেখানা, জল আছে চৌবাচ্চায়?

—আমি কি করে জানবো। দেখো গে যাও নিজে। চৌবাচ্চায় জল ভরে রাখতে আমার দায় পড়েছে।

—তবে আমারও দায় পড়েছে নাইতে খেতে। এই শুলাম।...

বৃন্দাবন চেঁচামেচি করে বলে ওঠে—খবরদার বলছি খোকা, আর দেরী করবে না। রসাতল করবো আমি।...বলি চব্বিশ ঘণ্টা কি এতো কাজে টো টো করে ঘুরে বেড়াও বলো দিকিন আমায়? ওই তো তোমাদের দলের একটা মেয়ে এসেছিল সকালে, কই—

—আমাদের দলের মেয়ে? সে আবার কে রে? কি রকম দেখতে?

—দেখতে তো দিব্যি। কিন্তু সেই মেয়েই তো বললে—'তোমার বাবুর এতো কি কাজ?' কখন যাও কখন আসো সব খোঁজ করছিল—

বাসুদেব হাত তুলে বলে—থাম্ বাবা থাম্, বেগে মেল থামা—বুঝতে দে দিকিন—'দলের মেয়ে' আবার কে। রোগা দাঁত উঁচুগোছের কি?

—বোকো না বাবু। বললাম না দেখতে দিব্যি।

—নাম জিগ্যেস করেছিলি?

—ভদ্দরলোকের মেয়ের নাম জিগ্যেস করবো মানে? এ কি আমাদের শিবসাগর? তুমিই তো মানা করে দিয়েছ ভদ্দরলোকের নাম জিগ্যেস করতে। তাতে নাকি 'এটিকেটি' থাকে না।

বাসুদেব হেসে উঠে বলে—রক্ষে কর বাবা বৃন্দাবন, আর 'এটিকেটি' শিখো না, নামই জিগ্যেস করো তুমি। কে আবার এলো বুঝতে পারছি না। কিছু বললে?

—বলবে না কেন? কতো কথা বললে। তোমার ঘরে গিয়ে খাতাপত্তর দেখলে—

—খাতাপত্তর ? সে কি রে ?···চমকে উঠলো বাসুদেব, রে বললে—তুই তাকে চিনিস্ না জানিস না, একেবারে ঘরে ঢুকতে দিলি, খাতাপত্তর দেখতে দিলি—এর মানে কি ? বুদ্ধিসুদ্ধি কি ঘোল হয়ে যাচ্ছে নাকি দিন দিন ?

—ঘোল কি দই তা জানি না বাপু, বললে,—'তোমার বাবুর ঘরটা দেখে আসি চলো—আর একটু চিঠি লিখে রেখে যাই' আমি কি বলবো—'না বাছা তোমার ঘরে-টরে ঢোকা হবে না ? কি জানি চোর কি ছ্যাচোড়'—

শেষ কথাটায় কান না দিয়ে বাসুদেব তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে চিঠির সন্ধানে।···কে ? কে ? কে ?

কে এসেছিল বাসুদেবের সন্ধানে ? কে ছুতো করে ওর ঘর দেখে গেল।···

না, অনুমানে ভুল হয় নি।

হঠাৎ যে-সম্ভাবনায় সমস্ত মন থর থর করে উঠেছিল—সেই ভাবনাতীত সম্ভাবনাই সত্য হয়ে উঠেছে।

পুরবী। পুরবীই বটে।

দু'ছত্র লিখে রেখে গেছে। টেবিলের ওপর নয়—বিছানার ওপর। অনেক জঞ্জালের স্তূপে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে হয় তো।···কিন্তু কোথায় বসে লিখেছিল ? বিছানায় ? বৃন্দাবনকে কি জিগ্যেস করা চলে ?···দূর ছাই যেখানেই বসুক না বাসুদেবের কি ?

না, ধাতস্থ হ'তে বেশী দেরী লাগে না বাসুদেবের। একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদে অবাক হয়ে গিয়েছিল বলেই মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। চিঠিটা তুলে নিতে কেঁপে উঠেছিল আঙুলের ডগা।

কিন্তু হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা করা অন্ততঃ দেশকর্ম্মীর শোভা পায় না। তাই সহজ অনাগ্রহে পড়তে হয় চিঠিটা।

আশ্চর্য্য !

দেবতা আর মানুষ ষড়যন্ত্র করে একদিনে জন্মোৎসব করবার সিদ্ধান্ত করেছে নাকি ? 'নীলকান্তজীর' জন্মদিনে জন্মাবার কী দরকার পড়েছিল ওর ?

কী দরকার পড়েছিল সেই বিশেষ তিথিটিতে একমাত্র অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানাবার বাসুদেবকে ?

বৃন্দাবন উঁকি মেরে মিটিমিটি হেসে প্রশ্ন করলে—কি গো, তোমার রাজ-ঐশ্বয্যি কিছু চুরি-টুরি গেছে নাকি ? বিশ্বাস নেই বাবা জগতের কাউকে। ভদ্দরলোকের মতো—

—বাজে বকিস নে বৃন্দাবন, থাম।

চিঠিটা বালিশের তলায় রেখে দিয়ে বাসুদেব খাটের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে আলস্য ভেঙে বলে—তেল-টেল একটু দেনা রে, নাইতে খেতে হবে না আজ ?

—লীলাময়ের লীলা।—বলে দুই হাতের ভঙ্গীতে অনেক কিছু ফুটিয়ে তুলে বেরিয়ে যায় বৃন্দাবন।

খেয়ে এসে বালিশের তলা থেকে চিঠিখানা টেনে বার করে আর একবার চোখের সামনে মেলে ধরলো বাসুদেব ভাষাটা কি অবোধ্য ? বার বার না পড়লে হৃদয়ঙ্গম হয় না ?

ভাষাটা না হো'ক ভাবটা অবোধ্য বৈ কি।

এতো অজস্র বন্ধু থাকতে বেছে বেছে একলা বাসুদেবকেই বা নিমন্ত্রণ করলো কেন পুরবী ? কৌশলে সে সংবাদটুকু প্রকাশ করতেও দ্বিধা করেনি। অথচ বাসুদেবকে বন্ধু পর্য্যায়ে ফেলতে গেলে নিতান্তই সত্যের অপলাপ করা হয়। বরং প্রতিপক্ষ বলাই ঠিক। যে ক'দিনই দেখা হয়ে গেছে দু'জনের, তর্ক বেধে যেতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নি।

সত্যি কথা বলতে গেলে—তর্ক তোলে পুরবীই, এবং যুক্তি তা'র দিকে যতো হালকা হয়ে আসে, উক্তিটা হয় তার ততো জোরালো। শেষ পর্য্যন্ত কলহের কাছাকাছি।

কিন্তু তবুও যায় বাসুদেব।

যায়—বোধকরি তর্কের নেশায়। তর্কেরও একটা নেশা আছে বৈ কি। যে সত্য নিজের ভিতর থাকে অস্ফুট হয়ে, যে যুক্তিতত্ত্ব ধূমায়িত হয়ে থাকে মনের মধ্যে, প্রতিকূল তর্কের বাতাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা'রা।

পাথরে শান দেওয়া অস্ত্রের মতো বুদ্ধির দীপ্তি ঝিলিক মেরে ওঠে তর্কের শানে। কিন্তু বাসুদেব কি মনে মনে পুরবীকে সত্যিই প্রতিপক্ষের সম্মান দেয় ? বাসুদেব তো জানে—পুরবীদের যে দল তাকে ওরা নেহাৎ নাবালক বলেই গণ্য করে। বিরক্তিকর নাবালক, যাদের বিবেচনাহীন অতি উদ্ধত দুষ্কর্মগুলো তা'দের কাজে বিঘ্ন ঘটায় মাঝে মাঝে যেমন—গৃহ কর্ম্মে শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটায় অবুঝ শিশুর দুরন্তপণা। পুরবীর মতো মেয়েছেলেরাই এই সব দলে এসে ভিড়ে যায় যাদের ভিতরে ছটফট করছে অকারণ চাঞ্চল্য, টগবগ করে ফুটছে রক্ত। ওদের কথায় তাই—তেজের চাইতে বেশী ঝাঁজ, কাজে—উৎসাহের চাইতে বেশী উগ্রতা। নিজের শক্তির দৈন্যে ওরা ক্ষুব্ধ নয়, নিজের শক্তির অহঙ্কারে মত্ত।

দেশকে চমক লাগিয়ে দেবার মিথ্যা আশায় ধমক লাগিয়ে বেড়ায় দেশ-সুদ্ধ লোককে।

তবু কেন ভালো লাগে সেই অযথা তর্ক ? কেবলমাত্র তর্কের নেশায় ?

ওদের দলের কোনো ছেলেকে একদিনের জন্যও কি সহ্য করা সম্ভব ছিল ? বিবেচনার বালাইহীন ভাবের ফানুসকে ?

চিঠিটা মুচড়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো বাসুদেব।

নেশা যারই হোক, ছাড়তে হয়। দেশ-কর্ম্মীর জীবনে নেশাটা বেমানান।

আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে গায়ে দিতে দিতে ডাক দিলে—বৃন্দাবন। বৃন্দাবন গম্ভীরভাবে এসে দাঁড়ালো। দেশে যাওয়ার কথাটা একবার উঠেই থেমে গেল, খেতে বসে খোকা তা'র সঙ্গে বাক্যালাপ মাত্র করলো না, এটা তার পক্ষে মানহানিকর নয় কি?

অতএব গম্ভীর হওয়াটাই তার পক্ষে মানানসই।

বৃন্দাবনের ভাবান্তরে লক্ষ্য রাখবার মতো মনের অবস্থা তখন নয় বাসুদেবের, তাই অন্যমনস্কের মতোই বলে—কালই যাবার ব্যবস্থা করে রাখিস্ বৃন্দাবন, সকালের গাড়ীতে। আমি বেরোচ্ছি এখন, আসতে দেরী হতে পারে, টাকার দরকার থাকে তো নিস্, ড্রয়ারে রইল।

—আবার এই দুপুর রোদ্দুরে বেরোনো হচ্ছে কোথায়—পেটের ভাত কটা চাল করতে?

—দুপুর? দুপুর কোথায় রে? চারটে বাজলো।

বৃন্দাবন অস্ফুট স্বরে কি মন্তব্য করলো সেটা শ্রুতিগোচর না হলেও প্রীতিকর যে নয় তা' বুঝতে দেরী হয় না। তবু দ্বিতীয় কথা না বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো বাসুদেব। শ্রীমন্তদার সঙ্গে একবার দেখা করে না গেলেই নয়।

সত্যি কথা বলতে গেলে, শ্রীমন্তদার চোখে খেলো হয়ে যাবার ভয়টা বোধ করি দেশের কাজে ত্রুটি হবার চাইতে বেশী অস্বস্তিকর।

শ্রীমন্তর মতো কঠোর কর্ম্মীর কাছে কোনো দুর্ব্বলতাই প্রকাশ করতে সাহস হয় না। নীলকান্তজীর জন্মোৎসব পালন করতে দেশে যাওয়াটা যে একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার, এটা বোঝানো কি সোজা কথা?

তবু বোঝাতেই হবে। হয় তো শুধু শ্রীমন্তকে নয়, নিজেকেও।

মার ডাককে অগ্রাহ্য করে এখানে থেকে, কোনো কাজে মন লাগাতে পারবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না যেন। কোথায় যেন জেগেছে চাঞ্চল্য, সুস্থির হ'তে দিচ্ছে না সে বাসুদেবকে।

শ্রীমন্তর মেসে এসে দেখলে পাখী পলাতক।

পাশের ঘরের বিজনবাবু বললেন—নেই না কি? এই তো ছিলেন। ভদ্রলোক যে কখন আসেন, কখন যান, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান, তার কিছু যদি ঠিক আছে। কি যে আপনাদের কাজ আপনারাই জানেন মশাই। স্বরাজ তো পেয়ে গেলেন, তবুও এতো কিসের খাটুনি? হাত পা মেলিয়ে দু'দিন জিরিয়ে বাঁচুন, তা' নয়।

উত্তরের যোগ্য কথা নয় তাই সামান্য একটু হেসে বাসুদেব শ্রীমন্তর ঘরে এসে বসলো।···কি করবে? পুরবীর মতো চিঠি লিখে রেখে যাবে?

আশ্চর্য্য। পুরবী এসে বাসুদেবের ঘরে বসেছিল? যেমন বাসুদেব এসে বসেছে শ্রীমন্তর ঘরে? বাসুদেবের তো রীতিমত বিরক্তিই লাগছে অপেক্ষা করতে, পুরবীরও লেগেছিল—বাসুদেবের অপেক্ষায় বাসুদেবের ঘরে বসে থাকতে?

কতোক্ষণ বসেছিল পুরবী? কতো যুগ বাইরে ছিল বাসুদেব?···

সকালের দিকে কি কি কাজে ব্যস্ত ছিল বাসুদেব মনে করতে পারে না। খুব বেশী প্রয়োজনীয় কাজ কি?···এমন কি হ'তে পারতো না যে বিশেষ কোনো কাজের অভাবে বাড়ীতেই বসে থাকতো সকাল বেলাটা? কিম্বা হঠাৎ বাড়ী ফিরতো বিশেষ কোনো দরকারে?···

জন্মতিথিটা কবে? পর্শু বুঝি?···নিমন্ত্রণটা সন্ধ্যায়। সন্ধ্যার দিকে হয় তো একটু অপেক্ষা করবে। কে না করে থাকে নিমন্ত্রিত অতিথির আসার অপেক্ষায়।···নিমন্ত্রিত অতিথি? তা' ছাড়া আবার কি।

পুরবী লিখেছে—'নির্ভয়ে আসবেন, মহার্ঘ্য কোন খাদ্যের আয়োজন করবো না আপনার জন্যে। স্রেফ লপ্‌সি। খদ্দরধারীদের যা চিরদিনের খাদ্য ছিল।···তাই একলা আপনাকেই ডাকলাম সভার শোভাবর্দ্ধন করতে।'

এটুকু শ্লেষ না করে থাকতে পারেনি পুরবী। বাসুদেবকে যে কোনো দিন কিছু খাওয়াতে পারেনি, এই ওর দারুণ অভিমান।

কিন্তু বাসুদেব ওর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে কি বলে?··· কেবলমাত্র আহার্য্য বস্তুর মহার্ঘ্যের প্রশ্নই তো নয়, শ্রেণী বিচারের প্রশ্নই যে প্রধান।

বিভাবতী শুনলে কি ক্ষমা করতে পারবেন ছেলেকে?··· ছেলের এই ধর্ম্মাধর্ম্মহীন অনাচারকে?···হয় তো বিশ্বাস করবেন না। হয়তো পাথর হয়ে যাবেন, হয়তো ছেলের অনাচারের প্রতিবাদে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসবেন নিজের অনশন দিয়ে।···

বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব তো পুরবীদের জানার কথা নয়—জানার কথা নয় বাসুদেবের সংস্কারের, কাজেই ওরা যা খেতে দেবে, সেটা ভদ্রসমাজের যোগ্য হলেও বৈষ্ণবসমাজে অচল।

বাসুদেবের সংস্কার তো আচারে অনাচারে নয়, মাতৃহৃদয়ে আঘাত দেবার ক্ষমতা নেই বলেই সংস্কারের দাসত্ব।

—কি হে একেবারে যে ধ্যানস্থ?···দিবানিদ্রাটা কি এখানেই সমাপ্ত হ'ল?···

ধড়মড় করে উঠে বসলো বাসুদেব। শ্রীমন্ত ডাকছে পিঠে থাবড়া মেরে।

কী সর্ব্বনাশ। ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? গভীর চিন্তা কি শেষ পর্য্যন্ত গভীর নিদ্রায় পর্য্যবসিত হয়ে গিয়েছিল?

—এই যে শ্রীমন্তদা, আপনার জন্তে বসে থেকে থেকে তো পিঠে ঘুণ ধরে গেল, কোথায় থাকেন বলুন তো ?

—জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে, কোথায় নয় ?…কিন্তু এমন কি জরুরী দরকার পড়লো ?—শ্রীমন্ত সোজাসুজি শুয়ে পড়লো চিরবিস্তৃত শয্যায়।

—দরকারটা দরকারটা হচ্ছে—একটু ইতস্ততঃ করে বাসুদেব বলে ফেলে—আট তারিখে আমি থাকছি না।

—সে কি হে, কেন ?—শ্রীমন্ত উঠে বসলো—কি আবার তোমার রাজকার্য্য পড়লো সেদিন ?

—মা লিখেছেন বাড়ী যেতে।

—এই কথা। ন'তারিখে গেলেই হবে, ওর আর কি ?… তোমার ওপর অনেক কিছু কাজের ভার দেব ঠিক করে রেখেছি।

—কিন্তু শ্রীমন্তদা, আট তারিখের মধ্যে না গেলে যাওয়ার কোন অর্থ থাকবে না।

—কেন বলো তো হে ?—শ্রীমন্ত সন্দিগ্ধ সুরে বলে—ব্যাপারটা যেন ঘোরালো ঠেকছে। ছাঁদনাতলা প্রস্তুত না কি ?—"বাপজীবন বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে বাড়ী আসিবা —?"

—ধ্যেৎ, কথাটা হচ্ছে—এই-ইয়ে—জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিশেষ একটা উৎসব হয় বাড়ীতে, আমি না গেলে মা'র বেজায় মন কেমন করবে, হয়তো কাঁদতেই বসে যাবেন।

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে শ্রীমন্ত আবার বিছানায় লম্বা হয়ে বলে—তবে আর কি করা যাবে, চালিয়ে নেব সবাই মিলে। তোমার অনুপস্থিতিতে আমরা অন্ততঃ কাঁদবো না এটা ঠিক।

বাসুদেব অপ্রস্তুত ভাবে টেবিলের উপরকার বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলে—মার মনে কষ্ট দিয়ে কিছু করতে মনটা কেমন যেন সায় দেয় না শ্রীমন্তদা।

—কী মুস্কিল, কে বলছে কৈফিয়ৎ দিতে ? কাঁদবার মতো একটা লোক থাকাও অনেক ভাগ্যের কথা হে।

বাসুদেব ভেবেছিল হয় তো অনেক তর্ক করতে হবে শ্রীমন্তর সঙ্গে, ওর এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শানানো যুক্তি প্রয়োগ করবে শ্রীমন্ত, খণ্ডন করতে বেগ পেতে হবে বাসুদেবকে—কিন্তু কিছুই হল না।

আর বসে থেকেই বা লাভ কি।

—শ্রীমন্তদা, যাচ্ছি।…শ্রীমন্তদা। বাঃ আপনিও যে এখুনি ঘুমিয়ে পড়লেন ?

—ঘুম ?…নাঃ। শরীরটা কেমন—শ্রীমন্ত উঠে বসবার চেষ্টা করেও শুয়ে পড়ে বলে—সামনের জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে যেয়ো তো, চোখে আলোটা ভালো লাগছে না।

বাসুদেব উদ্বিগ্নভাবে বলে—আপনার কি অসুখ করেছে শ্রীমন্তদা ?

—আরে না না। এমনি রোদে ঘুরে এসে…আচ্ছা, বিজনবাবুকে একবার বলে যেয়ো তো আমি ডেকেছি।

ডেকে দেবার সময় শ্রীমন্তর শরীরের বিষয় উল্লেখ করতে ভোলে না বাসুদেব।

বিজনবাবু হতাশভাবে দুই হাত উল্টে বলেন—শরীর আর খারাপ হবে না মশাই ? ভালো থাকে এই আশ্চর্য্যি। বড় লোকের ছেলে—আরামে লালিত পালিত শরীর—তাকে নিয়ে এই ঘোড়দৌড় করে বেড়ানো। বাবা স্বরাজ পেলি, হিন্দু মুসলমানের মিল হ'ল, আবার ভূতের ব্যাগার খেটে মরা কেন। দেশ ভাগ হলো, যে যার ধান্ধা বুঝে পড়ে নেবে, তা'নয়—তোরা যাবি তা'দের হিল্লে করতে। বানে ভেসে গেল দেশকে দেশ, তোরা যাবি তাকে ডাঙ্গায় তুলতে। পাগল আর বলেছে কাকে ? তাও এখন রোগ হলে দেখে কে ? আর কে ? এই বিজন হতভাগা আছে মেস সুদ্ধু লোকের বিনি মাইনের নার্স।

বাসুদেব একটু বিরক্ত ভাবে বলে—বেশ তো তেমন দরকার বোঝেন মাইনে দিয়েই নার্স রাখবেন, আমি এসে বুঝবো। দশ তারিখে আসছি আমি।

—দশ তারিখে ছেড়ে বিশ তারিখে আসুন না মশাই, কে আটকাচ্ছে আপনাকে ? কিন্তু ওই পয়সার কথা তুলবেন না, মাথা গরম হয়ে যাবে আমার। যতোক্ষণ বিজন চাটুয্যে আছে এই মেসে—করুক দিকিন আর কেউ রুগীর সেবা ? দু'দুখানা হাত দিয়েছেন কেন ভগবান ?

—তবে আর বলছেন কেন ?—বাসুদেব হেসে ফেলে।

—বলবো না কেন ? সুধু হাতই দিয়েছেন—জিভ দেননি ভগবান ?…বল মা তারা দাঁড়াই কোথা ? বল মা তারা—

রামপ্রসাদকে চর্ব্বণ করতে করতে তিনতলায় উঠে যান বিজনবাবু। "বেশ লোক"—বলে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো বাসুদেব।

বিশেষ কোনো কাজ আজ আর নেই—বাড়ী ফিরে গেলেই হয়। কিন্তু এখুনি বাড়ী যাবে কি, এই তো মোটে ছ'টা বাজলো। অনায়াসেই ঘুরে আসা যায় কলকাতার অপর প্রান্তে।…ক্ষমাপ্রার্থনা গোছের একটা কিছু করা দরকার নয় কি ? ধরো, এমনই সাধারণ কেউ যদি নিমন্ত্রণ করতো—রক্ষা করতে না পারলে ক্ষমা চাইতে হ'ত না ? দেশকর্ম্মীর কি ভদ্রতাবোধ থাকাটাও বেমানান ? কিছুই নয়, ঘণ্টাখানেকের কাজ—যেতে আসতে খুব জোর আধঘণ্টা, আর আধঘণ্টা (তাই বা কেন, মিনিট পনের) কথা কওয়ার জন্তে। অবশ্য এই আজকেই শেষ। আর ভদ্রতা সৌজন্য প্রভৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই, নেহাৎ নিমন্ত্রণটার জন্তেই—কর্ত্তব্য স্থির করতে করতে গাড়ী প্রায় গন্তব্য স্থলে এসেই হাজির হয়।

আর বাড়ীর দরজার কাছে এসে নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে বাসুদেবের। এতো রাস্তা পার হয়ে এলো—এতো দোকান পসার—একটা কিছু উপহার কিনে নেওয়া উচিত ছিলো না কি? ওদের সমাজে হয় তো এসব আছে।

আবার ফিরে যাবে? কিন্তু কি আনবে? কতোটুকু দেওয়া শোভন? কোথায় লঙ্ঘন করবে সীমানা? এ ধরণের অবস্থায় কখনো পড়তে হয়নি বেচারাকে।

ভাবতে ভাবতে থেমে গেল গাড়ী।

পূরবী বেরোচ্ছে বাড়ী থেকে। পূরবীদের বাড়ীটা যতো বড়ো তার পক্ষে গাড়ীবিহীনতাটা বেমানান, কিন্তু ব্রজমোহনের অসুখের পর থেকে মাধবীই তুলে দিয়েছে গাড়ীর পাট। কি হবে মিথ্যে ব্যয় বাড়িয়ে, আয়টাই যখন কমে গেল অনেক পরিমাণে।

সুধু পূরবী। সেও তখন এতটা সচল হয়ে ওঠেনি, দরকারই হ'ত না গাড়ীর। তা'ছাড়া পূরবী গ্রাহ্যও করে না ওসব। ওরা ভীড় ঠেলে বাসে ট্রামে উঠবে, মিশবে কুলি মজুরদের সঙ্গে, নেমে আসবে সকলের সঙ্গে পথের ধূলোয়, গাড়ীর অভাব ওদের ক্ষুব্ধ করে না।

পূরবী পথে বেরিয়েছে পায়ে হেঁটে।

আশ্চর্য্য! ওই সুকুমার পা দু'খানি এই ধূলি-ধূসরিত দীর্ঘ পথ মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাবে?...কোথায় যাবে, কত দূর?...

আচ্ছা পূরবীর মুখটা অতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো কেন? সদ্যজ্বালা রাস্তার আলোয়? হয় তো তাই—হয় তো পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে যে সৌজন্যের হাসি ফুটে ওঠে মানুষের মুখে, সুধু তাই। তার বেশীকিছু ভাববার কোনো মানে হয় না—পূরবীর দীপ্তমুখে তো অমনি আলোই জ্বলে ওঠে যখন তখন।

—আপনি?—পূরবী সামান্য হেসে গাড়ীর কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

—আমি তো বটেই, কিন্তু দেখছি আসাটা অসময়ে হয়ে গেছে। যাচ্ছেন কোথায়?

—এমনি, সামান্য কাজে থাক, নাই বা গেলাম এখন, চলুন বাড়ীর ভেতর।

—আর কি। শেষকালে এই কাজে-বিঘ্নকারী লোকটাকে শাপ দিন মনে মনে। তার চেয়ে আসুন।

নেমে পড়ে গাড়ীর দরজাটা খুলে ধরে বাসুদেব।

—'আসুন' মানে?—পূরবী হেসে ফেলে।

—আসুন মানে চলুন কোথায় যাবেন।

—আপনার গাড়ী চড়ে যেতে কী দায় পড়েছে? আজ তো আর বৃষ্টি নেই।

—বৃষ্টি না হলে গাড়ী চড়তে নেই?

—অন্ততঃ পরের গাড়ী চড়তে নেই।

—শুনে সুখী হলাম।...আচ্ছা নমস্কার।

—ব্যস্' অমনি রাগ হয়ে গেল—পূরবী গাড়ীর ধার ঘেঁসে দাঁড়ায়—এতো অল্পে যার রাগ হয়ে যায় তার আবার দেশের কাজে নামা কেন?

—কে বলেছে আপনাকে যে আমি দেশের কাজ করে বেড়াচ্ছি?

—নাই বা কেউ বললো—সাধারণ বুদ্ধিতেই বলা যায়। যেমন আপনি অনায়াসে বলতে পারেন, আমরা লাঠি খেলি কি ছোরা খেলি, হাত কাঁপে কি বুক কাঁপে।

প্রসন্নকণ্ঠে হেসে ওঠে বাসুদেব—রহস্যটা তা'হলে ভেদ করে এসেছেন আজকে?

—তা' এলাম বৈ কি, কিন্তু ঘরের জানালা থেকে অপরের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করাটা জন-হিতের কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে তাই ভাবছি।

মাপ করবেন। সত্যই বলছি ওটা মোটেই অসদভিপ্রায়ে নয়, এমনি চোখে পড়ে যায়, অথচ ঘরের জানালা বন্ধ করে থাকতেও পারিনে আমি। ওর জন্যে তো ক্ষমা চাইলাম-ই, তাছাড়া আরো আছে ক্ষমা চাইবার, কিন্তু আসুন না, গাড়ীতেই না হয় গল্প করা যাবে খানিকক্ষণ। আসবেন?

চঞ্চল মন এই লোভনীয় আহ্বানে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, তবু নিজেকে শাসন করে নিলে পূরবী—গাড়ীতে বসে গল্প করলে আমার মাথা ধরে, যাবেন ত চলুন বাড়ীর মধ্যে।

—আপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে?

—তা' কেন? দিদি তো রয়েছেন—পূরবীর ঠোঁটের কোণের চাপা হাসির আভাস নেহাৎ রাত্রি বলেই ধরা পড়ে না—দিদি তো আপনার জন্যে অস্থির, এই তো সকালবেলা নিজেই যাচ্ছিলেন নেমন্তন্ন করতে। তা'ছাড়া দিদিই তো আপনাকে কোনো দিন খাওয়াতে পারেন না বলে দুঃখে কাতর। আমার কি?

—আচ্ছা তা'হলে তাঁর কাছেই ক্ষমাটা চাইছি—গম্ভীর অন্ধকার মুখে বললে বাসুদেব—বলবেন আমার হয়ে, রাখতে পারলাম না তাঁর অনুরোধ। কলকাতায় থাকছি না সেদিন। আচ্ছা—

কিন্তু পূরবী হঠাৎ এমন পাগলামি করে বস্‌লো কেন? চলেই যদি যেতো বাসুদেব, ক্ষতিটা কি ছিল? গাড়ীতে উঠে পড়বার ঠিক আগের মুহূর্ত্তে গাড়ীর দরজায় রাখা বাসুদেবের হাতের ওপর হাতটা রাখলো কি বলে? বাসুদেব যদি কলকাতায় না থাকে—পূরবীর কি? ওর কণ্ঠে অমন হতাশার সুর ফুটে উঠলো কি জন্যে?

—কলকাতায় থাকবেন না? কেন?

পরক্ষণেই হাতটা ফিরিয়ে নিয়েছে স্বস্থানে।

অন্ধকার-মুখ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে এক মুহূর্ত ওর মুখের পানে চেয়ে কোমলসুরে উত্তর দেয় বাসুদেব —না গিয়ে উপায় নেই সত্যি। প্রয়োজনটা এতো প্রবল না হলে আপনার আমন্ত্রণ অবহেলা করবার সাহস হ'ত না। বাড়ি যাচ্ছি মার ডাকে। দশ তারিখে আসছি। দিদিকে বলবেন ফিরে এসে ত্রুটি পূরণ করবো, আর…আর… আপনার কাছেও রইল ত্রুটি—

—আমার জন্যে ভাবতে হবে না—কিন্তু গাড়ী হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছেন যে বড়ো? এতক্ষণ আমাকে 'ডিটেন' করলেন তার ত্রুটি পূরণ করছেন না যে?…চলুন পৌঁছে দেবেন।

—দয়ার জন্য ধন্যবাদ। কোথায় যাবেন?—মনে মনে বললে—'রহস্যময়ী'।

—যাবো?…ওঃ এই এখানে—আনোয়ার শা রোড।… চেনেন তো?

—আপনি তো চেনেন?

গাড়ী চলতে থাকে নিঃশব্দে। এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে বাসুদেব বললে—বৃষ্টির একটা মাদকতা আছে, নয় কি? বৃষ্টি আর ঝড়।

চমকে উঠলো পূরবী—কি বলছেন?

—এমন কিছু নয়। অতো চমকে উঠলেন যে?

—কি জানি।…কিন্তু এ কি? আমরা যে আনোয়ার শা রোড ছাড়িয়ে এসেছি।

—ক্ষতি কি? গাড়ী ঘোরালেই আবার ফিরে পাওয়া যাবে আপনার আনোয়ার শাকে।

বলে কিন্তু সামনের দিকেই এগিয়ে চলে।

নাঃ, পূরবী আজ পাগলা হয়েই গেছে।

অমন দুঃসাহসী মেয়ে এতো নার্ভাস হয়ে গেল কেন? হঠাৎ ষ্টীয়ারিঙ্‌ হুইল-ধরা হাতখানার ওপর একটা হাত রেখে শিথিল সুরে বলে—আবার এগোচ্ছেন কেন? ফিরিয়ে নিয়ে চলুন, আমার ভয় করছে।

গাড়ীর গতি কমিয়ে বাসুদেব মৃদু হেসে বলে—ভয় করছে, সে কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনার আঙুলের ডগা, কিন্তু এই কি ছোরা খেলার হাত?

—জানি না। ফিরে চলুন।

—অতো অস্থির হচ্ছেন কেন?—প্রায় ধমকের সুরে বলে বাসুদেব—এতো নার্ভাস হবার কি আছে? আপনারা যে 'মেয়ে' সে কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারেন না? যে দেশের মেয়েরা আজ গভর্ণর হচ্ছে—মিনিষ্টার হচ্ছে—হচ্ছে বিদেশের রাষ্ট্রদূত, যাচ্ছে বিশ্ব-সভায় নিজেদের দাবী জানাতে, সে দেশের মেয়ে হয়ে আর এই ছিঁচ-কাঁদুনে-পণা শোভা পায় না।

নিজের দুর্ব্বলতায় নিজের ওপর এতো বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে পূরবী যে, প্রথমটা কথাই কইতে পারে না। কিন্তু কেন এমন হয়? কেন বাসুদেবের কাছাকাছি এলেই ওর বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে—ঠাণ্ডা হয়ে আসে আঙুলের ডগা, কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না, হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হতে থাকে? কি এ?

কতোদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে সমিতির ছেলেদের সাহচর্য্যে, একলা গিয়েছে সমীরের সঙ্গে বরানগরের পোড়ো বাড়ীতে রিভলভার প্র্যাক্‌টিস্‌ করতে—কই ভয় করে নি তো এমনধারা।

বরং কারো কারো তার ওপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে হেসেছে মনে মনে।…তবে এ কি? প্রেম? সেই লজ্জা-জনক মানসিক দুর্ব্বলতা। যাকে ওরা পরিহাস করে, অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়?

ছি ছি।

হঠাৎ সচেতন হয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে—থাক্‌ যথেষ্ট উপদেশ বর্ষণ হয়েছে। কিন্তু ভুল করছেন আপনি, মেয়েলিপণা করে নিজেকে খেলো করবার সখ আমার নেই। ভয় আপনাকে নয়—আমার স্বাস্থ্যকে। শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে—হঠাৎ ফেণ্ট হয়ে পড়লে—

—সে অভ্যাস আছে না কি?

বাসুদেবের প্রশ্নের উত্তরে পূরবী মনে মনে বলে—নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক গাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে থাকলে হওয়া অসম্ভব নয়। আশ্চর্য্য। প্রেমটা কি একটা মানসিক বিপর্য্যয়? বুদ্ধির দ্বারা যাকে রোধ করা যায় না। অনেক চেষ্টাতেও স্বাভাবিক হতে পারা যায় না।

মুখে বললে—হুঁ।

—তবে চলুন ফেরা যাক। আপনার অসুবিধে ঘটিয়ে থাকলে মাপ করবেন, কিন্তু সত্যি বলছি এখুনি ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, ভারি ভালো লাগছিল।

হায় ঈশ্বর। ভালো কি পূরবীরই লাগেনি? ভালো লাগছিল—অদ্ভুত ভালো। এতো ভালো লাগা সহ্য করতে পারার ক্ষমতা নেই ওর। কিন্তু ভালো লাগাকে প্রশ্রয় দেওয়াই কি উচিত? যে রুক্ষ কঙ্করময় ধূলি-ধূসরিত পথের পথিক পূরবী, সেখানে প্রেমের স্থান কোথায়? ভাল লাগার মূল্য কি?

বাসুদেবের পথ—পূরবীর পথ—সম্পূর্ণ ভিন্ন।

—কটা বাজলো?

—আটটা দশ।

—আনোয়ার শা রোডে যাবেন তো?

—না আজ থাক, বাড়ী চলুন।

ছোট ছোট টুকরো টুকরো কথা—খানিকটা খানিকটা নিস্তব্ধতা।

—দেশ থেকে ফিরে, আসবেন আবার।

—বলতে পারছি না। হয় তো আর কোনোদিন আসবো না।

—কি রে রুবি, রাণু ভালো আছে তো? বাড়ী ঢুকতেই উদ্বেগ্র প্রশ্ন করে মাধবী। পূরবীর মুখ দেখে রাণুর ভালো থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। মামাতো বোন রাণু সম্প্রতি বিয়ে হয়ে এসেছে শ্বশুরবাড়ী আনোয়ার শা রোডে। রাঁচী থেকে মামী সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন—রাণুর খবর নিতে। এসেই নাকি অসুখে পড়েছে ও। বলে বলে মাধবীই পাঠিয়েছিল পূরবীকে।

রাণু।

বিস্মৃতির অতল তল থেকে হাতড়ে বার করতে হয় নামটাকে। ওঃ রাণুর অসুখ দেখতেই বেরিয়েছিল সে। কি যেন রাস্তাটা? আনোয়ার শা রোড। তাই না?

—রাণু? রাণুকে দেখতে যাওয়া হয় নি।

—সে কি রে? কেন? তবে এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলি?

—এমনি ঘুরে এলাম খানিকটা।…নম্বর ভুলে গেছি ওদের বাড়ীর।

মাধবী সন্দিগ্ধ স্বরে বলে—পাগলামি করছিস কেন? এই তো মামীমার চিঠি দেখে ভালো করে ঠিকানা জেনে গেলি?

—তবুও ভুলে গেছি।—বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে যায় পূরবী। আর বেশীক্ষণ কারুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার সাহস নেই। মনে হচ্ছে কি যেন অপরাধ করে এসেছে সে, মুখ দেখে ধরে ফেলবে লোকে। আলো জ্বালিয়ে আর্শিতে মুখটা দেখে নেবে নাকি?

না থাক। নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে যাবে পূরবী। নিজের মনকে যাচিয়ে দেখবে।

শিবসাগর।

বাসুদেবের পিতৃভিটে।

বৃহৎ বাড়ী, বিরাট ঠাকুরদালান, নাটমন্দির, নহবৎখানা—জীর্ণ হয়ে এলেও উৎসবের আয়োজনে যেন গম্ গম্ করছে।

আলপনা দিতে দিতে বিভাবতী ঠাকুরদালান থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন—নীরদা দেখতো বাইরে গাড়ী এলো না কি?

নীরদা উঠোনে বসে এক ঝুড়ি ঝুনো নারকেল নিয়ে ছুলতে বসেছে, হাতের কাজ থামিয়ে বলে—গাড়ী এসে তো দরজায় থেমে থাকবে না মা, গাড়ীতে যে বসে আছে সে নাববে বৈ কি।

—খুব পণ্ডিতি শিখেছিস যে? গতর তুলে উঠতে পারবি না তাই বল। চাকার শব্দ পেলাম মনে হচ্ছে।

—চাকার শব্দ পেতে এখন এক ঘণ্টা দেরী আছে মা, কেন মিথ্যে মন উচাটন করছো বলো দেখি।

—মরণ আর কি? মন উচাটন আবার কখন দেখলি তুই? ছেলেটার আসবার কথা রয়েছে—গাড়ীর শব্দ পেলাম মনে হল, তাই বলছি—

নীরদা গম্ভীরভাবে বলে—তুমি তো ঘরবার করছো—এখন এলে হয়। যা না খামখেয়ালি ছেলে তোমার।

মন্তব্যটা বিভাবতীর পক্ষে প্রীতিকর নয়, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন—তোর কাজ শেষ হ'ল? দুটো নারকোল ছুলতে বসেছে—এ যুগ আর সে যুগ! যতো হয়েছে কুঁড়ের দল।

—ছেলে বাড়ী এলেই আবার সবাই কাজের লোক হয়ে যাবে।—বলে মুচকে হেসে নীরদা জোরে জোরে হাত চালায়।

ছেলের কথা নিয়ে সকলেই ঠাট্টা করে বিভাবতীকে।

অন্য সময় হাসেন বটে, কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এখন আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলছে মন, নৈরাশ্যব্যঞ্জক কথা শুনলে—তা' সে ঠাট্টা হ'লেও—রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায় বিভাবতীর।

তিনিও তাড়াতাড়ি আলপনার লতা টানতে থাকেন।—তবু অভ্যস্ত সুনিপুণ হাতের গুণে পদ্ম ফুটে ওঠে চকচকে সীমেণ্টের ওপর।

—মা চন্দরপুলির ক্ষীরের জন্যে ক'সের দুধ চড়ানো হবে, নতুন খুড়ি জিগ্যেস করলেন—

আর একজন দাসী এসে দাঁড়ালো।

—তোরা কি আমায় পাগল করবি রাখালি? আজন্মকাল করছে নতুন বৌ, জানে না চন্দরপুলিতে কতো দুধ লাগে, ক'টা নারকোল! সব জিগ্যেস করা চাই।—মানুষের মন মাথার দিকে দৃষ্টি নেই।

—তবে তাই বলিগে—প্রত্যেক বছর যা হয়—

—অমনি 'তাই বলিগে'—সব ঠ্যালামারা কাজ। বলগে আটসের চড়াতে।

—বড় বৌ, আনন্দ নাড়ু তো ভেজে এনেছেন বামুন গিন্নী, কি করবো—

—মাথায় করে নাচবে—বিভাবতী বিরক্ত স্বরে বলেন—নাড়ু আবার করবে কি ঠাকুরঝি, ঠাকুরের ভাঁড়ারে তুলবে। তোমাদের যেন দিন দিন বুদ্ধিসুদ্ধি হরে যাচ্ছে।

—দিদি, সরকার মশাই কেষ্টকে দিয়ে জিগ্যেস করে পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে বাসু কি ফল আনবে?

—সরকার মশাইকে বলে পাঠাও মেজ বৌ, আমি এখনো হাত গুণতে শিখিনি।

গাড়ী আসতে যে এক ঘণ্টা বাকী ছিল, সে ঘণ্টাটা এই ভাবেই কাটে।

অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। গাড়ীর শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই বেজে ওঠে 'মা' শব্দ। বাসুদেব এসেছে। বাসু বাসু বাসু।—কতোবার ডাকলে মন ভরবে? কিন্তু ডাক তো ধ্বনিত হচ্ছে শুধু মনেই, কণ্ঠে এলো কই? এতক্ষণকার আবেগ উৎকণ্ঠা আশা আশঙ্কা দ্রবীভূত হয়ে নেমে এলো দুই চোখে।

ছেলেকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরবার প্রবল ইচ্ছাটা দমন করতে হ'ল, নেহাৎ ছেলের পরণে রেলের কাপড় জামা বলে।

অনেক রাত্রে সব কাজ সেরে বিভাবতী এসে বসলেন দোতলায় বাগানের দিকের বারান্দায়। ঠিক জানতেন বাসুদেবকে পাওয়া যাবে এখানে।

ধারণাটা ভুল নয়, বাসুদেব শুয়েছিল পাটি পেতে। উঠে বসে বললে—মা এইবার শুতে পাবে তো?

—শোবো কি রে। তোর সঙ্গে গল্প করি।

—শুয়ে শুয়ে করো না গল্প। সারাদিন তো খেটে অস্থির হলে, আবার তোলা আছে কালকের যুদ্ধু।

—তুই এসেছিস, এবার গায়ে জোর হবে।

বিভাবতী হেসে ওঠেন।

মায়ে-ছেলের গল্প আর ফুরোয় না—দীর্ঘদিনের জমানো গল্প। রাত্রি গভীর হ'তে থাকে, বর্ষার জোলোহাওয়া মাঝে মাঝে শীত ধরিয়ে দেয়, বাতাসে ভেসে আসে বাগানের নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভ—উগ্র মধুর। নতুন ফোটা শিউলি ফুলের, বকুল আর বাতাবী লেবু ফুলের, সদ্য বৃষ্টিতে ভেজা ভাদ্রের রোদ পাওয়া শুকনো সোঁদা মাটির। এই হাওয়ায় নিজেকে যেন কেমন তুচ্ছ মনে হয়, অসহায় লাগে। অসম্ভব কল্পনার হাতে আত্মসমর্পণ করতে দ্বিধা হয় না।

গল্প চলছে, তবু ছেলের ঈষৎ অন্যমনস্কতাটুকুও নজর এড়ায় না বিভাবতীর। এক সময় বলে ওঠেন—তোর কি হয়েছে বল তো বাসু?

—কি হবে? কই?

একটু অবাক হ'ল বাসুদেব।

—কিছু হয়েছে নিশ্চয়, কথায় যেন তেমন মন নেই তোর, থেকে থেকে কি যেন ভাবছিস। দেশ তো তোমাদের স্বাধীন হ'ল, আবার এতো ভাবনা কিসের?

বাসুদেব হা হা করে হেসে উঠলো—শুধু 'আমাদের' দেশ? তোমাদের নয়?

—আমাদের আবার স্বাধীন পরাধীন।

বাসুদেব ব্যথিতভাবে বলে—ওকথা কেন বলছো মা? স্বাধীনতা কারুর একলার জিনিস হয় না, প্রত্যেকেরই তা'তে অংশ আছে।

বিভাবতী হাসিমুখেই বলেন—আমি পরাধীন 'নীলকান্ত-জী'র কাছে, পরাধীন তোর মায়ায়, আমাকে স্বাধীনতা কে দিতে পারবে বল্‌তো?

—ওর থেকেও স্বাধীন হতে হবে।···বুঝলে মা, সমস্ত পরাধীনতার মূল কথা ওই সংস্কার আর মায়া।

—জানি রে বাবা জানি। তাই বলে কি ছাড়বার ক্ষমতা আছে? ও যে মজ্জাগত। এই যে তুই, তুই যদি মন্দ হ'স্ তোকে কি ছাড়তে পারবো?

—পারো না?—বাসুদেব হেসে বলে—সত্যি বলছো, না মুখের কথা?

—মুখের কথা কি মনের কথা, সে এখন তোকে বোঝাতে পারি না বসে বসে। আমার ছেলে মন্দ হবার ছেলে নয়রে বাপু।

—অতো বিশ্বাস রেখো না মা, ওটা আঘাত পাবার পথ। কিন্তু ধরো, এমনও কতোকাজ আছে যাকে আমি মন্দ ভাবি না, তুমি মন্দ ভাবো।

—সে তো আছেই—বিভাবতী লঘুস্বরে বলেন—এই বিয়ে থা' না করে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে বেড়ানোকে তুই মন্দ ভাবিস না, আমি ভাবি।

—কিন্তু ধরো যদি—ধরো যদি আমি বিয়েই করি হঠাৎ? খুসি হবে?

বিভাবতী কিসের একটা আশঙ্কায় দ্বিধার সুরে বলেন—হবো বৈ কি, তোর যুগ্যি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে খুসি হবো না?

—যোগ্য অযোগ্যের বিচার হবে কার কাছে বলো তো মা?

অন্ধকার বলেই যে সুধু এতো স্বচ্ছন্দে মার সঙ্গে এতো কথা বলতে পারছে বাসুদেব তা' নয়, মার সঙ্গে খোলাখেলা কথা কওয়া ওর চিরদিনের অভ্যাস।

—কার কাছে আবার—বিভাবতী এবার বেশ আত্মস্থ ভাবেই বলেন—দশের কাছে, সমাজের কাছে।

—সমাজের কথা থাক—তোমার কথাই বলো না? ধরো যদি এমন মেয়ে হয় কুলে শীলে বিত্তে বিদ্যায় সমাজের চোখে রীতিমত সুপাত্রী, কিন্তু তার দেব দ্বিজে ভক্তি নেই, আচার অনাচার বোধ নেই, খাদ্যাখাদ্যের বালাই নেই—

—থাম্ বাপু, ঘুমে আমার শরীর পাথর হয়ে আসছে, এখন এলো আমাকে মিথ্যে জ্বালাতে। বিয়ে যে তুমি কতোই করবে তা আর জানতে বাকী নেই আমার।

সমস্ত আলোচনার ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে উঠে পড়েন বিভাবতী। "আর হিম লাগাসনে বাসু, ঘরে যা"—বলে নিজেই ঘুমের তাড়নায় টলমল করার ভঙ্গীতে টলমল করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন।

বাসুর কথায় যা সর্বনেশে ইঙ্গিত, সে সহ্য করবার ক্ষমতা বিভাবতীর নেই। একথার আলোচনাও ভালো নয়। তার চেয়ে ভালো উড়িয়ে দেওয়া।

কিন্তু একি? তাঁর সন্ন্যাসীছেলের মনে রং ধরলো না কি? নারায়ণ রক্ষা করো।

তার চেয়ে ঢের ভালো—'দেশ দেশ' করে সন্ন্যাসী হয়ে থাকা। তবু সে যেন জমানো টাকা। আর একটা আচার-ভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ মেয়েকে বিয়ে করা মানে তো নিঃশেষে খরচ হয়ে যাওয়া। জীবনের একমাত্র মূলধনকে এমন ভাবে অপব্যয় করতে পারবেন না বিভাবতী। কিছুতেই না।

বিভাবতী বলে গেলেও বাসুদেব ওঠে না, পাটিতে পড়ে থেকে হিমই লাগায়। জীবনের গতি সীমাবদ্ধ, কিন্তু কল্পনার তো সীমারেখা নেই। দৈবাৎ একদিন সেই সীমাহীন কল্পনার কাছে আত্মসমর্পণ করলে ক্ষতি কি?—যখন বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে বকুল শিউলি আর নেবুফুলের মদির গন্ধে, আকাশে উঁকি মারছে কৃষ্ণাষ্টমীর নিষ্প্রভ চাঁদ।

মাদকতা আছে এই ইঁট কাঠেরও। এখানে এলে যেন কর্ম্মজীবনের উজ্জ্বল ছবিটা ঝাপসা হয়ে আসে। এ বাড়ীর আনাচে-কানাচে অনুসন্ধান করলে আজও যেন খুঁজে পাওয়া যায়—এক দায়িত্ববোধহীন-বালককে আদর্শ-চেতনাহীন অপরিণত কিশোরকে।...

আচ্ছা এতোবড়ো বাড়ীটায় বিভাবতী ভিন্ন আর কাউকেই কি আঁটে না?

নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই, তবু সকালবেলা ছেলের তল্লাসে এলেন বিভাবতী। বাসুদেব সেইমাত্র উঠেছে ঘুম থেকে। ভোরবেলায় ওঠা বরাবরের অভ্যাস, সুধু গত রাত্রের অনিদ্রার ক্ষতিপূরণ করতেই বোধ করি আজ এতো বেলা।

কিন্তু সারারাত বাসুদেব একটা মাত্র বালিশ সম্বল করে খোলা বারান্দায় শুয়েছিল নাকি? বিভাবতী অবাক হয়ে বলেন—ঘরে উঠে বিছানায় শুস্‌নি? এ কি অবাক কথা রে? এই বাগানের ধার—মশাতে আস্ত রেখেছিল?

সুগঠিত সবল দেহের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাসুদেব হেসে ওঠে—রেখেছে তো দেখছি। বরং চমৎকার ঘুমিয়েছিলাম। বাগান থেকে সুন্দর গন্ধ আসছিল।...কি ফুল ফোটে মা আজকাল—শিউলি না?

—শিউলী, বকুল, রজনীগন্ধা, কতো রকম। তুই এখন চান করে নিবি তো?

—হ্যাঁ। কিন্তু তোমার কিছু কাজ আছে নাকি?

—ভাবছিলাম মঞ্চটা যদি সাজিয়ে দিস। এবারে—বেশী বড়ো করে "কংস কারাগার" "ঘোর যমুনা" "যোগমায়ার আবির্ভাব"-টাবির্ভাব করিয়েছি কি না নতুন।

—দৈবকী তো কংস-কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন মা, আবার সখ করে মাটির কারাগার গড়িয়ে খেলা করতে চাও কেন?

বিভাবতী কথাটার গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে না পেরে আহতভাবে বলেন—আমার সামনে 'খেলাটেলা' বলিসনে বাসু, আমার প্রাণ কেমন করে। তুই দিবি কি না বল?

—ওসব তোমার ওই ঠাকুর মশাই তো বেশ পারেন বাপু।

—পারবেন না কেন, চিরদিনই তো করে আসছেন। তবে বয়েস হয়েছে, তেমন পরিপাটি করে পারেন না তাই। থাক্ তুই যখন পারবি না—

এ ধরণের কথা বিভাবতীর নতুন।

কি জানি কেন হঠাৎ বিভাবতীর মনে হচ্ছে ছেলের আর তাঁর মাঝখানে কিসের একটা ব্যবধান জন্মে গেছে। দেখা যায় না, প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুধু অনুভব করা যায়।

গত রাত্রে গল্প করতে বসে এই নিষ্ঠুর সত্যটা যেন আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি। হয় তো তাই—সেই সর্বনেশে আশঙ্কার সত্য মিথ্যা যাচাই করতেই এমন তুচ্ছ একটা আবেদন নিয়ে এসেছেন ছেলের কাছে।

বাসুদেব অতো সন্দেহ করে নি, তাই এতো সহজে অনুরোধটা উড়িয়ে দিতে পারলো, নিতান্তই মার ছেলেমানুষী মনে করে।

বিভাবতী চলে যাবার পর মনে হল মা রাগ করে গেলেন না তো? অথচ এমন হাস্যকর কথা বিশ্বাস করাও অসম্ভব! এমন বাজে কারণে বিভাবতী রাগ করবেন বাসুর ওপর?

পাগল আর কি!

স্নান করে এসে দেখলে বিভাবতী ভোগ-রান্নার ঘরে। রাত্রি বারোটায় পুজো, তবু এখন থেকেই চলছে ভোগের আয়োজন। 'বাহান্ন-ভোগ' নইলে চলবে না পেটুক-চাঁদের।

বাসুদেব প্রায় দেড় বৎসর বাড়ী আসেনি, সবই যেন নতুন নতুন লাগছে ওর। ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক দেখে ভোগের ঘরে উঁকি মেরে বলে উঠলো—তোমাদের সদ্যোজাত শিশুটির আহার তো বড়ো কম নয় মা? এ কী কাণ্ড? ছেলে মানুষ এতো হজম করতে পারবেন কেন?

—তা' পারবেন কেন—বিভাবতী মুখ তুলে হেসে ফেলেন—এখনকার ছেলেদের মতন ম্যাক্‌সো খাবেন!

—তাই উচিৎ। ব্রহ্মাণ্ড খেয়েও আশা মিটছে না যখন, তখন জব্দ করাই ভালো।...হ্যাঁ তোমার 'কংস কারাগার' টারাগার দেখে এলাম, বেশ সাজিয়েছেন ঠাকুর মশাই।...কে গড়ালে?

—আর কে? আমাদের কানাই। অবিশ্যি একলা পারেনি—ওর ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়েছিল, ছেলেটার কাজ খুব

ভালো। আসছে বারে ভাবছি ওকে দিয়েই রাসের সখী গড়িয়ে নেব।

—তা মন্দ নয়।

উত্তর দেবার মতো কথা জোগান দিতে না পেরেই বোধকরি আর কিছু না বলে চলে যায় বাসুদেব। অকস্মাৎ ওরও মনে হয় যেন সৌজন্য প্রকাশ করা ছাড়া মার সঙ্গে আর সহজ অন্তরঙ্গতার কথা কওয়া যায় না। মাঝখানের যোগসূত্র গেছে ছিন্ন হয়ে।

কোন্ অদৃশ্য বাজীকর যে অলক্ষ্যে বসে সকলের অজ্ঞাতে ছিন্ন করে এই বন্ধনগ্রন্থী, কে জানে! ধরা পড়ে তখনই যখন তুচ্ছ কারণে টান প'ড়ে দু'টো মন যায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে।

'একাত্ম' বলে যে গর্ব্ব থাকে দু'জনের, মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায় সে গর্ব্ব।

অথচ এর না আছে প্রতিকার না আছে নালিশ।

ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোকে অনেক যত্নে সেলাই করলেও যেমন বারে বারে খসে সেই কৃত্রিম অখণ্ডতার ছলনা থেকে, তেমনি সৌজন্য আর ভদ্রতার রাংঝালে জোড় খাওয়ানো ভাঙা মনকে বেশীক্ষণ ব্যবহার করা চলে না, খচ খচ করে ওঠে যখন তখন।

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

সত্যকার দায়ী হয় তো তুমি আমি কেউ-ই নয়, দায়ী চলমান কাল।

কালের চাকার গতি যখন মাঝে মাঝে পড়ে ঝিমিয়ে, 'চলছে' সে কথা বোঝা দায় হয়—তখন পুরুষানুক্রমে সুখ-শান্তিতে বাস করতে পারে মানুষ। ভিতরে বাইরে সংঘাত এমন প্রবল হয়ে ওঠে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন এতোই অল্প যে—ঠাকুর্দার জীবনধারাকে মেনে নেওয়া নাতির পক্ষে অসম্ভব হয় না। বিনা বাধাতেই মেনে নেওয়া চলে। তখন সম্প্রীতি থাকে রাজায় আর প্রজায়, দেশে আর বিদেশে, মালিকে আর শ্রমিকে।

বিরোধহীন নিশ্চিন্ত সুখের জীবন।

কিন্তু কালের সেই স্তিমিত চক্রে হঠাৎ একদিন নতুন করে পড়ে শান, গতি হয়ে ওঠে দুর্ব্বার, তখন এই সম্প্রীতির ফাঁকি ধরা পড়ে সন্ধানী মানুষের চোখে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন ঘটে পারিপার্শ্বিকতার।···

কিন্তু নালিশ করবো কার বিরুদ্ধে?

বিভাবতীর 'কংস কারাগার' আর 'রাসের সখী' বাসুদেবের জীবনে যেমন অবাস্তব, তেমনি অবাস্তব কি বিভাবতীর কাছে নয়—বাসুদেবের জীবনের পরাধীনতার গ্লানি, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা?

নীলকান্তজীর জন্মোৎসব। বাসু এসেছে বাড়ী।

এতো আনন্দের দিনেও বিভাবতী যেন সম্পূর্ণ সুখী হতে পারছেন না, মনের কোথায় রয়েছে কাঁটা বিঁধে। অথচ কেন? নিজে থেকে বিয়ের কথা তুলেছিল বাসু তাই? কিন্তু সে কি সত্যি? বাসুদেবের কথার ভঙ্গীই তো পরিহাসের সুরে।···রাত্রে শুয়ে ফুলের গন্ধ ভালো লেগেছিল বাসুর, এটা কি একটা মনে রাখবার মতো অসন্তোষ?···অথচ সেই অর্থহীন অসন্তোষটাই সমস্ত দিন মনের মধ্যে পাক খেয়ে মরছে বিভাবতীর।

দ্বিপ্রহর রাত্রে অনেক ধুমধামের সঙ্গে পূজা শেষ হয়ে গেলে প্রসাদ বিতরণান্তে বিভাবতী যখন জল খেতে বসলেন, তখন বোধকরি রাত্রি শেষের আর বেশী দেরী নেই। বাসুদেবও ঘুমোতে পারে নি—মার খাওয়া না হ'লে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না। আন্দাজমতো সময়ে নেমে এসে দেখলে ঠাকুরদালানে মা একলা—সামনে সামান্য কিছু জলযোগের আয়োজন।

অবাক হয়ে বললে—তুমি একলাটি? কাকীমা পিসিমা এঁরা সব?

বিভাবতীর এতক্ষণ যে অভিমান রুদ্ধ ছিল, ছেলেকে এত রাত্রে বিনিদ্র দেখে তার কিছুটা উপশম হল যেন, মৃদু হেসে বললেন—নতুন বৌ ভোগের পেসাদ খেয়েছে সকলের সঙ্গে, আর তোর পিসিমার তো নির্জ্জলা উপোস।

—নির্জ্জলা? কেন বলোতো?

—এ দু'দিনেই কি তুই সব ভুলে গেলি বাসু? ওঁরা শাক্ত না? রোহিণী না ছাড়লে ওঁদের জল খেতে আছে নাকি?

একমাত্র 'শাক্ত' কথাটা ছাড়া আর কিছু যে বোধগম্য হ'ল বাসুর এমন নয়, তবু রীতিমত সব-জান্তার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলে—ও হ্যাঁ তাই তো।—যাক্ আমি তবে জন্মালাম এতক্ষণে!

'বাসুদেব' কথাটার মূলগত অর্থ হিসেব করে বিভাবতীও হেসে ওঠেন—

—হ্যাঁ জন্মালে। এখন দৈবকীকে ফেলে নন্দালয়ে যেতে যা দেরী।

—কেন তুমি কি আমার দৈবকী মা?

—তাছাড়া আর কি বল বাবা? দেশই তোর এখন মা যশোদা।

বাসুদেবও হেসে ওঠে—মা যশোদাকেও একদিন কাঁদতে হয়েছিল জান তো? কিন্তু এমন ছেলে কি হতে পারবো? আমি বিহনে দেশ কাঁদবে?

ছেলের অকল্যাণ আশঙ্কায় 'ষাট' উচ্চারণ করে বিভাবতী বলেন—তোর যেন সব কথাতেই ঠাট্টা। বোস্, তোদের কলকাতার গল্পই কর শুনি। এই এক বছর ধরে কতো কাণ্ড কতো কারখানা হয়ে গেল, লোকের মুখেই শুনি খালি—আর

দিন রাত ছটফটিয়ে মরি। অথচ তোর চিঠিতে উল্লেখ মাত্তর নেই, সুধু—"যেতে পারলাম না, কাজ আছে"—ব্যস্, বল সব শুনি।

—নতুন আর কি শুনবে? যা হয়েছে—যা হয় নি—সবই তো শুনে নিয়েছ। বরং তোমার কথা বলো।

—আমার আবার কথা!—পুরনো অভিমান মাথা তোলে বিভাবতীর—আমাদের হচ্ছে অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। বরং তুই সেই মেয়েটার কথা বল।

বাতির আলোয় বিভাবতীর চোখের চতুর-সন্ধানী-দৃষ্টি বাসুদেবের চোখে ধরা পড়ে না, চমকে উঠে বলে—কোন্ মেয়েটার?

—ওই যে কোন্ আচার-বিচারহীন ম্লেচ্ছ না খৃষ্টানের মেয়েকে বিয়ে করবি বলছিলি?

পরিহাস মাত্র বলে উড়িয়ে দিতে গেলেও ঠিক ভাষাট জোগাড় হয় না, তাই বাসুদেব সামান্য হেসে বলে—সেরকম কেউ আছেই স্থির করে নিচ্ছ কেন? মনে করো কাল্পনিক। তোমাকে ভাবতে দিচ্ছি—

—নতুন করে আমাকে আর কি একজামিন করবি তুই? তবে এখন বড়ো হয়েছ—ভালো মন্দ জ্ঞান হয়েছে—এখন আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে তুমিই বা মানবে কেন, আর আমিই বা চাপাতে যাবো কেন?

—ওরে বাবা, বাজে কথা শুনেই যা রেগে গিয়েছে মা, সত্যি 'মেলেচ্ছ' মেয়ে এনে হাজির করলে দেখছি মুখই দেখবে না। ভাগ্যিস্ বাজে কথা।

পরিহাস-অস্ত্রে সমস্ত আলোচনার মূলচ্ছেদ করে উঠে দাঁড়ায় বাসুদেব, হাই তুলে বলে—যাই, ঘুম পেয়ে গেছে।··· সারাদিন উপবাসের পর কি বা খেলে? আবার কাল খাটবে কি করে তাই ভাবি।

ছেলের গমনপথের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেললেন বিভাবতী। বাসু আজ দায়সারা ভদ্রতা করে গেল মায়ের সঙ্গে। আগে হলে—ভালো করে খাওয়াতে সাধাসাধির আর অন্ত থাকতো না। হয়তো তাকিয়ে দেখেও নি কি ছিল মার পাতে!

হ্যাঁ বদলে গেছে বই কি। মায়ের সঙ্গে কবে কোনদিন মিথ্যা কথা বলেছে বাসু? কবে সত্যি কথাটা উড়িয়ে দিয়েছে মিথ্যা বলে?

বোকা মূর্খ সেকেলে যাই কিছু হোন বিভাবতী, সন্ন্যাসী ছেলের মুখে যে রং ধরেছে এ খবর ধরা পড়তে দেরী হয়নি তাঁর কাছে। কিন্তু তাতেই বা এতো অশান্তি কেন?

ছেলের বৈরাগ্যের বিরুদ্ধেও তো কম অভিযোগ ছিল না?

সে কথা কে বোঝাবে? কে বুঝবে? কবে কোন্ মা বুঝেছে?

উৎসব-বাড়ীতে অনেক আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, বাইরের উঠোনে প্রকাণ্ড 'ডে লাইট্'টা জ্বলছে বীরবিক্রমে, তবু বিদ্যুতালোকের সঙ্গে তুলনা চলে না। ভিতর বাড়ীটা নিষ্প্রভ, দোতলার লাইনবন্দী অপ্রয়োজনীয় ঘরের সারি, জমাট অন্ধকারে ঢাকা। যেন একটা বিরাট দৈত্য!

বড়ো দালানে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেল বাসুদেব, নতুন করে উপলব্ধি করলো এর বিরাটত্ব। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়লো অপ্রয়োজনীয় দিকটাও।

এতো বড়ো বাড়ী মানুষ করে কেন? কোন আশায়? কি হিসেবে? ভাবী উত্তরাধিকারীর মুখ চেয়ে?···এ বাড়ীতে—এ সব ঘরে আর কোনদিন কি আলো জ্বলবে? কে জ্বালবে? এতোবড়ো বাড়ীখানা স্বার্থপরের মতো আগলে রেখে লাভ কি? ইস্কুল খুলে দেওয়া যায় না এখানে? দান করা যায় না হাসপাতালকে?

বিভাবতীর প্রয়োজন কতটুকু?

কে জানে—হয়তো আগাগোড়াই প্রয়োজন। প্রয়োজন বিভাবাতীর না থাক, নীলকান্তজীর যে অনেক চাই। তাঁর জন্যেই সব কিছু বাঘিনীর মতো আগলে থাকবেন বিভাবতী, এটুকু বুঝতে দেরী হয় না বাসুদেবের।

অদ্ভুত!

অদ্ভুত বৈ কি, এ ভক্তির মধ্যে মুক্তির পথ কোথায়? অহরহ বন্ধনই বেড়ে চলে সুধু।

শেষ পর্য্যন্ত ঠাকুরের বেড়াজালে পড়েই দম আটকে আসে মানুষের।

যে যুগে মানুষ খেয়ে ফুরোতে পারতো না পৃথিবীর উপস্বত্ব, ভোগ করে উঠতে পারতো না ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, বিগ্রহের সৃষ্টি বোধকরি সেই স্বর্ণযুগে। আজ মানুষের পেটে টান পড়েছে, কিন্তু ঠাকুর আছেন অটল। সোনার সিংহাসন থেকে যে নেমে আসতে হবে, সে হুঁস নেই।

তবু সেই অটল পাষাণমূর্তির কাছেই মানুষের যতো আবেদন নিবেদন। শেষ রাত্রে শুতে যাবার আগে বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে বিভাবতী যা ব্যাকুল প্রার্থনা করলেন, সেটা নিতান্তই দেবতার কানে কানে, তাই রক্ষা। বাসু শুনলে বোধকরি লজ্জায় ধিক্কারে মাটিতে মিশিয়ে যেত। ছেলেকে সেই অজ্ঞাত 'ম্লেচ্ছ ডাইনীর' কবল থেকে উদ্ধার করে দেবার পুরস্কার স্বরূপ জড়োয়ার নেকলেস্ মানত করলেন বিভাবতী নীলকান্তজীর কাছে।

অতঃপর বোধকরি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেলেন।

আর বাসুদেব তখন উঠলো ঘুম থেকে—কলকাতায় ফেরবার প্রস্তুতি হিসাবে। কথা ছিল কাল যাবে। কিন্তু গত রাত্রে সহসা এই থাকাটা এতো নিরর্থক মনে হ'ল, যে—

বিভাবতীর অভিমান-অভিযোগের চিন্তাটাও হালকা হয়ে গেল যেন।

কে জানে, বুঝি বা বিভাবতীর ওজনটাই কমে গেছে কোন ফাঁকে।

কমিটির অমন বিশেষ অধিবেশনটা ছেড়ে এতো ঘটা করে জন্মাষ্টমী দেখতে দেশে আসাটা নেহাৎ পাগলামী মনে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব সেন্টিমেন্টকে জয় করতে হবে।

দেশকর্মীর কোনো কিছুতেই সেন্টিমেণ্ট থাকবে কেন?

• • •

মাথার যন্ত্রণা কমাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল শ্রীমন্ত, ঘুম ভাঙলো তখন বেলা আটটা। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, মাথার যন্ত্রণাটা যদিও বা কিছু কমে থাকে, মাথাটা ভারী হয়ে আছে যেন বিশমুণী বোঝা।

—কি জানি ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হচ্ছে বেশ জ্বর হয়েছে।—চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে শ্রীমন্ত। যেন চুলগুলো উপড়ে ফেললে মাথার যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হয়।

বিজনবাবু মিনিটখানেক নিঃশব্দে শ্রীমন্তকে—শুদ্ধভাষায় যাকে অবলোকন করা বলে, তাই করে বলেন—সুধু মনে হচ্ছে? নিশ্চিত নয়? বলি রাত্তিরে যে মশাই একশো চার পর্য্যন্ত উঠেছিল, সে খোঁজ রাখেন?

—একশো চার? কে বললে?

—বলবে আবার কে থার্মোমিটার ছাড়া? হুঁসপর্ব্ব কি কিছু ছিল আপনার? সারারাত—'তেরেকেটে তাক্ তেরে-কেটে তাক্'।

—সারারাত ছিলেন নাকি এঘরে? ছি ছি ভারী অন্যায়।

—অন্যায়? অন্যায় কিসে মশাই? আমি কি সুন্দরী স্ত্রীলোক? সারারাত আপনার ঘরে থেকে মহাভারত অশুদ্ধ করে দিয়েছি।

—ধেৎ, আপনি ভারী ইয়ে। মানে—জাগতে তো হ'ল? অনর্থক কতোটা কষ্ট হল।

—পাশের ঘরে শুয়ে বিবেকের কামড় খেতে খেতে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে হলেই বা কষ্টটা কি কম হতো শ্রীমন্তবাবু।—তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে তাক্—বলি খাবেন কি আজ?

—আজ আর কিছু খাবো না।

—তা' খাবেন কেন? পয়সা খরচ হবে যে। এদিকে তো শুনতে পাই বড় মানুষের ছেলে, ইয়া বড় বাড়ী—গাড়ী, কতো কি। আপনাদের লীলা বোঝা ভার, ওই সব খদ্দর-মদ্দর বড়ো গোলমেলে জিনিস মশাই। যাক্, দেখি বাজারে লেবু পাই কি না, বিস্কুট খানতো, না কি?

—খাই। সে কথা নয়, শুনুন—আমায় বোধহয় আবার জ্বর আসছে বেশী। দয়া করে আপনি যদি কোনো ডাক্তারকে—

বিজনবাবু এবার 'তেরেকেটে তাক্' বন্ধ দিয়ে উদ্বিগ্নমুখে বলেন—একদিনের জ্বরে ডাক্তার কেন বলুন তো? আমার তো মনে হয় শ্রমজ্বর মতো হয়েছে।

—খুব সম্ভব তাই। তবে অসুখ-টসুখতো করে না কখনো, ভয় হচ্ছে আপনাদের বেশী জ্বালাতনে ফেলবো না কি। ভয়ানক খারাপ লাগছে শরীরটা।

—বেশ, আমাদের ইন্দু ডাক্তারকে ডেকে আনি।...শরীর খারাপ! বলে শরীরটা যে এখনো আছে আপনাদের, এই আশ্চর্য্য!

ইন্দু ডাক্তারকে যখন পাওয়া গেল তখন জ্বরে বেহুঁস্ হয়ে পড়ে আছে শ্রীমন্ত। ডাক্তারী শাস্ত্রের বিধান মতো মোটামুটি পরীক্ষা করে ডাক্তার রায় দিলেন—রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে, কারণ "ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার" লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে যেন।

বিজনবাবুর পোড়া কপাল। অফিস যাওয়া মাথায় উঠলো।

শ্রীমন্তর বাড়ীর ঠিকানা জানেন না, এই ভেবে হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে তাঁর। বরাবর বাড়ীর কথা হেসেই উড়িয়ে দেয় শ্রীমন্ত। লোকপরম্পরায় শোনা, অবস্থা ভালো—মেসে পড়ে থাকা নাকি ওর সখের খাতিরে। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেশবার সুযোগ নিতে। কিন্তু ঠিকানাটা কেউ বলতে পারলে না। কেউ বলে কাশীপুর, কেউ বলে পাইক-পাড়া, কেউ বলে—দমদম।

আসলে সুরাহা কিছুই হ'লনা।

অবস্থা যখন রীতিমত ঘোরালো, তখন এলো বাসুদেব।

—এই দেখুন মশাই কাণ্ড!

বাসুদেব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলচে—সেইদিন থেকেই জ্বর? আজ তা'হলে এই পাঁচদিন? টেম্পারেচার কতো?

—আর বলবেন না, পর্শু রাত্তিরে হান্‌ড্রেড্‌ সিক্স পয়েণ্ট এইট্‌! চোখ কপালে উঠে গেল আমার। হোল-ডে এণ্ড নাইট আইস্ চলছে। আমাদের ম্যানেজার ভদ্রলোক, পালা করে তিনি আর আমি—ভালো কথা, ওঁর বাড়ী ঘর দোরের খবর রাখেন মশাই?

বাড়ী!

বাড়ীর কথা তো কিছুই জানে না বাসুদেব। অথচ শ্রীমন্ত বলতে গেলে তার গুরু। অসমবয়সের নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে যেমন একটা সশ্রদ্ধ আনুগত্যের ভাব থাকে। কিন্তু শ্রীমন্তর পারিবারিক জীবনের কোনো খবরই তো জানতে চেষ্টা করেনি বাসুদেব। ইচ্ছেও হয় নি, মনেই আসেনি

ঘোটে। নিজের সম্বন্ধে কেমন যে একটা সহজ অবহেলার বর্ম আছে শ্রীমন্তর, তাই ওর ব্যক্তিগত জীবনের দিকে উঁকি দেবার কথা মনেও আসে না। ও যেন অনেক দূরের মানুষ।

তাই অপ্রস্তুতভাবে নিজের অজ্ঞতা জানালে।

—ওই তো হয়েছে মুস্কিল, তবে জ্বরের ঝোঁকে পর্শু রাত্রে কয়েকবার একটা ঠিকানা বলছিলেন—ভাবছিলাম খবর নিয়ে দেখবো—সত্যি না বিকারের ঝোঁকে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে কখন কি করি। এঁকে ফেলে তো—

বাসুদেব কৌতুহলের স্বরে বলে—মনে রেখেছেন সেটা?

—হ্যাঁ। বারকয়েক শুনলাম কি না—মুখস্থ করে ফেলেছি—টেন্, এ, সরোজ ব্যানার্জ্জি রোড।

—কি? কি বললেন? কি রোড?

অহেতুক উত্তেজিত শোনায় বাসুদেবের স্বর।

সরোজ ব্যানার্জ্জি রোড। কেন, জানেন না কি সে বাড়ী?

—জানি, মানে—ঠিক জানি না—ইয়ে ওই কাছেই আমার আত্মীয়ের বাড়ী রয়েছে কি না। আর কিছু বলেছেন?

—কতো এলোমেলো বকছেন মশাই, ঠিক-ঠিকানা আছে কিছু? এটা নেহাৎ বারবার বলছিলেন তাই কাণে ঠেকলো। কাল থেকে তবু যেন মন্দের ভালো, টেম্পারেচারটাও অতো রাইজ, করেনি। যাই হোক, দেখবেন নাকি খোঁজ করে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করে বাসুদেব শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে বসলো।

প্রলাপের উত্তেজনা নেই, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, হয়তো ওষুধের ক্রিয়া, হয়তো রোগের দুর্ব্বলতা।

সেই অচৈতন্য মানুষটার দিকে চেয়ে যেন অভিভূতের মতো বসে রইল বাসুদেব।

কে আছে? কে থাকতে পারে? শ্রীমন্তর সঙ্গে যার যোগসূত্র থাকা সম্ভব। হয় তো সে বাড়ীতে আরো অনেক লোক আছে, শ্রীমন্তর যারা আত্মীয়।

পূরবী ছাড়া কাকেই বা চেনে বাসুদেব?

কিন্তু পূরবীকেই কি সত্যি চেনে সে?

চেনবার কোনো পথ রেখেছে পূরবী?

যে মেয়ে অনায়াসে অপরিচিতের গাড়ীতে উঠতে দ্বিধা বোধ করে না, সেই মেয়েই কিনা অনায়াসে উচ্চারণ করে বসলো "ভয় করছে"। দ্বিধামাত্র করলে না।

বাসুদেব কি রাগ করবে? অপমান বোধ করবে? না বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে? সেদিনকার মনের অবস্থা এখন আর ঠিক মনে পড়ে না—তবু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সে বাড়ীতে যাবার একটা ছুতো পেয়ে সত্যিই ভালো লাগছে।

অচৈতন্য বন্ধুর রোগশয্যার পাশ থেকেও বারে বারে সেই চিন্তাটাই আনাগোনা করছে মনে।

'আর কখনো আসবো না হয়তো'—এ কথাটা উচ্চারণ করে নিজের পথেই যে কাঁটা দিয়ে এসেছিল, সেটাতো ঠিক। শ্রীমন্তর অর্থহীন প্রলাপোক্তির জন্যও ধন্যবাদ।...কিন্তু সত্যিই যদি নিছক প্রলাপমাত্র হয়? ঠোঁট বাঁকিয়ে মনে মনে হাসবে তো পূরবী? ভাববে এ এক চাল। আচ্ছা আজই শেষ। একবার সুধু জিগ্যেস করা প্রয়োজন বাসুদেবকে পূরবী ভয় করলো কেন? কিসের ভয়? সেই অতি সাধারণ ঘৃণ্য ভয়?

বিজনবাবু ওষুধ নিয়ে ফিরে এলে বাসুদেব উঠলো।

—যাচ্ছেন নাকি?—প্রশ্ন করেন বিজনবাবু।

জানালায় দাঁড়িয়ে বিজনবাবু গম্ভীরভাবে স্বগতোক্তি করেন—নাঃ খদ্দর-মদ্দর পরুক আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াক, তবু ছোকরার কিছু সেন্স আছে। এই তো দিব্যি গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। আর আমাদের শ্রীমন্তবাবু! হুঃ। আরে বাপু খাবি না পরবি না—বেথা করে ঘর সংসার করবি না—এতো কি দেশের কাজ! সব বজায় রেখে করবি, তবে না সাহস আসবে মানুষের, এগোবে আর পাঁচ জন! গাড়ী চড়ছে না কে? গাড়ী ছেড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে যে নেতারা! জাত যাচ্ছে তাদের? বিয়ে করবে না! হুঁ। বলি গান্ধী বিয়ে করে নি? জহরলাল? সি আর দাশ? যতো কৃচ্ছ সাধন তোদের!

শূন্যকে উদ্দেশ করে মাঝে মাঝে এরকম ঝগড়া করে থাকেন বিজনবাবু, হয় তো আরো চালাতেন, নেহাৎ মনে পড়লো—ওষুধটা এনেছেন, খাওয়ানো দরকার।

প্রথম দেখা হল মাধবীর সঙ্গে।

মাধবী বললে—পূরবী বাড়ী নেই, কোথায় যেন গেছে।

বাসুদেবের হঠাৎ মনে হ'ল যেন একটা ভার নেমে গেল মন থেকে। এসেই পূরবীর সঙ্গে দেখা হল না, এই ভালো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আসবার উদ্দেশ্যটা সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ যেটুকু প্রয়োজনের ছুতোয় এসেছে, সেটুকু মাধবীর কাছে মিটিয়ে নিতে বাধা নেই। কিন্তু তারপর?

কি বলবে?—শ্রীমন্ত নামে কাউকে চেনেন আপনারা?

হয়তো মাধবী বলবে—কই না? হয় তো বড়ো জোর বলবে—কেন বলো তো? বাসুদেব কি বলবে? কারণটা খুলে বলবে না হয়। কিন্তু তারপর? পূরবীর প্রতীক্ষায় বসে থাকবে? কি বলে? কোন লজ্জায়?

মাধবী নিজে থেকেই পূরবীর অনুপস্থিতির সংবাদ দিলে, অর্থাৎ বাসুদেবের আসার উদ্দেশ্যটাই যেন পূরবী। ধ্যেৎ।

মনকে স্থির করে নিয়ে বাসুদেব হেসে বললে—আপনি তো আছেন? না কি কাজ ক্ষতি হবে আপনার?—কিছু না! আমার জীবনে কাজ বলে কিছু নেই, যা করি সবই অকাজ। বোসো ভাই।

—হ্যাঁ বসছি, মানে বেশীক্ষণ বোসতে পারবো না—বন্ধুর অসুখ দেখে এসেছি। আচ্ছা একটা কথা জিগ্যেস করবো, মনে কিছু করবেন না?

—জিগ্যেস করে দেখো, মনে করার উপযুক্ত কিনা বিবেচনা করি।

হাসতে থাকে মাধবী।

—শ্রীমন্ত—শ্রীমন্ত সান্ন্যাল বলে চেনেন কাউকে? যদিও প্রশ্নটা প্রায় পাগলামীর সামিল···ও কি আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

—না না। চেয়ারের হাতলটা চেপে ধরে মাধবী সহজ হবার চেষ্টা করে বলে—না না—শরীর খারাপ করবে কেন? হঠাৎ ও কথা জিগ্যেস করছো যে—

—সত্যি চেনেন বুঝি? আশ্চর্য্য। ওই যে বন্ধুর অসুখ বললাম—অবশ্য বন্ধু মানে—ঠিক সমবয়সী নয়—

—অসুখ করেছে? কি অসুখ?

বাসুদেবের বন্ধুর অসুখের সংবাদে মাধবীর কি ক্ষতি? মাধবী কেন এমন ব্যাকুল হবে?

—ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া—অবশ্য কিছুটা সামলে গেছে।

—কিন্তু তুমি কি করে জানলে?

মনে হ'ল মাধবী যেন কোন দূর থেকে কথা বলছে।

বাসুদেব বিমূঢ় ভাবে বলে—কি জানলাম?

—এই আমি চিনি।

—জানলাম কই? জানতে চাইছি তো। প্রলাপের ঘোরে তিনি না কি বার বার এ বাড়ীর ঠিকানা বলছিলেন।

—ঠিকানা? এ বাড়ীর? সুধু ঠিকানা! আর কিছু নয়? কোনো কথা?

—আমি ঠিক জানিনা দিদি, সবে আজ এসেছি দেশ থেকে। শুনলাম তাঁর মেসের এক ভদ্রলোকের মুখে, কিন্তু শ্রীমন্তদা কি আপনাদের নিকট-আত্মীয়?

মাধবীর মুখ দেখে পরিচয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সুধুই কি পরিচয়? সন্দেহ যে আরো গভীর হচ্ছে।

অতো উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন মাধবীকে? অতো বিচলিত? কিন্তু কিন্তু—মাধবী তো বিবাহিতা···শ্রীমন্তর সঙ্গে এমনি কি আত্মীয়তা থাকতে পারে যে—

—উনি কি আজকাল মেসে থাকেন?—ক্লান্ত শোনায় মাধবীর স্বর—অসুখ কি খুব বেশী বাসুদেব?

—বেশী বই কি দিদি, তবে ক্রিটিক্যাল ষ্টেজটা পার হয়ে গেছে আশা করা যাচ্ছে, দেখতে যাবেন?

—আমি? আমি দেখতে যাবো কি করে? সে তো মেস।

হতাশভাবে উচ্চারণ করে মাধবী।

—বেস্ তা' কি হয়েছে? চলুন না আমার সঙ্গে—

বলতে গিয়ে থেমে যায় বাসুদেব। কি জানি এই আহ্বানটা স্যায়সঙ্গত কিনা, মাধবীরও ভয় করবে কি না কে জানে। সমাজ সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান হয়তো নেই বাসুদেবের।

—তা' হয় না। সুধু তুমি ফোন্ করে আমায় সংবাদ দিও এক একবার কেমন থাকেন। দেবে তো? কিছু মনে করবে না তো ভাই?

—মনে?—বাসুদেব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে—নিশ্চয়ই মনে করবো—'করবো' কেন, করছিই তো। ফোনে খবর নিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল বুঝি? অথচ তিনি হয় তো আপনাদের আশা করছিলেন ভেতরে ভেতরে। অসুস্থ মানুষ আত্মীয়-স্বজনকে আশা করে না কি?

—না। আশা করবার আর কিছু নেই তাঁর। যাবার উপায় সত্যিই নেই। কিন্তু ডাক্তার টাক্তার দেখানো হচ্ছে তো?

—যতোটা সম্ভব। মুস্কিল এই—ওঁর বাড়ীর ঠিকানা বা কেউ আছে কিনা কিছুই জানি না—

—বাড়ীতে? কেই বা আছে—অন্যমনস্কের মতো উচ্চারণ করে মাধবী—চাকর বাকর ছাড়া।

—আচ্ছা, খবর দেবো আপনাকে—উঠে দাঁড়ায় বাসুদেব।

—চলে যাচ্ছো?

মাধবীর স্বরে এক অর্থহীন ব্যাকুলতা।

বাসুদেব চলে গেলেই বা ক্ষতি কি? ওতো যাবে না বাসুদেবের সঙ্গে। বাধাটা কি সত্যই এতো দুর্ল্লঙ্ঘ্য? এই মুহূর্ত্তে ছুটে যাওয়া যায় না শ্রীমন্তর রোগশয্যার পাশে? যে শ্রীমন্ত প্রলাপের ঘোরে উচ্চারণ করে মাধবীর ঠিকানা।

এ বাধা সৃষ্টি করলো কে?

নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেও কি মাধবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে?

ফিরে আসতে আসতে সারা পথ মাধবীর ব্যাকুল-মুখ মনে পড়ছে বাসুদেবের। আত্মীয়—সাধারণ অর্থে 'আত্মীয়' বলে মনে হ'ল না। তবু হয় তো পরমাত্মীয়। বিবাহিতা নারীর পক্ষে যে আত্মীয়তা স্বীকার করা কঠিন।

আশ্চর্য্য! শ্রীমন্তর জীবনের সমস্যাও একদিন জটিল হয়ে উঠেছিল এই বাড়ীতেই?···কবে? কতো দিন আগে? শ্রীমন্তকে আজ তিন বছর দেখছে বাসুদেব, কোনোদিন কোনো ছলে শোনেনি এ পাড়ার নাম ওর মুখে।

তবু সন্দেহ করবার কিছু নেই।

আত্মভোলা কর্ম্ম-পাগল শ্রীমন্তর জীবনেও লুকোনো আছে রহস্য, আছে প্রেম! কাউকেই ছেড়ে কথা কয় না সে!

মেসের দরজাতেই দেখা বিজনবাবুর সঙ্গে।

—কি হল? গিয়েছিলেন না কি?

প্রশ্ন করলে ভদ্রলোক।

—হ্যাঁ গিয়েছিলাম বৈ কি। না নেহাৎ প্রলাপ নয়, রয়েছে আত্মীয়, তবে—এমন কিছু আত্মীয় বলে মনে হ'ল না, ফোনে খবর দিতে বললে—কেমন থাকেন।

সহজ সুরে উচ্চারণ করলে বাসুদেব।

—তবে তো খুব মহত্ত্ব দেখিয়েছে—বিজনবাবু বিরক্তভাবে বলেন—শ্রীমন্তবাবুর গলায় দড়ি তাই হেদিয়ে মরছিলেন তাদের জন্যে। যতো সব রাবিশ!

যাক এখন আছেন কেমন?

—অনেকটা ভালো, টেম্পারেচারটা অনেকটাই ফল্ করেছে। বরফ বন্ধ করে দিলাম। ডাক্তার এসেছিল একটু আগে, ভালোই বলে গেল।

শ্রীমন্তর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শ্রীমন্ত চোখ খুলে বললে —কে, বাসু? কবে এলে?

—আজই তো, কেমন আছেন?

—দেখছি তো মরলাম না।

মৃদু হেসে চোখ বুজলো শ্রীমন্ত।

বাসুদেব চলে যাবার পরদিন ঘুম থেকে উঠেই পুরবীর প্রথম মনে হ'ল কী যেন একটা প্রকাণ্ড লোকসান হয়ে গেছে তার। কিন্তু কেন? বাসুদেব যদি কোনোদিনই আর না আসে, এতো কি লোকসান? বাসুদেবকে তার প্রয়োজন কি?

যতোই ভাবতে চেষ্টা করে—নেই—কোন প্রয়োজন নেই, ততোই ঘুরে ফিরে মনে পড়ে গত সন্ধ্যার কথা।

স্পষ্ট আর কি মনে পড়ে? সুধু একটা উদ্দাম গতিবেগ, আর একটা অননুভূত হৃদয়াবেগের ভার। যে ভার সহ্য করা সহজ হচ্ছিল না।...কিন্তু ছিঃ! পুরবী কি করে উচ্চারণ করলো 'ভয় করছে'। কি করে হাত চেপে ধরলো তার? লজ্জায় ধিক্কারে নিজের ওপর বিরক্তিতে শতধা হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

বারে বারে কেবলই কি পুরবী নিজেকে এমনি করে খেলো করবে? যার কাছে দৃপ্তভঙ্গীতে নিজেকে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে, তার কাছেই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে প্রতিদিন?...

কি মনে করলো বাসুদেব?...

কি মনে করলো পুরবীকে?...

বাসুদেব কতো সহজে স্বীকার করলো—'ভালো লেগেছে—' 'ভালো লেগেছে পুরবীর সান্নিধ্য।'...পুরবী কেন পারলো না? অন্ততঃ ভালো লাগা না-লাগার বাইরে ঘটনাটা নিতান্ত সহজভাবে নিয়ে বাসুদেবের কাছে আত্মসম্মানটা বজায় রাখতে পারলো না কেন? পুরবী যে কিছুই কেয়ার করে না এ কথা কি আর কোনদিন বিশ্বাস করবে বাসুদেব?

প্রিয়জনের দৃষ্টিতে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

মাধবী এক সময় পাকড়াও করলে—তোর কি হয়েছে রে রুবি?

—কই, কিছু তো হয় নি। হবে আবার কি?

—এই যে কেমন উদ্‌ভ্রান্তর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কি রে বাপু প্রেমে-ট্রেমে পড়ছিস্ না তো?

নিজস্ব ভঙ্গীতে দিদিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে হেসে ওঠে পুরবী—বলে—পড়েই তো আছি তোমার প্রেমে।

—রক্ষে কর বাপু, আমার প্রেমে আর পড়ে কাজ নেই। কিন্তু সাবধান।

দিদিকে ছেড়ে দিয়ে পুরবী রহস্যময় হাসি হেসে বলে—যদিই পড়ি? কি হয়?

—হয় আর কি, লোকনিন্দে! পাঁচজনে বলবে—মা নেই, শাসন করবার কেউ নেই—মেয়েটা বয়ে গেল।

—শাসন? ইঃ। আমাকে আর কারুর শাসন করতে হয় না, আমি একটি দুঃশাসন, বুঝলে।...নাও, এখন সরোতো ঘরের ঝুল ঝাড়ি।

—ঝুল ঝাড়বি? তুই?

হতবুদ্ধি মাধবীর কথার উত্তরে পুরবী পিঠের আঁচল টেনে এনে কোমর বাঁধতে বাঁধতে বলে—নিশ্চয় আমি। কেন নয়? ইচ্ছে করলে কিনা পারি আমি?

—আচ্ছা তুই খুব কাজের মেয়ে, কিন্তু ঝুল ঝাড়া কাজটা না পারলেও চলবে। কিম্ভূত একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে, কেমন?

—হ্যাঁ, ভয়ানক। না করতে পেলে রক্ষে রাখবো না।

দুম্ দাম করে কাজে লেগে গেল।

সত্যিই কিছু না করলে যেন স্থির থাকতে পারছিল না। ক্রমান্বয়ে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে থাকলে যে ক্লান্তি আসে, গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমেও বোধ করি তেমন হয় না। ক্লান্তিতে পুরবীর বড়ো ভয়।

ও লাফাবে ছুটবে চেঁচাবে, বেঁচে থাকবে। মাধবীর মতো মরে যাবে না।

সুধু নিজের ঘর পরিষ্কার করে ক্ষান্ত হ'ল না, বাড়ীর সর্ব্বত্র হৈ হৈ লাগিয়ে দিল।...সঙ্গে সঙ্গে ঝি-চাকরদের শাসনকার্য্যও চলছে পুরোদমে। আজকে যে আর তাদের শান্তির আশা নেই, এ বুঝতে পেরে সকলেই উৎসাহ দেখিয়ে কাজে লাগলো। বড়দির কাছে যতো কিছু ফাঁকি চলে, কিন্তু ছোড়দি দুর্দান্ত মেয়ে, ওকে ভয় না করে উপায় নেই।

বাচ্চা চাকর গণেশ বোধ করি ছোড়দিকে খুসী করবার উপযুক্ত আর কিছু খুঁজে না পেয়ে—এখান-সেখান থেকে রাজ্যের ধুলোপড়া পুরনো ফটোর কাঁচগুলো মুছে পরিষ্কার

করতে বসেছিল—পূরবী এর মধ্যে একখানা এনলার্জ করা বড়ো ফটো দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।…এ কী!

—এ ছবি কোথায় পেলি রে গণেশ?

ছোড়দির প্রশ্নের উত্তরে গণেশ মহোৎসাহে বলে—উই তো ও ঘরে আলমারীর পেছনে গোঁজা ছিল। টেনে বার করে ধুলো ঝাড়ছি—কর্ত্তামার ছবি তো?

কর্ত্তামাকে অবশ্য সে দেখেনি কোনোদিন্ তবে শোনা ছিল।

পূরবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলে—এ ছবি আলমারীর পেছনে পড়েছিল? কে রেখেছিল?

গণেশের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। ভয়ে ভয়ে বলে—আমি কেমন করে জানবো? আগে তো তেতলায় বাবুর ঘরে টাঙানো ছিল দেখেছি, কে রেখেছে শুধোও?

—রোসো শুধোচ্ছি। ভালো করেই শুধোচ্ছি।

পূরবীর চেঁচামেচীতে মাধবী এসে দাঁড়ালো, বললে—এই তোর কাজ? সারাক্ষণ বক্‌বক্ করবার জন্যে?

—বক বক? দেখো দিকিন তাকিয়ে? চিনতে পারছো ছবিটা?

—মার ছবি!—মাধবী বলে—মোছাচ্ছিস ভালোই, ভারী ধুলো হয়েছে দেখছি!

পূরবী নামিয়ে এনেছে ভেবে বিশেষ কিছু বলে না।

—বাবার ঘর থেকে এর নির্ব্বাসন হয়েছে বুঝলে? আলমারীর পিছনে মাকড়সার জাল হয়ে পড়েছিল।

—ও মা সে কি? কে পেড়ে আনলে?

—জানি না, জিগ্যেস করো তোমার আদরের চাকরদের।

আর কেউ সদুত্তর দিতে না পারলেও বিমলা পারলে।

মিসেস হালদারই নামিয়ে দিয়েছেন। রোগীর ঘরে চোখের সামনে অনবরত একটা মৃত ব্যক্তির ছবি রাখা নাকি চিকিৎসাশাস্ত্র-বিগর্হিত, তাই সরিয়ে দিয়েছেন মিসেস হালদার।

—কে তাকে সর্দ্দারী করতে বলেছে শুনি?…বিমলা, বলে দিবি বাড়ীর জিনিস এদিক-ওদিক করবার কোনো দরকার নেই তাঁর।

বিমলা মুখ টিপে হেসে চলে গেল এবং মিনিট দুই পরেই এসে বললে—ছোড়দি, নার্স মাসীমা বললেন—রুগীর বিষয়ে তিনি যা ভালো বুঝবেন—

—ফের 'নার্স মাসীমা'? কতোদিন বলেছি ওসব বলবিনা খবরদার?

বিমলা অমায়িক ভাবে বলে—তবে কি বলবো?

—কেন মিসেস হালদার বলতে পারো না তুমি? এতো শক্ত ইংরিজি?

—শক্ত কেন হবে, তবে বারোমাস একটা ঘরের লোককে হিজিবিজি বলা যায় কখনো? মা, মাসী না বললে চাকরী থাকবে কেন আমাদের?

—চাকরীর কর্ত্তা কি তিনিই হয়েছেন আজকাল?

—কি জানি ছোড়দি, এ বাড়ীর কে যে কর্ত্তা কে যে গিন্নী, হিসেব করাই দায়। আমাদের হয়েছে মরণ।

—পূরবী মাধবীর কাছে গিয়ে উত্তেজিত ভাবে বললে—দিদি তুমি ওকে তাড়াবে কি না?

—কাকে রে?

—তোমার ওই সাধের মিসেস হালদারকে। ও কি ভেবেছে যা ইচ্ছে তাই করবে? পয়সা দিলে আরো ঢের নার্স মিলবে। মাইনে করা লোকের এত ফড়ফড়ানি কিসের? অনেকদিন লক্ষ্য করেছি আমি—

—রুবি, চুপ কর।

শান্ত শোনায় মাধবীর কণ্ঠস্বর।

কিন্তু রুবি মাধবী নয়, উদ্ধত কণ্ঠস্বর ওর নীরব হবে না সহজে।

—কেন চুপ করবো? ওকে এতো ভয় কিসের? বেশ, তুমি না পারো আমিই যাচ্ছি বলতে।

—পাগলামী করিস নে রুবি, ওকে তাড়াবার ক্ষমতা তোর আমার নেই।

—হঠাৎ তোমার এরকম ধারণার মানে?

—মানে বোঝা কি খুব বেশী শক্ত রে? যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস—এইটুকু বোঝা উচিৎ, বাবার ঘর থেকে যে মার ছবি নামিয়ে দিতে পারে—তাকে নামানো খুব সহজ নয়।

বোকা পূরবীও নয়, সুধু বাড়ী সম্বন্ধে ও বড়ো বেশী অন্যমনস্ক বলেই বোধ করি বোঝাতে হ'ল মাধবীকে।

মিনিটখানেক আরক্ত মুখে গুম হয়ে থেকে বললে—তাহ'লে এই সব স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে হবে?

—উপায় কি? স্বেচ্ছাচারকে কখনো আটকানো যায় না রুবি। না তোমার, না আমার, না আর কারোর।

—সুবিধে পেয়ে খোটা দিচ্ছ?—জল টল্‌টল্ করে ওঠে পূরবীর দুই চোখে।

—ছিঃ। ও কথা বলিস না। ভেবে দেখ আমার স্বেচ্ছাচারকেও তো তোরা আটকাতে পারিস্‌নি?

কোনো প্রতিকার হ'ল না, শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেল ওদের "মৃত্তিকা ক্লাবে।"…একটু ঘুরপথ দিয়ে গেলেই বাসুদেবের বাড়ীটা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাসুদেব আজ নেই। দোতলার জানলাগুলো সব বন্ধ। কাল যখন বাসুদেবের বাড়ীতে এসেছিল পূরবী, উঠেছিল ওই দোতলায়, মাঝখানের জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল—যেখান থেকে চোখে পড়ে 'মৃত্তিকা ক্লাবের' পিছনের দিকের জমিটা। মুক্তিকামী বীর সৈনিকদের স্মৃতিকাগার।

ঘরের মধ্যে সকলেই প্রায় জড়ো হয়েছে। সুরমাদি, আভাদি, উজ্জলাদি, কুন্তলাদি, সবিতা, বাণী সেন, বিকাশ,

সুখেন্দু, সত্যব্রত, চিরঞ্জীব, পরিমল, আরো কয়েকজন যাদের নাম ভালো করে জানে না এখনো পূরবী।

পূরবী ঘরে ঢুকতে সবাই একবার চোখ তুলে দেখলো—কেউ কিছু বললো না। কৌতূহল প্রকাশ করা এদের নীতি-বিরুদ্ধ—কারুর সম্বন্ধে বা কোন বিষয়ে। পূরবী কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিল কেন সে-প্রশ্ন করবেনা কেউ। সুধু সুরমাদি হয়তো কোনো সূত্রে কোনো সুযোগে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করবেন।

টেবিলের ওপর কিসের একটা খসড়া বিছোনো, যাঁরা প্রধান তাঁরা ঝুঁকে আছেন তার ওপর, অপ্রধানরা উঁকিঝুঁকি মারছে তাঁদের কাঁধের পাশ দিয়ে।···অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা চলছে—দু'একটা শব্দ কাণে এলেও ঠিক বোধগম্য হচ্ছেনা ব্যাপারটা। অথচ কাউকেই কোনো প্রশ্ন করবার উপায় নেই, কৌতূহলপ্রকাশ নীতিবিরুদ্ধ।

কিছুক্ষণ পরে কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে সুরমাদি মুখ তুলে প্রায় বক্তৃতার ভঙ্গীতে আরম্ভ করলেন—তোমরা সকলেই এসেছো দেখছি, ভালো লক্ষণ এটা। কারণ আজকাল অনেকেরই একটু অবহেলার ভাব লক্ষ্য করছি—

—প্রত্যেকদিন এলে কলেজের পার্সেন্টেজ মোটে থাকেনা সুরমাদি—

সবিতা বলে ওঠে।

—বেশ তো কলেজের পার্সেন্টেজটাই বজায় রাখলে পারো, এখানে আসবার দরকার কি?—চশমার ভেতর থেকেও সুরমাদির দৃষ্টির তীব্রতা ধরা পড়ে।

সবিতার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

—যাক্ যা বলছিলাম—সুরমাদি ফের সুরু করেন—আগামী অধিবেশনে আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করাতে চাই, তার আগে এবিষয়ে একটু আভাস দিচ্ছি। দেশের অনেকেই আজ 'স্বাধীনতা পেয়েছি' বলে আনন্দে অধীর হচ্ছে, অথচ যা পেয়েছে সে যে কতো ভুয়ো কতো অসার তা' বলে কাজ নেই।···এতোদিনের এতো চেষ্টা, এতো সাধনা, এতো স্বপ্ন, এতো আত্মত্যাগ, এতো রক্তপাতের পুরস্কার কি এই? আমি চট্টগ্রামের মেয়ে, বাণী বুঝি মৈমনসিংয়ের—সত্যব্রত খুলনার ছেলে—আমরা আর ভারতীয় নই! ভাবতে পারো একথা? এর নাম স্বাধীনতা পাওয়া? নেতারা তাই জোর গলায় বলছেন—যে যার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করো। গলায় দিতে দড়ি জুটবে না আমাদের? অ-ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে আমরা জগতের সামনে ঘুরে বেড়াবো? মুখ দেখাবো পৃথিবীকে?

—না না কিছুতেই না।

অনেকগুলো কণ্ঠ একসঙ্গে সাড়া দিয়ে ওঠে।

—অথচ আমাদের পথ বন্ধ হয়ে আসছে চারিদিক থেকে—সুরমাদি বলতে থাকেন—যে বিক্ষোভ যে বিদ্রোহ ছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে, সেটা চালাতে হবে দেশবাসীর বিরুদ্ধে! কিন্তু উপায় নেই। আমাদের তো বাঁচতে হবে।···নেতারা যতো বড়ো বড়ো গালভরা কথাই বলুন, আসলে সেই ডিক্টেটরশিপ্। আসলে ব্যাপারটা কি জানো—ওঁরা চেয়েছিলেন খানিকটা ক্ষমতা, সেটা পেয়ে গেছেন, সাধারণ লোকের মনের দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ নেই ওঁদের।···আমরা যদি আজ এই স্বাধীনতার স্বর্ণযুগের ওপর শর সন্ধান করতে চেষ্টা করি, নতুন করে চালাতে চাই সংগ্রাম, আমাদের দেশদ্রোহী বলে জেলে পাঠাতেও হয়তো কুণ্ঠিত হবেন না এঁরা।···তবু ভয় খাবো না আমরা। নতুন পরিকল্পনায় নামবো সংগ্রামের ক্ষেত্রে।···

পূরবী একটু উসখুস্ করে বলে উঠলো—কিন্তু সুরমাদি, ওঁরা তো বলছেন—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ওঁরা সবজান্তা।—সুরমাদির কালো চোখ চশমার মধ্যে থেকে জ্বলে ওঠে—সব ঠিক হয়ে যাবার নমুনা দেখতে পাচ্ছি—পাঞ্জাবে, দেখেছি বাংলায়, আবার দেখবো সারা ভারতে।···বাইরের জগত ধন্য ধন্য করছে, বিনা রক্তপাতে ভারত স্বাধীন হ'ল'—কিন্তু এই অজস্র রক্তপাতের হিসেব ধরা হচ্ছে না কেন?

—কে ধরবে?

বোকা সবিতা বোকার মতোই প্রশ্ন করে বসে।

—কে ধরবে? ধরবো তুমি, আমি, দেশের ক্ষমতাহীন জনসাধারণ। বিনা কৈফিয়তে যে যার মাছের ভাগটুকু নিয়ে ঘরে উঠলে চলবে না।

তার্কিক পূরবীর স্বভাব জেগে ওঠে—তর্কের সুরে বলে—তবু তো দেশের লোকেই নিলো? বিদেশীরা যে ল্যাজা মুড়োসমেত আস্ত রুইটাই গ্রাস করে রেখেছিল? তারা তো গেল!

সুরমাদি শ্লেষের হাসি হেসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দেন—তর্কের গন্ধ পেলে পূরবীর খেয়াল থাকে না যে সে কোন্ সমিতির সদস্য। বেশ তো যাও না সেই আদি ও অকৃত্রিম কংগ্রেসের ছত্রতলে, দুইচোখে সাতপুরু কাপড় বেঁধে মহা-পুরুষ নেতার অনুসরণ করো গে। যিনি—

—থাক্ সুরমা, ভুলে যেও না ব্যক্তিগত সমালোচনা আমাদের নীতি নয়।

সীতেশ সুরমার চেয়ে বয়সে বড়ো বলেই হোক কিম্বা বেশী অন্তরঙ্গতার সুযোগেই হোক 'তুমি'ই বলে সুরমাকে। সুরমার অতি উদ্ধত মতাবতটা সব সময়ে সকলের পক্ষে হজম করা কঠিন বলেই মাঝে মাঝে তাকে থামাতে হয় সীতেশকে।

—এটা সমালোচনা নয়।

গুম্ হয়ে চুপ করেন সুরমাদি।

সীতেশ আরম্ভ করে—শোনো তোমরা—সুরমা বলতে চাইছেন—

—আমি কিছুই বলতে চাই না।

গর্জ্জন করে ওঠেন সুরমাদি।

—মান-অভিমানটাও আমাদের নীতিবিরুদ্ধ—সীতেশ মৃদু হেসে বলতে থাকে—বেশ আমিই বলতে চাইছি—ধরে নেওয়া গেল স্বাধীনতা এসেছে—ধরে নেওয়া গেলো বিদেশীরা দূর হয়েছে, তবু এখনো আমরা, নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট নই।···আমাদের আরো সংগ্রাম চালাতে হবে। তার জন্যে চাই পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা। এলোমেলো করে—ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে যাবার দিন আজ আর নেই। এর জন্যে প্রথমে চাই সমিতির ওপর আনুগত্যের শপথ, তারপর—

—কিন্তু সংগ্রামের চেহারাটা কি?—চিরঞ্জীব প্রশ্ন করে।

—সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে—সুরমাদি অভিমান ভুলে খিঁচিয়ে ওঠেন।

—চেহারাটা কি, সেইটাই বোঝানো হবে আগামী অধিবেশনে।

পূরবী একটু গম্ভীর হয়ে সুরমাকে অগ্রাহ্যের ভঙ্গীতে সীতেশকে উদ্দেশ করে বলে—

—কিন্তু সীতেশদা, আজ ছ'মাস ধরে তো অধিবেশনের পর অধিবেশনই চলছে, হচ্ছে—নতুন নতুন পরিকল্পনা, কিন্তু সত্যিকার কোনো কাজ আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন কই?

—কাজ গাছের ফল নয় যে পেড়ে এনে তোমাদের হাতে দেব—সুরমাদি বিরক্ত হয়ে বলেন—কতো অসুবিধের মধ্যে আমাদের কাটাতে হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া আছে? চাঁদা—তাও সদস্যেরা সকলে নিয়মিত দেয় না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে অনেক সদস্য-সদস্যারাই চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সীতেশ বললে—হ্যাঁ, ওটাও একটা প্রধান কথা। অর্থাভাবেই আমাদের সব কিছু পণ্ড করছে, অর্থহীন করে তুলছে সব কথা। কাজে নামবার আগে—

কুন্তলাদির কথায় ঝাঁজ নেই, টক আছে—মুচকে হেসে বলেন—কাজে নামবার আগে বরং কিছুদিন চারটী চেলাচামুণ্ডা জোগাড় করে প্রার্থনাসভা করে বেড়ান সীতেশদা, ও চিন্তাটা দূর হবে।

—কুন্তলা, ফের!

—বাঃ ঠিকই তো বলেছি সীতেশদা। মহাপুরুষভজা দেশ আমাদের, নিরন্ন হলেও নির্লজ্জ নয়, টাকার থলি আপনার দু'দিনে ভরে উঠবে।

—কুন্তলা, এটা ফাজলেমীর জায়গা নয়—সুরমাদি পা ঠুকে বিরক্তি প্রকাশ করেন—আমি লক্ষ্য করেছি সিরিয়াস্ আলোচনার মাঝখানে তুমি ইয়ার্কি জুড়ে দাও। মানে কি এর?

—আমার স্বভাব সুরমাদি।

—সীতেশ, তুমি হাসছো? লজ্জা করে না এই সব বেয়াড়াপনাকে প্রশ্রয় দিতে?

—পৃথিবীটাই যে একটা বেয়াড়া জায়গা সুরমা।—সীতেশ হেসে ফেলে।

সুরমাদি নিরুপায়-আক্রোশে চেয়ারে বসে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন—উঃ অসহ্য! এ দেশের উচ্ছন্ন যাওয়াই ঠিক। আমি আর এর মধ্যে নেই সীতেশ মনে রেখো।

—পাগলামী কোরোনা সুরমা—সীতেশ গম্ভীরভাবে বলে—তা'হলে—আজকের মতো 'মৃত্তিকার' কাজ বন্ধ হোক—আগামী অধিবেশনে—কবে হচ্ছে ওটা সুরমা? বারো তারিখে?···হ্যাঁ বারো তারিখে ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য উপস্থিত হবে। এইবার তোমাদের কাজ দেবো—সত্যিকার কাজ।

সুরমা, সীতেশ আর সত্যব্রত ছাড়া সকলেই বেরিয়ে এলো।

সভার চেহারা প্রায়ই এই রকম হয়। প্রথম দিকে থাকে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ যথাযথ আদবকায়দা সম্বলিত, আস্তে আস্তে ঝড় ওঠে—শেষ পর্য্যন্ত। "সত্যিকার কাজের" হদিশ আগামী অধিবেশনের জন্যে তুলে রেখে দেওয়া হয়, সভা ভেঙে বেরিয়ে আসে সবাই—পথে আলোচনা সমালোচনা সব কিছুই হতে থাকে। অসহিষ্ণু যারা তা'রা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আলাদা একটা প্রতিষ্ঠান খুলবে। মোট কথা, সুরমাদির ওপর কেউই বিশেষ প্রসন্ন নয়, কিন্তু পরবর্ত্তী অধিবেশনের মুখে দেখা যায় সুরমাদিই তোড়জোড় করছেন সব চেয়ে বেশী। অবিশ্যি না করলেও চলে না, উনিই যখন সেক্রেটারী।

—এওতো সেই ডিক্টেটরী—পথে এসে বাণী সেন তীব্র মন্তব্য করে। উনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে—প্রতিবাদ চলবে না, তর্ক চলবে না—এই বা কেমন কথা?

'উনি' অর্থে সেক্রেটারী সুরমাদি।

পূরবীর বোধকরি প্রতিবাদ করাই স্বভাব, তাই হঠাৎ সুরমাদির পক্ষাবলম্বন করে বাণী সেনের কথার প্রতিবাদ করে ওঠে—

—একজনকে কিছুটা প্রাধান্য না দিলে কোন কাজই সুশৃঙ্খলে চলে না বাণী, তা' না হ'লে মিনিষ্টারদের পোষ্ট উঠিয়ে দিতে হয়—

—আমার কিন্তু মনে হয়—বিকাশ এগিয়ে এসে বলে—মনে হয় সুরমাদির বদলে আপনারই সেক্রেটারী হওয়া উচিৎ পূরবী দেবী।

হঠাৎ আপনার এরকম উচিৎ-বোধের উদয় হ'ল কেন বলুন তো—পূরবী হেসে ওঠে।

—কারণ আপনার কথায় যুক্তি আছে, বিচার আছে, ধৈর্য্য আছে। স্বরমাদির সব কটিরই অভাব।

—তবু স্বরমাদিকে নইলে সীতেশদার চলেনা।

সকলেই হেসে ওঠে। এটা 'মৃত্তিকা ক্লাব' নয়—নিতান্তই পৃথিবীর মাটি মাত্র, তাই বোধকরি নীতিবিরুদ্ধ কাজটা করতে দ্বিধা দেখা যায় না বড়ো কারুর।

গন্তব্যস্থল এক নয়—আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সকলে নিজ নিজ পথে।

তবু এরাই অপরের সঙ্গে তর্ক করবার বেলায় করে বড়ো বড়ো কথায়, য' শিখে আসে ক্লাবে। নিজেদের মস্ত একটা কিছু মনে করে সুখ পায়। দেশকে ইচ্ছে মতো গড়া ভাঙা যে কিছু নয় তাদের কাছে, কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর বোকামীর জন্যে পারছে না, সেই কথাটাই সশব্দে ঘোষণা করে বেড়ায়।

পুরবী ফিরতেই মাধবী বিরক্তভাবে বললে—তুই কি আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিবি নে রুবি? না খেয়ে-দেয়ে সেই বেরিয়ে গেলি, এখন আসা হল?

—ও, আমি আজ খাইনি বুঝি। মনে ছিল না কিন্তু।

—তা' থাকবে কেন। ক্ষিদে পাবে তোর, আর মনে রাখব আমি। বাবা তোমাকে দু-দুবার ডেকে পাঠিয়েছেন তা' জানো? নাও কিছু খেয়ে নিয়ে যাও শিগগির।

পুরবী কঠিন হয়ে উঠলো মুহূর্তে—কেন আমাকে তাঁর কি দরকার? তিনতলায় ওঠাতো ছেড়েই দিয়েছি আমি।

—তাই বা দিয়েছিস কেন? অসুস্থ বাপের কুশল-প্রশ্নটা করবার সময় হয়না তোর?

—হবে না কেন, যাইনা, আমার ভালো লাগেনা বলে।

—ভালো লাগা না লাগাটাই তোর কাছে সব? কর্ত্তব্যজ্ঞান বলে কিছু নেই?

—দোহাই দিদি, মাপ করো। তোমার মতো আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান অতো টনটনে নয়। যেটা বিরক্তিকর সেটাকে বিরক্তিকর ছাড়া আর কিছু বলতে পারিনে আমি।

—বেশ করো, খুব বাহাদুরী করো। নাও এখন এসো কিছু খেয়ে নাও দয়া করে।

—নেবোনা যাও। তুমি যা রেগে রেগে কথা বলছো!

—ওমা কখন আবার আমি রেগে রেগে কথা কইলাম?

—ওই যে—তুই বলছোনা—তুমি বলছো।

—এই কথা? আচ্ছা 'তুই তুই তুই'—হ'ল তো? এখন চল খাবি।

—নাঃ দিদি ঘুরেই আসি ওপর থেকে।

—সে কিরে? খিদেয় সারা হচ্ছিস—

—কে বললে সারা হচ্ছি? বরং পায় নি।···এসো আসছি।

ব্রজমোহনের ঘরে গিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—আমায় ডাকছিলেন?

ব্রজমোহন ভুরু কুঁচকে বলেন—ডেকেছিলাম—তা' তোমার তো সময়ই হয় না।

—এখন সময় আছে, বলুন কি বলবেন।

—সময় আছে? কৃতার্থ হলাম। বোসো ওইখানে।

—ঠিক আছি, বলুন না।

—তোমাকে কিছু বলবার আছে, দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না।

—বলুন না কি বলবেন।

—কেন বসতে তোমার আপত্তি কি?—ব্রজমোহন প্রায় ধমক দিয়ে ওঠেন—বলছি বসো।

—অনর্থক জেদ করছেন কেন,—এঘরে বসতে আমার ভালো লাগেনা।

—আপনার এ কথার অর্থ?—ব্রজমোহনের মাথার দিক থেকে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন মিসেস হালদার—এ ঘরটা এতো অপবিত্র হ'ল কিসে মিস ঘোষাল?

—আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছে না—মিসেস হালদারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পূরবী বাপকে উদ্দেশ করে বলে—কি বলতে চান একটু তাড়াতাড়ি বলবেন।

—কেন? ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে তোমার? ভারী কাজের লোক হয়েছ, না? একটা লোক মরেছে কি বেঁচে আছে—ছ'মাসে খোঁজ নেবার সময় হয়না এতো কাজ! লজ্জা করে না?

বাপের কাছে এধরণের অভিযোগ এবং শ্লেষ বিদ্রূপ ধমক খাওয়া সব কিছুই অভ্যাস আছে পুরবীর, কিন্তু মিসেস হালদারের সামনে অপমানে মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, তবু ধৈর্য্যচ্যুত না হয়ে স্থিরভাবেই বলে—কাজ থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু আছে বলে মনে করি না আমি, কিন্তু আপনি কি শুধু এই বলবার জন্যই ডেকেছিলেন?

পুরবীর কথার সুরে অবহেলা কল্পনা করে ব্রজমোহন 'তেলে বেগুনে জলে' ওঠেন—এই জন্যে। তোমাকে সায়েস্তা করবার জন্যে ডেকেছি, অবাধ্য বাচাল মেয়ে!

না, পুরবীর মুখ চোখ যতই রাঙা হয়ে উঠুক, হারবেনা কিছুতেই। চলেও যাবেনা, কেঁদেও ফেলবেনা। অতএব কাঁদতে যে না চাইবে বাধ্য হয়ে হাসতেই হবে তা'কে।

মৃদু হেসে বলে—ওগুলো বড্ড পুরনো হয়ে গেছে বাবা। নতুন কিছু যদি বলবার না থাকে তো যাই আমি।

—আপনার মেয়েদের শিক্ষাটা বেশ ভালোই দিয়েছেন দেখছি মিষ্টার ঘোষাল!—মিসেস্ হালদারের চৌকো ফ্রেমের

চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টি ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে—একজন তো স্বামীর ঘর করতেই পারলেন না, ইনিও যে ভবিষ্যতে—

ভবিষ্যতে পূরবীর পক্ষেও স্বামীর ঘর করা সম্ভব হবে কি না—মিসেস হালদার বোধকরি সেই সন্দেহ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করছিলেন—পূরবী অনুত্তেজিত ঠাণ্ডা গলায় বলে, আপনি বাইরে যেতে পারেন মিসেস হালদার। আমাদের পারিবারিক আলোচনার মধ্যে অপরের উপস্থিতি পছন্দ করিনা আমি।

ব্রজমোহন মনে মনে এই মেয়েটাকে রীতিমত ভয় করলেও মুখে হারতে রাজী হন না, এবং সেই কারণেই বোধকরি ভেতরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যা বলে বসেন সেটা অতিরিক্ত রকমের রূঢ় শোনায়। আজও মিসেস হালদারের অবমাননায় ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চীৎকার করে ওঠেন ভদ্রলোক—যদিও ভাবটা খুব ভদ্র নয়—

—তোমার পছন্দ-অপছন্দয় পৃথিবী চলবে না বুঝলে? বেশ করবেন থাকবেন উনি এ ঘরে—যে পছন্দ না করবে সে বেরিয়ে যাক।

—সে তো চাইছিই, আপনিই আটকালেন। এ ঘরে ঢুকতে আমারও প্রবৃত্তি হয় না।

—প্রবৃত্তি হয় না? প্রবৃত্তি হয় না তোমার আমার ঘরে ঢুকতে? আমার মুখের ওপর এই কথা বলছো তুমি? রুগ্ন বাপের ঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি হয় না—হয় যতো রাজ্যের বওয়াটে ছোঁড়ার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াতে, কেমন? মনে করো বিছানায় শুয়ে থাকি, কিছুই টের পাই না, জেনো তোমার বিষয় অনেক কথা জেনেছি আমি।

পূরবীর মুখে এলো—'জানবেন না কেন, বিছানায় শুয়ে দুনিয়ার খবর রাখা যায়—যদি—ভালো সংবাদদাতা থাকে'—কিন্তু বললে না সে কথা, গম্ভীরভাবে একটা চেয়ার টেনে বসে বললো—আচ্ছা এই বসলাম, আপনার যা যা বলবার আছে বলে নিন।

এ মেয়েকে কী শাসন করবেন ব্রজমোহন!

অথচ কিছুও করা দরকার। ঠিক পিতৃকর্তব্য স্মরণ করে নয়, দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়ে থেকে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে যেমন ধারণাটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে ব্রজমোহনের, তেমনি সাংসারিক ভালোমন্দ বিচার-বুদ্ধিও হয়ে এসেছে ঘোলা। তাঁর সন্তুষ্টিসাধন ছাড়া সংসারের লোকের আর কিছুই করবার নেই—এই জ্ঞানটাই ছিল স্পষ্ট। এর আগে যা কিছু অভিযোগ, অনুযোগ, তিরস্কার, বিদ্রূপ ছিল সেই দিক থেকেই, কিন্তু ইদানীং মিসেস হালদার তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করার চেষ্টায় লেগেছেন। বয়স্থা মেয়েকে সামলাতে না পারলে কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটতে পারে তার বিশদ আলোচনা করে করে অবিরত বোঝাচ্ছেন তিনি—এই বেলা বিয়ে দিয়ে ফেলতে না পারলে সমাজে মুখ দেখানো ভার হবে ব্রজমোহনের। সমাজের জন্যে যতোটা না হোক মিসেস হালদারের কাছে মুখ রাখবার জন্যেই ব্রজমোহনের এই শাসন-প্রচেষ্টা।—বিয়েটা এখুনি হাতের ভেতর নেই, কিন্তু 'সামলানোটা' তো হাতের ভেতর।

চেয়ার টেনে বসার পর মুখে আর কথা জোগায় না ব্রজমোহনের, একটু চুপ করে থেকে বলেন—আমি শিগগিরই তোমার বিয়ে দিতে চাই—

—এই কথা? বেশ তো চেষ্টা করুন—বলে উঠে দাঁড়ালো পূরবী।

—তার আগে তোমার গতিবিধিটা একটু সংযত করতে হবে, আমি চাই না যে যার তার সঙ্গে মেলামেশা বা যেখানে সেখানে যাওয়া আসা করো তুমি।

—আপনার মুখ হেঁট হবার মতো কিছুই করি না আমি, কিন্তু বাবা, এও জানবেন, আমাদের মুখ হেঁট হবার মতো কাজ আপনার দ্বারা ঘটলে সেটাও সমান নিন্দনীয়।

পূরবীর পদশব্দ সিঁড়িতে মিলিয়ে যেতেই মিসেস হালদার ভারী শরীরখানি নিয়ে বিছানার ধারে 'ধুপুস' করে বসে পড়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে বলেন—আমাকে বিদেয় করে দিন মিষ্টার ঘোষাল, বিদায় করে দিন আমায়। আমার জন্যে আপনার মেয়েদের মুখ হেঁট হচ্ছে, এ কথা শোনার পর আর থাকা চলে না আমার।...আমি নার্স, পয়সার বিনিময়ে পেসেন্টের সেবা যত্ন করা আমার কাজ, যেখানে যাবো দিন চলে যাবে আমার, নেহাৎ আপনার মায়ায় জড়িয়ে পড়েই—কিন্তু এভাবে অপমানিত হয়ে—বাষ্পভারাক্রান্ত কণ্ঠে নীরব হ'ন মিসেস হালদার।

পূরবীর শেষ কথা কয়টায় ব্রজমোহন যেটুকু বিমনা হয়ে পড়েছিলেন, মুহূর্তে দূর হয়ে যায় সেটুকু। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসবার ব্যর্থ চেষ্টায় কাৎ হয়ে ব্যাকুলভাবে বলেন—চুপ করো লীলা, চুপ করো। দুঃখ কোরোনা, তোমাকে অপমান করে কেউ পার পাবে না—সে যেই হোক। দুই মেয়েরই ব্যবস্থা করে ফেলছি আমি। ভেবেছিলাম—ওরা যেমন আছে থাক, আমি এক পাশে তোমাকে নিয়ে—তা' সে ওদের সইল না। বেশ আমিও দেখে নেব। কিন্তু তুমি চুপ করো লীলা, চোখের জল সইতে পারি না আমি।...এসো সরে এসো।

ব্রজমোহনের নিজের দিক থেকে হয়তো হিসেব ঠিকই ছিল, কিন্তু সকলের হিসেব তো সমান নয়। সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কেবলমাত্র লীলার সান্নিধ্য উপভোগ ব্রজমোহনের পঙ্গুজীবনের চরম সুখ হতে পারে, কিন্তু সুস্থ সবল লীলার পক্ষে পঙ্গু ব্রজমোহনের সঙ্গসুখটুকুই কিছু আর চরম লক্ষ্য নয়।

যে সর্ব্বগ্রাসী লোভের তাড়নায় তাকে অনবরত এই ক্লান্তিকর প্রেমের অভিনয় করে চলতে হচ্ছে, সে লোভের পথে ব্রজমোহনের মেয়েরা শুধু অন্তরায় নয়—কণ্টক।—ওরা যেমন আছে তেমন থাকলে চলবে কেন তার?

'মেয়েদের দেখে নেবার' সংকল্পটা যতোই জোরালো হোক, উপায়টা ততো সহজ নয়। তবু মাধবীকে ডেকে একদিন ব্রজমোহন পূরবীর বিয়ের চেষ্টায় অবহিত হ'বার নির্দ্দেশ, এবং মাধবীর নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'বার জন্যে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়ে খানিকটা কাজ এগিয়ে রাখলেন।

আর ঠিক সেই দিনই এলো বাসুদেব শ্রীমন্তর অসুখের খবর নিয়ে। পূরবীর অনুপস্থিতিতে একলা মাধবী শুনলো সেই খবর।

পূরবী এসে দখলে, মাধবী শোবার ঘরের জানলার ধারে বসে আছে, ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। সেকেলে ভারী পালঙ্ক···স্ট্যাণ্ড-বসানো প্রকাণ্ড আয়না···বনেদি দেরাজ আলমারী···কালো কালো ছায়ামূর্ত্তির মতো ভীড় করে রয়েছে ঘরে।

অভ্যাসমতো 'দিদিভাই' বলে ডেকে পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরতে সাহস হল না, আলো না জ্বেলেই পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। নিজের মনেও আর নেই আগের উৎফুল্ল তারল্য। ব্রজমোহন তার একটা বিয়ে-ফিয়ের জোগাড় করে বিটকেল কিছু করে বসবার আগে—নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়া সম্ভব কি না তাই দেখছিল।

ক্ষতি কি একটা সামান্য চাকরীই যদি করে পূরবী?

অন্ততঃ নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার মতো কিছুই কি সংগ্রহ করতে পারবে না? মিথ্যেই তবে এতোদিন পড়ে পড়ে গ্র্যাজুয়েট হ'ল। এম, এ, টা হয়তো পড়া হবে না, না হোক—ব্রজমোহনের অর্থে এবং নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে থেকে বিনা দ্বিধায় বসে বসে পড়বার রুচি আর নেই।

তা ছাড়া—"মৃত্তিকা"র কাজও হয়তো বেড়ে যাবে, সীতেশদা বলেছেন—এইবার দেবেন সত্যিকার কাজ।··· একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বার করবার কথা হচ্ছে কিছুদিন থেকে, সব নিয়ে জড়িয়ে পড়লে পড়ালেখা হবেও না।··· অনেক চিন্তার ভীড়···অনেক কল্পনার ভার।

জীবন যন্ত্রের সহজ সুরটা গেছে হারিয়ে, তাকে ঠিক সুরে বাজাবার কঠিন কৌশল করতে হবে আয়ত্ত।

মিনিট দুই চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু স্বরে বললে—দিদি ভাই, শরীর ভালো নয় বুঝি?

মাধবী মাথা নাড়লো।

—তবে এমন চুপচাপ বসে কেন?

—এমনি।

—বলবে না বুঝি আমাকে?

—বলবার কিছু নেই রুবি।

রুবি এই ভাবান্তরের কারণ অনুমান করে বললে—বাবার বোধকরি আবার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সজাগ হয়ে উঠেছে? শাসাতে করতে ডেকেছিলেন?

—না।

—তা' নয়? পূরবী আশ্চর্য্য হয়ে বললে—তবে?··· বাবার ঘরে যাওনি তখন?

—গিয়েছিলাম। বললেন তোর বিয়ের কথা, আর—আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তার কথা।

—তোমার ভবিষ্যৎ তো পিতাপুত্রীতে মিলে বেশ উজ্জ্বল করে রেখেছো।···এখনো বলছি দিদি—হয় তো সময় আছে—

—হয় তো আর সময় নেই রুবি—হঠাৎ এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগ ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে—

—ব্যাপার কি বলোতো?—পূরবী হালকা হবার চেষ্টা করে—সহসা কি সংবাদ পেলে? শ্রীমন্তবাবু আর একটা দারপরিগ্রহ করেছেন?

—তিনি—তিনি কেমন আছেন জানি না রুবি, বাসুদেব বলে গেল—বাড়াবাড়ি অসুখ—

—কে বলে গেল? কে?—সংবাদের চেয়ে সংবাদদাতার নামটাই উত্তেজিত করে তোলে পূরবীকে।

মাধবী এ উত্তেজনা তেমন লক্ষ্য করলো না, শ্রান্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে বললে—বাসুদেব এসেছিল একটু আগে।

নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হ'ল পূরবী। এবার শান্ত ভাবে বললে—রোসো, আমাকে বুঝতে দাও সবটা—অসুখ করলো শ্রীমন্তবাবুর, খবর দিয়ে গেলেন তোমার বাসুদেব, এটা কি হল?

—ওরা যে এতো পরিচিত তা আমরা জানতাম না রুবি। বললে—বিশিষ্ট বন্ধু।

মাধবী যে বেশী কথা কইতে নারাজ, কিন্তু পূরবী শুধু এইটুকু সংবাদে তৃপ্ত হবে কেন? যদিও—'বাসুদেব এসেছিল' এই সংবাদটাই বারে বারে ছাপিয়ে উঠছিল শ্রীমন্তর রোগ-সংবাদকে—তবু রোগকেই প্রাধান্য দিয়ে জেনে নিতে হয় সমস্ত তথ্য, প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কথা।

সব কথা শোনার পরে বললো—আচ্ছা এই শ্রীমন্তবাবুই আমাদের, সে প্রমাণ কই?

—এ বাড়ীর ঠিকানা আর কে বলবে রুবি?

—সেটা দৈবাতের ঘটনাও হ'তে পারে—না কি? উনি তো নিজে শোনেনও নি, অপরের মুখে শোনা কথা। এমনও তো হ'তে পারে—ওটা তোমার বাসুদেবের কবি-কল্পনা। কিম্বা এক শুনতে আর শুনেছেন।

মাধবী থতমত ভাবে বলে—তাই কি?

—আমার তো তাই মনে হচ্ছে। নইলে বাসুদেবকে ঠিক শ্রীমন্তবাবুর সমবয়সী বন্ধুই কি বলা যায়? তাছাড়া সেসেই বা থাকতে যাবেন কেন?

মাধবী দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললে—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে—ভুল নয়। হয় তো বাড়ীতে থাকলে কাজের অসুবিধে—

—আচ্ছা বেশ, কালই খোঁজ নিচ্ছি আমি, বলো তো আজই যাই।

—তুই আবার কি করে খোঁজ নিবি? মাধবী অবাক হয়।

—কেন? আমি কি তোমার মতো ঘটিগিন্নী? বাড়ী থেকে এক পা বেরোতে গেলে বডিগার্ড চাই? যিনি ঘটা করে খবরটা দিয়ে গেছেন, তাঁর কাছেই সন্ধানটা জেনে আসি। আমাদের ক্লাবের কাছেই তো।…গট গট করে যাবো, চারটী পয়সা ট্রাম ভাড়া দেব, ব্যস্।

মাধবী হেসে ফেলে বলে—থাক্ এখন রাত হয়ে গেছে, আর গট গট করে যেতে হবে না। কাল যা হয় হবে। কিন্তু খবর নিয়েই বা কি দরকার?

—তা দরকার থাকবে কেন? বেঁচে আছে কি মরে গেছে, তাতেও তোমার দরকার নেই, কেমন?

দস্তুরমতো রাগ করে উঠে যায় পূরবী।

অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে দালানে।

কেন এলো বাসুদেব? আজকেই কেন এলো? ঠিক যখন পূরবী ছিল অনুপস্থিত?…শ্রীমন্তর ঘটনাটা কি সত্যি?…কল্পিত ঘটনা হওয়া অসম্ভব নয় তো?…আসবার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করা হতে পারে না কি?…কিন্তু যেৎ। পূরবী কি ভাবে নিজেকে? উপলক্ষ্য যে সৃষ্টি করে, সে কি লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে পারতো না?

যাক্, উপলক্ষ্যটা যদি সৃষ্টি করাও হয়—পূরবীর জন্যেও সৃষ্ট হল একটা।

পরের দিন সকালে পূরবী যখন বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, মাধবী ইতস্ততঃ করে বললে—দেখ রুবি, কি হবে গিয়ে? বাসুদেবকে বলেছি খবর দিতে—রাগ করিস্‌নি—হয় তো ভাবেন এটা আমার ইয়ে—

—খোসামোদ করা, কেমন? মানের হানি হয়ে যাবে, তাই না? আশ্চর্য্য! তোমার মান-মর্য্যাদাজ্ঞানের মানে পাই না আমি। যেতে বারণ করো যাবো না, কিন্তু লোকটা যে কে, সত্যিই তাও জানা দরকার নয় কি। বাসুদেব তো খবর দেবে—কিন্তু যার খবর দেবে, সে একটা ভুঁড়িওলা গুঁফো শ্রীমন্ত কি না, কে বলতে পারে? পৃথিবীতে এক নামের লোক একটাই থাকে না নিশ্চয়?

—তবে যা।—বললে মাধবী।

মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো পূরবী—যেন অভিসারে যাচ্ছে। যাবার কারণটা তুচ্ছ হয়ে গেছে—যাচ্ছে এইটাই মনে রয়েছে সুধু। মানের হানি করে অকারণে যাচ্ছে না, এর জন্যে ও কৃতজ্ঞ সেই অপরিচিত শ্রীমন্তর ওপর। নিশ্চিত জানে ওটা একটা ছল মাত্র।

কেন নয়?

মালবিকারাই সুধু ছল করে আঁচল বাধাবে সহকার শাখে?

যাবার সময় গট গট করেই গেল ট্রাম লাইনের ধারে, নগদ চারটী পয়সা খরচ করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতেও দেরী হল না, কিন্তু বাড়ীর সামনে আসতেই হঠাৎ ঝিম্‌ঝিম্ করে এলো শরীর। ভয় করতে লাগলো—অদ্ভুত একটা ভয়—যেমন করেছিল সেই সন্ধ্যার গাড়ীতে—টালিগঞ্জের জনশূন্য পথে।

—আমি কি আমার সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারি?

চমকে উঠলো পূরবী। ও যে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা হুঁস হল এতোক্ষণে।…হয় তো এক মিনিট, হয় তো কয়েক সেকেণ্ড…তবু মনে হল দীর্ঘকাল। দীর্ঘকাল ধরে যেন প্রতীক্ষা করে আসছে এই পরিচিত কণ্ঠটি শোনবার আশায়।

—বোধকরি এই রাস্তায় যেতে যেতে চিনতে পেরেছেন বাড়ীটা, তাই—

বাসুদেবের কথার উত্তরে পূরবী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—মোটেই না, আপনার কাছেই এসেছি।

নিজের মনকে সহজ করে নিচ্ছে সে। না, কিছুতেই আর এই মানসিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না। নিজের দরকারে এসেছে, সে সত্য প্রকাশ করতে কুণ্ঠা কিসের?

—চলুন ভিতরে।

—ভিতরে যাবার সময় বেশী নেই, আপনার কাছে একটা খবর নিতে এসেছিলাম—

—জানি, কিন্তু রাস্তা থেকে আপনাকে ফিরে যেতে দেব, এইটাই কি আশা করেন?…

ঘরে এসে বললে—কালকে বেশ শোধ নিলেন।

—শোধ আবার কিসের?

—একদিন আপনি এসেছিলেন আমি ছিলাম অনুপস্থিত, কাল আমি গেলাম আর আপনি—সত্যি গিয়ে প্রথমটা কিন্তু হঠাৎ কেমন হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম।

—যাক্ তারপর সামলে নিয়েছিলেন তো? বাঁচা গেল।…এখন বলুন তো শ্রীমন্তবাবু কে?

—কে? এ কথার উত্তর দেওয়া তো সহজ নয়। আমি কে? আপনি কে?

—থাক্ হয়েছে। সাধারণ অর্থে শ্রীমন্তবাবুর পরিচয়টাই চাইছি।

—দেখুন তাও দেওয়া শক্ত। আমার দিক থেকে বলতে পারি—আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং সহকর্মী। সাধারণ অর্থে একজন ভারতীয় নাগরিক, কিম্বা—

—হয়েছে। আপনার 'কিম্বা' রাখুন, বলুন বয়স কতো —চেহারা কেমন, বাড়ী কোথায়—বিবাহিত কি অবিবাহিত—

—মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। আপনার দিদি তো এক কথাতেই চিনতে পারলেন, আপনি হঠাৎ এরকম পুলিশি-জেরা করছেন যে?

—আছে কারণ। দিদির মতো ভালোমানুষ তো সবাই নয়। বাংলা দেশে যে "শ্রীমতী" "শ্রীমন্ত"র অভাব নেই, সে খেয়াল নেই। আপনিও বলে এলেন, উনিও বুঝে গেলেন, কিন্তু আমি তো দিদি নই?

—তা হ'লে—শুনুন। বয়েস—বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, চেহারা মার্জ্জিত, বাড়ী জানি না—বিবাহিত কি না জানবার চেষ্টা করিনি কোনোদিন, নয় বলেই বিশ্বাস।

—আপনার এতো বন্ধু আর এটুকু খবর রাখেন না?

—বন্ধুত্বের সীমারেখা কোথায়, সেটা বলা বড়ো শক্ত বুঝলেন? কোন সূত্রে যে বন্ধুত্বের বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে, কে জানে—অথচ ব্যক্তিগত জীবনে সেই নিবিড় বন্ধুত্ব মূল্যহীন। শ্রীমন্তদার সঙ্গে—যাকে আপনারা বাজে কাজ বলেন, তাই করে বেড়াই মাঝে মাঝে—শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি—এই পর্য্যন্ত। কখনো ভেবে দেখিনি বিবাহিত কি অবিবাহিত, সেটার খোঁজ না রাখা বে-আইনী।

—তবে আর কি হবে। উঠি তা'হলে। কিছুই পরিষ্কার হ'ল না।

—আমারও না। আচ্ছা এখন বলুন তো তাঁর ঘটকালি করবেন নাকি?

—নাঃ ও ব্যবসাটা ধরিনি এখনো।

—তবে?

—কিছুই না ধরুন।

—ধরতে বললে, তাই ধরতে বাধ্য। কিন্তু রহস্যটা রহস্যই থাকলো।

—শুনবেনই?…

—আপনার আপত্তি থাকলে নিশ্চয়ই নয়।

—আপত্তির আর কি আছে?—পূরবী আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে—'শ্রীমন্ত' আমার দিদির বরের নাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের ব্যবধানটা প্রায় দুস্তর সমুদ্রের মতো, অথচ অসুখ শুনে—দিদি বেচারা—যাক্ আপনার বন্ধু এবং দিদির বর উভয় শ্রীমন্ত এক কি না, সেই মীমাংসা করা যখন সম্ভব হচ্ছে না, উপায় কি?

"দিদির বরের নাম।" শুনে চমকে উঠলো বাসুদেব। কই, এ সন্দেহ তো মনে আসে নি। শ্রীমন্ত বিবাহিত? শ্রীমন্ত মাধবীর স্বামী?

আহা বেচারা মাধবী। শ্রীমন্তর মতো স্বামীকে পেয়েও পায় নি। কিন্তু কেন?

শ্রীমন্তর কাজ? কাজের জন্যে মাধবীর সঙ্গে তার দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান? এমন কোমল হৃদয়ের মধ্যে এমন নিষ্ঠুরতা থাকা সম্ভব? গত সন্ধ্যার দেখা মাধবীর পাংশু বিবর্ণ মুখ মনে করে হায় হায় করে উঠলো মনটা।—বললে—চলুন না, মীমাংসা করেই আসবেন।

—আমি যাবো কোথায়?

—কেন, শ্রীমন্তদার ওখানে। আপনার সঙ্গেও কি দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান?…ওঃ না—আমার প্রস্তাবের জন্যে মাপ চাইছি, আপনার তো আবার গাড়ী চড়লে ভয় করে।

আচ্ছা, এ কি হাড়-জ্বালানো কথা! ইচ্ছে করে রাগিয়ে দেওয়া নয় পূরবীকে? তবু ও আর সহজে ঠকছে না, গম্ভীর ভাবে বললে—আর ভয় করবে না, রামনামের কবচ ধারণ করেছি কি না।

—বাঁচা গেল। তাহলে যেতে পারেন?

—পারি। কিন্তু যদি দেখি মোটা কালো আর শুঁকো শ্রীমন্ত, তাহলে কিন্তু সহ্য করবো না।

—সে আপনার সহ্যশক্তির ওপর নির্ভর করছে, তবে—আমার বিশ্বাস ওগুলোর একটাও পাবেন না।

—তা'হলে চলুন।

কাটলো কিছুক্ষণ—'চলুন' বললে কিন্তু উঠলো না।

পূরবী আছে মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে চেয়ে—বাসুদেব অন্যমনস্কের মতো চেয়ে আছে ওর ঈষৎ বাঁকানো ঘাড়ের ওপর পড়ে থাকা সরু সুতোর মতো একটু সোনার রেখা আর বিদ্যুৎ-দ্যুতিমান একখানি কর্ণাভরণের পানে।

সামান্যক্ষণ…বাসুদেবই প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করলে—আচ্ছা একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমায়? সেদিন অমন অদ্ভুত ভাবে ভয় পেলেন কেন? সত্যিই কি আমাকে ভীতিকর মনে হয়েছিল আপনার?

পূরবী উত্তর দেয় না, ঘাড়ও ফেরায় না, কিন্তু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—বলুন সত্যি। নইলে চিরদিন একটা জায়গায় ভারি খটকা লেগে থাকবে আমার।

—ভয় আপনাকে নাও হতে পারে, ধরুন নিজেকেই।… আচ্ছা চলুন তো এখন। অন্য কাজ নেই যেন আমার।

ব্যস্ততার ভানে সপ্রতিভ হয়ে ওঠে পূরবী।

ঠিক এই সময়ে ঢুকলো বৃন্দাবন—রীতিমত একটা প্রাতরাশ সাজিয়ে।

বাসুদেব এটা আশা করে নি, কারণ বৃন্দাবন যে এক ফাঁকে পূরবীকে দেখে গেছে, সেটা ওর ধারণা ছিল না। থাকলে হয় তো—বারণ করতো। কারণ এই নিয়ে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়ার খুবই আশঙ্কা।

হ'লও তাই।

পূরবীর সামনে থালাটা নামিয়ে দিতেই পূরবী গম্ভীরভাবে বললে—এটা কি হল?

—আমি কি জানি? বলুন ওই বৃন্দাবন চন্দরকে।

হাসবার চেষ্টা করলে বাসুদেব।

—আচ্ছা বেশ। বৃন্দাবন, এটা তুলে নিয়ে যাও, বুঝলে?

—আজ্ঞে তাই কি আর হয়?—বিনয়ে গলে পড়ে বৃন্দাবন।

—হয় বৈ কি বৃন্দাবন, তোমার বাবুকেই জিগ্যেস করো হয় কি না।

বাসুদেব বারকয়েক বৃন্দাবনকে চোখ টেপবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হতাশ ভাবে বলে—মিথ্যে কষ্ট করে আনলি বৃন্দাবন, উনি খাবেন না।

—এ আবার কি ঘরভেদী বিভীষণের মতো কথা হ'ল খোকা? এক কথায় কি আর খাবেন? অনুরোধ, উপরোধ করতে হয় বৈ কি। বলে—উপরোধে ঢেঁকি গিলছে লোকে। এতো তুচ্ছ দুটো ফল মিষ্টি।

—তুচ্ছ জিনিস খাওয়াবার জন্যেই বা তোর এতো মাথা ব্যথা কেন বল তো? সকালবেলা কেউ ফলমিষ্টি খায় না—যা।

তা খাবে কেন—বৃন্দাবন বাসুর ভাব বুঝতে না পেরে বিরক্তভাবে বললে—তা খাবে কেন, ভদ্দরলোকের মেয়ে সকালবেলা উঠেই—মুরগীর ঝোল নিয়ে বসে! তা সে যদি কেউ চায়, এ বাড়ীতে তো মিলবে না। আচ্ছা, এই উঠিয়ে নিচ্ছি—

বৃন্দাবনের রাগ দেখে পূরবী হেসে ফেলে বলে—মুরগীর ঝোল খেলেই যে সন্দেশ খাওয়া যায় না তা' নয় বৃন্দাবন, কিন্তু তোমার বাবু যদি লোকের বাড়ী গিয়ে জলস্পর্শ না করেন, লোকেই বা কেন ওঁর বাড়ী সন্দেশ খেতে বসবে?

বৃন্দাবন একগাল হেসে বলে—এই কথা? তা' খোকার কি কোনখানে খাওয়ার জো আছে—কলকেতার সহরে সবই ম্লেচ্ছ কাণ্ড। এদিকে মার কড়া হুকুম—এদিক ওদিক হবার জো নেই। মস্ত বোষ্টমের ঘরের ছেলে যে—

—জানতাম না ...আচ্ছা—পূরবী উঠে দাঁড়ায়। তাহলে ওসব ছানা চিনি মালপো সন্দেশ তোমার বাবুর জন্যেই তুলে রাখো বৃন্দাবন, সদ্ব্যয় হবে।—সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে ওঠে পূরবীর।

বৃন্দাবনের ওপর রাগে সর্বাঙ্গ 'রি রি' করতে থাকে বাসুদেবের, কিন্তু বলেই বা কি? অথচ পূরবীর রাগের কারণ বোঝাও ত কম শক্ত নয়।...মাধবীর দেওয়া খাবার প্রত্যাখ্যান করবার কারণ এতক্ষণে হয়তো বুঝেছে পূরবী, কিন্তু এমন চটে উঠলো কেন? বাসুদেবের বৈষ্ণবত্বে ওর ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

বৃন্দাবন এবার যথার্থ ই রেগে গিয়ে খাবারটা তুলে নিয়ে চলে যায়। তাড়াতাড়ি অতিথি-সৎকারের চেষ্টা নেহাৎই খোকাকে সন্তুষ্ট করতে, কিন্তু এসব কি গোলমেলে ব্যাপার বোঝা দায়! আসলে ওই 'পাক দিয়ে কাপড় পরা' মেয়েগুলোই গোলমেলে।...রোসো, শিবসাগরে বৌমার কাছে খবর দিতে হচ্ছে। তা চিঠি একখানা বৃন্দাবন লিখতে পারেনা তা' নয়। ভাষার পারিপাট্য না থাক—ভাবের অভাব থাকেনা তা'তে।

কে জানে—ওই 'পাক দেওয়া কাপড় পরা' মেয়ের পাল্লায় পড়ে খোকা না পাক খেয়ে মরে। স্বদেশী স্বদেশী করে বে'থায় মন নেই বটে—তবু কথায় বলে মন না মতি।

বৃন্দাবন চলে যেতেই পূরবী দাঁড়িয়ে উঠে আরক্তমুখে শাড়ীর প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে—ভেতরের কারণ জানতাম না তাই—অনেক সময় অনর্থক উপরোধ করে আপনাকে জ্বালাতন করেছি, সেজন্যে ক্ষমা করবেন।

বাসুদেব বোধকরি কেমন অন্যমনা হয়ে পড়েছিল, চমকে উঠে বললে—কি বলছেন?

—বলছি—আমাদের বাড়ীতে খেতে যে আপনার অপ্রবৃত্তি হয়, ঘৃণা হয়, সেটা আগে জানালে এত উপদ্রব সইতে হ'তনা আপনাকে। কেন জানান নি?

—কারণ সেটা সত্যি নয়।

নিজস্ব ভঙ্গীতে চেয়ারের পিঠে ঠেস দিয়ে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দেয় বাসুদেব। অনেকটা যেন অবহেলার ভঙ্গী। অন্ততঃ তাই মনে হয় পূরবীর। এবং সেই কাল্পনিক অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠে—তবে সত্যিটা কি?

—সে আপনাকে বোঝানো শক্ত, আপনি বড়ো রগচটা। শোনবার আগেই রেগে যাবেন এখন চলুন—

আমি যাবোনা।—পূরবী বললে—আপনি দিদিকে ফোনেই খবর দেবেন, আমার অন্য কাজ আছে, চললুম।

বাসুদেবও উঠে দাঁড়ালো, সামান্য একটু কাছে সরে এসে মৃদু হেসে বললে—নাঃ আপনাদের নিয়ে আর পারা গেল না। সেই আদি ও অকৃত্রিম মেয়েলীপনা! ও আর শতজন্মেও বদলাবে না।

পূরবীকে রাগিয়ে দেওয়া যেন ওর একটা আমোদ।

ক্রুদ্ধ পূরবী আরো চটে উঠে বলে—আপনার দৃষ্টিটা একটু সূক্ষ্ম দেখছি। কাজ থাকার মধ্যে 'মেয়েলীপনা'র কি আবিষ্কার করলেন বোঝা শক্ত।

—কিছুই শক্ত নয়। কারণ কাজ নেই। ওইটে তাই —যা শুনলে আপনি চটে যান। যাবেন—কিন্তু তার জন্যে অনুরোধ চাই, উপরোধ চাই, কতো ঝামেলা।

—বেশ তো, কে আপনাকে সইতে বলছে ঝামেলা? আমি যাবোনা, ব্যস।

—কিন্তু দিদিকে গিয়ে কি বলবেন?

—সে আমি বুঝবো।

—সেটা ঠিক। যেটা আপনাদের সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যাপার, সে-বিষয়ে আমার কথা বলা ধৃষ্টতা।

—ওই হ'লতো রাগ?—পূরবী কিঞ্চিৎ নরম হয়ে যায়—মান-অভিমানে নিজেও কিছু কম যান না। খালি পরের বেলায় নিন্দে। বেশ, যাবেন তো চলুন।

গাড়ীটা চালাতে চালাতে বাসুদেব একসময় হেসে উঠে বললে—আচ্ছা, আমাদের কেন দেখা হলেই ঝগড়া হয় বলুন তো? কিন্তু বিশ্বাস করুন সত্যি, আপনি ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কারুর সঙ্গেই কখনো ঝগড়া হয়নি আমার।

—তার মানে আমিই ঝগড়াটে?

—বাধ্য হয়ে তাই বলতে হয়।

—বেশ বলুন না, আমার তাতে এসে যাবেনা কিছু। কিন্তু আমার ধারণা যদি শুনতে চান—ঝগড়া আপনিই বাধান এবং সেটা ইচ্ছে ক'রে। ওকি, থামছেন যে? এসে গেল না কি?

—মনে তো হচ্ছে।

পূরবী একটু ইতস্তত: করে বলে—আচ্ছা এক কাজ করুন না—বরং আপনার বন্ধুকে জিগ্যেস করে আসুন না—পূরবী নামে কাউকে চেনেন কি না, আমি ততক্ষণ গাড়ীতেই থাকছি।

বাসুদেব হেসে ফেলে বলে—অতো ভাবনার আছে কি? বাঘের গুহা তো নয়? মজুর মিস্ত্রীর বস্তিতে ঢুকে প্রচারকার্য্য করে আসেন, আর ভদ্রলোকের মেসে ঢুকতে এতো ইতস্তত: কেন? পৃথিবীর মাটিতে যখন নেমেছেন তখন অত খুঁৎখুঁতে হ'লে চলেনা। বাসে উঠে নিশ্চয়ই 'লেডিস্ ওনলি'র একখানা বেঞ্চ একলা দখল করে বসে থাকেন?

—হ্যাঁ থাকি, বেশ করি। হ'ল তো? আবার বলা হচ্ছে "ঝগড়া কেন হয় বলুন তো?"

রাগ করেই ঢুকে পড়তে হয় পূরবীকে।

চোখ বুজে চুপচাপ শুয়েছিল শ্রীমন্ত, ঘুমন্ত কিনা বোঝা কঠিন। বাসুদেব একটু ইতস্তত: করে ডাকে—শ্রীমন্তদা কেমন আছেন আজ? বাসুদেবের ডাকে চোখ খুলে শ্রীমন্ত দুর্ব্বলভাবে বলে—ভালই আছি। ভোরের দিকে একবার ছেড়েছিল জ্বরটা, এখন বোধ হয় আবার একটু—ওকি, তোমার সঙ্গে ও কে?…রুবি!

পূরবী উত্তর দেবে কি, শ্রীমন্তর চেহারা দেখে নির্ব্বাক হয়ে গেছে বেচারা। একেই তো অনিয়ম, অতি পরিশ্রম, খাওয়ার কষ্ট, ইত্যাদিতে পূর্ব্বের লাবণ্য অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল শ্রীমন্তর—তাছাড়া সম্প্রতি এই দুরন্ত রোগ। অবিন্যস্ত চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আরো শীর্ণ আর করুণ দেখাচ্ছিল তাকে।

—আয় রুবি বোস—দুর্ব্বলকণ্ঠ স্নেহে কোমল হয়ে আসে—কোথায় খবর পেলি? বাসুর সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?… কিরে কথা নেই কেন? আরে ও কি, কেঁদে ফেলছিস যে!

নেহাৎ বাসুদেবের সামনে বলেই বোধ করি—পূরবী নিজেকে সামলে নিয়ে শান্তভাবে বিছানার এক পাশে ব'সে ধীরে ধীরে শ্রীমন্তর কপালের ওপর হাত রাখে।

ভ্রাতৃবিহীন জীবনে শ্রীমন্তর জায়গাটা বড়ো ভাইয়ের মতোই ছিল অনেকটা। কিন্তু মাধবী যখন নিজের জীবনকে এলোমেলো করে ফেললো, বারবার ফিরিয়ে দিল শ্রীমন্তকে, তখন পূরবী যেন বিরক্ত হয়েই ওদের কথার মধ্যে থেকে সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। শ্রীমন্ত যে একেবারেই তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করবে, এমন আশঙ্কাও সত্যি ছিল না। ক্রমশ: ক্রমশ: যখন আশঙ্কা সত্যে রূপায়িত হ'ল, তখন পূরবীর জীবনে এসেছে নতুন জোয়ার—'মৃত্তিকার' হাতছানি। ফিকে হয়ে এসেছে দিদির ভবিষ্যতের চিন্তা, ফিকে হয়ে এসেছে শ্রীমন্তর প্রিয় পরিচিত মুখ।

মাঝে মাঝে অস্বস্তিবোধ ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারে নি। দু'মাস ছ'মাস হ'তে হ'তে কখন যে তিনটে বছর কেটে গেছে কে জানে। এতোদিন পরে শ্রীমন্তকে দেখে হঠাৎ যেন উপলব্ধি করলো পূরবী, ভীষণ ত্রুটি হয়ে গেছে তার নিজের দিক থেকেও। পূরবীকে তো হাত পা বেঁধে রাখেনি কেউ?

শ্রীমন্ত মৃদু হেসে বললে—একে কোথায় কুড়িয়ে পেলিরে বাসুদেব?

—ওঁকেই বলতে বলুন—বলে মুচকে হেসে পূরবীকে উদ্দেশ ক'রে বাসুদেব বলে, কালো মোটা এবং গুম্ফবহুল কি না দেখেছেন তো মিলিয়ে?

—দেখেছি মিলিয়ে। আপনাকে আর বক বক করতে হবে না, থামুন তো।

বাসুদেব বুঝতে পারে পূরবীর কুণ্ঠা। বাসুদেবের উপস্থিতি ওর সহজ আবেগ প্রকাশের বাধা হচ্ছে। তাই বলে—শ্রীমন্তদা, আমি একবারটী ঘুরে আসছি।…ভালো কথা, বিজনবাবুকে দেখছি না যে?

—ওঁর বুঝি আজ বাজার করবার পালা।…কেন, কি দরকার?

—আপনাকে নিয়ে যাবো আমার ওখানে, সেটা ভদ্রলোককে বলে যেতে হবে তো?

—আমায় নিয়ে যাবি কি রে?—শ্রীমন্ত অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

—আচ্ছা সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনি এখন রুগী, আমাদের এক্তারে আছেন।…বিজনবাবুর সঙ্গে বলা কওয়া আছে আমার, জ্বর ছাড়লেই নিয়ে যাবো।

—পাগল তুই!

—ধরুন পাগল। কিন্তু পাগলের পাগলামীতে বাধা দেওয়াও বিপদ জানেন তো?…আচ্ছা পূরবী দেবী, আপনার ঝগড়াঝাঁটিগুলো—মানে—যা আপনার স্বভাব—সেরে রাখুন ততক্ষণ, আসছি আমি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে যখন ফিরে এলো, তখন দীর্ঘ অদর্শনের কুণ্ঠা কাটিয়ে বেশ সহজ হয়ে উঠেছে পূরবী, শ্রীমন্তর মৃদু দুর্বল কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে পূরবীর দ্রুত তীক্ষ্ণ কণ্ঠ আর হাসি ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে—ঘর থেকে বারান্দায়।

—আপনার ডিউটি শেষ হয়েছে তো?—পূরবীর উদ্দেশে এই কথাক'টি নিবেদন ক'রে বাসুদেব এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলে—ক'দফা হ'ল শ্রীমন্তদা?

—কিসের ক'দফা?

—এই ঝগড়ার?

—ওঃ।—শ্রীমন্ত যেন অনেকটা ভালো হয়ে উঠেছে—হেসে ফেলে বলে—এতোক্ষণ কিন্তু অন্যরকম রিপোর্ট পাচ্ছিলাম। আসল ঝগড়াটে তুই। তুই নাকি ওদের দলকে বিদ্রূপ করিস—অগ্রাহ্য করিস। অবিশ্বাস করিস ওদের কর্মনিষ্ঠাকে। ওদের নাকি দেশও নেই, কাজও নেই, আছে কেবল হুজুগ।

—ব্যাপারটা কি জানেন শ্রীমন্তদা, সত্যি কথা বলাটাই কেমন অভ্যাস, বানিয়ে বানিয়ে অন্যকিছু বলতে পারিনে।

—শুনছেন তো শ্রীমন্তবাবু, শুনছেন? তার মানে ওইটাই সত্যি। আমরা হুজুগে, আমরা বাজে, কারণ আমরা তকলি কাটি না।

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন, শ্রীমন্তদা আমাদেরই দলের।

—তা'তে কি? কারুর খাতিরে বানিয়ে অন্যকিছু বলা আমারও অভ্যাস নেই। শ্রীমন্তবাবুকে এতোক্ষণ সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম, এই আফিঙ-খেগো ঘুমন্ত দলটাকে ছাড়ুন।

—তা' শ্রীমন্তদা ছাড়তে রাজী হয়েছেন তো?—বাসুদেবের মুখে চাপাহাসি খেলা করে।

—রাজী হ'লে আর ভাবনা কি ছিল? দেশ তা'হলে এতোদিনে সত্যিই কিছু পেতো। এ আর কি হ'ল? 'স্বাধীনতা পেলাম'—কি না—দেশসুদ্ধু লোক একদিন দেশটাকে বিয়ে-বাড়ী সাজিয়ে—গাড়ী চড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে স্বাধীনতা দেখিয়ে বেড়ালো। ব্যস্, তারপর যে ঘাসজল সেই ঘাসজল।

—এতো শিগগির আর কতোটাই হতে পারে রুবি? দু'শো বছরে জমানো জঞ্জাল সাফ্ করতে লাগবে বই কি কিছু বছর।

—সেই জন্যেই বিপ্লবের দরকার শ্রীমন্তবাবু। হয়তো দু'ঘণ্টার ঝড়ে সাফ হতে পারে সেই জঞ্জাল। পুরনো দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলে যাবে। নতুন যুগের জন্যে গড়ে উঠবে নতুন মানুষ। যারা হিসেব করে পা ফেলবে না, দাঁড়ি পাল্লা হাতে দর কষাকষি করবে না। বেণের দোকান খুলে স্বাধীনতা লাভ হয় না শ্রীমন্ত দা।

—তোদের মতে কি কিছুই লাভ হয়নি রুবি?

—হয়েছে বৈ কি—বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দেয় পূরবী—একেবারেই যে কিছু হয়নি, তাই বা বলা যায় কই? তিরিশ বছরের সাধনা কি একেবারে নিষ্ফলা যায়? হচ্ছে—আফিঙের মৌতাত ধরছে ক্রমশঃ। বেশ ঠাণ্ডা মেরে আসছে যত বিদ্রোহী রক্ত। কর্তারা আমাদের ভার নিয়েছেন, আবার কি! বিনা আয়াসে যদি গাছ থেকে পাকা ফলটা টুপ করে হাতে এসে পড়ে, কে যাবে জমিতে সার দিতে, আর মাটি কোপাতে?

পূরবী থামতেই শ্রীমন্ত সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলে—এতো কথা তুই কবে শিখলিরে? আমাদের যে ক্রমশঃ কোণঠাসা করে ফেলেছিস। ভয় হচ্ছে সত্যিই বুঝি কী দুষ্কর্ম করে আসছি এতোদিন।

শ্রীমন্তর কৌতুকস্মিত মুখের পানে চেয়ে বাসুদেব হাসি চেপে গম্ভীরমুখে বলে—যা বলেছেন শ্রীমন্তদা, ও'র ঝাঁজালো অভিযোগ শুনে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বৃটিশের পঞ্চমবাহিনী নইতো আমরা।

শ্রীমন্ত হেসে উঠলো।

কিন্তু পূরবী দমতে রাজী নয়, উদ্ধতভাবে উত্তর দেয়—সে-সন্দেহ যদি করে থাকেন, হয়তো খুব বেশী ভুল করবেন না! আপনারা কি? অন্ধ অনুগামী বইতো নয়? আপনাদের ওপরওয়ালা যে-পথ ধরেছেন তার ভালোমন্দ তলিয়ে দেখবার মতো বুদ্ধিতো দূরের কথা, ইচ্ছেমাত্র নেই আপনাদের। আপনাদের শ্রেষ্ঠ নেতা, একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কিনা, সেটুকু যাচাই করে দেখবারও খেয়াল নেই। হ্যাঁ, আমি বলবো বৃটিশের চরই আপনারা। সত্যিকার মহামানবের সোনার কাঠির স্পর্শে চল্লিশকোটি মানুষ জেগে উঠেছিল—রূপোর কাঠির ছোঁওয়ায় তাদের পাশ ফিরিয়ে ঘুম পাড়াবার ভার নিয়েছেন আপনারা। কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ওরা আপনাদের দেবে সেই পাকা মাকাল ফলটা। চাখতে দিয়ে

দেখছে—হজমশক্তি আছে কি না আপনাদের, পরীক্ষায় পাশ করলে নিঃস্বত্ব হয়েই দিয়ে দেবে শুনছি।

উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ, কণ্ঠ এসেছে রুদ্ধ হয়ে।

বাসুদেব নিষ্পলক চোখে কয়েক সেকেণ্ড সেই আরক্ত মুখের পানে তাকিয়ে বলে—দেখুন শ্রীমন্তদা, আমি ভাবছিলাম—এঁকে প্রশ্ন করবো—এঁদের 'মৃত্তিকা' ক্লাবের জানলা দরজাগুলো কাঠের কিনা, কাঠের হ'লে মুস্কিল—জলে যাওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু মুখ দেখে আর প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছে না।···কিন্তু আমি এইবার উঠি শ্রীমন্তদা।—বলে সব কথার ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পূরবী।

—যাচ্ছিস? আচ্ছা—

শ্রীমন্ত এতক্ষণে যেন টের পেলো নিজের ক্লান্তির ওজন, তাই দুর্ব্বলভাবে চোখ বুজলো। আবার আসবার অনুরোধ জানালো না।

বাসুদেব শ্রীমন্তর কাছে সরে এসে ঝুঁকে বলে—আমি কিন্তু আজকেই আপনাকে নিয়ে যাবো শ্রীমন্তদা—এঁকে পৌঁছে আসি।···কই, যাবেন তো চলুন।

বলাবাহুল্য শেষের কথা কয়টা পূরবীর উদ্দেশে।

পূরবী গম্ভীরভাবে বলে—যখন তখন আপনার গাড়ী চড়তে হবে তার মানে কি? বাসে ট্রামে "লেডিস্ ওন্লি" তো উঠে যায়নি এখনো। তাছাড়া এখন তো সাপে আর নেউলে হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায়—ভয়েরও কিছু নেই।

—নাঃ তা নেই সত্যিই। কিন্তু গাড়ীটাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না কেন বলুন তো? দৈবক্রমে আমি ওটা চালাবার ভার পেয়েছি কিন্তু আসলে তো জিনিসটা রাষ্ট্রের সম্পত্তি মাত্র! নাগরিক অধিকারের বলে নিঃসঙ্কোচে চড়তে পারেন আপনি।

বাসুদেবকে ঠেকানো শক্ত।

সারা গাড়ী একটাও কথা কইল না পূরবী।

ভয়?

না, আজ আর ভয় নয়, সুধু অবাক হয়ে বসেছিল। অবাক হচ্ছিল নিজের স্বভাবে। পূর্ণপানপাত্র হাতে পেলেই আছড়ে ভেঙে ফেলবার দুর্মতি কেন হয় তা'র? বারে বারে কেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি?

মাধবীর কাছে একদিন কথাটা পাড়লে পূরবী।

শ্রীমন্ত এসে রয়েছে বাসুদেবের বাড়ী, মাধবী তো ইচ্ছে করলেই দেখতে যেতে পারে। প্রায়ই যাচ্ছে পূরবী।

মাধবী উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বললে—তোর কাছে তো পাচ্ছিই খবর, গিয়ে আর কি হবে?

পূরবী রেগে বললে—কি হবে আর না হবে, সে তুমিই জানো। আমার বলবার আমি বললাম। কিন্তু এও বলছি দি, তোমার বোকামী আর জেদের ফল তুমি পাবে একদিন। শ্রীমন্তবাবুর মতো লোকের জীবনটা যে সুধু খেয়ালের বশে নষ্ট করে দিতে পারে, সে ক্ষমারও অযোগ্য।

—তাঁর মতো লোকের জীবন নষ্ট হবার নয় রুবি। সে জীবন সকল অবস্থাতেই সার্থক। কিন্তু তোর এতো ভক্তি কেন বলতো?—মাধবী হাসতে চেষ্টা করে—অহিংসদের ওপর যে তোর ষোলো আনা হিংস্রভাব ছিল!

—সেটা এখনো আছে। তাই বলে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে ভালবাসবো না কেন? সত্যি ভারী দুঃখ হয়—শ্রীমন্ত বাবু যদি আমার দাদা হ'তেন!···আচ্ছা দিদি, বলতে পারো তোমার বাধাটা কোথায়?

—কি জানি—মাধবী কতকটা আত্মস্থভাবে বলে—হয়তো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আমার নিজেরই মনে। মনে হয় কিছুতেই আর সহজ হতে পারবো না তাঁর কাছে।

—দেখা হলে কিন্তু দেখবে—সেই সহজ হওয়াটা কতো সহজ।···আচ্ছা একবার দেখাই করবে চলো না? কী ক্ষতি তা'তে?

মাধবী দুইহাতে মুখ ঢেকে বলে—না রুবি, না। তাঁকে মুখ দেখাতে আর পারবো না আমি।

কিন্তু কেন? কি অপরাধ করেছে মাধবী যে মুখ দেখাতেও কুণ্ঠা? কি জানি—হয়তো সুধুই অপরাধবোধ নয়—অচেতন-মনে লুকানো আছে দুরন্ত অভিমান। এই সুদীর্ঘকাল মাধবী কী মানসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে কাটাচ্ছে, সে ধারণা কি সত্যিই নেই শ্রীমন্তর! তাই যদি না থাকে—তবে আর কোন্ সুখের আশায় তার কাছে যাবে মাধবী? অন্নবস্ত্রের আশায়? বাপের ঘরে যেটা ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠছে?

এইতো আবার এর মধ্যে একদিন অনুযোগ করেছেন ব্রজমোহন মাধবী সম্বন্ধে। কেন সে শ্রীমন্তকে চিঠিপত্র লিখছে না। চিরদিন পিতৃগৃহে থাকবার ইচ্ছাটাও তো মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কারণটা কি?

রুগ্ন ব্রজমোহন কতোদিন আর বিবাহিতা মেয়ের ভাবনা সুস্থ ভাববেন।

মার কাছ থেকে যাবার সময় বাসুদেব বলে গিয়েছিল আশ্বিন মাসে আবার আসবে। যাবার ইচ্ছেটা প্রবল হলেও যাত্রা-সময়টা কেমন বেদনাদায়ক, মা ছেলে দু'জনেরই চোখ ছলছল করে এসেছিল। সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে বাসুদেব। কিন্তু আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে গেল—না বাসুদেব, না বাসুদেবের চিঠি। বিভাবতী আবার চিঠি দেবেন—না অভিমান দেখিয়ে চুপ ক'রে থাকবেন তাই চিন্তা করছেন, এমন সময় চিঠি এলো বৃন্দাবনের।

একদা বৃন্দাবনের বাবা নাকি ছেলেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করাবার চেষ্টায় লাঠালাঠি করেছিল, কিন্তু বৃন্দাবনকে

দাস্তবৃত্তির উপযুক্ত ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারেনি। শুধু অনেক কলম ভেঙে চিঠি লিখতে শিখেছিল বৃন্দাবন।

সেই বিদ্যা আজ কাজে লাগলো।

সেই অপরূপ হস্তাক্ষর আর মৌলিক বানানসমেত দীর্ঘ পত্রখানি যথার্থ বাঙলায় রূপান্তরিত করলে এই দাঁড়ায় যে—"বাসুদেবের মতি গতি দেখিয়া বৃন্দাবন বিশেষ চিন্তিত, কারণ একটা মেলেচ্ছ মেয়েকে—হয়তো ব্রাহ্মণ কন্যাও নয়, বিবাহ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে বাসু। অবশ্য মুখে সে কিছুই বলে না, কিন্তু বৃন্দাবন আজ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মাঠে চরিয়া খাইতেছে, পাতা দেখিলেই গাছ চিনিতে পারে।...বাড়ীতে আবার একটা বন্ধু পুষিয়াছে বাসুদেব—যদিও লোকটা খুব ভালোমানুষ আর রুগ্ন, তবে—বিপদটা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। মেয়েটা নাকি উক্ত বন্ধুর শ্যালিকা, সেই আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া যখন তখন আসিয়া হাজির হইতেছে মেয়েটা। খোকা বরং জন্ম জন্ম বিবাহ না করুক, কিন্তু এরূপ 'মানোয়ারী গোরা'-মেয়েকে যেন বিবাহ না করিয়া বসে। বিভাবতীকে জানানো কর্তব্য বোধে এই পত্র লিখিতেছে বৃন্দাবন।"

চিঠিখানা হাতে করে 'কাঠ' হয়ে বসে থাকেন বিভাবতী। ক্ষীণ আশঙ্কা যে এতো তাড়াতাড়ি এমন নির্ভুল সত্যে পরিণত হবে, এতোটা সত্যিই ভেবে রাখেননি তিনি। কিন্তু এ বিভাবতী সহ্য করেন কেমন করে? একটা মাছমাংসভোজী আচার-অনাচার বোধহীন মেয়েকে (অজাত কুজাত হওয়াই সম্ভব) কেবলমাত্র বাসুর প্রিয়তমা বলে বরণ করে তোলা? অসম্ভব।...বাসুর বৌ এসে যদি লক্ষ্মীর আলপনা দিতে না পারলো—না পারলো নীলকান্তজীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন করতে, তবে সে বৌতে দরকার কি?

নিজে অশক্ত হ'লে—দুর্বল হ'লে—বাসুর বৌয়ের হাতে এক ঘটী জল খাওয়া চলবে না বিভাবতীর? তার আগে—সে বৌ বরণ করে তোলবার আগে—বিভাবতীর মরণ হয় না কেন? তা'ছাড়া—যে বাসুদেব মায়ের শত অনুরোধ উপরোধ হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, সে আজ অনায়াসে একটা 'বেহায়া বাচাল' মেয়ের মোহে পড়ে প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলী দিতে দ্বিধাবোধ করবে না? বিভাবতীর মাতৃগর্ব্ব রইল কোথায় তবে?

সন্ধ্যা হয়ে গেল, বিভাবতীর ওঠার লক্ষণ নেই।

জা ননদ যারা সংসারে আছেন, সকলেই দূর সম্পর্কের—আশ্রিত শ্রেণীর, বিভাবতীর বিরক্তির সময় সামনে এগোতে বড়ো কেউ সাহস করে না। তবু অনেকক্ষণ এভাবে গুম্ হয়ে বসে থাকতে দেখে নতুন বৌ সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে ডাকলে—দিদি, আরতির সময় হয়েছে, ভটচায্ মশাই এসেছেন।

বিভাবতীর কাছ থেকে উত্তর এলো না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে সে বেচারা আরো কুণ্ঠিত গলায় ডাকলো—দিদি ভটচায্ মশাই বলছিলেন—

—আঃ নতুন বৌ, তোমরা কি আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না?

—কিন্তু আপনি না এলে যে আরম্ভ হচ্ছে না দিদি। পাঠক মশাই চুপ করে বসে রয়েছেন, আরতি না হ'লে পাঠে বসতে পারছেন না।

—কেন? পারছেন না কেন?—বিভাবতী বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান—আমি যদি মরে যাই, আরতি হবে না? পাঠ বন্ধ হয়ে থাকবে?

নতুন বৌ প্রতিবাদ করে না, বিভাবতী উঠলেন এই ঢের। নইলে বিভাবতীকে বাদ দিয়ে একদিন যদি এসব কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়, তার দুঃসহ পরিণামটা নতুন বৌয়ের চাইতে আর বেশী কে জানে?

পরাশ্রিত স্বল্প বয়সী বিধবার অনেক কিছুই যে জানতে হয়।

সেই সন্ধ্যায় আর রাত্রে বিভাবতীকে যেন ভূতে পেলো।

আরতির শেষে উঠে এসে তিনি সারা বাড়ীটা ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন।...কতো বড় বাড়ী, কতো মহলা, কতো ছাদ দালান সিঁড়ি চাতাল, চোর-কুঠরি, গুপ্ত খিলান, চাপা দরজা—যেসব জায়গায় দু'চার বছরের মধ্যে কখনো বিভাবতীর পায়ের ধূলো পড়ে কিনা সন্দেহ, লণ্ঠন ধরে ধরে সব দেখে বেড়ালেন বিভাবতী।

সতের বছর বয়সে স্বামী মারা গেলেন, আর উনিশ বছর বয়সে শাশুড়ী, তারপর থেকে এই বিরাট অট্টালিকার মালিক হয়ে রয়েছেন বিভাবতী। জমিদারি যা আছে সেটা যেন অদৃশ্য শক্তিমান ভগবানের মতো—করুণাটা আসে কিন্তু ঠিক উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু এই বাড়ী-বাগান, মন্দির উঠোন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাসনপত্র, গৃহসজ্জা—এসব যেন দেহধারী প্রিয়জনের মতো। এর বিরহ প্রিয়-বিরহের চাইতে কিছু কম কি?

না, না, প্রাণ থাকতে এসব ছাড়তে পারবেন [illegible] বিভাবতী।

অথচ কে যে তাঁকে ছাড়তে বলেছে, তিনি [illegible] 'বাসু পর হয়ে গেল, হাত ছাড়া হয়ে গেল, এমনি একটা মর্মান্তিক আশঙ্কায় নিজের শক্তির ওপর যেন [illegible]শ্বাস হারিয়ে ফেলছেন তিনি—সব বুঝি যাবে। আলগা [illegible] পড়বে। কিন্তু না, কিছুতেই ছাড়বেন [illegible]—প্রাণপ[illegible] আঁকড়ে থাকবেন।

হাসতে হাসতে বাসুদেব যে একদিন বলেছিল—"[illegible], বড় বিরাট বাড়ী আমাদের দু'জনের কি হবে মা? [illegible] মতো আগলে না থেকে হাসপাতাল করে দিলে মন্দ হয়

কিন্তু"—সেই কথাটাই এতো দিন পরে মনে পড়ে কঠিন হয়ে উঠলেন বিভাবতী।···পারে পারে, বাসু সব পারে —যার মুঠি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই সাত পুরুষের বাস্তভিটে তচনচ্ করে ফেলতে পারে—আইন তো তারই পক্ষে।

কিন্তু বিভাবতীর বজ্রমুষ্টির কাছে আইন ?

বাড়ী তো মানুষের মতো রক্তমাংসে গড়া সচল জীব নয় যে জোর করে দখলে রাখা যাবে না।···ছেলে হাত ছাড়া হলেও যদি বা সইবে, বাড়ী হাত ছাড়া হলে নয়।

সেই রাত্রে আলো জ্বালিয়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন বিভাবতী।—লিখলেন—এই মহৎ পবিত্র ধার্মিক-বংশের উপযুক্ত বংশধর হতে না পারলে পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত সম্পত্তিতে কোনো দাবী নেই বাসুদেবের। তেমন আশঙ্কার কারণ ঘটলে সব কিছুই দেবত্র বলে গণ্য করতে হবে। পুরনো দলিল খুঁজলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা নয়—পরিষ্কার ভাষায় গুটিকতক কথা।

কখন যে সে চিঠি বাসুদেবের হাতে এসেছিল কে জানে। খেতে বসে—হঠাৎ হাসতে হাসতে বাঁ হাতে চিঠিখানা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে বার করে বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—তোর বৌমা যে আমাকে তেজ্যপুত্তুর করেছেন রে বৃন্দাবন!

—ও আবার কি অলুক্ষুণে কথা! বৃন্দাবনের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করে ওঠে—চিঠিটা লিখে পর্য্যন্ত তাঁরও ঠিক স্বস্তি হচ্ছিল না।—খোকাকে বোঝা দায়, এই তো আবার আহার নিদ্রা বন্ধ করে আজ ক'দিন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে সেই ঘোড়ার ডিমের 'পুনর্বসতি' না কি কাজে। মাথামুণ্ড বোঝাও যায় না ওদের কাজের। দেশশুদ্ধু লোক যদি কাটাকাটি করে মরে, ঘরে আগুন লাগায়, তোরা তাদের কি হিত করবি ? কিন্তু খামোকা অত বড় একটা বদনাম দিয়ে বসলো বৃন্দাবন খোকার নামে ? সোনার খোকা! চাঁদের কলঙ্ক আছে তো খোকার নেই।

বাসুদেব অবশ্য বৃন্দাবনের ভেতরের পাপ জানে না, তাই সহাস্যে বলে—'লক্ষুণে অলক্ষুণে' তুইই জানিস, দেখনা পড়ে, জানিস তো বাঙলা পড়তে!

বৃন্দাবন চিঠিখানা তুলে নিলে বটে কিন্তু তখুনি পড়বার চেষ্টা করলে না। বাঁ হাতের মুঠোয় রেখে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলো পাতে। খাওয়া যে শেষ হয়ে গেছে সে খেয়াল নেই।

—শেষ পর্য্যন্ত দেখছি বিয়েই করতে হবে একটা। বুঝলি বৃন্দাবন, মা যে ভাববেন তেজ্যপুত্তুর হ'বার ভয়ে খোকা জব্দ হয়ে গেল, ওসব সহ্য করবো না বাবা। তুই বাপু একটা 'মেলেচ্ছ মেয়ে' জোগাড় কর।

শ্রীমন্ত রোগা মানুষ, অনেক আগে খাওয়া হয়ে যায় তার। বাসুদেব বেলায় একলাই খায়। খেয়ে গিয়ে ওপরে উঠে অবাক হয়ে গেল, পূরবী কখন এসে বসে আছে শ্রীমন্তর কাছে। বিস্মিত হয়ে বললে—আপনি এ সময় যে ? কলেজ নেই ?

—না। ছেড়ে দিয়েছি, আর পড়ি না।

—কেন বলুন তো ?

শ্রীমন্ত গম্ভীর ভাবে বললে—উনি আর পরমুখাপেক্ষী থাকবেন না। নিজের জীবিকা নিজে অর্জ্জন করবেন। বাবার ভাত খেতে কলিকপেন্ হচ্ছে ওঁর।

—আঃ শ্রীমন্ত বাবু, ভালো হচ্ছে না বলছি। আমি তো আপনাকে চাকরী খুঁজে দিতে বলিনি যে রাজ্যের বাজে লোককে বলে বেড়াতে হবে।

—দেখ তুই আমার থেকে অনেক জুনিয়ার হ'লেও সম্পর্কে শ্যালিকা, একটু পরিহাস করে নেবো কি না ভাবছি।

—না বলছি। কক্ষনো না। আমি এইবার যাই শ্রীমন্তবাবু।

—কেন এখুনি পালাবি কেন ?

—'পালাবো' আবার কি ? যাবো।

—তাও তো বটে, পালানোটা কাপুরুষতা।···কিন্তু আমি বলি কি, চাকরীই যদি খুঁজছিস, একটা পাকা চাকরী জোগাড় করে ফেল না ? সরকারি কাজ, চাকরী যাবার ভয় নেই, বুড়ো হলে পেন্সন আছে।

—সে রকম চাকরী আছে নাকি আপনার কাছে ?—সকৌতুকে বলে পূরবী।

শ্রীমন্ত একবার বাসুদেবের দিকে এক নজর চেয়ে ভালো-মানুষী মাখা মুখে বলে—আমার কাছে ? না, আমার কাছে আর কই ? বরং বাসুর কাছে রয়েছে।

—শ্রীমন্তদা—বাসুদেব অপ্রতিভভাবে বলে, আগে ভাবতাম—কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না আপনি, সে ধারণা বদলাচ্ছে।

—বদলাবে বই কি। অনেক কিছুই বুঝতে পারছি আজকাল, তাই না ?

পূরবী দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে এতক্ষণে রহস্যটা উপলব্ধি করতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁদুরের মতো লাল মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—কি রে, চটে গেলি ?

—না চটবো কেন ? যা খুসি তাই বলবেন—আমি কিন্তু আর কক্ষনো আসবো না।

—পাগল, তাই কি হয় ? সকাল থেকে তোর আশাপথ চেয়ে বসে থাকি। বাসুর হুকুম, ডাক্তারের হুকুম, নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে রয়েছি—

—তা' আমি কি করবো? দিদির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রেখে গিয়েছেন কেন? আমি সুধু ঝগড়াটে কেমন?

চট্‌পট্ ঘর থেকে বেরিয়ে জুতোটা পায়ে ঢোকাতে ঢোকাতে নীচে নেমে যায় পূরবী।

এতোদিনের মধ্যে এই প্রথম শ্রীমন্তর সামনে দিদির নাম উচ্চারণ করে সে। নইলে সহস্র কথার মধ্যেও সন্তর্পণে মাধবীর প্রসঙ্গটা এড়িয়ে চলেছে তারা, পূরবী শ্রীমন্ত দু'জনেই। পূরবী আসতো যেন শ্রীমন্তরই সম্বন্ধের লোক, ছোট বোন যেন। বড়ো ভাইয়ের মতোই সস্নেহ মমতায় আহ্বান করতো তাকে শ্রীমন্ত, গল্প করতো, তর্ক করতো, রাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতো।

অবান্তর বলে নয়, গভীর বেদনাময় বলেই যেন ব্যথার জায়গাটায় হাত দিতে সাহস হ'ত না কারুরই।

সিঁড়িতে ওর জুতোর শব্দ মিলিয়ে গিয়েও যেন ধ্বনিত হচ্ছিল—খট্ খট্ খট্। বেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল দু'জনেই, এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করে শ্রীমন্ত বলে—বাসু, তুই রুবিকে বিয়ে কর।

—আপনি কি পাগল হলেন শ্রীমন্তদা?

—না রে, খেয়ালের মাথায় বলছি না, ভালো করে ভেবে চিন্তেই বলছি। খাটি সোনা। ওকে বিয়ে করে তুই ঠকবি না।

—বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার জীবনের আদর্শ নয় শ্রীমন্তদা।

—ভুল করছিস বাসু, সবাই সব কাজের উপযুক্ত হয়ে তৈরি হয় না। প্রেমহীন ছায়াহীন শুকনো কঠোর যে কর্ম্মজীবন, সে তোদের জন্যে নয়। জোর করে করতে গেলে চারদিক থেকে নিজেকে নষ্টই করে ফেলবি। বিয়ে করলেই বয়ে যাবি, এমন দুর্ভাবনাই বা কি জন্যে? গতানুগতিকভাবে—সুধু বিয়ে করলাম, ঘর-সংসার করলাম, বৌয়ের বাজুবন্ধ গড়িয়ে দিলাম, তাই বা কেন? দেশ তো সুধু গোটাকয়েক সন্ন্যাসী ছেলেমাত্র চায় না, তা'তে সমৃদ্ধি কোথায়? 'আমরা সংসারী, অতএব আমরা তুচ্ছ, আর আমাদের জগতের দরবারে কোনো কর্ত্তব্য নেই'—আজ আর একথা ভাবলে চলবে না। সকল অবস্থায় সকল মানুষই দেশের একজন। জমিতে যখন লাঙলচষা হয় দেখেছিস? দীর্ণ বিদীর্ণ শুকনো শ্রীহীন। সেই জমি যখন ফসলে ভরে ওঠে, তার রূপের আর তুলনা হয় না। হয়তো এতদিন প্রয়োজন ছিল তেমনি রুক্ষ কঠোর শ্রীহীন জীবনের, সংগ্রামে বেদনায় দীর্ণ বিদীর্ণ। কিন্তু আজ এসেছে ফসল তোলবার দিন। নিজের জীবনে শ্রী আনতে না পারলে অন্যের জীবনের শ্রী ফেরাবি কিসে? এই আমাদের দেশ—একদিন ঐশ্বর্য্যে লাবণ্যে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠবে, ভরে উঠবে সুখী সন্তুষ্ট মানুষে, এ আমি যেন চোখ বুজলেই দেখতে পাই বাসু। নিজেকে বঞ্চিত করে অসুখী করে রাখবি কেন? ...ভয়ানক একটা—মহৎ একটা কিছু করছি, এ ধারণাটা নাই বা থাকলো।...বিয়ে করবি বৈ কি, বিয়ে করলেই তো আর দেশকে কেউ খপ্ করে কেড়ে নেবে না তোর হাত থেকে?

—কিন্তু ওকে তো আপনি চেনেন শ্রীমন্তদা।

—চিনি বলেই তো বলছি রে সাহস করে। ছোট স্বার্থে পথ আটকে রাখবার মেয়ে ও নয়।

—কিন্তু আমাদের দু'জনের চিন্তাধারা যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—তা'তো জানেন? জানেন তো কী ওদের মত, কী ওদের পথ!

—জানিস বাসু, দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের পথটা ভুল, তাই মতটাও ভুল। কিন্তু গতিটা মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়—আগুনটা। ওদের ভেতর যে আগুন জ্বলছে, ডিরেকটার তাকে গৃহস্থের কল্যাণে না লাগিয়ে লাগাচ্ছে গৃহস্থের চালের মটকায়। ডিরেকশানের ভুল।

—ভুল হোক ঠিক হোক, ওদের পথ থেকে ওরা কেন নিবৃত্ত হবে?

—হতেই হবে রে—ভুল কখনো চিরদিন চলে না। যথার্থ কল্যাণের পথ ওদের চোখে পড়বেই একদিন। কিন্তু এখনও তো ওদের আগুন বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না, কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

—কিন্তু শ্রীমন্তদা—বাসুদেব দ্বিধাভরে বলে—ও রাজী হবে না।

—তুই একটী হস্তীমূর্খ। কবি মিথ্যে বলে না—'আদর্শ-বাদীদের বুদ্ধি সুদ্ধি ভোঁতা।' তোকে নইলে ওর চলবেই না—এ কি তুই চোখ খুলে চেয়ে দেখতে পাস না?...আর তোর নিজের কথা? সে আর বলে লজ্জা দিতে চাইনে।

শ্রীমন্তর সামনে বসে থাকতে আর সাহস হ'ল না বাসুদেবের, মুখের চেহারা লুকাবে কোথায়? পাশের ঘরে চলে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কিন্তু—না, পূরবীর কথা ভাবতে নয়, ভাবছে শ্রীমন্তর কথা।

নিজের জীবনকেই বা এমন দীর্ণ বিদীর্ণ শ্রীহীন করে রাখবে কেন শ্রীমন্ত? এই মহৎ প্রাণকে আশ্রয় দেবার মতো জায়গা কি মাধবীর কাছে নেই?

হয়তো আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না এদের। নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ এরা। তাই সাধারণ হিসেবে দুঃখী মনে হ'লেও দুঃখী নয়। কিন্তু মাধবী?

মাধবীর কথা মনে প'ড়ে মনটা ভারী হয়ে গেল। সুধুই স্বামী-পরিত্যক্তা বলে তো নয়, শ্রীমন্তর মতো স্বামী-পরিত্যক্তা বলেই। নিজের জীবনে সৌভাগ্যের স্পর্শ লাগলেই বোধকরি অন্যের দুর্ভাগ্যের স্বরূপ চেনা যায়।

সবদিক তো একরকম গুছিয়ে আনা গেছে—সুধু মাধবীর জন্যেই অবস্তির শেষ নেই মিসেস হালদারের। শোনা যাচ্ছে নাকি ছোট মেয়েটার বিয়ের কথা চলছে—জানা কথা। সেই ফর্সা ছোকরাটা পূরবীকে বিয়ে না ক'রে ছাড়বে না, এ আর জানতে বাকী ছিল না মিসেস হালদারের।

সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

যাক গে, বিয়েটা হয়ে গেলে আপদ চোকে, তারপর নিজের মাকে এনে এবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করবার একটা প্ল্যান করা আছে। খামোকা বুড়ো মার জন্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া—নিজে আর তিনি ক'দিন থাকেন! বারোমাসই তো পরের বাড়ী কাটে।

ভালোও লাগে না আর এই রুগী নিয়ে ধাঁটাঘাটি।

জঘন্য কাজ।

হরেক রকমের রোগ আর হরেক রকমের রুগী। রাগী, খিটখিটে, বেয়াড়া, অসাবধানী, খুঁৎখুঁতে, শুচিবাইগ্রস্ত, কতো রকম রুগীই দেখলেন জীবন ভোর। অরুচি এসে গেছে।

এখন একটু নিশ্চিন্ত জীবনের আকাঙ্খা।...মন্দ কি, যদি এরকম একটি স্বচ্ছল সংসারে গৃহিণীর আরামে থাকতে পাওয়া যায়! সামান্য একটু অভিনয়ের বিনিময়ে আদায় করা যায় —ষোলো আনা সুখসুবিধা।...তার পর—নিজেকে ভালোমত প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারলে পুরণো বন্ধুদের কি আর আনা যাবে না?...পঙ্গু ব্রজমোহন কিছু আর বিছানা ছেড়ে নেমে এসে সব দেখে বেড়াতে পারবে না। আশঙ্কাও করবে কিনা সন্দেহ। নেহাৎ ইডিয়ট বৈ তো নয়! তাকে যে কোনো স্ত্রীলোকের ভালোলাগা সম্ভব নয়, এ জ্ঞানটুকুও নেই। নিজের ঝোঁকেই বিভোর। অতএব এইবেলা আখের গুছিয়ে নিতে পারাই বুদ্ধির কাজ।

কিন্তু ওই-মাধবী।

সুখের শনি।...ঘুস দিয়ে দাসীদের মুখ বন্ধ রাখা যাবে, কিন্তু মাধবীর? অবিশ্যি মাধবী যে মিসেস হালদারের 'রীতচরিত্রের' কথা বাপের কানে তুলতে যাবে, এমন আশঙ্কা নেই, ছোটটার মতো অত ঝাণু নয়, বোকাসোকা ভালোমানুষ গোছের আছে। তবু নিষ্কণ্টক সুখ ভোগ করা এক, আর চোখের সামনে চক্ষুঃশূল টাঙিয়ে রাখা আর।

অথচ কেনই যে স্বামীর ঘরে যেতে চায় না মেয়েটা, সেও এক আশ্চর্য্য। লোকের কাছে যতোই "রহস্য আছে" বলে মাথা নাড়ুন মিসেস হালদার, নিজের মন থেকে অবিশ্যি জানেন ঘোষণীয় রহস্য কিছুই নেই। দেখছেন তো এতোদিন। জামাইটাও তো শুনতে পাওয়া যায় খারাপ টারাপ নয়, দেশোদ্ধারী বীর।...তবে?

পূরবীর অসাক্ষাতে মাধবীকে কম অপমান অপদস্থ তো করেন না মিসেস হালদার। কই? অপমানের জ্বালাতেও তো বিদেয় হবার চেষ্টা করে না। ওদিক দিয়ে চলবেনা—বুড়োকে দিয়ে জামাইটাকে একটা চিঠি দেওয়াতে হবে।—বেশ মিষ্টি মিষ্টি চারটী বচন ঝাড়তে পারলে—সে ছোঁড়াই যদি অপদস্থ হয়ে বৌকে নিতে আসে।

ভাব ভালোবাসা সবই ছিল—সুধু বাপের অসুখ নিয়ে এমন মনোমালিন্য হ'ল যে, জন্মের মতো কারখৎ? সবই অনাসৃষ্টি!

কিছু নয়—মিসেস হালদারের কপাল!

—হ্যাঁরে রুবি, বাসু আর একদিনও এলো না কেন বলতো? বিয়ের কথায় এতোই লজ্জা হ'ল বাবুর? না কি ঝগড়া করেছিস?

—হ্যাঁ, করেছি। ওই করতেই আছি যে আমি।...ও মনের দুঃখে চাটগাঁ চলে গেছে।

—বালাই বাটু, দুঃখ কিসের?

—নয়ই বা কিসের? এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পঞ্জিকা তোমাদের—যে দু'দুটো মাস 'নো এ্যাড্‌মিশান' করে রেখে দিয়েছে!—বাচাল পূরবী দিদিকে জড়িয়ে ধরে খিলখিল করে হেসে ওঠে—এমন ফাইন শরৎকালে কি না বিয়ে করতে পাবে না লোকে! দেখোতো অন্যায়! কি আর করবে—'বাণভাসি'দের উদ্ধার করতে গেল।

—গেল তো—আবার অসুখ বিসুখ না করে।

মাধবী অভিভাবিকা-জনোচিত উদ্বেগ প্রকাশ করে।

—অসুখ? কেন অসুখ করতে যাবে কেন? ওই তো কাজ ওদের।...কিন্তু দিদি, বেশ গেল ওরা—দেখে হিংসে হচ্ছিল। নেহাৎ এখন সঙ্গে যাবার বায়না নিলে তোমরা ঠাট্টা করবে তাই, নইলে চলে যেতাম ওদের দলের সঙ্গে। কি চুপচাপ সুধু বাড়ী বসে থাকা—ভালো লাগে না।

মাধবী 'ভালো না লাগার' অন্য অর্থ অনুমান করে মনে মনে হেসে বলে—কেন তোদেরও তো দল আছে, দলপতি আছে, গেলি না কেন? রিলিফের কাজ তো কারুর একচেটে নয়?

—আমরা? হুঁঃ। টাকা কোথায়? লোক কোথায়? ডাক্তার কোথায়? ওষুধ কোথায়? সুযোগ সুবিধে কিই বা আছে আমাদের?

—ওসব কি আকাশ থেকে পড়বে? সুযোগ সুবিধে তৈরি করে নিতে হবে।

—কে করছে?

—তোরাই করবি। নইলে কি করতে যাস রোজ? শত্রুর মাথায় লাঠি বসাবার জন্যে যেমন হাত পাকাতে হয়—তেমনি বন্ধুর ব্যথায় হাত বুলোবার মতো কোমলও রাখতে হয় হাতটাকে।

—দূর, লাঠি খেলতেও আর ভালো লাগে না। কাজের মধ্যে তো খালি সপ্তাহে দু'দিন অধিবেশন ডাকা হচ্ছে, আর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সকলের সমালোচনা করা হচ্ছে। কি যে সীতেশদার 'সত্যিকার কাজ' তাও দেখতে পাই না। একটা সাপ্তাহিক বার করা হ'ল—তাও টি'কলো না।

—কেন রে? টি'কলো না কেন?

—সেই পৃথিবীর আদি ও অকৃত্রিম সমস্যা, অর্থাভাব আর মতভেদ। প্রথমটা তবু চাঁদাটাঁদা তুলে ম্যানেজ করে আনা যেত, শেষেরটা অসম্ভব। সুরমাদিকে আর কেউ চায় না, অথচ মুখ ফুটে বলতেও পারছে না। উনি সম্পাদিকা, ওঁর মতেই চালাতে হবে কাগজ, ওঁর মতে আর আস্থা নেই কারুর। সুরমাদি বলেন—কাগজটা যখন মেয়েদের পরিচালিত, তখন একটা শরীর গঠন ও রূপচর্চ্চার বিভাগ থাক।" বাণী সেন বললে—"না, একঘেয়ে।" কুন্তলাদি বললেন—"সেলাই বোনা আর রান্নার একটা পাতা থাকুক"—আমি বললাম—"রাবিশ।" নীলা রায় বললে—"ছোট গল্প বা কবিতা না থাকলে চলবে?" উজ্জলাদি বললেন—"না চলে উঠে যাক্।" উঠেই গেল।

—বালাই গেছে—বলে হেসে ফেলে মাধবী।

গল্পও থেমে যায়।

কিছুক্ষণ দু'জনেই বসে থাকলো চুপচাপ।...

পুরবীর মনে যে জোয়ার বইছে, মাধবী তার নাগাল পাবে কোথায়? মাধবীর মনে যে ব্যথার সমুদ্র, পুরবী তার হিসেব রাখবে কি করে? বুদ্ধি দিয়ে, সহানুভূতি দিয়ে, অন্যের মন বুঝতে চেষ্টা করি আমরা, কিন্তু কতোটুকু বুঝি?

আর তেমন সহানুভূতিই বা কই? মানুষের ওপর মানুষের?

বিভাবতী বসে থাকলেন তেমনি অনমনীয় মনোভাব নিয়ে।

বাসুদেবের চিঠির যা উত্তর দেন—নিতান্তই মামুলি কুশল প্রশ্ন। অগাধ স্নেহের সমুদ্র এক নিমেষে কেমন করে যে উষর-মরুভূমিতে পরিণত হ'ল, এই আশ্চর্য্য। এদিকে নীলকান্তর মন্দিরে ভোগরাগের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে। কেবলমাত্র সন্ধ্যার পাঠ বসতো, আজকাল সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই পাঠক আসেন ভাগবত নিয়ে। জোর গুজব—পাঠকঠাকুরকে নাকি জমি জায়গা দিয়ে এখানেই প্রতিষ্ঠিত করবেন।

সংসার-বীতরাগীর ভাব ফুটিয়ে তুলতে যা যা করা আবশ্যক, তার কিছুই ত্রুটি হচ্ছে না।

আশ্রিতারা সন্ত্রস্ত, দাস-দাসীরা ভীতি-বিহ্বল।

এই রকম সময় বাসুদেব এলো চট্টগ্রাম থেকে।

পরিশ্রম-পথশ্রম, অনিয়ম অত্যাচার, অনেক কিছুর ছাপ মুখে চোখে। সোনার রং তামার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে আগে এরকম টাটকা টাটকা মার সামনে আসতে সাহস করতো না বাসুদেব। দু'চার দিন কলকাতার জল গায়ে লাগিয়ে অন্ততঃ একটু ফর্সা হয়েও আসতো। এবারে হাতে ততো সময় ছিল না, বোধ করি মনে তেমন ভয়ও ছিল না। ওর এই হাড়ির হাল দেখে সে রকম যে হা-হুতাশ করবেন না বিভাবতী, এটা যেন স্থির নিশ্চয় করে এসেছে সে। ধারণাটা ভুল নয়—বিভাবতী শুধু প্রথম দর্শনে একবার বললেন—চেহারা যে দেখছি খুব খারাপ হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়ার খুব অযত্ন হয়েছে বোধ হয়?

—খাওয়া? জুটেছে এই ঢের। তাও সবদিন নয়।—এই বলে চুপ করলো বাসুদেব। মায়ের সঙ্গে যখন গল্প করতো বাসু, পিসিমা হেসে বলতেন—বিধাতাপুরুষ কেন যে তোকে একটা মোটে মুখ দিয়েছেন বাসু তাই ভাবি। ব্রহ্মার মতো চতুর্মুখ হতিস্ তো গল্পটা জমতো ভালো।

সেই বাসু আজ কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু দোষ কি বাসুদেবের? বিভাবতী যেন ইচ্ছে করে নিজের চারদিকে কঠিন বর্ম্ম রচনা করে রেখেছেন—গাম্ভীর্য্যের আর অবহেলার।

কিন্তু বাসুদেবের তো চুপ করে থাকলে চলবে না, কথা বলবে বলেই যে এসেছে। ভেবেচিন্তে রেখেছিল তাই ইতস্ততঃ না করে এক সময় পাড়লো কথাটা। বললে—মা তোমার নীলকান্তজীর সঙ্গে আর ভাগ-বখরা নিয়ে ঝগড়া করতে পারিনে বাপু, উনিই মনের সুখে মালপো খান।

বিভাবতী ভুরু কুঁচকে বললেন—তার মানে?

—মানে, আমি তো এক বাউণ্ডুলে, কবে কোথায় থাকি না থাকি ঠিক নেই, বিষয় সম্পত্তির বুঝিও না কিছু, যা আছে ওঁরই হেফাজতে থাক্, কি বল? যদি দরকার থাকে তো বলো—লিখে পড়ে পাকা করে দিই।

আর পারলেন না বিভাবতী, রাগে দুঃখে ফেটে পড়লেন একেবারে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন—পিতৃ-পিতামহের উত্তরাধিকারিত্ব ত্যাগ করবে, তবু একটা বাজে খেয়াল ত্যাগ করতে পারবে না? এতোটাই উচ্ছন্ন যেতে হয়?

বাসুদেবের মনের মধ্যেও কি ঝড় বইছিল না? কি জানি মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না ওর। তেমনি হাসি-মাখা মুখে বলে—পিতৃ-পিতামহ যে আমার ওপর খুব বেশী আশা রাখতেন, এমন মনে হয় না মা। বোধ করি বংশধরদের সম্বন্ধে তাঁদের দূরদৃষ্টি ছিল অসীম, তাই পাথরে গড়া পাকা প্রহরী নিযুক্ত করে রেখে গেছেন। ভালোই করে গেছেন। আমি যেমন বাউণ্ডুলে, হয়তো—হাতে পেলে পিতৃ-পিতামহের ভিটের গন্ধ চরিয়ে ছাড়তাম। যাক্, ভালোই হবে যে

দেবতার খাস তালুক হয়ে থাকবে—মানুষের আর 'ট্যাফো' চলবে না।

—তবু সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে হবে? অথচ আমি যখন বিয়ে বিয়ে করে মাথামুড় খুঁড়েছিলাম তখন—একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল এখন? বিয়ের ইচ্ছে হয়েছিল—সেটুকু ঘুণাক্ষরে একবার আমাকে জানালে মেয়ে জোগাড় হ'ত না? কোথাকার একটা অজাত কুজাত মেয়ে—বিধবা কি সধবা তার ঠিক নেই—

—পাড়াগাঁয়ে গিন্নীদের মতো কথাগুলো বোলোনা মা, দোহাই তোমার। কোথা থেকে যে কি শুনেছ আর কতোটা ভেবে ভেবে আবিষ্কার করেছ তুমিই জানো, হয়তো আমার কাছে সমস্তটা শুনলে এতো অস্থির হতে না।···কিন্তু তবু শুনে রাখো—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, এবং যতোদূর মনে হয়—অবিবাহিতা। হয়তো দেখলে তোমার মত বদলাতো—কিন্তু সে সুযোগ যখন হচ্ছে না, উপায় কি?

'উপায় কি?'—একটি মাত্র নিরুপায়ের বাণী উচ্চারণ করে সকল আলোচনার ওপর যবনিকা টেনে দিলে বাসু?··· বলতে পারলো না—"মা তুমি প্রসন্ন মনে মত না দিলে চলবেই না আমার।" বলতে পারলো না—"মা আমার ভুল হয়েছে, তবু তুমি তো চিরদিনই সব ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে এসেছো, সেই সাহসে এসেছি।" বলতে পারলো না—"তুমি একবার দেখে আশীর্ব্বাদ করে আসবে চলো, পায়ে পড়ি।" নভেলি ভাব-ভালোবাসার ঝোঁকে যাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সেই রকমই বাজে আর সাধারণ ছেলে তবে বাসু? লজ্জা নেই, কুণ্ঠা নেই। আবার বলে কি না—'পাড়াগেঁয়ে গিন্নীদের মতো কথা বলো না!' বলেছেন কি আর বিভাবতী সাধে? একটা কলহ কেলেঙ্কারী বচসা চেঁচামেচি চললেও যেন বাঁচেন তিনি, মনের পাষাণভার নামে। বাপের বিষয়ের স্বত্ব ত্যাগ করে উদারতা দেখিয়ে চলে যাবে ও, আর বিভাবতী থাকবেন অপরাধের ভারে মাথা হেঁট করে?

এই তবে এখনকার নিয়ম? বেশ, তাই ভালো।

—উপায় তো নিশ্চয়ই নেই—গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ান বিভাবতী—ইচ্ছে থাকলে উপায়ের অভাব হ'তোনা হয়তো—কিন্তু লাঠি-খেলোয়াড় মেয়েকে 'বৌ' বলে আশীর্ব্বাদ করে আসবার ইচ্ছেও নেই আমার, রুচিও নেই।

ছেলের সঙ্গে সারাদিনে আর দেখা করলেন না বিভাবতী, জপের মাত্রা এতো বেড়ে গেল যে, নীলকান্তর ঘর থেকে উঠে আসবার ফুরসুৎই হ'ল না।

রাত্রের ট্রেণ, তবু বেলা থাকতে না বেরোলে চলে না। গ্রাম থেকে মাইল তিন চার সাইকেল চালিয়ে তবে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণ ধরতে হয়।—কার্ত্তিকের বেলা, সন্ধ্যা হ'ল বলে।

বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পিসিমাদের দরবারে এসে হাজির হ'ল বাসু।

মৃদু হেসে বললে—কই গো পিসিমা, কিছু খেতে টেতে দাও? শেষকালে না খেয়ে চলে যাবো আর মন-কেমন করে কাঁদতে বসবে তোমরা!

আহারের আয়োজন করাই ছিল কিন্তু বিভাবতীর অনুপস্থিতিতে ছেলেকে ডেকে খাওয়াবার সাহস পিসিমা খুড়িমাদের নেই। অথচ বিভাবতীর ঠাকুরঘর থেকে বেরোবারও নাম নেই। শেষ অবধি—'আজ আর বোধ হয় যাবে না বাসু' ভেবে নিশ্চিন্ত হচ্ছিলেন। এতো বড়ো বাড়ী, কে কখন কোনদিকে থাকছে, কি করছে, হিসেব রাখাও দায়।

বাসু নিজে এসে চাইতেই ব্যস্ত হয়ে খাবারের থালা বার করে আসন পেতে দিয়ে বললেন—ওমা তুই আজ যাবি? আমি বলি বৌ এখনো ঠাকুরঘরে বসে রইল, তবে বুঝি যাবি না।···কলকাতায় যে তোর কী এতো কাজ বাপু, একটা দিন থাকতে পারিস না?

—অকর্ম্মাদেরই সবচেয়ে সময়ের অভাব, তা' জানো না পিসিমা?

আহারের রুচিমাত্র ছিল না, তবু পিসিমার তৈরি ছানার জিলিপির অশেষ প্রশংসা করে মহোৎসাহে খেতে থাকে বাসুদেব।

ধারে কাছে বিভাবতী নেই, তাই সাহসে ভর করে পিসিমা চাপা গলায় বলেন—বৌ বুঝি রাগ করে বসে আছে?

বাসু মুখ তুলে একবার হাসলো।

পিসিমা শান্ত গলায় বললেন—মায়ের প্রাণ, রাগ অভিমান একটু হয়েছে, ওকি আর থাকবে? তুই বাড়ী থেকে পা বাড়াবি আর কেঁদে মরবে।···তুই বিয়ে করে বাড়ী আসিস্—দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তাই কি হয় পিসিমা?

—হয় বৈ কি বাবা, হয়। সাহস করে কাছে এসে দাঁড়াতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যায়। চিরদিনের সম্বন্ধ—মা ছেলের সম্বন্ধ, একি এক কথায় মুছে যাবার জিনিষ? আর তোর বৌ আমরা দেখবো না?

বাসুদেব একটু চুপ করে থেকে বলে—তার চেয়ে তুমি ন'খুড়িমা চলোনা কলকাতায়? তোমরা কেউ না গেলে কে আমার বিয়ে দেবে বলো তো? বৌ বরণ করবে কে?

পিসিমা হঠাৎ—আগত অবাধ্য এক ঝলক চোখের জলকে তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে ফেলে বলেন—তাই ইচ্ছে করছিল বাবা, কিন্তু ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাবো কোন্ মুখে বল্? সে মুখ কি আর তোর মাকে দেখাতে পারবো? তুই বৌ এনে দেখাবি। আমি জানি—যে মেয়েকে তুই গ্রহণ করতে পারছিস, সে ফেল্‌না মেয়ে নয়।

—কিন্তু পিসিমা, সে যে—বাসুদেব হেসে ওঠে—লাঠি-খেলোয়াড় মেয়ে।

—হলেই বা—পিসিমাও হেসে ওঠেন—তাই বলে কি এসেই তোর বুড়ো পিসির মাথায় লাঠি বসাবে? এতো ভয় কিসের?

যাবার সময় নিকটবর্তী হয়ে আসে, অধৈর্য্য পিসিমা আর থাকতে পারেন না। ঠাকুর মন্দিরের দরজায় এসে বলেন—জপ শেষ হল বৌ? বাসু যে বাড়ী থেকে আসছে গিয়ে।

উত্তর আসে না।

—বৌ শুনছো, ছেলেটা কতোদিনের জন্যে যাচ্ছে, এ সময় রাগ অভিমান পুষে রেখে ওর মনটায় কষ্ট দিও না।

পূজারিণী নিরুত্তর, সুধু হাতের মালাটাই ঘুরতে থাকে দ্রুততালে।

—বৌ, তা'হলে আসবে না?

সাড়া এলো না। নীলকান্তজীর মতোই পাথর হয়ে গেছেন বোধ করি বিভাবতী। আবেদন নিবেদন কিছুই পৌঁছয় না কাণে।

আশ্রিতা হোন, জ্ঞাতিমাত্র হোন, তবু সম্পর্কটা ননদ, তা ছাড়া—নিঃসন্তানা বিধবার সমস্ত স্নেহ তো পিতৃবংশের এই একটীমাত্র প্রদীপের ওপর পড়েছিল। তাই বিভাবতীর এই নির্লিপ্ত নিরুত্তরতা তাঁকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন—অতি কিছুও ভালো নয় বৌ। কচি ছেলের ওপর যে জোর খাটে, তাই কি জোয়ান ছেলের ওপর খাটবে? হাত দিয়ে হাতী ধরা যায় না। সে চেষ্টাই বোকামী। বাসু যদি পর হয়ে যায়, তার দোষ দেবোনা আমি, পর তুমিই করলে। জগতে সুধু তুমিই আছো, আর তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে? আর কারুর মনপ্রাণ ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছু নেই, কেমন? এতো অহঙ্কার তো ভালো নয়।

নিতান্ত মরিয়া অবস্থা বলেই বোধকরি বিভাবতীর মুখের ওপর এতগুলো কথা বলার সাহস হয় পিসিমার। চলেও যান নিতান্ত সশব্দে।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। কাঠ হয়ে বসে থাকেন বিভাবতী। হাতের মালাও আর ঘোরে না।

বিভাবতী বাদে সকলেই এসে বারবাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়ায়।

লালধুলো উড়িয়ে বাসুদেবের সাইকেলের চাকা পথ কেটে চলে।– চলতে চলতে এক সময় মিলিয়ে যায়।

গোল পাকালে বৃন্দাবন, কিন্তু দেখা গেল বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহ বৃন্দাবনেরই বেশী। বেশ কিছু ঘটা করতে না পেলেও, বাসুদেবের নির্দ্দেশে সে চলতে রাজী নয় মোটেই।

বিয়েই যখন হচ্ছে, তখন বিয়ের মতো করে না করলে মান থাকবে কেন?

মূর্খ অশিক্ষিত বলেই বোধকরি অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিতে সহজে পারে। আপত্তিকর হলেও পারে। শ্রীমন্তকেও সে আবার এ বাড়ীতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সত্যি তো আর বৃন্দাবন নিজে বরকর্ত্তা হতে পারে না।

কিন্তু শ্রীমন্ত কি করবে? সেই বাড়ীতে যাবে বরকর্ত্তার বেশে?

যে বাড়ীতে একদিন নিজে গিয়েছিল মালাচন্দনে সেজে? ···মাধবী কি এখনো তেমনি আছে? তিন বছর—না তিন যুগ? কোন্ ছুতোয় যে এই বরকর্ত্তাগিরিটা এড়ানো যায়, সেইটাই ভেবে ঠিক করতে পারে না শ্রীমন্ত। বিজনবাবুকে ভার দেবে? হঠাৎ অসুখের ভান করবে?

কিন্তু···কিন্তু···সুযোগ কি বারে বারে আসে? জীবনেও কি আসবে আর?

বাসুদেব ভাবছে আর-একভাবে। শিবসাগর থেকে ফিরে এসে দিন দুইতিন উদ্ভ্রান্তের মতো কাটিয়ে নেহাৎ যখন দেখলে বিয়ের দিন এসে গেছে, তখন একদিন চক্ষুলজ্জার মায়া ত্যাগ করে গিয়ে উঠলো টেন্-এ, সরোজ ব্যানার্জ্জি রোডে।

মাধবী অনেক সমাদরে বসালো। এতোদিন না আসার জন্যে অনেক অনুযোগ করলে—কিন্তু বাসুদেবের কাছে কথায় কে পারবে? মাধবীর কথা শেষ হ'তে হেসে বললে—যাক্ আপনার কথাগুলো সব শোনা হ'ল, এখন আমারগুলো শুনুন—মাকে আনতে পারলুম না, এখন আমাদের সংসার গুছিয়ে দেবে কে? আপনি ভিন্ন?

—আমি? আমি কি করবো?—মাধবী অবাক হয়ে তাকায়।

—কেন আপনার বোনটীর সঙ্গে গিয়ে—আমার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতে হবে তো? একলা ওর হাতে পড়লে কি আমার কি দুর্গতির শেষ থাকবে?

—আমার হাতে পড়লেও দুর্গতি কম নয়।—বলেই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে নেয় মাধবী—মাকে আনা গেলনা কেন বলোতো? ঠাকুর ফেলে আসা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? সামান্য ক'দিনের জন্যেও নয়?

—নাঃ। ঠাকুরের কাছে আর কিছুই নেই তাঁর।··· কিন্তু আমরা কি ভেসে যাবো? আপনি যাবেন এই জেনে নিশ্চিন্ত থাকবো আমি, বুঝলেন?

—ও মা কী আশ্চর্য্য কাণ্ড! আমি তোমার বৌয়ের সঙ্গে 'কনের ঝি' হয়ে যাবো না কি?···

—বলুন, অভিভাবিকা হয়ে।—আমার বৌয়ের নয়, আমার।

—কবি শুনতে পেলে আস্ত রাখবে না তোমায়।

কাছাকাছি আছেই কবি এটা অনুভব করেই বাসুদেব উত্তর দেয়—সেই তো ভয়। তাই তো আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। যাবেন তো?

বিব্রত মাধবী বলে—আমি কি করে যাই বলো তো? এদিকেও তো বিস্তর কাজ আছে?

—শরণাগতকে রক্ষা করাও কাজ, বুঝলেন?

—বাঃ। কুটুম্ব বাড়ী যাবো, আমার বুঝি লজ্জা করবে না?—উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলে মাধবী, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়। বাসুদেব রাজী না করিয়ে ছাড়ে না। ওর ধারণা—দু'জনের একবার দেখা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাসুদেবের বাড়ী শ্রীমন্ত থাকবে—এমন আশঙ্কা নেই বলেই কি মাধবী সম্মতি দিলে? না, শ্রীমন্ত থাকতে পারে এই আশায়? সুযোগ কি বারে বারে আসে? জীবনে কি আর আসবে?

অজ্ঞতার ভান করে যাওয়া যায় না কি?

যাবার পথে অবশ্য পূরবী আটকালো বাসুদেবকে।

নেহাৎ দিদির সামনে একটু লজ্জা করছিল। তা' বলে—নির্জ্জন মিলনে গদগদভাবে প্রেম নিবেদন করবে এমন মেয়ে নয়, বললে—পালাবার আগে একটা জবাব দিয়ে যান।

এমনভাবে সুযোগ জোগাড় হবে আশা করেনি বাসুদেব। চলে যাবার সময় মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ করছিল বটে। তবু ভাবলে যাক কিছু ধৈর্য্য থাকা ভালো।

পূরবীর কথায় এদিক ওদিক চেয়ে হেসে বললে—কিসের জবাব? ঘণ্টায় ক'গজ স্পীডে তকলি কাটতে পারি আমি?

—ও জিগ্যেস করতে দায় পড়েছে আমার। তকলির পরমায়ু ফুরিয়েছে এবার। আমি জানতে চাই—যার হাতে পড়লে 'দুর্গতির শেষ থাকবে না', তার হাতে পড়বার দরকার কি?

—তাই তো ভাবছি।

—কি ভাবছেন? এখনো সময় আছে তাই?

—হ্যাঁ তাই।—চাপা হাসিমাখা মুখে বাসুদেব বলে—তাই ভাবছি—এখনো যথেষ্ট সময় রয়েছে, একবার ঘুরে আসা যায় না?

কথার মোড় ঘুরে যাওয়ায় পূরবী অবাক, বলে—কোথায় ঘুরে আসা যাবে?

—এই ধরুন—আনোয়ার শা রোডে—না কি ভয় করবে?

—হ্যাঁ করবে—করবেই তো।—সারা মুখ লজ্জায় আনন্দে লাল হয়ে ওঠে পূরবীর।

—আচ্ছা খুব কসে রাম নাম গান করবেন। চলুন।

এ ডাক এড়ানো শক্ত।

গাড়ীর গতি কি তাল রাখতে পারে হৃদয়ের গতির সঙ্গে?

পূরবীর মনে হয় যুগ যুগান্তর ধরে ও যেন চলেছে এমনি করে—চলবে আরো বহু লক্ষ যুগ।…বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ… ছায়াঘন কোমল তৃণাবৃত পথ…নদীতট…গিরিপ্রান্তর…সমস্ত পার হয়ে পৃথিবীর শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌছবে—এমনি নিশ্চিন্ত নির্ভরতায়।

নারী কি কোনোদিন ছাড়তে পারবে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সুখ? কাড়াকাড়ি করে পৃথিবীর সমস্ত দাবী দাওয়ার অংশ নেবে, কিন্তু স্বপ্ন দেখবে আশ্রয়ের।

—ভয় করছে?

—করছে।

ষ্টিয়ারিং হুইল ধরা হাতের ওপর একখানি হাত এসে পড়লো—স্বেদাক্ত কোমল।

—কবি।

চমকে উঠলো পূরবী, অনভ্যস্ত কানে ডাকটা নতুন লাগবে বৈকি।

—কবি, আমরা কি ভুল করছি?

—হঠাৎ একথা কেন?—দুর্ব্বল গলায় প্রশ্ন করে পূরবী।

—মিথ্যে বলবো না—মাঝে মাঝে এই সংশয় ধাক্কা দিচ্ছে মনকে। তোমার আমার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা,—অজস্র তফাৎ দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো খুঁটিনাটিতে। এই বিরোধ ধীরে ধীরে কুয়াসার সৃষ্টি করে আমাদের জীবনের সূর্য্য ঢেকে দেবে না তো?

পূরবী সোজা হয়ে বলে—কণ্ঠের দুর্ব্বলতা দূর হয়ে গিয়ে এসেছে—সতেজ স্বাস্থ্য। বলে—ভীষণভাবে হিসেবের ভুল করছেন, কুয়াসা সূর্য্যকে ঢাকতে পারে না, সূর্য্যই দূর করে কুয়াসাকে—আর আলাদার কথা বলছেন? অস্বীকার করবো না সে কথা—আমাদের মত আলাদা, পথ আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য তো আলাদা নয়?…লক্ষ্যে পৌছতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বরকে যারা খুঁজতে বেরিয়েছে, তা'দের মধ্যেও তো মত আর পথ নিয়ে বিরোধের শেষ নেই? কতো তর্ক, কতো কলহ কিচিমিচি, কিন্তু খোঁজার পালা যাদের শেষ হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কি আর কোনো বিরোধ ঠাঁই পায়? লক্ষ্যে একদিন পৌছবই আমরা—এতে তো আর সন্দেহ নেই?…আপনারা বলছেন পৌছেছি। আমরা বলছি 'না অনেক বাকী'—এই তো? কিন্তু ঝগড়া করে লাভ কি? ভোর হয়েছে—সে কি আলো জেলে দেখতে হয়?

—হয়তো হয়না। কিন্তু চোখ বুজে থেকে প্রভাতকে অস্বীকার করতে চা'য় এমন লোকেরও তো অভাব নেই জগতে।

—সে জেদ কতোক্ষণ টেঁকে বলুন?—পূরবী স্থির স্বরে বলে—আমার কি মনে হয় জানেন—দেশের ওপর ভালো-

আসলটা যদি উভয়পক্ষেরই খাঁটি হয়—স্বাধীনতাই হয় যথার্থ কাম্য, মত-বিরোধের বিরাট হিমালয়ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একদিন। মিলতেই হবে উভয় পক্ষকে।...যেমন দেখুন—সংসারের ভেতর, একটা মানুষকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বেধে ওঠে মা আর স্ত্রীর মধ্যে, অশান্তির ঝড় ওঠে সংসারে, তবু একজায়গায় মিলতেই হয় তাদের—সে প্রিয়জনের কল্যাণের ক্ষেত্রে—প্রিয়জনের জন্য আশঙ্কার ক্ষেত্রে।...নাঃ আর বেশী বলবো না, বক্তৃতার মতো শোনাচ্ছে মনে হচ্ছে।—হেসে ওঠে পূরবী।

'গভীর স্বরে গভীর কথা' বলা ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বাসুদেব বলে—তোমার থিয়োরি হয়তো ভুল নয়, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো? বড়ো বড়ো সমস্যার মীমাংসা বরং সহজে হয়, অতি বড়ো বিরোধেও সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ সমস্যা, ছোট ছোট বিরোধ, জীবনকে কালো করে তোলে। ...ধরো যেমন—আমি সুতো কাটি—তোমার চক্ষুঃশূল—তোমার গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি নেই—আমার বিরক্তিকর—

পূরবী হেসে ফেলে বলে—আচ্ছা হয়েছে, অতো দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সুধু 'গো' কেন কীট-পতঙ্গ পিঁপড়ে-আরশোলা সকলকে একযোগে ভক্তি করতে সুরু করবো। তা' হলেই হ'ল তো?

—আর ধরো আমি যদি দৈবক্রমে হঠাৎ খুব গরীব হয়ে যাই?...এই গাড়ী বাড়ী টাকা পয়সা কিছুই থাকে না, নেহাৎ মোটা ভাত কাপড় মাত্র সার হয়, পারবে?

বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দেয় পূরবী—দেখবো চেষ্টা করে।

—ঠাট্টা নয় রুবি, হয়তো দারিদ্র্যের সেই প্রখর মূর্ত্তির সামনেই মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে আমাদের, অথচ সমস্ত আইডিয়া ভুলে কেবলমাত্র যে উপার্জ্জনের চেষ্টায় ছুটোছুটি করবো, তা'ও তো সম্ভব মনে করি না।

পূরবী হেসে মাথা নেড়ে বলে—

"ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে ভিক্ষা যেন না যাচি—
কিছু নাহি ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছো আমি আছি।"

রবীন্দ্রনাথ তো পড়লেন না? সুধু 'হরিজন' পড়ে আর কতো বুদ্ধি হবে?

—রবীন্দ্রনাথ পড়িনি, তোমায় কে বললে? আমরা তো আর মেয়ে নই—হেসে ওঠে বাসুদেব—যে রাঁধলে আর চুল বাঁধা হবে না।

—দিদিকে কি বলছিলে?—এক মিনিট পরে প্রশ্ন করে পূরবী।

—দিদিকে? দিদিকে নিয়ে যাবো আমি, শ্রীমন্তদার কাছে পৌঁছে দিতে।

—বাঃ!—পূরবী কৃত্রিম অভিমানে মুখ ভারী করে বলে—আমার প্ল্যানটা আপনি নিয়ে নিচ্ছেন। আমি ভেবে রেখেছি—গোলমালের সুযোগে আপনার শ্রীমন্তদাকেই এনে হাজির করবো আমার দিদির দরবারে।...নিজের হাতে সাজিয়ে দেবো দিদিকে বিয়ের কনের মতো, সাজাবো আর একটা বাসর ঘর।...হাসছেন? সত্যি বলছি ওই রকমই ইচ্ছে হচ্ছিল। দিদিকে একলা ফেলে চলে যাবো মনে করে এতো অস্বস্তি হচ্ছে। কী নিঃসঙ্গ জীবন!

—আশ্চর্য্য!—একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস গাড়ীর ভিতরের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তোলে—বাসুদেব বলে—আশ্চর্য্য! কারণহীন অর্থহীন এই একাকীত্ব!

কিন্তু মানুষের অধিকাংশ দুঃখই কি অর্থহীন অকারণ নয়? এমন দিন কি আসবে কোনোদিন—ভিতরের শুভবুদ্ধির জোরে মানুষ জয় করতে শিখবে এই অকারণ ক্ষয় ক্ষতি বেদনা?

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসে—পথ ফুরোয় এক সময়।

ফেরার পথে—বাড়ীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ যেন কি ভুলে গেছে এই ভাবে পূরবীর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বাসুদেব ব্যস্তস্বরে বলে—হ্যাঁ শোনো শোনো—একটা বাসরঘর তো—তোমার দিদির আর শ্রীমন্তদার, আর একটা?

—আর একটা?...আর একটা আদা আর কাঁচকলার—ব'লে কৌশলে মুখ সরিয়ে নিয়ে দুষ্টু হেসে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে পূরবী।

নিজের অসাবধানতায় ঈষৎ লজ্জিত হয় বাসুদেব। ওকি বড়ো বেশী হালকা হয়ে যাচ্ছে? হতে বসেছে আদর্শভ্রষ্ট? জীবনের প্রারম্ভে জীবনযাপনের যে ছক্ কেটে রেখেছিল সে তো মুছে গেছে হঠাৎ বর্ষার প্রবলধারায়, কিন্তু নতুন করে কি আঁকা চলবে না সার্থক পথের রেখা? জীবন কি কোনো ক্ষেত্রেই অসার্থক হয়—যদি থাকে জীবন-দর্শনের জ্ঞান?

সুরমাদি পুরু লেন্সের ভেতর থেকে তীব্র দৃষ্টি হেনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—আর সেই বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে ক্লাবে এসেছো তুমি নিমন্ত্রণ করতে?...লজ্জা করলো না?

পূরবী, বাণী সেন আর বেলা শিকদারের দিকে একবার চোরা-চাউনি ফেলে অমায়িকভাবে সুরমাদিকে বলে—লজ্জা? কই না তো?

—'হয়নি,' সেটা বাহাদুরী নয়। হওয়া উচিত ছিল। এই কি তোমাদের প্রতিজ্ঞা আর একনিষ্ঠতা? শেষ পর্য্যন্ত সেই রাবিশ বিয়ে!

—কিন্তু সুরমাদি, বিয়েটা সত্যি রাবিশ কি না সেটা তো আমরা কেউই জানি না। হয়তো যতোটা রাবিশ ভাবি, ততোটা নয়।

—থাক্ যথেষ্ট ভেঁপোমী হয়েছে।—প্রাক্তন স্কুল-মিষ্ট্রেস্ সুরমাদি পূর্ব্ব অভ্যাসের সুরে ধমক দিয়ে ওঠেন।

—করলেন করলেন—বিকাশ খাটো গলায় অনুযোগের সুরে বলে ওঠে—শেষে কিনা একটা ভোঁতা কংগ্রেসীকে! যাই বলুন—এ কিন্তু আশা করিনি আপনার কাছে।—দেখিছি ভদ্রলোককে, এমন কিছু এ্যাট্রাকৃটিভ চেহারাও নয়—বড়লোকের 'বাবু বাবু' ছেলের মতো—

পূরবীও সুরমাদির কাণ বাঁচিয়ে বলে—রূপগুণের আকর্ষণের চাইতেও প্রবল আকর্ষণ হচ্ছে—মতভেদের, বুঝলে? জীবন ভোর ইচ্ছেমতো তর্ক করবার সুবিধে পাওয়া যায়, এ কি কম লাভ?…ধরো যদি তোমাকে বিয়ে করতাম আমি, অবস্থাটা কি মারাত্মক হ'তো ভাবো? আমি বলতাম—আকাশটা লাল, তুমি বলতে—"সত্যিই তো অবিকল গোলাপ ফুল"—ব্যস্‌ তারপর? বেঁচে থাকার আর কি মানে থাকতো?…

বাণী সেন বলে—যাই বলিস—যতই প্রেম করে বিয়ে করিস, শেষকালে সেই হাঁড়ি-কুড়ি ডাঁটাচচ্চড়ি। সেই জোলো-মেয়েলীপণা করে ঘর সংসার করা। তা—ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই, কাজ নেই, দুঃসাহসিকতা নেই—

—"উড়াবো উর্দ্ধে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে"—

দুর্দ্দম বেগে দুঃসহতম কাজে"—আগে থেকেই হাল ছাড়বো কেন ভাই বল? ভেবে দেখলাম—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—পূরবী হেসে ওঠে।

যাবার সময় দলীয় নীতিবিরুদ্ধ সত্ত্বেও পূরবী হেঁট হয়ে সীতেশের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—সীতেশ দা, আমি কিন্তু আবার আসবো?

সীতেশ ডান হাতখানি মাথার ওপর রেখে কী আশীর্ব্বাদ করে কে জানে? তারপর উদার প্রসন্ন গলায় বলে—আসবে বই কি, নিশ্চয়ই আসবে।

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবে—পারো তো ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করতে এসো।—সুরমাদির ব্যঙ্গতা-ব্যঞ্জক কণ্ঠের ভিতর থেকে আস্বাদ পাওয়া যায় নিমপাতা বাটার।

অবশেষে এলো সেই পঞ্জিকা নির্দ্দিষ্ট শুভদিন।

আর সেই দিনই নামলো বৃষ্টি। কূলকিনারাহীন নিশ্ছিদ্র মেঘের অবিরাম বৃষ্টি!…বৃষ্টি…বৃষ্টি…এর যেন শেষ হবে না কোনোদিন। সেই ধারা-বর্ষণের পানে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হয় সৃষ্টির প্রথম থেকে যেন চলছে এই বৃষ্টির খেলা! পৃথিবীতে কোনোদিন রৌদ্র ছিল—আকাশে ছিল সূর্য্য, একথা সহসা বিশ্বাস করা কঠিন।

বিজ্ঞজনেরা বললেন—"এতো বড় 'লগনসা'—বৃষ্টি না হয়ে যায়? দেখে আসছি তো চিরদিন!" অনভিজ্ঞরা বললে—"বাবা! বর কনে কী বাদুলে! অঘ্রাণ মাসে এতো বৃষ্টি!" দূরদর্শীরা বলতে লাগলো—হবে না? সব দিক দিয়ে তো মানুষকে মারা চাই ভগবানের! পাকা ধানের ওপর এই যে বৃষ্টিটা পড়লো, এক গোছা ধান ঘরে উঠবে চাষার?…

নিজের মন দিয়ে সবাই ভেবে নেয়।

মাধবী ভাবে—এও এক পরিহাস বিধাতা পুরুষের! এমনি এক বৃষ্টির দিনে পূরবী এসেছিল বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে।…আজ বাসুদেব নিয়ে যাবে পূরবীকে।

সুখী হোক সার্থক হোক পূরবী!…

তবু—মাঝে মাঝে পূরবীর চিন্তা ছাপিয়ে জাগছে আর একখানি মুখ। এদের মিলন-উৎসবের কোলাহলের সুযোগে হয়তো দেখা পাওয়া যাবে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি।

কখন কী সূত্রে দেখা হ'তে পারে ঠিক আন্দাজ নেই, তবু সারাদিন মনের মধ্যে বেজে আছে একটা আশার সুর। বৃষ্টির মাদকতায় যেন ওর বাস্তব দিকগুলো গেছে হারিয়ে।

বিয়ে বাড়ী, আর বৃষ্টি!

কল্পনা করতে কষ্ট নেই তার বাস্তব চেহারা। যদিও ব্রজমোহনের সংসারে চিরদিনই লোকাভাব, কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আত্মীয় স্বজন তাঁর অগুণতি। কতো লোক—কতো গোলমাল। কতো কাজ, কতো দুশ্চিন্তা।

এক সময় বিবাহসজ্জা-পরা পূরবী কোন ফাঁকে এসে মাধবীকে জড়িয়ে ধরে, কাঁধের ওপর মাথা রেখে বলে—দিদিভাই, জন্মের মতো পর হয়ে যাচ্ছি—একটা কথা রাখবে?

—বালাই ষাট। পর হতে যাবি কি দুঃখে রে?…কি কথা?

—শ্রীমন্তবাবু আসবেন আজ জানো তো?…ও কি চমকাচ্ছো কেন?…তিনিই বরকর্ত্তা তা জানো না বুঝি?…আর ফিরিও না তাঁকে। ঢের তো ভুল আর বোকামী করলে, এইবার তাকাও নিজের দিকে।…আর এ বাড়ীটা তো বাস করার যোগ্য থাকছে না দিদি।…কথা দাও আমায়।

মাধবী খাটের ওপর বসে পড়ে অস্ফুটস্বরে কি বলে বোঝা যায় না।

এই সময় বিয়ে বাড়ীর তরুণীর পাল এসে হৈ হৈ করে—'বর এসেছে বর এসেছে, কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়ে এসেছে কেন? চলো চলো।' বারে বারে বাজছে মঙ্গল-শঙ্খ—বৃষ্টির শব্দে গম্ভীর শোনাচ্ছে আওয়াজটা। অনেক কোলাহল, অনেক কণ্ঠ—'বড় জামাই'—'বড় জামাই এসেছে যে—'

এ ঘরে লোকের ভিড় নেই। গৃহসজ্জা সেকেলে, ঘরটা পুরনো, তাই পছন্দ করেনি কেউ। উৎসবের আলো জলেনি এ ঘরে—সুধু একটু স্নিগ্ধ মদির গন্ধ বাতাসে কাঁপছে।

নিবেদিতার ফটোয় কে এক গাছা গোড়ে মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে, তারই গন্ধ।

কিন্তু মাধবীর কি বসে থাকলে চলবে আপন হৃদয়ের ভারে ব্যাকুল হয়ে? কতো কর্ত্তব্য! কতো দায়িত্ব! জনতার মাঝখানে হারিয়ে গেল মাধবী। কর্ত্তব্যের মাঝখানে হারালো হৃদয়তার।

তবু তারও শেষ আছে।

সব কাজ শেষ করে মার ঘরে এসে বসলো—মনে হ'ল যেন মার কাছে এসে বসেছে। ফুলের গন্ধ মার আশীর্ব্বাদের মতো ঝরে পড়ছে মাথায়। বাসরঘরে বসে পুরবী চুপি চুপি বলেছে—শ্রীমন্তদাকে তোমার ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি দিদিভাই, ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলো এই তক্কে। লক্ষ্মীটি দিদি!

স্পন্দিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছে মাধবী সেই শুভলগ্নের।

কিন্তু পাশের দালানে যে মিসেস হালদার বসেছেন তাঁর নবাগত মাতৃদেবীকে নিয়ে খোস গল্প করতে, সে কথা কে জানতো?—বিদ্রূপতিক্ত সেই কণ্ঠস্বর তো ভুল হবার নয়।··· নানা ছলে নানা সুবিধেয় এই কণ্ঠ যে পরিবেশন করছেন মিসেস হালদার মাধবীর কানে।···

—হ্যাঁ ওই তো বড়োজামাই। 'শ্রীকান্ত' না কি যেন নামটা।···কর্ত্তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মুখটা দেখলে একবার? শুকিয়ে চুণ হয়ে গেছে। আচ্ছা করে 'কড়কে' দিতে বলেছিলাম কি না। এখন ঘাড় হেঁট করে—'নিয়ে যাবো' বলতে পথ পেলেন না বাছাধন।···ইচ্ছে কি ছিল? নেহাৎ অপমানের জ্বালায় দায়ে পড়ে রাজী হল। আর সত্যি, রাজীই বা হবে কেন সহজে? পুরুষের মন, সন্দেহ হতে কতক্ষণ লাগে? ওই সোমত্ত বয়েস, আর চেহারা খানিও তো দেখলে? এতো বছর বর ছেড়ে থাকা—মাথার ওপর কেউ নেই।

মাধবী কি জেগে আছে? মাধবী কি বেঁচে আছে?··· কতো মিনিট মাধবী বসে আছে এইখানে? শ্রীমন্তর প্রতিক্ষায়? শ্রীমন্তকে ও মুখ দেখাবে না কি?···

মাথার ওপর করস্পর্শ?···এ স্পর্শ কি ঘৃণার?···এ স্পর্শ কি করুণার?···

উপুড় হয়ে থাকলে কি বোঝা যায় কে বসেছে মাথার কাছে?···

—মাধবী! মুখ কি তুমি তুলবে না?···মাধবী, তোমার সব কর্ত্তব্য তো সারা হ'ল, এবার চলো?

উঠে বসতে কি ভুলে গেল মাধবী? অহল্যার মতো পাষাণী হয়ে গেছে?

—মাধবী! মুখ তোলো, শোনো।

মাধবী অন্ধ বধির পাষাণ।

—মাধবী, আমি তোমার নিতে এসেছিলাম।

–না, না, মাধবী এই মিথ্যা কথার বিশ্বাস করবে না।···

কিন্তু সে-কথাও যদি মুখ ফুটে বলতে পারতো! বলতে পারতো···না, না, কিছু বলতে পারবে না সে।

—মাধবী, ওরা অতো সহজে মিলতে পারলো—অমন প্রবল বিরোধ জয় করে, আমরাই কি সুধু চিরদিন এই অর্থহীন বাধাকে বাঁচিয়ে রাখবো?

কিন্তু মাধবী উত্তর দেবে কি? আরো প্রবল বাধা যে ওর কণ্ঠস্বর রোধ করে রেখেছে। পিতৃগৃহের শ্রদ্ধা সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলেই কি ও আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেবে? মাধবীকে সাধনায় জয় করে নেবে না শ্রীমন্ত? পাবে কুড়িয়ে?

ছি ছি।

মৃত্যুটাতো এখনো মানুষের হাতধরা আছে, তবে কেন মানুষের পায়ে ধরতে যাবে?···

প্রেম দুর্নিবার কিন্তু অভিমান?

অভিমানের চাইতে দুস্তর আর কোন্ সমুদ্র?

লজ্জার চাইতে দুর্লঙ্ঘ্য কোন্ পাহাড়?

অথচ এমনই হয়তো হয়।

এমনই ব্যর্থ হয় তৃতীয় পক্ষের চেষ্টা। কাল্পনিক বাধা দূর হয়ে যখন নিজস্ব চেতনায় রচিত হয় মিলনের সেতু, তখনই সার্থক হয় সেই রচনা। সম্পূর্ণ হয় সেই মিলন।

অন্যের চেষ্টায় যা গড়ে উঠতে চায়, তা নিতান্ত কৃত্রিম বলেই ধূলিসাৎ হতে দেরী হয় না।

মাথার ওপর আর অনুভব হচ্ছেনা কোনো স্পর্শ।

ঘৃণার নয়, করুণার নয়, আশ্বাসের নয়।—শ্রীমন্ত চলে গেছে।

কিন্তু শ্রীমন্ত কি এসেছিল? স্বপ্ন নয় তো?

স্বপ্ন?···জোলো হাওয়ায় মাধবীর শীত করছে ভেবে যে নিজের গায়ের আলোয়ান খুলে সযত্নে ঢাকা দিয়ে গিয়েছে মাধবীকে, সে কি স্বপ্নের শ্রীমন্ত?

কিন্তু আলোয়ানখানা তো স্বপ্ন নয়, তার কোমল আর উষ্ণস্পর্শ যে শ্রীমন্তর আলিঙ্গনের মতো ঘিরে রয়েছে মাধবীকে।

তারপর

—:*:—

—তাল্‌পল ভি হলো ?

—তার পর ? তার পর সেই পরী কাঁদতে কাঁদতে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলো।

—তাল্‌পল ?

—তার পর যেই সোনালি মুখোস-পরা দৈত্যেরা এসে দখল করলো সিংহাসন, হুলস্থুল পড়ে গেলো দেশে।

গল্প না বললে খোকাকে ঘুম পাড়ানো দায়। দস্যি ছেলে কিন্তু গল্প শুনলেই একেবারে চুপ। আবার মজা এই, পরীর গল্প না শুনলে ঘুম আসবে না মহাপ্রভুর। বাঘ সিংহী শেয়াল খরগোস সবাইয়ের কাহিনী শোনার শেষে ঘুমে-জড়ানো চোখ টেনে-টেনে বলবে—এইবালে পলীল্‌ দপ্‌পো বলো ?

গোঁজামিল দিয়ে পরীর গল্পের অপঘাত মৃত্যু ঘটাইবার উপায়ও নেই, ঠিক ঠিক বলতে হবে। যতোক্ষণ না ঘুম-সাগরের অতল তলায় তলিয়ে যাবে চেতনার ঢেউ, ততক্ষণ প্রশ্ন ক'রে চলবে—তাল্‌পল ?

দিনের পর দিন তাই আর পরীর গল্পের জের মেটে না।

কাজে কাজেই কালকে ব'লে রাখা কাহিনীর সূত্র খুঁজে নিয়ে আরম্ভ করতে হয়—তার পর—দেশে তো পড়ে গেলো হুলস্থুল। অথচ দৈত্যেরা মুখোস খোলে না। সোনালি মুখোস, তাতে আয়নার মতো পালিশ, বোঝবার উপায় নেই দেবতা না দৈত্যি।···হুলস্থুল তো বাধিয়েছে চার দিকে, এদিকে আবার দেশের যতো প্রজাদের ডেকে ডেকে মিষ্টি মিষ্টি করে বলে—দেখো, তোমরা বড়ো দুঃখী আর বড়ো বোকা। তোমাদের দেখে আমাদের বুক ফেটে যায়।

প্রজারা এ ওর মুখ চায়—তাই তো। তারা যে দুঃখী তা বরং মালুম হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু বোকা ? তা তো কই জানা ছিল না।

—"জানা ছিল না মানে ?"···চোখ পাকিয়ে এক জন আর এক জনকে বললে—বোকা নইলে কখনো এমন হয় ? আমরা বুঝতে পারি ওদের কথাবার্তা চাল-চলন ? ওদের বুদ্ধি দেখলে তাক লেগে যায় না আমাদের ?

—যায়ই তো, যায়ই তো—ছোটোরা বললে ঘাড় নেড়ে।

—তবে ?

—তবে আবার কি, ওদেরই শরণ নেওয়া হোক। গোঁয়ার দু'-এক জন ঘাড় বেঁকিয়ে বললে—কি ? ওদের শরণ নিতে হবে ? ওরা আমাদের পরীকে তাড়ালে। ওরা হুলস্থুল বাধালে আমাদের দেশে।

বুড়ো এক জন কপালে ঘা দিয়ে বললে—ছি, ও-কথা মুখে এনো না, ও-সব করেছে আমাদের ভাগ্যে। ওদের তাড়নায় পরী চলে গেলো সেটা নিমিত্ত, কিন্তু তার পর ওরাই তো রক্ষা করছে আমাদের ?

গোঁয়াররা মাথা চুলকে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাইতে থাকলো—তাই তো। ওরা নইলে আমাদের রক্ষা করতো কে ? কিন্তু·········

* * * * *

—তাল্‌পল ?

চমকে উঠি, এই রে, গল্প বলতে বলতে নিজেরই ঘুম এসেছিল যে।

অবহিত হয়ে বলি—তার পর—দৈত্যেরা ধরে ফেললো ওদের অসন্তোষ, আবার ডাকালো সবাইকে—বললে, দেখো, পরীর জন্যে কাঁদছো কেন ? পরী তোমাদের দিয়েছিল কি ? সেই সত্যযুগের আমল থেকে তোমাদের যা ব্যবস্থা চলে আসছে, এখনো তাই চালাচ্ছো, ছিঃ।···তোমাদের চাল-চলন দেখলে হাসি পায়, পরণ-পরিচ্ছদ দেখলে লজ্জা করে, আর খাওয়া-দাওয়া দেখলে করুণা হয়।···ছি ছি!

প্রজারা ঘাড় হেঁট করে নিজেদের পরণ-পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে মনে মনে প্রতিধ্বনি করলে—ছি ছি!

—তা যাক্‌, কিছু ভেবো না—সাদা দাড়িওয়ালা সাদা পোষাক-পরা বুড়ো দৈত্যেরা বলে বেড়াতে লাগলো—কিছু ভেবো না—আমরা তোমাদের ভালো করবো।

প্রজারা হাতজোড় করে একবাক্যে বলে উঠলো,—তাই করো প্রভু, তাই করো, আমরা বড়ো দুঃখী, বড়ো অনাথ। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা কিছু নেই, আমরা গাছ-পাথর, মাটি-কাঠ, সবাইকে ভয় করি, সকলকে পুজো করে মরি, এ

লজ্জার কি শেষ আছে? তোমরা আমাদের এই মূর্খতার হাত থেকে উদ্ধার করো।

দৈত্যেরা খুসি হয়ে বললে—নিশ্চয়! নিশ্চয়! তোমাদের ভালো করবার জন্যেই তো আমাদের আসা। নইলে সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী ডিঙিয়ে এই জংলী অসভ্য দেশে এসে পড়ে থাকবার উদ্দেশ্য কি?

তাই তো!

আবার সবাই এ ওর মুখ চায়, তাই তো—এটা তো খেয়াল হয়নি এত দিন, সাত-সুমুদ্দুর তেরো-নদী পার হয়ে ওদের এখানে এসে পড়ে থাকবার কারণ কি?…ওই—আমাদের ভালো করা। আহা…ওদের—কি অগাধ দয়া! কি অপরিসীম করুণা!

তখন একবাক্যে সকলে কাতর কোলাহল করে উঠলো—রক্ষা করো—আমাদের রক্ষা করো! আমাদের যে কিচ্ছু নেই, আমরা বেঁচে মরে আছি মাত্তর, এই সোজা জ্ঞানটুকুও নেই আমাদের। আমাদের জ্ঞান দাও।…

* * * * *

—তাল্‌পল?

খোকার প্রশ্নের ধারা অব্যাহত।

—ও, তার পর? তার পর থেকে সুরু হয়ে গেলো ভালো করবার ধুম। সে কি কাণ্ড-কারখানা! কোমর বেঁধে লেগে গেলো যতো দৈত্যের দল।…দৈত্যে কুলোয় না—নিজেদের দেশ থেকে নৌকো বোঝাই করে করে আরো দৈত্য আনায়, আনায় যতো সব পাকা-মাথা ঝানু দৈত্যদের।……

* * * * *

ইট-পাথর লোহা-লক্কড়ে ভরে গেল দেশ।

রাত-দিন 'ঠক্‌ঠক্' 'কড়কড়' 'দুমদাম' 'হাঁই-হাঁই' শব্দে দেশ তোলপাড়। কান ভোঁ ভোঁ করে লোকের, প্রাণ আনচান করতে থাকে, তবু বিভোর হয়ে দেখে হাঁ করে।…দণ্ডে দণ্ডে তাক লেগে যায় কারিগরদের বাহাদুরী দেখে।…সত্য যুগের আমল থেকে যা কিছু চলে আসছিল তার আর চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায় না…বাঘ-সিংহী সাপ-খোপ ভূত-প্রেত যে যার আস্তানা ছেড়ে দিয়ে পালাতে পথ পায় না। জলা-জঙ্গল গাছ-পালা নদী-নালা সর্ব্বত্র উড়তে থাকে মানুষের বিজয় নিশান।

দৈত্যেরা বুক ফুলিয়ে বেড়ায় আর বলে—দেখছো তো, তোমরা কি ছিলে আর কি হলে?

কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ে দেশের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ।…

তাই তো—আমরা কি ছিলাম আর কি হয়েছি!

দৈত্যেরা মুচকে হেসে বলে—পরীর আমলে তোমাদের ছিল কি? এরা ঘাড় চুলকে লজ্জায় লাল হয়ে বলে—কিছু না, কিছু না। সে সব কথা মনে পড়লে মাথা কাটা যায় আমাদের।…

মাথা কাটা যাবার ভয়ে সে সব কথা আর মনেই আনতে চায় না কেউ, ওদের জয়গান করে আর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে থাকে।

* * * * *

যাক, এতোক্ষণে তবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

"সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না" করার পর আর "তার পরের" বালাই নেই, এইবার "আমার কথাটি ফুরুলো"—বললেই হয়।…

হরেকৃষ্ণ!

আবার দুই চোখ বড়ো করে বলে কি না—তাল্‌পল?

আমি তাড়াতাড়ি বলি—আবার তার পর কি রে? এইবার তো আমার কথাটি ফুরুলো—

খোকা গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে দরাজ হুকুম চালায়—'না না, আমাল কতাতি ফুলুবে না—তাল্‌পল তি হলো বলো।'

সর্ব্বনাশ করেছে!

আবার 'তার পর' থেকে সুরু করতে হলে তো সে এক মহাভারত। কিন্তু খোকা নাছোড়। আবদার নেই, বায়না নেই, গম্ভীর ভাবে শুধু বলে যাবে—তাল্‌পল?

নিরুপায়।

মাথা ঘামিয়ে আবার সুরু করতে হয়—তার পর? তার পর তো সেই তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাচ্ছে—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। এমন সুখে কাটাচ্ছে যে, বোঝবার জো নেই জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে।

সারা জগৎ ওদের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায় আর 'চুকচুক' করে বলে—আহা, কি শান্তির দেশ! দেখো তো, আমাদের মতো চব্বিশ ঘণ্টা এমন ছুরি শাণাতে হয় না ওদের, আবিষ্কার করতে হয় না বারুদ তৈরির নতুন নতুন মাল-মশলা।

দৈত্যেরা শোনে আর বুক ফুলিয়ে হাসে—হবে না? ওদের রক্ষা করবার ভার নিয়েছে কে? ছোরা-ছুরি? গোলা-গুলী? ছি ছি, অমন কথা ভাবতেই পাবে না ওরা, যোগে নিমগ্ন দেশ।…বড়ো জোর ঘুসি পাকাতে পারে, তাও শুধু পাকায়—মারে না। আর যদিও বা মারে তো সে নেহাৎ আপনার লোকের গায়ে। পরের গায়ে হাত তোলা? ছি ছি! ও রকম স্বপ্নও দেখে না ওরা।

* * * * *

বেশ চলছে—ও হরি! হঠাৎ এক দিন দেখা গেল এদের ভেতর থেকে কোন্ ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে আবার এক দল গোঁয়ার।···

সেই পুরনো গোঁয়ারদের বংশধর···হবেও বা।

তারা অদ্ভুত এক নতুন কথা বলে। বলে—উঁহু, এ ঠিক হচ্ছে না, এতো শান্তি ভাল নয়।

দেশশুদ্ধ লোক এ ওর মুখের দিকে চায়···ও বাবা! এরা বলে কি! শান্তি ভালো নয়, সাত জন্মে তো শুনিনি এমন কথা।···

তা' সাত জন্মে শোনেনি বলেই বোধ করি শোনবার নেশা লাগে। দলে দলে লোক এসে জমা হয় ওদের কথা শুনতে।

তারা বলে—দেখো, তোমরা যে মনে করছো খুব সুখে আছো, সেটা ভুল, এর জন্যে তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। ওরা শয়তান, ওরা তোমাদের ঠকিয়ে খাচ্ছে। লজ্জা হয় না?

এরা এ্যা—তো বড়ো হাঁ করে বলে—অ্যাঁ। লজ্জা!

তারা বললে—হ্যাঁ, লজ্জাই তো। লজ্জা, ঘেন্না, অপমান, কী নয়? জগতের লোক চুণকালি দিচ্ছে গালে।···বুঝতে পারছো না কি দুঃখে দিন কাটাচ্ছো তোমরা? তোমাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রোগে ওষুধ নেই, এ কি রকম শান্তি?

ক'জন বুড়ো রেগে মেগে তেড়ে উঠলো—তোমরা কে হে বাপু ফোঁপরদালাল? তোমাদের পরামর্শ কে চেয়েছে? ভাত নেই কাপড় নেই—সে আমাদের অদৃষ্টের ফের, ওদের কি দোষ?

গোঁয়ার-গোবিন্দরা বললে—ওদের দোষ নয়? ওরাই তো কেড়ে খাচ্ছে। দেখছো না, ওদের চেহারার কি জৌলুষ? আর তোমাদের? আয়নাতে দেখ না চেয়ে।

বুড়োরা বললে—ওদের চেহারার জৌলুষ হবে তার আর আশ্চয্যি কি? ওরা যে দেবতা।

গোঁয়ারেরা ধিক্-ধিক্ করে উঠলো—আ ছি ছি। ওরা আবার দেবতা? ওদের মুখোস খুলে দেখেছো কোনো দিন?

—মুখোস?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। দোত্যি ওরা, একদম দোত্যি। দেখো যে দিন মুখোস ছিঁড়ে দেব ওদের?

—ছিঁড়ে দেবে? তোমরা? সর্ব্বনাশ।

গোঁয়াররা গম্ভীর ভাবে বলে—সর্ব্বনাশের আর বাকী আছে? তোমরা বোকা অন্ধ তাই টের পাওনি। এই যে তোমাদের কঙ্কালের মতো চেহারা, গায়ে নেই এক ফোঁটা রক্ত, এ সব গেল কোথায়?

গেল কোথায়। তাই তো!

—'তাই তো' বলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, লড়তে হবে।

—এইবার বুড়োরা হেসে উঠলো হো-হো করে—লড়তে হবে? ওদের সঙ্গে? এই পাগলগুলোর কথা কে শুনবে?

হঠাৎ দলের যতো ছেলে-ছোকরার দল হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলো—আমরা। আমরা শুনবো পাগলামী, আমরা লড়বো।

বুড়োরা অনেক সাধ্য-সাধনা করলে, বললে—গোঁয়ার-গোবিন্দদের কথা শুনো না, সর্ব্বনাশ যদি কেউ করে তো ওরাই করবে।

ছেলে-ছোকরারা কর্ণপাত করলো না সে কথায়।

আর কেনই বা করবে? বুড়োদের কথায় কর্ণপাত ছেলে-ছোকরারা কবে করেছে?···ঘর ছেড়ে তারা বেরিয়ে পড়লো গোঁয়ারদের পিছু-পিছু।

গোঁয়ারদেরই তারা দলের কর্ত্তা করবে মনস্থ করে।

পথে ঘোরে—আর নতুন দলপতিরা আঙুল বাড়িয়ে দেখায় আর বোঝায় এদের—দেখছো তোমাদের দুর্দ্দশা? বুঝছো এর মূল কারণ?

ছোকরারা কাতর ভাবে বলে—কই না তো? আর দুর্দ্দশা? তাই বা তেমন কই?

আবার ধিক্কার দিয়ে হেসে ওঠবার পালা নতুন দলপতিদের।

—দুর্দ্দশা অনুভব করবার মতো বোধটুকুও হারিয়েছো যে, বুঝবে কি করে? আচ্ছা, একটা কথাই ধরো, ওই যে মাঠ-ভর্ত্তি অগাধ ধান, ওসব কার?

—কার? কার আবার কি? ওপরওলাদের।

—কেন?

—কেন? তোমাদের কথাগুলো এবারে একটু বেশী নতুন ঠেকছে। ওদের জিনিষ ওদের হবে তার আবার 'কেন' কি?

ওই তো—ওইখানেই তো যতো গোলমাল। বলি—দেশ কার?

—দেশ?···

ছোকরারা ফিস্‌ফিস্ করে বললে—চুপ চুপ, ওরা শুনতে পেলে রক্ষে রাখবে না, চাবকে লাল করবে। কানে কানে বলি—মনে হয়—দেশ আমাদেরই।

—সাবাস! এই তো ঠিক কথা। আচ্ছা জমি?

—মনে তো হয় আমাদেরই কিন্তু ওরা শুনলে—

—আহা, ওদের ভয়টা ছাড়ো না ছাই, বলি জমির জন্যে খাটলো কে?

—আমরা! আমরা!

—ব্যস্। দেখো তাহলে—দেশ তোমাদের, জমি তোমাদের, খাটুনি তোমাদের, অথচ ধান ওদের! এ সব

পাগলের কথা নয়?…ওরা খেয়ে মেখে ফেলে ছড়িয়ে দয়া করে যেটুকু দেবে তাই খেয়ে থাকতে হবে? কেন? দু'মুঠো বেশী চাইলে চাবুক খেতে হবে কেন?…ওদের দূর করে দিলেই তো আপদ চুকে যায়? কতো কাল আর বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে ওরা?

সর্বনাশ!

ওদের তাড়ানো কি সহজ কথা হলো? এ কথা মুখে আনলে ফাঁসিই দিয়ে দেবে হয় তো।

—বুঝলাম, না হয় শক্ত কথাই, ফাঁসিই দিলো না হয়। কিন্তু এ রকম মরে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো।

চমকে উঠে সকলে ভাবলে—তাই তো! সত্যিই তো মরাই ভালো।

—তাহলে?

—তাহলে—ওদের তাড়াও।

কিন্তু কি করে?

—ফন্দি বাৎলে দেবো আমরা।…এতো দিন ধরে ওই ফন্দি-ফিকিরই তো শিখছিলাম আমরা ঘরে বসে বসে।

—তাহলে লেগে যাই?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, লাগো না, আমরা তো আছিই সামনে।

গোঁয়াররা দলপতি হয়ে চললো দৈত্যরাজের বাড়ী।…

দৈত্যরাজ সোনার সিংহাসনে বসে মনের আনন্দে গান শুনছিলেন—হঠাৎ কানে এলো—বাইরে যেন বড়ো গোলমাল। তেড়ে বললেন—কোন্ হায়?

দ্বারী বলে দিলে—মহারাজ, ওরা দেশের প্রজা।

কি বলছে হঠাৎ?

—বলছে? বলছে—বলছে—আপনারা এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। এটা না কি ওদের দেশ।

—বলছে না কি? হা হা হা!…

ভুঁড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দৈত্যরাজের হাসি আর থামে না।…

কিন্তু ক'দিন হাসবে?

এরা যে রীতিমত 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে। তাড়াবেই, না তাড়িয়ে ছাড়বে না।…চব্বিশ ঘণ্টা দৈত্যরাজের দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে লাঠিও নেই সোঁটাও নেই, শুধু দুই হাত জোড় করে সকলে এক বাক্যে চেঁচাচ্ছে—'তোমরা যাও'। 'তোমরা যাও'।

ঝঞ্ঝাট দেখো দিকি?

দোর জোড়া করে বসে আছে সকলে, পথে বেরোবার জো নেই। কি করবে? মারবে চাবুক? পায়ে মাড়িয়ে যাবে না? ধরে ধরে ফাঁসি কাঠে লটকাবে না?…এই এতো বছর ধরে এতো ভালো করলো এদের, তার এই প্রতিদান?…এই যে গোঁয়াররা, এতো কথা ওরা শিখলো কোথা থেকে? ওরা যে অজ্ঞান সেটা বোঝবার মতো জ্ঞানটা মগজে ঢুকিয়ে দিলো কে? আমরাই তো, না কি?…এই যে সাপ-খোপ বাঘ-ভালুকের দেশটাকে ইন্দ্রভুবন করে তুললাম এতো কাল ধরে, এই কি তার কৃতজ্ঞতা?

দলপতিদের কাছে শিখে শিখে প্রজারা চীৎকার করে বলতে লাগলো—তেমনি যে তোমরা এতোদিন ধরে নিঃশব্দে আমাদের রক্ত চুষে চুষে খেলে? দেখো তো আমাদের চেহারা? শুধু কঙ্কালসার। আর তোমাদের কি চেক্‌নাই!

দৈত্যরাজ এদের স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে বললে—তোরা আর আমরা? তুলনা করছিস?

—বাঃ, করবো না কেন, তোমরা মানুষ, আমরাও মানুষ?

—মানুষ?

দৈত্যরাজ আর একবার হো-হো করে হেসে উঠে মড়মড় করে ওদের মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলো …কতো সখ! ওঁরাও আবার মানুষ! লাগাও কাঁটার চাবুক।

সেপাই শান্ত্রী পাইক পেয়াদা লেগে গেলো হাতের সুখ করতে।

আর সেই বুড়োরা?

তারাও এসে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছে দৈত্যের দলে। …বলে—দেখছো, আমরা তোমাদের কতো অনুগত? আমাদের যেন চরণ-ছাড়া কোরো না!

দৈত্যরাজ ওদের পিঠ-চাপড়ে আশ্বাস দিলে—বেশ! বেশ! তোমাদের জন্যে বরাদ্দ থাকলো এক জোড়া করে বাতিল জুতো।…তাহলে আর আর কিছু নয়, যেড়ে ইঁদুর চরণ-ছাড়া হবার ভয়ই থাকবে না।…কিন্তু তার বদলে একটি কাজ চাই যে?

—আজ্ঞে হুজুর?

—ওই গোঁয়ার-গোবিন্দগুলো কি সব শলা-পরামর্শ করেছে—ওইগুলো জেনে এসে ফাঁস করে দিতে হবে।

—এই কথা?…বুড়োরা ঘাড় কাৎ করে হাসে—তা আবা'র বলতে? আমরা তো ওদের আনাচে-কানাচেই আছি।…

* * * * *

—তারপর?

—এই মুস্কিল, আবার 'তার পর'? আর কিছু নেই, ঘুমো?

—না। তারপর কি হলো বলো।

বুঝুক না বুঝুক 'তার পর কি হলো'—শুনতেই হবে খোকাবাবুর।—

—তার পর আবার কি, ওরা বেদম মারে, আর এরা পড়ে পড়ে মার খায় আর জোড়হস্তে বলে—ঢের তো হলো প্রভু, এইবার আপনারা যান?…মার খেয়ে খেয়ে অর্দ্ধেক

শোক মরেই গেলো তবু গোঁ ছাড়লো না।···গোঁয়ারের শিষ্য হয়েছে কি না।

* * * * * *

অবশেষে—

মার খেতে-খেতে কাতর হয়ে এক দিন প্রজারা দলপতিদের কাছে এসে পড়লো—আর তো পারা যায় না মশাই, ওরা রেগে গিয়ে আমাদের ভাত-কাপড়, ঘর-বাড়ি সব কেড়ে নিচ্ছে, এই দেখো—কী হাল, এই দেখো সর্বাঙ্গে রক্ত, এখন কী হয়?

দলপতিরা পিঠ চাপড়ে বলে উঠলো—আরে ভাই আর কিছু দিন, পরী এলেই ঠিক হয়ে যাবে।

পরী!

—হ্যাঁ গো, পরী। পরীর অভাবেই তো তোমাদের এতো দুর্দশা।···পরী এলে কি আর কোনো কষ্ট থাকবে?··· কিছু না।

—পরী আসবে?

—নিশ্চয়। ওরা যেতে যা দেরী। ওরা বিদেয় হলেই পরী আসবে।

—পরী আসবে? এঁ্যা, পরী আসবে? সত্যি?

—সত্যি সত্যি সত্যি! শুধু তোমরা একটু কষ্ট স্বীকার করলেই হয়।

কষ্ট!

আরো?

এ ওর মুখ পানে চায়।···দলপতিরা বিরক্ত হয়ে বলে—বাঃ, বেশ তো, কষ্ট সইবে না? পরী কি অমনি আসবে?··· তা'কে খুঁজে-পেতে ধরে আনতে এখনো কতো কষ্ট। তেমনি এসে গেলে—

—এসে গেলে?···সকলে একবাক্যে চেঁচিয়ে ওঠে—এসে গেলে? আর কিছু দুঃখু থাকবে না?

—নিশ্চয়ই না। পরী এলে আবার দুঃখু?

—দু'বেলা খেতে পাবো?

—দু'বেলা? বল যে, চার বেলা। পরী এলে চার বেলা খেতে পাবে।

—পরতে পাবো?

—সে কথা বলতে?

—রোগের ওষুধ?

—তা'ও পাবে।···ভাবো না সে দিনের কথা? যখন পরী ছিল?···"ঘরে ঘটি-বাটি ঝকমক করে, আলনায় কাপড় ঝলমল করে, গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, পেটে ভাত, মুখে পান—" সেই সোনার দিনকে আবার ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে হয় না? কিছুই না, কিছুই না, শুধু একটু কষ্ট করা।

—বেশ, তবে তাই হোক। কষ্ট করবো—যতো বলবে। কিন্তু পরী আসবে তো?

—নিশ্চয়। চলো, খুঁজতে বেরোই সকলে মিলে।

ব্যস, তোড়জোড় লেগে গেল পরীকে খুঁজে আনার।

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে পরী কে জানে?

—তালপত্র?

—ওরে বাবা, আবার তার পর?···ওরা তো এখন পরী খুঁজছে।

—না—আ আ···তালপত্র!

—তাই তো—তার পর—সে কতো মাঠ-বন পাহাড়-পর্বত নদী-নালা সাগর-সমুদ্দুর পার হয়ে গেল তারা, কিন্তু কোথায় পরী? চলছে তো চলছে—চলার আর শেষ নেই—পড়লো এসে অজগর বিজন অরণ্যের সামনে···এ ওর মুখ তাকায়···এখানেও ঢুকতে হবে না কি? সাপে খাবে না?

দলপতিরা উৎসাহ দিয়ে বলে, খাক না। কতো খাবে? যারা বাকী থাকবে তারাই আনবে খুঁজে।···নইলে পরী আসবে কেন?···ঢুকে পড়ে তারা। কিন্তু সেখানে নেই পরী।

সাপ খোপ বাঘ-ভালুকের পেটে যারা গেল তারা বাদে বাকীরা আবার এগোয়···

—কর্তা, এ যে ভয়ঙ্কর কাঁটা বন। মানুষের ঢোকা অসাধ্য।

—অসাধ্য! আ, ছি ছি ছি।···মুখে এনো না ও-কথা, তাহলে কখনো পরী আসে? সে যে বড়ো দুর্লভ।

—কিন্তু পরী কি সত্যিই আসবে?

—নিশ্চয়ই। দেখো না, তখন তোমাদের সকল কষ্ট সার্থক হবে, সব দুঃখের লাঘব হবে।

—তবে চলো।···কিন্তু সেখানেই বা পরী কই? আবার চলতে সুরু করে।···দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর···পথ আর ফুরোয় না।

—এ কি, এ যে অগাধ সমুদ্র! পার হবো কি করে?

কেন হেঁটে।···দলপতিরা অম্লান বদনে বলে।

হেঁটে সমুদ্র পার! বাঃ, ডুবে যাবো যে?

—যাও না। ক'জন যাবে? কেউ তো থাকবে? তারাই দেখবে পরী।

তবে নামি?

—নামো না।···এই তো দেখো না—আমরাও নামছি।···

* * *

তা দলপতিরা তবু সাঁৎরে সাঁৎরে ওঠে…এরা ডোবে… হাজারে হাজারে…লাখে লাখে…বাকীরা যারা কোনো গতিকে পার হোলো—ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে—আমাদের সন্দেহ হচ্ছে পরী বোধ হয় আসবে না।

—পাগল! এই এলো বলে—শুধু তোমরা আর একটু-খানি কষ্ট স্বীকার করলেই হয়।…

—আরো কষ্ট?

—তা' নয়? বাঃ! কতো দিন…আগের হারিয়ে যাওয়া পরী, এতো সহজে কখনো আসে?

তবে চলো…।

চলতে চলতে…দেখে সামনে আগুন! জলছে দাউ দাউ করে। এরা শিউরে উঠে দলপতিদের পিছন খোঁজে।…এ কি, এ যে আগুন!

দলপতিরা কোনো প্রকারে গা বাঁচিয়ে নিয়ে চীৎকার করে ডাকেন…এসো, দাঁড়াচ্ছো কেন? ও কিছু নয়, দাবানল!

—কিন্তু পুড়ে যাবো যে?

—যাও না, দোষ কি? কতো কোটি লোক দেশের, তোমরা পুড়ে মরলে তারা আসবে।

—তবে পরীকে দেখবো কি করে?

—আহা, তোমরা না-ই বা দেখলে? তোমাদের ছেলে-পুলে নাতি-পুতি? তারা তো দেখবে পরীকে।

—তবে ঝাঁপ দিই?

—দাও।

পুড়লো অনেক লোক. দলে দলে কাতারে কাতারে।

হায় পরী! তোমার পথের কি শেষ নেই?

এরা অবশেষে এক দিন কাতর হয়ে বলে—মশাই, আমরা আর পারছি না। মনে হচ্ছে, পরী-টরী সব ভুয়ো, তাকে পাওয়া যাবে না!…সে মরে গেছে।

—আ, ছি ছি ছি! বলতে আছে?…পরীর মৃত্যু নেই! —এইবার ঠিক পাওয়া যাবে, শুধু সামনের এই পাহাড়টা ডিঙোতে পারলেই হয়।

—ডিঙোতে? এতো বড়ো পাহাড় ডিঙোনো যায়?

—কেন যাবে না?…না হয় সকলে মিলে ভেঙে ফেলো।…

ভেঙে ফেলবো? বলো কি?

—ঠিকই বলছি। ভেঙে ফেলো।…এই যে আমরা জোগাচ্ছি শাবল গাঁইতি…। এতো কোটি লোক…একটু করে ভাঙলেই পাহাড় নিশ্চিহ্ন। ব্যস তার পরেই তো পরীর দেখা মিলবে।

শাবল হাতে করে কপালের ঘাম মুছে এরা বললে—আচ্ছা, পরী এলে আমাদের কি সুখ হবে বলো তো?

—তোদের? তোদেরই তো সবটা সুখ রে, দেশও তোদের, পরীও তোদের।

—ঠিক বলছো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—তবে ভাঙি?

—নিশ্চয় নিশ্চয়।

* * *

দিনের পর দিন শাবল আর গাঁইতির শব্দে আকাশ ভরে ওঠে…অবশেষে সত্যিই পাহাড় নিশ্চিহ্ন হয়…আর সঙ্গে সঙ্গে উঁকি মেরে দেখে এক দলপতি লাফিয়ে ওঠে—ওই যে পরী।

—কই! কই! কোথায় পরী?

—ওই যে, দেখছিস্ না?

—কই দেখছি না তো।

আঃ, তোরা কি অন্ধ রে। ওইতো গাছতলায় পড়ে আছে।

—গাছতলায় কেন?

—তা কি করবে? ওর কি আশ্রয় ছিল? এইবারে আমরা দেবো আশ্রয়।

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে সকলে মিলে।

গাছতলায় কি একটা রয়েছেই বটে।

কিন্তু এই কি পরী?…এ যে আগাগোড়া ঢাকা দেওয়া।

কর্তারা বললে—হোক না। তোমরা স্থির হয়ে দেখো—আমরা ঢাকা খুলবো।

সাহসে ভর করে এরা এগিয়েই গেলো।…নেড়ে চেড়ে দেখে-শুনে…কাতর ভাবে চেঁচালে—এ পরী বোধ হয় মারা গেছে।

—না না—দলপতিরাও চেঁচায়—পরীরা অমর। ঠিক আছে দেখো না। আমরা জীওবো ওকে। তোমরা শুধু বয়ে এনে দাও।

অনেক দেখে-শুনে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে পরীকে তুলে আনলো এরা।…আপাদ-মস্তক কালো স্তাকড়ায় মোড়া, বোঝবার জো নেই, পরী কি সাপ ব্যাঙ।

দলপতিরা দুই হাত তুলে নৃত্য করে বললে, 'পেয়েছি' 'পেয়েছি।' এতো দিনের সাধনার ফল পেয়েছি। পেয়েছি যুগ-যুগান্তের হারিয়ে যাওয়া পরী! এসো, এবার উৎসব করো।

উৎসব!

তাই তো!

কি নিয়ে উৎসব করবে? কাকে নিয়েই বা? অর্দ্ধেক তো খতমই হয়ে গেছে!

কিন্তু তা বললে চলবে না। উৎসব হবে না? পরী এসেছে!

পুরনো ক্যানেস্তারা পিটোতে পিটোতে হৈ হুল্লোড় করে দলপতিদের ল্যাজ ধরে চললো সবাই।

কিন্তু?

—দৈত্যরা বিদেয় হয়েছে?

দলপতিরা বললে—হবে না? আমরাই তো তাড়ালাম।

প্রজারা ভয়ে ভয়ে উঁকি মেরে বলে—কিন্তু ওই যে রয়েছে মনে হচ্ছে?

—থাক না, ক্ষতি কি। এখন ওরা বন্ধু যে।···এখন শুধু এখানে—খাবে-দাবে আর ফুর্তি করবে, মারতে পারবে না। চাবুক কেড়ে নিয়েছি কি না আমরা।

প্রজারা নিশ্বাস ফেলে বেঁচে বললে—তা সে চাবুকটা গেলো কোথায়?

দলপতিরা নিজেদের ঝোলা খুলে দেখালে—এই যে আমাদের কাছে।···

* * * *

—তালপল?

—এই মাটি করেছে। আবার কিসের তার পর?

—হ্যাঁ—অ্যাঁ—বলো তালপল কি হলো।

—তার পর?···তাই তো—তার পর কি হলো জানিস্? দৈত্যরাজের ছেড়ে-যাওয়া প্রাসাদটায় ঢুকে পড়লো ওরা।

—ওলা? কালা?

আরো অবহিত হয়ে শোনবার ভঙ্গীতে কাছে ঘেঁষে সরে এসে প্রশ্ন করে খোকা।

বললাম—ওরা মানে সেই দলের কর্তারা। প্রাসাদে ঢুকেই দুম্ করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বললে—গোলমাল কোরো না, আমরা এখন পরামর্শ করছি।

এরা বাইরে থেকে গলা ফুলিয়ে চেঁচায়—কিসের পরামর্শ? কিসের পরামর্শ?

—বাঃ, পরামর্শ নেই? তোমাদের রক্ষা করতে হবে না?

—আবার রক্ষা? তোমরাও আবার আমাদের রক্ষার ভার নিলে নাকি?

—নেবো না? বাঃ, তোমরা ছেলেমানুষ অবোধ, বেঁচে থাকবার কল-কৌশল জানো কিছু?

এরা বললে—জানলাম আর কবে, মরেই তো ছিলাম এতোকাল, তা একবার আমাদের সব জানতে দাও?

দলপতিরা বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখো হে বাপু, বোঝো না সোঝো না, নাক গলাতে এসো না এর ভেতর। আমরা যা বুঝছি ঠিক বুঝছি।

এরা বিমর্ষ হয়ে চলে যায়।···

খিল দেওয়া দরজায় ও-পিঠে পরামর্শই চলতে থাকে।

—আজও চলছে কালও চলছে।

* * * *

এরা পথে পথে, রাজপুরীর আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়···ভাত নেই কাপড় নেই, চাল নেই চুলো নেই।··· দৈত্যেরা তবু—মুখোস খুলে খাবার ভয়েই হোক আর যাই হোক—নিজেরা খেয়ে মেখে ফেলে ছড়িয়ে এক-আধ মুঠো দিতো, কিন্তু এখন—এ কি?

খাবার-পরবার সামগ্রীগুলো চোখে দেখতেই পাওয়া যায় না যে!

* * * *

মরিয়া হ'য়ে এক দিন দোরে ধাক্কা দিতে গেলো এরা।

বললে—কি মশাই, হোলো কি? আমাদের গতি কি?

দলপতিরা পাথরের দেয়ালের ও-পিঠ থেকে গম্ভীরভাবে বলেন—মেলা বক বক কোরো না, দেখছো না, তোমাদের ভালো করবার জন্যে কতো নতুন নতুন স্কীম তৈরি করছি মাথা খাটিয়ে।

আবার "ভালো করা"!

শুনে হাত-পা অবশ হয়ে আসে এদের।

সাহসে ভর করে এক-আধ জন চেঁচিয়ে বলে—ভালো-মন্দ যাই হোক, আমাদের ভাবনাটা আমাদেরই ভাবতে দাও না?

কর্তারা ঘুলঘুলির ফাঁকে চোখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেন—ছিঃ ছিঃ, ছেলেমানুষী কোরো না। তোমাদের অতো ভাববার দরকারটাই বা কি? আমরা তবে আছি কেন?

কিন্তু এরা ক'দিন চুপ করে থাকবে?

পেটে ভাত না থাকলে চুপ করে থাকা সহজ না কি? ঘুরে-ফিরে তাই আবার আসে তারা। মাথামুড় খুঁড়ে বলে—আমরা যে খেতে পাচ্ছি না।

ঘুলঘুলির মধ্যে মুখ রেখে দলপতিরা উত্তর দেন—পাবে কোথা থেকে, দেশে কি আর ধান-চাল কিছু আছে?

—বলো কি? গেলো কোথায়? এতো বড়ো দেশের এতো ধান-চাল গেলো কোথায়?

গেলো কোথায়?

তাই তো!

মাথা চুলকে চুলকে কর্তারা বললেন—আর কিছু নয়—ধেড়ে ইঁদুর! ধেড়ে ইঁদুরের উৎপাতেই আজ এই অবস্থা দেশের।

এরা উৎসাহিত হয়ে বলে—তবে আর কি, সমস্যার সমাধান তো হয়েই এসেছে—কল পাতো? জাঁতি-কল, খাঁচাকল, বাক্সো-কল, কলের তো অভাব নেই তোমাদের?

—আহা, তা তো নেই-ই, কিন্তু ভেবে-চিন্তে পাততে হবে তো? রোসো, দেখি পরীক্ষা করে করে।

দেশের যতো ছুতোর, কামার আর ইঞ্জিনীয়ারের দল লেগে গেল কল তৈরী করতে।···

সাদা, কালো, সবুজ, পাঁচ-রঙা, সোনালী—কতো বাহারি কল তৈরী হলো—হরেক রকম নাম। পাতা হলো ভাঁড়ার খুঁজে খুঁজে···কিন্তু কোথায় কি?···ধেড়ে ইঁদুর তো দূরের কথা, ধান চালের কুঁড়োগুলোর চিহ্ন মেলে না। পৃথিবীতে যে কোনো দিন ভাত-কাপড় ছিলো তা-ও আর মনে পড়ে না কারুর।

* * *

হলে কি হবে, ভুলে থাকবার তো জিনিষ নয়? এরা এবার রাগারাগি করে, কাগজে লেখালেখি করে, কর্ত্তাদের কাছে নালিশ জানাতে যায় ফের।

এবার কর্ত্তারাও চটেন।

রেগে-মেগে বলেন—কি করবো বলো? দেখছো তো চেষ্টার ত্রুটি রাখছি না, ইঁদুররা কলে না পড়লে? তোমরা ধরে এনে কলে ফেলে দিতে পারো তো কিছুটা সুরাহা হয়।

এরা এ ওর মুখ চায়···কি করবে, করবে না কি চেষ্টা?

কিন্তু একটা পুঁচকে ছোঁড়া হি হি করে হেসে বলে—মিথ্যে খেটে মরবে, কল গড়েছে—ছিটকিনি গড়েনি। ধেড়ে ইঁদুদের দল ধরা যদি বা পড়ে, আটক পড়বে না।

তবে উপায়।

উপায়—নিরুপায়।

—কর্ত্তা—ও কর্ত্তা—কর্ত্তা গো—

কর্ত্তারা শুনতেই পায় না এই সব চেঁচানি।

খোকা মুখের মধ্যে দু'টি আঙুল পুরে গম্ভীর ভাবে বলে—আর পরীটা কোথায় গেল?

—তাই তো!

পরীটার কথা ভুলেই যাচ্ছিল যে সবাই। হঠাৎ এক দিন এক দল লোক বললে—বেশ, পরীটাকেই দিয়ে দাও না আমাদের, দেখি, আমাদের দুঃখু ঘোচে কি না।

দুঃখু!

কর্ত্তারা মর্ম্মাহত হয়ে গেলেন শুনে। দুঃখু? এ যে স্বর্গরাজ্যে বাস করছো তোমরা, বুঝতে পারছো না? আর বিশ-পঁচিশটা বছর ধৈর্য্য ধরে থাকো, দশ-বিশখানার স্কীমগুলো তৈরী হবে যাক, দেখবে, তখন এ দেশের ভাত-কাপড়ে পৃথিবী পোষা যাবে।···এ কি সোজা দেশ? সোনার দেশ!

—কিন্তু এখন?

—নাঃ, তোমরা বড্ড দিক্ করছো, তোমাদের ওই সব তুচ্ছ কথায় কান দেবার সময় আছে আমাদের? আমাদের বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।

—কিন্তু আমরা?

—কি ঝন্ঝাট! তবু বক্ বক্ করবে? মনে রেখো—সেই চাবুকটা তারা নিয়ে যায় নি, আমাদের কাছেই আছে।···

—তারপর?

—আঃ খোকা! আবার তার পর? আর 'তার পর' নেই।

—বাঃ রে, পরীটা কই?

—পরী? সে তো সেই কালো হ্যাকড়ায় মোড়া দৈত্যপুরীর অন্দরের কোণে লুকানো আছে।

—এরা দেকবে না কেন?

—জানি না 'কেন।' তুই ঘুমোবি কি না তাই বল।

—না—আ—আ! ঘুমোবো না—তারপর কি হলে বলো—

—ফের খোকা? তার পর আর কিছু নেই, যাঃ!

—না, দপ্‌প্পো শুনবো। বলো তারপর—

—অসহ্য!

ঠাস্ করে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুই।

নিরুপমা

—:*:—

সুদীর্ঘ টেলিগ্রামখানা এই লইয়া তিনবার পড়িতে পড়িতে শিবনাথ বাড়ীর ভিতর আসিয়া অমিয়াকে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, মা কোথায়?

অমিয়া বাঁকা হাসি চাপিয়া উত্তর দিল—মা আর এসময় কোথায় থাকেন পুজোর ঘর ছাড়া?

কথাটা মিথ্যা নয়, এখন বেলা আটটা মাত্র—দশটা সাড়ে দশটার আগে নিরুপমা পূজার ঘর হইতে বাহির হন না …শিবনাথ পত্নীর চাপা হাসিটা লক্ষ্য করে না, তেমনি ব্যস্তভাবে বলে—ও, পুজোর ঘরে? মুস্কিল হ'ল তো—ভয়ানক দরকার ছিল যে। এখন নামবেন না বুঝি?

অমিয়া ঠোঁটের কোণে তেমনি হাসি বজায় রাখিয়া বলে—ডেকে দেখতে পারো। তবে দরকারটা এমন কি ভয়ানক? ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে বড়ো নয় নিশ্চয়ই?

শিবনাথ এবার টেলিগ্রামখানা হইতে চোখ তুলিয়া এক সেকেণ্ড অমিয়ার মুখের পানে তাকাইয়া দেখে, এক সেকেণ্ডের বেশী নয়, পরক্ষণেই পাশ কাটাইয়া তিনতলায় উঠিয়া যায়। মাকেই যে ডাকিতে যাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কারণ তিনতলায় পূজার ঘর ভিন্ন আর কিছুই নাই।

অমিয়া একটু অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকে। স্বামীর এরকম ব্যবহারটা নূতন। এই নীরব তিরস্কারের ভঙ্গীটা।

তা'ছাড়া নিরুপমার পূজার ঘরে গিয়া হানা দিবার দুঃসাহস তো কখনো কাহারও হয় না। অন্ততঃ মনে পড়ে না।

আশ্চর্য্য! টেলিগ্রামের কথাটা জানাই হইল না, কে দিল এত বড়ো টেলিগ্রাম? 'ভয়ানক দরকারি' কথাটা বোধ করি ওর মধ্যেই আছে। তা'—শিবনাথের কি মাকে জানাইবার আগে তথ্যটা স্ত্রীকে জানাইয়া ফেলিলে জাত যাইত? অমিয়া কি জানে বাবু চটিয়া মটিয়া লাল হইবেন? তবে নয় আগেই আশঙ্কার ভাণ দেখাইয়া তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করিত।…

শোক সংবাদ নিশ্চয়ই নয়।

এমন প্রিয় আত্মীয়ই বা শিবনাথের কে আছে যার মৃত্যু সংবাদ আসিবে 'তার' বাহিয়া।· চিঠির মতো এতো দীর্ঘই বা হইবে কেন সে 'তার'? নিজের বাপের বাড়ীর দিক হইতে অবশ্য নিশ্চিন্ত আছে অমিয়া। তার পিতৃগৃহের দূরত্বটা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, ডাকবিভাগের শরণ লইবার প্রয়োজন হয় না।

কোন্ সংবাদ? কাহার সংবাদ? যার জন্য অসময়ে নিরুপমার ধ্যানভঙ্গ করানোর মতো অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হয়।

অমিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে, শিবনাথ উঠিয়া যায় তিনতলায়, কিন্তু উঠিয়া আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়া ছাড়া গতি থাকে না। অমিয়ার প্রচ্ছন্ন হাসিটাই একরকম ঠেলিয়া আনিয়াছে তাহাকে। বর্ত্তমান মনের অবস্থায় বড়ো কটু ঠেকিল হাসিটা। কিন্তু এখন এই বন্ধ দরজার কপাট খোলাইবার সাহস জোগাইবে কে।

অথচ এমন বোকার মতো দাঁড়াইয়া থাকার অর্থও হয় না, সময়ও নাই।

শিবনাথ একটী খ্যাতনামা কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক, রাশভারী বলিয়া অখ্যাতিও আছে ছাত্রমহলে, কিন্তু মায়ের কাছে বালক মাত্র।

পনের বছর বয়সে 'মা' বলিতে যে ভয়ভক্তি ছিল, পঁয়ত্রিশের কোঠায় আসিয়া তার এক তিলও কমে নাই।… হয় তো অমিয়ার প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের মূল উৎস এইখানেই।

মিনিট তিন চার চুপচাপ কাটে, টেলিগ্রামখানা আরো বার দুই চোখ বুলানো হয়, অবশেষে নিতান্তই মরিয়া হইয়া ডাক দিতে হয় শিবনাথকে—মা শুনছো? মা—একটা বিশেষ দরকার ছিল।

ঘরের ভিতর নিরুপমা বোধ করি প্রথমবারটা নিজের কাণকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডাকটা স্পষ্ট নির্ভুল।…ঠাকুরের কাছে ক্ষমা-টমা চাহিয়া আরো মিনিট কতক পরে নিরুপমা দরজা খুলিয়া বাহির হন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন—ব্যাপার কি শিবনাথ?

—ব্যাপারটা—মানে ব্যাপারটা ইয়ে—একটু ভাববার হচ্ছে। বাবা 'তার' করেছেন—এখানে আসছেন।

এক নিশ্বাসে বলিয়া লয় শিবনাথ, বা বলিয়া বাঁচে।

নিরুপমা কি কাণে কমই শুনিতেছেন আজকাল? তাই তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করিয়া ওঠেন—কে আসছে?

ভীষণ একটা অবিশ্বাস্য কিছু শুনিলে যেমন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে মানুষ, তেমনি তীক্ষ্ণ শোনায় নিরুপমার কণ্ঠস্বর।

কিন্তু শিবনাথ ভিতরে ভিতরে বল সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে, তাই মায়ের কথার উত্তরে একটু দৃঢ় স্বরে বলে—বললাম যে বাবা আসছেন। এই যে 'তার' করেছেন—'শরীর ভাল নয়—সকলকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে'—এই সব আর কি।

নিরুপমা এবার শান্ত কণ্ঠে বলেন—ওঃ পাগলের খেয়াল! তা তুমিও 'তারে'ই জবাব দিয়ে দাও বাবা—সেটা সম্ভব নয়।

—জবাব দিয়ে দেব? জবাব দেবার আর সময় কোথা? ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাবার সময় হলো যে। পর্শুর তারিখ রয়েছে টেলিগ্রামে, অথচ আজ এসে পৌঁছল,—যা অবস্থা হয়েছে আজকাল পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের।

ডাকবিভাগের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া আলোচনার ধারাটা সহজ করিয়া লইবার চেষ্টা করে শিবনাথ। যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়, যেন হামেসাই আসিয়া থাকেন শক্তিনাথ, শুধু এবার টেলিগ্রামটা বিলম্বে আসার দরুণই যা কিছু অসুবিধা।

কিন্তু নিরুপমা সহজ হইবেন কোন্ শক্তিতে?

বত্রিশ বছরের অদেখা স্বামীকে বিনা দ্বিধায় সহজভাবে গ্রহণ করিয়া লওয়া এতো সহজ নয়। শিবনাথ পারিবে না কেন? শিবনাথের কাছে শক্তিনাথ বাহিরের মানুষ ছাড়া আর কি? ভদ্রতার প্রশ্ন ভিন্ন আর কোনো প্রশ্নই নাই তার। দূরাগত কোনো আত্মীয় যদি সামান্য সম্বন্ধ-সূত্রের জের টানিয়া আসিতে চাহিত, নিরুপমা কি নিষেধ করিয়া পাঠাইতেন?

কিন্তু শক্তিনাথ আসিতে চাহিয়াছেন!

কোন্ হিসাবে আসিতে চাহিয়াছেন ভাবিয়া অবাক লাগে নিরুপমার। বত্রিশ বছর ধরিয়া যেটুকু যোগসূত্র রাখিতে চাহিয়াছেন শক্তিনাথ, সমস্তই তো অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন নিরুপমা।

বালক শিবনাথের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বৎসরে বৎসরে যে অজ্ঞাতনামা-ব্যক্তি-প্রেরিত মূল্যবান উপহার রাশি আসিয়াছে—প্রত্যেকটাই কি "লইতে অনিচ্ছুক" মার্কা লইয়া প্রেরকের নিকট ফিরিয়া যায় নাই?

শেষ পর্য্যন্ত উপহার পাঠাইবার সখ তাঁহার মিটিয়াছে।

তবু শিবনাথ বড়ো হওয়ার পর সরাসর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন শক্তিনাথ কুশলপ্রশ্ন সহ পোষ্ট কার্ডের মারফৎ। "লইতে অনিচ্ছুক" বলিয়া ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই পোষ্টকার্ডগুলা থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু কবে তার উত্তর মিলিয়াছে?

ছেলের উপর কড়া নিষেধ ছিল নিরুপমার।

অবশেষে শিবনাথ এম, এ, পাশ করিয়া বাহির হইবার পর লজ্জা-সরমহীন লোকটা দুঃসাহসের চরম প্রমাণ দিতে কি না শিবনাথের নামে পাঠাইয়া বসিল এক মোটা অঙ্কের চেক। বোঝা গেল লোকটার আর্থিক অবস্থা ধারণাতীত রকমের ভালো, চেকের অঙ্কটা রীতিমতই মোটা, ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ সুগম করিয়া তুলিতে বেশ কিছু পাথেয়।

কিন্তু জগতে তো অর্থবান ব্যক্তির অভাব নাই, নিরুপমা কি তাহাদের কাছে ভিক্ষামুষ্টি লইতে দিবেন শিবনাথকে?

হয়তো—নিরুপমার ব্যবহারটা একটু রূঢ়, বেশী কঠোর, কিন্তু—শক্তিনাথেরই বা ধৃষ্টতার সীমা থাকিবেনা কেন?…

যে রাজ্য নিরুপমা রাজেন্দ্রাণীর মতই অনায়াসে অবহেলায় ত্যাগ করিয়াছেন—আজ তাহার এক মুঠি শস্যকণার লোভ করিবেন—এমন উঞ্ছমনোবৃত্তি নিরুপমার নয়—এটা যদি এতদিনেও না বুঝিয়া থাকেন শক্তিনাথ, বুঝাইয়া দিতে হইবে বৈ কি।

চেক ফেরৎ দিবার পর হইতে আর কোনো সাড় আসে নাই, যেন শেষ আঘাতে স্তব্ধ হইয়া গেছে মানুষটা। নিরুপমাও স্বস্তি পাইয়া বাঁচিয়াছেন। অন্ততঃ সেইটাই স্বাভ্য।…তবু মনের অগোচরে পাপ নাই, তাই মাঝে মাঝে মনে হয় অমিয়াকে কিছুটা দেখাইতে পারিলে যেন ভালো হইত। নিরুপমা যে কতো সহজে ঐশ্বর্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার—আগ্রহকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রাখেন, সে গৌরবটা অমিয়াকে না দেখাইতে পারার মধ্যে খানিকটা ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। এ সংসারের সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিয়া, আচার-নিষ্ঠার কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধনে, আর গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রের সাধনে—দেবত্বের মহিমায় নিজেকে ঊর্দ্ধলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াও, কোথায় যেন লুকাইয়া থাকে পরাজয়ের গ্লানি…আত্মীয় অনাত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কাহারও কাছে নয়, শিবনাথের কাছেও নয়, কেবলমাত্র শিবনাথের বৌয়ের কাছে।

কিন্তু কেন?

নিরুপমা নিজেও জানেন না কেন এই অস্তি গোপনে বিঁধিয়া-থাকা সুতীক্ষ্ণ কাঁটাটা কিছুতেই উপড়াইয়া ফেলা যায় না, অহরহ পীড়া দেয়।

নিজের গৌরবময় ত্যাগের ছবি অমিয়াকে দেখাইবার সুযোগ কখনো ঘটিল না। অমিয়ার বিবাহের সময়ও নয়, কারণ ছেলের বিবাহের সংবাদ শক্তিনাথকে দেন নাই নিরুপমা।

নিষ্প্রোয়জন বোধেই দেন নাই।

কিন্তু অমিয়া শাশুড়ীকে ভাবে কি?

পতি-পরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী নারী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না হয় তো।

অতীত কাহিনী গল্প করিয়া গৌরব করিবার মেয়ে নিরুপমা নয়—শুধু অতীতের অন্ধকার যবনিকাখানা তুলিয়া ধরিয়া বত্রিশ বছর আগের দৃশ্যটা যদি দেখানো যাইত।……

পলাতক পুত্র ঘরে ফিরিয়াছে…একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ তিন বৎসর নিরুদ্দেশ জীবন যাপনের পর বাড়ী আসিয়াছে শক্তিনাথ।…কঠোর আচারপরায়ণ পিতার কাছে অনুমতি পাওয়ার আশা দুরাশা বোধে পলাইয়া সাগর পাড়ি দিয়া আসিয়াছে।…অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছে—কর্ম্ম-জীবনের সাফল্য। অনবদ্য স্বাস্থ্য, অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য।…যে-চাঞ্চল্য ভক্তিনাথের সংস্কারাচ্ছন্ন সংসারে বেমানান।

দৃশ্যটা যেমন ছবির মতো স্পষ্ট হইয়া আছে—তেমনি স্পষ্ট হইয়া আজো কাণে বাজে প্রত্যেকটী কথা।…প্রথম খবর আনিল বাড়ীর রাখাল ছেলেটা। গরুগুলা মাঠে ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তীক্ষ্নস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো মাঠান, বড়দাদাবাবু এয়েছে, হেইমা পেত্যয় করো, নিজের চোক্ষে দেখে এনু। কি যে রূপ হয়েছে মাঠান, যেন সায়েবকে ঝক্ দিচ্ছে। কোট পেণ্টুল পরে—একেবারে সত্ত সায়েব।

শাশুড়ী অবিশ্বাসের সুরে উত্তর করিয়াছিলেন—কে বললে বড়দাদাবাবু? তুই সায়েবই দেখে এসেছিস কোথায়।…

অবশ্য ছেলের খবরটা ইদানীং কানাঘুসায় পাওয়া গিয়াছিল—"ভারতীয়ছাত্রের কৃতিত্ব" বলিয়া ফটোও ছাপা হইয়াছিল কোথায় যেন—কিন্তু বিনা সংবাদে হঠাৎ বাড়ী আসিবে, এটা অবিশ্বাস্য।

—ওই তো মাঠান তুমি পেত্যয় করছোনা? এসটেশন থে আসছে—কোট পেণ্টুল দেখে আমি তো ভয়ে ভয়ে ছুট দেবার মতলব করছি, আমাদের বড়দাবাবু আমাকে ডাক দে বললে—কিরে মাধো, ভাল আছিস তো?'

শক্তিনাথজননী সন্দিগ্ধভাবে বলিয়াছিলেন—তুই কি বললি?

—আমি? আমি বলনু—বড়দাবাবু তুমি পেলিয়ে গেলে—মাঠান কেঁদে কেঁদে মরতে পড়লো—আর বলনু তোমার পোষাকটার কি যে বাহার—বলিতে বলিতে দম লয় ছেলেটা।

—তবে তো খুব বলেছিস। তা কই এলো না?

—আসছে—পায়ে হেঁটে আসবে তো?

—তুই বুঝি উড়ে এলি?

—কও কথা। আমার সঙ্গে তুলনা? আমি তো এই ষষ্ঠিতলা দে, ধোপা পুকুরের পাড় দে' ছুটতে ছুটতে এনু। আচ্ছা, রওনা দু দণ্ড, ঝুটমুট বলছি কিনা দেখো।

না, ঝুটা কথা সে বলে নাই, মিনিট কয়েক পরেই শক্তিনাথ আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন উঠানের মাঝখানে।…দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ, স্বাভাবিক ফর্সা রং আরো টকটক করিতেছে…অভিনব বেশভূষা। ভক্তিনাথের সংসারে ইতিপূর্ব্বে ম্লেচ্ছের পোষাক প্রবেশ করে নাই।

বত্রিশ বছর আগে সেই শেষ দেখিয়াছিলেম নিরুপমা।

মুহূর্ত্তমাত্র। পরমুহূর্ত্তেই ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন …কিন্তু কেন? ভয়ে? লজ্জায়? রাগে? অভিমানে…সেই কথাটাই শুধু স্পষ্ট মনে পড়ে না আর।…

বহুদিন বহুভাবে ভাবিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু রাগ হওয়াই কি অসঙ্গত ছিল নিরুপমার পক্ষে? শক্তিনাথের এই নিষ্ঠুর পলায়ন কি নিরুপমার ললাটে পরাজয়ের কালি লেপিয়া দেয় নাই?…

বধূজীবনের কথা মনে করিতে গেলেই তো সব ছাপাইয়া, জাগিয়া ওঠে ভয়ের স্মৃতি। স্বামিসান্নিধ্যের মধুর রোমাঞ্চের গা ঘেঁসিয়া—উদ্যত শাসনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে গুরুজনের ভ্রূকুটি। শুধু সবে যখন ভয় ভাঙিতে সুরু করিয়াছে, আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় কেমন করিয়া যেন ধরা পড়িয়া গেছে নিজের মূল্য, সংসারে আসিয়াছে প্রতিষ্ঠার আভাস, সেই স্বপ্নময় দিনরাত্রিগুলির উপর তীক্ষ্ন বিদারণ রেখা টানিয়া দিয়া কী অনায়াসেই চলিয়া গেলেন শক্তিনাথ!

সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া নিরুপমার জন্য রহিল শুধু ধিক্কার।

সেই পলাতক স্বামীর বিরুদ্ধে যদি সমস্ত মন বিদ্রোহী হইয়া থাকে, সে কি নিরুপমার অন্যায় ঔদ্ধত্য?…ভাবিতে বসিলে অনেক কিছু ভাবা যায়, শুধু ভাবিয়া কূলকিনারা পাওয়া যায় না—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে নিরুপমা অমন প্রেতাহতের মতো ছুটিয়া পলাইয়াছিল কেন?…আর একবার তাকাইয়া দেখে নাই কেন?

পরের দৃশ্যটা মর্ম্মান্তিক।

সারদাময়ী ক্ষুধিত মাতৃহৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা লইয়া 'কাঠ' হইয়া বসিয়া আছেন, পুত্রকে সম্ভাষণ করিবার পর্য্যন্ত সাহস নাই।…বিচারকের আসনে ভক্তিনাথ।

ধর্ম্মের উপর পুত্রস্নেহ নয়। পিতৃহৃদয় চূর্ণ হইয়া যাক, বিধর্ম্মী পুত্রকে ঘরে স্থান দিবার সাধ্য তাঁহার নাই।

শক্তিনাথ কম্পিত গলায় বলিয়াছিলেন—আপনি ভুল শুনেছেন বাবা, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিনি আমি, হিন্দু ছিলাম, হিন্দুই আছি।

ভক্তিনাথের কণ্ঠস্বর স্থির—হিন্দুর আচার—খাদ্যাখাদ্যের বিচার—সমস্ত মেনে এসেছ এই তিন বছর?…উত্তর দাও।

—বিদেশে—ওসব জায়গায় সম্পূর্ণ আচার মেনে চলা সম্ভব নয় বাবা।

—ইচ্ছা থাকলে, নিষ্ঠা থাকলে, কিছুই অসম্ভব নয় শক্তিনাথ। বেশ, তোমার উপবীতের ধর্ম্ম রক্ষা করেছিলে? গায়ত্রী করেছ দু'বেলা? মাথা হেঁট করছো যে? উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই—কেমন? উপবীতটাও ত্যাগ করনি কি? ভক্তিনাথ মুখুয্যে ভুল শুনে কিছু সিদ্ধান্ত করে না শক্তিনাথ। ...আমার ধর্ম্মের সংসারে উপবীতত্যাগী ম্লেচ্ছের স্থান নেই।

শক্তিনাথ তখনো মাথা হেঁট করিয়া ছিলেন না কি?...

না আর নয়। ঘরের ভিতর হইতে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন নিরুপমা সেই অকুণ্ঠ ভঙ্গী।...

—মা, তোমারও বোধকরি একই মত? তোমাদের কাছে স্থান পেলামনা এর জন্যে দুঃখিত, তবু আশা করছি পৃথিবীর কোনোখানে একটু স্থান পাবোই।...কিন্তু...আমার সঙ্গে আরও তো কিছু ছাড়তে হবে তোমাদের। এ সংসারে আমারও কিছু দাবীর জিনিস রয়েছে যে—

ঘরের ভিতর থাকিয়া ঘৃণার লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন নিরুপমা এই স্পষ্ট নির্লজ্জ উক্তিতে।

ভক্তিনাথ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—ও, তোমার স্ত্রী পুত্র? বেশতো নিয়ে যাও। ওরে কে আছিস, বৌমাকে তৈরী হয়ে নিতে বল্ খোকাকে নিয়ে—

সারদাময়ী হাহাকার করিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—ওগো, তুমি কি পাষাণ? প্রাণ বলে কি কিছু নেই তোমার? খোকাকে ছেড়ে—

ভক্তিনাথ তেমনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—প্রাণের কথা তো হচ্ছেনা বড়বৌ; কথা হচ্ছে অধিকারের। আর প্রাণের কথাই যদি বলো—নিজের ছেলেকে ছাড়তে পারবো আর পরের ছেলেকে পারবো না? সব পারবো—শুধু ছাড়তে পারবোনা ধর্ম্ম।

তাঁহার ধর্ম্ম তিনি রাখিয়াছিলেন...কিন্তু নিরুপমা স্বামী ছাড়িলেন কোন্ ধর্ম্মে? ভক্তিনাথ তো পুত্রবধূকে আটক করেন নাই।...অথচ কী অপরিসীম মর্য্যাদায়, কী সহজ অবহেলায় নিরুপমা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন শক্তিনাথের আহ্বান।...

সারদাময়ীর তীব্র ভর্ৎসনা আজও মনে পড়ে—"শ্বশুরের সুয়ো হয়ে জীবন কাটবেনা বৌমা, আখের মাটি কোরোনা, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরোনা, ম্লেচ্ছ হোক যবন হোক, ওই তোমার দেবতা—ইহকাল পরকাল।...শক্তির সঙ্গে চলে যাও তুমি।"

নিরুপমা উপহাসের হাসি হাসিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন সেই উপদেশ।...ঠিকই করিয়াছিলেন। কেন নয়? শক্তিনাথের ধৃষ্টতার উপযুক্ত উত্তরই দেওয়া হইয়াছিল।

অবশেষে—শক্তিনাথের শেষ অনুরোধ, একবার দেখা করিবার—শক্তিনাথের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নিজমুখে শেষকথা জানাইবার অনুরোধ—তা'ও রক্ষা করেন নাই নিরুপমা।

হ্যাঁ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—দেখা করার প্রয়োজন নাই, ধর্ম্মচ্যুত স্বামীর সঙ্গে নিরুপমার সম্পর্ক কি?

শ্বশুরের স্নেহছায়ায় সামান্য কয়টা দিন কাটিয়াছিল... তারপর আসিল উত্তপ্ত মরুভূমি।...আশ্রয়হীন ভয়লাহীন নিঃসঙ্গ জীবন।...একা নিরুপমা সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন।...

মানুষের মতো মানুষ।

—অমিয়া কি জানে সেই যুদ্ধের ইতিহাস? অমিয়া কি বুঝিবে নিরুপমার দৃপ্ত মহিমা?

কিন্তু ছেলেকে শক্তিনাথ দেখিলেন কবে? এইটুকুর জন্য তুচ্ছ মাধোর উপর কিছু কৃতজ্ঞতা আছে নিরুপমার। চাঁদের মত ছেলে, দেখাইবার মত ছেলে, এ ছেলেকে না দেখাইতে পাইলে নিরুপমার বিজয় গৌরব সম্পূর্ণ হইত না যে!

শক্তিনাথ চলিয়া যাওয়ার পর সমস্ত বাড়ীটা যখন মৃত্যুর মতো স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে—মাধো কোথা হইতে খোকনকে কোলে লইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া হাজির—"মাঠান, এই দেখো শিবুবাবু আমাদের রোজগার করতে শিখে গেছে। দেখাও তো শিবুবাবু ঠাকুমাকে।"

আড়াই বছরের ছেলে চকচকে দুই চোখ তুলিয়া মুখে আঙুল পুরিয়া গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া থাকে আর উচ্ছ্বসিত মাধো তার জামার পকেট হইতে বাহির করিতে থাকে নবলব্ধ ঐশ্বর্য্য।

—এই দেখ আংটি, একটা সোনার—একটা পাথরের—এই দেখ একটা ইংরিজি ঘড়ি—হাতে বেঁধে দেব শিবুবাবুর। আর এই দেখ—ইয়া পেটমোটা এক মণিবেগ, কতো নোট্ কতো ট্যাকা গোনসে' মাঠা'ন।

সারদাময়ী শোক ভুলিয়া অবাক সুরে বলেন—এসব কিরে মাধো?

—কি আবার? খোকনের মুখ-দেখানি। তোমরা তো ইদিকে বড়দাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করতে লেগে গেলে—খোকনকে দেখিয়ে মুখ-দেখানি আদায় করবারও খেয়াল নেই—আমি বলি ভালোরে ভালো। ছুটনু খোকনকে নিয়ে ইষ্টিশানের রাস্তায়। বলা যায় না—বাবু যা ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই, লাগ্ ঝমাঝম বেধে গিয়ে রাগ করে চলেই যাবে হয়তো বড়দাবাবু।...ঠিক তাই—দেখি গট্‌গট্ করে চলে যাচ্ছে, ধরনু গিয়ে। বলি—খোকনকে একবার দেখেও গেলেনা? ধন্যি রাগ তো? বড়দাবাবু বললে—'রাগ করে তো যাচ্ছিনারে, আমাকে সবাই তাড়িয়ে দিলে—'শোনো কথা? তা'পর না খোকনকে কোলে নে, সে কী আদর, হাতের গোড়ায় যা

পাচ্ছে সব দিচ্ছে। আমি তবু বলছু—ছেলেকে আদর করে সবছিষ্টি ওজোর করে দিলে যে—তা যাবে কি করে? বিন্‌টিকিটে?···কে শোনে কার কথা?···আচ্ছা মাঠান, গাজনের দিন জন্মালো না শিবু? 'শিবনাথ' নাম তো ওরির নেগেই রাখা? তাই বলছু দাদাবাবুকে—

প্রত্যেকটা কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে নিরুপমার।

কিন্তু বিতাড়িত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখ দেখাইতে চায় কোন্ মুখে?

ছেলের কাছে?

কিন্তু ছেলেকেও তো নিরুপমা পদে পদে শিখাইয়া আসিয়াছেন তেজের মন্ত্র! তার জীবনেই কি পিতার স্থান আছে?

তাই বিপন্নপুত্রকে আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে বলেন—অত ভাবনার কি আছে শিবনাথ? পাগলের খেয়ালে তো আর সহজ মানুষ চলবে না? এসে পড়ে থাকেন ভালোকথা, কলকাতা সহরে কিছু আর হোটেলের অভাব নেই।

কিন্তু শিবনাথ হঠাৎ বাল্যকৈশোর কাটাইয়া যুবকের দৃঢ়তা পাইল কোথায়? মাতৃভয় ভুলিয়া নিরুপমার কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়া স্বচ্ছন্দে বলিয়া বসিল—সে হয় না মা। বাবা আমাকে ষ্টেশনে থাকতে বলেছেন—বাড়ীতো চেনেন না।

—তুমি কি মনে করেছ এই বাড়ীতে এনে তুলবে?

—তা' ছাড়া?

—তবে তো আমার আর একদণ্ডও থাকা হয় না বাবা, আমার ব্যবস্থা আগে করে—

—কোনো ব্যবস্থাই আর করবার সময় নেই মা, মাদ্রাজ মেল এসে গেলো এতক্ষণ। যাচ্ছি আমি। তা ছাড়া—তোমারই বা এতো ভাববার কি আছে?

শিবনাথের হিসাবে ভাবিবার কিছু না থাকিলেও, শিবনাথ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো অজস্র ভাবনা ভাবিতে থাকেন নিরুপমা। সম্ভব অসম্ভব কতো জায়গার কথাই চিন্তা করেন···কিন্তু পলাইয়া আশ্রয় লওয়ার ঠাঁই এ জগতে কোথায় আছে নিরুপমার?···তাছাড়া লোক-দেখানো নাটুকেপণা কিছু একটা করিয়া বসা যে আরো লজ্জাকর।

কিছুই ঠিক হয় না।

শেষ পর্য্যন্ত অসমাপ্ত পূজাটা সমাপ্ত করিতেই বোধ করি ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দেন। কিন্তু পূজার মন্ত্র কি নির্ভুল হয়? সমস্ত ইন্দ্রিয় কি শ্রবণশক্তির সীমানায় আসিয়া উন্মুখ হইয়া থাকে না বিশেষ একখানি গাড়ীর শব্দের প্রতীক্ষায়?

না, নিরুপমা অত কাঁচা নয়, সুদীর্ঘ সাধনায় মজবুত বনেদ।

ধ্যানের মূর্ত্তি যদি বা ঝাপ্‌সা ঠেকে, গুরুস্তোত্র তো আছে?···

বাহিরের দরজায় কার গাড়ী আসিয়া থামিল সে-হিসাব রাখিবার জন্য মাথাব্যথা নাই তাঁহার।

তবু এক সময় বাহির হইতেই হয়।

ঘরে খিল লাগাইয়া বসিয়া থাকিবার মধ্যে যে হাস্যকর দিকটা আছে, সেটা না বুঝিবার মতো অল্পবুদ্ধি মেয়েমানুষ নিরুপমা নন···সত্যই তো আতঙ্কের কি আছে? নিজের সংসারে নিজের পদমর্য্যাদায়-প্রতিষ্ঠিত-নিরুপমার, বাহিরের একটা লোকের উপস্থিতি অনুপস্থিতিতে কি আসিয়া যায়?

বিতৃষ্ণা?

তা' ঠিক, কিন্তু তা'তেই বা আসিয়া যায় কি? জগতের কতো বস্তুর উপরই তো বিতৃষ্ণা আছে নিরুপমার!··· বাহিরে আসিলেন বটে তবে নিজের চারিপাশের গাম্ভীর্য্যের বর্ম্মটা আরো সুদৃঢ় করিয়া লইলেন।

এদিকে শক্তিনাথকে লইয়া অমিয়ার ঘটার আর অন্ত নাই।

এতো আশা শক্তিনাথ করেন নাই।

মায়ের অজ্ঞাতসারে শিবনাথ ইদানীং চিঠিপত্রের সূত্রে কিছুটা যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল বটে, তবু এতোটা সশ্রদ্ধ ভালোবাসা পাইবার আশা সত্যই ছিলনা। তার উপর আবার অমিয়া।

বৈচিত্র্যহীন নিশ্ছিদ্র কর্ম্মজীবনের মাঝখানে স্নেহ ভালোবাসার আস্বাদ কবে পাইয়াছেন শক্তিনাথ?···বন্ধু প্রতিবেশী, অনুগত ভৃত্য, এদের কাছে যতোটুকু পাওয়া সম্ভব, তার বেশী নয়। স্বভাবটা মিশুকে, হাতটা অকৃপণ, অবস্থাটা স্বচ্ছল, কাজেই বন্ধুবান্ধবের অভাব ঘটেনা এই পর্য্যন্ত।

'বাবা' ডাকটা কি মিষ্ট! 'বাবা' বলিয়া একেবারে মেয়ের মতো কাছ ঘেঁসিয়া বসিবার ভঙ্গীটী অমিয়ার কি স্নিগ্ধ!··· শক্তিনাথকে মাঝখানে রাখিয়া শিবনাথ আর অমিয়ার কলহের ছলনাটুকু কি উপভোগ্য!·· দীর্ঘ মরুভূমির শেষপ্রান্তে এমন শীতল সরোবর রচিত ছিল শক্তিনাথের জন্য, এতো আশা থাকিবে কেন? এ যে অপ্রত্যাশিত।

সাহস করিয়া আসিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। শুধু—

কিন্তু নিরুপমা কি এ বাড়ীতে আছে?

কি কাজে শিবনাথ ঘরে আসিয়াই মৃদু হাসিয়া বলে, বাবার স্নানাহারের ব্যবস্থা না করে শুধু আদর কাড়ানো হচ্ছে! তা' মন্দ নয়।

বলাবাহুল্য কথাটা অমিয়ার উদ্দেশে বলা হয়।

অমিয়া ছেলেমানুষের মতো মাথা নাড়িয়া বলে—দেখছেন বাবা, আমার ওপর কী হিংসে? আমি একটু আপনার কাছে বসেছি দেখে হিংসেয় অস্থির একেবারে। আপনাকে স্নানের তাগিদ দিতেই যেন আসিনি আমি! আপনার খাওয়ার সময়-অসময়ের হিসেব যেন আর কেউ রাখে!

শক্তিনাথ হাসিয়া বলেন—সত্যিই তো শিবনাথ, ভারী অন্যায় তোমার, মার ওপর সর্দারী কেন? এই তো মা আমাকে স্নানের তাগিদ দিতে এসে বললেন—'না বাবা তোমার এখনো খিদে পায়নি মনে হচ্ছে' তবেই না টের পেলুন সত্যিই খিদে পায়নি।

শিবনাথ হাসির সঙ্গে ঈষৎ উদ্বিগ্নস্বরে বলে—কিন্তু খিদে পাচ্ছেনা কেন বলুন তো? শরীর কি ভালো থাকছে না এখানে?

না না সে কি কথা, শরীর ভালো থাকবে না, একি হতে পারে? মার অখ্যাতি হবে যে সেটা। শরীর ঠিক আছে, শুধু মার হাতের ব্রেকফাষ্টটা এতো জবরদস্ত হয়ে পড়ে যে আবার ঘণ্টা তিন-চার আগে খিদে পাওয়া শক্ত।

—হ্যাঁ অমনি আপনি বাজে কথা সুরু করছেন বাবা—অমিয়া আবদারে-গলা-সুরে বলে—কতো কি ভালো ভালো রান্না জানি আমি, তার কিছু তো খাওয়ালাম না এখনো।··· ভালো ভালো রান্না শিখেই রেখেছি শুধু, রাঁধতে তো পাই না, খাবে কে? আপনার ছেলেটী তো পরম বৈষ্ণব, এবাড়ী অসাত্ত্বিক জিনিসের প্রবেশ নিষেধ বললেই চলে। ভালো রান্না রাঁধবো কি নিয়ে?

শক্তিনাথ যেন থতমত খান।···বৈষ্ণব! শিবনাথও পরম বৈষ্ণব! শক্তিনাথের সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখিয়াছে তবে সে? কই, এই তিন চার দিনে এমন সন্দেহ তো মনে আসে নাই।···ও, তাই বুঝি শিবনাথ কোনোদিন একত্রে আহারে বসেনা, সকালের চা পর্য্যন্ত না। কাজের অজুহাতে কখন কোন্ ফাঁকে খায়, টেরও পাননা শক্তিনাথ।···কিন্তু অমিয়া তো কাছে বসে ছোট মেয়ের মতো আবদার করিয়া খাওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে খাইতে লজ্জা করে না।···তবে?

শুধু শক্তিনাথের মর্য্যাদা রাখিতে?

বিপন্ন-বিহ্বল মুখে বলেন—সে কি? তা' হলে—তবে? মা অমিয়া, তোমার তো এটা খুব অন্যায়! এবাড়ীতে যখন ওসব চলেনা—তখন আমার জন্যে কেন শুধু শুধু—ছি ছি কী অসঙ্গত বলো তো?···না, না, দেশী রান্নাও আমার খুব ভালো লাগবে। তুমি আমার জন্যে বরং মোচার ঘণ্ট-টণ্ট—

—দায় পড়েছে আমার মোচার ঘণ্ট রাঁধতে—অমিয়া একবার স্বামীর দিকে গোপন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলে—তার জন্যে তো পাড়েজী মশাই আছেন—আমি বাপু আপনার দৌলতে তবু মুখ বদলে বাঁচছি।

তবু শক্তিনাথ নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারেন না, বার বার বলিতে থাকেন—এটা অমিয়ার উচিত হয় না—বাড়ীতে আর কারো আপত্তি থাকতে পারে।

নিরুপমাকে অবশ্য আসিয়া পর্য্যন্ত চোখে দেখেন নাই তিনি, তবু উপস্থিতির আভাসটা যে বাড়ীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে, সেটা আর বুঝিতে ভুল হয় না।

অপরাধের ভারে কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন বেচারা।

শিবনাথ স্ত্রীর এতোটা আদিখ্যেতা সত্যই পছন্দ করে না, কিন্তু শাসন করিলে অমিয়া আরো বাড়ায়।···গোপনে একবার ক্ষুণ্ণদৃষ্টিতে তাকায়—অর্থাৎ কি লাভ হইল মানুষটাকে অপ্রতিভ করিয়া—মুখে হাসি বজায় রাখিয়া বলে, আপনি ওই সব বাজেলোকের কথা বিশ্বাস করছেন বাবা? মোটেও করবেন না। পয়লা নম্বর কুড়ে, কিচ্ছুটী করতে নারাজ, এখন আপনার জন্যে যা একটু নড়তে দেখছি।···সেটাও পলিসি, পাছে আপনি আমাকে বেশী ভালোবাসেন, বুঝলেন?

সরলচিত্ত শক্তিনাথ হাসিয়া ওঠেন।

—আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে শিবনাথ, তোমার চেয়ে মাকেই যেন বেশী ভালোবেসে ফেলছি—

—বাসুন না, আমার কি? ক্রমশঃ যখন গুণ জানতে পারবেন, টের পাবেন মজা।

ভালোমানুষ মানুষটাকে আনন্দ দিতে স্বভাব-বহির্ভূত চাপল্য প্রকাশ পায় শিবনাথের কথায়।···হয়তো কিছুটা নিরুপমার ব্যবহারের ত্রুটিপূরণ।···

বাপকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মায়ের উপর তার রাগও হয়না, ভক্তিও হয়না, হয় শুধু করুণা মমতা। বেচারা মা! কী শোচনীয় হিসাবের ভুলে কী অমূল্য সম্পদ হইতেই না বঞ্চিত রহিলেন চিরদিন!

শক্তিনাথ স্নানের উদ্যোগ করিতে ওঠেন, মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে শিবনাথ।···দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ বার্দ্ধক্যের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। আহারে বিহারে পোষাকের পরি-পাট্যে শক্তিনাথের এখনো যে প্রাচুর্য্য, যুবক শিবনাথের যদি তার অর্দ্ধেকও থাকিত!

প্রত্যহ তিন মাইল পথ হাঁটিয়া বেড়াইয়া আসেন শক্তিনাথ, অথচ এই কলেজটুকু যাইতে গাড়ীর সাহায্য লইতে হয় শিবনাথের···এই বিশাল শরীরের মধ্যে আছে একটি নির্ম্মল শিশুর বিশ্বস্ত হৃদয়।

এমন হৃদয়ের আবেদন নিরুপমার কাছে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? মাকে তাই আর মহীয়সী ভাবিয়া অভিভূত হইতে পারেনা শিবনাথ, দুঃখিনী বলিয়া বেদনা বোধ করিতে থাকে।

শিবনাথ যাই ভাবুক, নিরুপমা আপন মর্য্যাদা হারান নাই। শিবনাথকে আপন এলাকায় ডাকিয়া তিনি সেই কথাই সমঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন।

—ক'দিন আমি চুপ করেছিলাম শিবনাথ, কিন্তু আর নয়। ওঁকে নিজের পথ দেখতে বলো এবার।

—কি আশ্চর্য্য! তুমি কি করে বলছো বলো তো মা? আমি বলবো—আপনি এবার পথ দেখুন?

—কেন বলবেনা—তা'ওতো বুঝছিনা। অবশ্য তোমার খেয়ালে আর বাধা দেওয়া উচিত নয় আমার, বড় হয়েছো, ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছ, কিন্তু তবুও আমি যতক্ষণ থাকবো, আমার মতেই সংসার চলবে, এই আমার শেষ কথা।

শিবনাথ ম্লানভাবে বলে—কিন্তু তুমিই যে কেন এতো অসন্তুষ্ট হচ্ছো মা, বুঝছি না। তোমাকে তো কোনো সংস্রব রাখতে হচ্ছে না?

—না হোক, তবু অসঙ্গত বাড়াবাড়ি সহ্য করবো না আমি। শেষ পর্য্যন্ত এবাড়ীতে কিনা মুরগী রান্না চলছে! ছি ছি!

মুখ দেখিয়া মনে হয়, এইমাত্র বুঝি উক্ত অমেধ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়া গেছে নিরুপমার। শিবনাথ নিরুপায় ভাবে বলে—আচ্ছা আমি নয় বারণ করে দেব—

কথা সমাপ্ত হয়না, পিছন হইতে অমিয়ার কথা শোনা যায়—বারণ করলেই হ'ল আর কি, বা-রে! বাবার ওসব নইলে খাওয়াই হয় না।

নিরুপমা বিরক্তভাবে বলেন—তোমার মতামত নেবার জন্যে তো ডাকা হয়নি বৌমা।

—না হতে পারে। কিন্তু আপনারা মায়ে-ছেলে যুক্তি করে যে আমার বাবাটীকে তাড়াবার ফিকির খুঁজবেন, সেটী হচ্ছেনা।

—বাড়ী তোমার নয় বৌমা।

—সে যদি আপনি ভেবে সুখ পান, ভাবুন, কিন্তু আমিও বলছি—বাবা এখানেই থাকবেন এবার থেকে।

নিরুপমা শিবনাথ দু'জনেই অমিয়ার এই স্পষ্ট স্পর্দ্ধায় অবাক হইয়া যান। বাঁকা হাসিকে তবু না বোঝার ভাণে পরিহার করিয়া চলা যায় কিন্তু এ যে প্রায় কলহ।...এতো স্পর্দ্ধা কে জোগাইল অমিয়াকে? শক্তিনাথ ছাড়া আর কে হইবে? কই আগে তো কোনোদিন অমিয়ার এতো স্পর্দ্ধা দেখা যায় নাই?

কথাটা মিথ্যা নয়।

শক্তিনাথের প্ররোচনা না হোক, উপস্থিতি।

শ্বশুরকে লইয়া এতো বাড়াবাড়ি অমিয়ার, শাশুড়ীর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলা যায়।...শিবনাথও অবশ্য চায় শেষ জীবনটা অন্ততঃ শক্তিনাথ একটা সংসারের আশ্রয়ে শান্তিতে থাকুন, তবে সেটা মার সঙ্গে কলহ করিয়া নয়, আপোষ করিয়া।...কিন্তু অমিয়ার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে।...এমন যা তা বলিয়া বসে!

নিরুপমা একমিনিট গুম্ হইয়া থাকিয়া সহসা তীক্ষ্ণ হাসির সঙ্গে বলেন—শ্বশুরের ব্যাঙ্কের হিসেবটা স্মরণ করেই বোধ করি বৌমার আমার এতো ভক্তির আধিক্য? তা ভালো—কিন্তু একজনকে তো তোমার ছাড়তেই হয় শিবনাথ! হয় আমায় তাড়াও, নয় তো—

টাকার উল্লেখে অমিয়ার চোখ মুখ রাঙা হইয়া ওঠে।

—বেশ, তা'হলে তাড়াবার ভারটা আপনিই নেবেন! অভ্যাস তো আছে, অসুবিধে হবেনা।...বলিয়া বিদ্যুতের মতো ঝিলিক হানিয়া সরিয়া যায়।

অমিয়ার সেবার হাতটী বাস্তবিকই চমৎকার নিপুণ।

প্রতিপদে এই নিপুণতার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া যান শক্তিনাথ। একজনের খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধার দিকে যে আর একজনের সতর্কদৃষ্টি এমন সতত সজাগ হইয়া থাকিতে পারে, এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

রাত্রে ঘুমাইবার আগে কিছু পড়াশোনা করা শক্তিনাথের বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু লেখা আর পড়ার সরঞ্জামটী বিছানার পাশে গোছানো থাকিবে—হাতের গোড়ায় থাকিবে সিগারেটকেস আর এ্যাশট্রে, খাবার জলটা থাকিবে নিতান্ত আয়ত্তের সীমানায়—চটি জোড়াটা উন্মুখ হৃদয়ে খাটের নীচে পড়িয়া থাকিবে চরণযুগলের প্রত্যাশায়—এ অভ্যাস তো ছিল না! এ সব কি অসম্ভব ঘটনা?

স্নিগ্ধতৃপ্তিতে যেন মন জুড়াইয়া আসে।

বিছানার উপর গুছাইয়া বসেন শক্তিনাথ...কয়েকখানা দরকারি চিঠি লিখিবার আছে...আছে আকর্ষণীয় খানকয়েক বই, অনেক যত্নে বাছিয়া বাছিয়া আনিয়া দিয়াছে শিবনাথ।

চিঠিলেখা শেষ হয়...বই পড়া আর শেষ হইতে চাহেনা।

রাত্রি গভীর হইতে থাকে...বইয়ের ঝোঁকে হুঁস থাকে না।

ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া যায়।

পড়া? না কি তন্দ্রা আসিয়াছিল?

রাত্রি দুইটা বাজিয়া যাইবে—খেয়াল থাকিবে না—এটা কি সম্ভব? কিন্তু তন্দ্রা ছুটিয়া যাওয়ার পর...স্বপ্ন দেখা যায়? বহুবার বহুরূপে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন শক্তিনাথ। নিরুপমা?...কিন্তু—

স্বপ্নের নিরুপমা কি এমন শীর্ণ শুষ্ক শ্রীহীন?...ষোলো বছরের নিরুপমাকে চিনিয়া বাহির করিতে হইবে এই ছায়ামূর্ত্তির ভিতর হইতে?

ভীতত্রস্ত শক্তিনাথ অস্থির হইয়া ওঠেন...আর কিছুর জন্য নয়, কোথায় বসিতে দিবেন নিরুপমাকে এই ভাবিয়া।

—থাক আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবেনা, বসছি.আমি।

ধর্মভ্রষ্ট আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছ শক্তিনাথের শয্যার একাংশে বসিয়া পড়েন নিরুপমা।...

এতো রাত্রে কি আর জাগিয়া পাহারা দিবে অমিয়া?

—তুমি আর কতোদিন থাকবে এখানে?

অস্বস্তিকর ফিসফিস্ গলায় প্রশ্ন করেন নিরুপমা। কিন্তু প্রশ্নটা তীক্ষ্ন। শক্তিনাথ বিব্রতভাবে বলেন—আমি তো ইয়ে—এতদিনে চলেই যেতাম—শুধু শিবনাথ বৌমা এরা যে কিছুতেই—

—ওদের কথা থাক, এখানে থাকবার আর কোনো কারণ নেই তোমার? নিজের ইচ্ছে নেই কিছু?

ইচ্ছা! কারণ!

শক্তিনাথ বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকেন, নিরুপমার দিকে। কি বলিতে চান নিরুপমা? কি বলিতে আসিয়াছেন?...প্রেম নিবেদন করিতে নয় নিশ্চয়ই?

পঁয়ত্রিশ বছর আগে যে লাবণ্যময়ী তরুণীর শয্যাপার্শ্ব হইতে চুপিচুপি পলায়ন করিয়াছিলেন—শক্তিনাথ, এতদিন পরে তার প্রেতমূর্তি শক্তিনাথের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিল কি ব্যঙ্গ করিতে? না প্রতিশোধ লইতে? শক্তিনাথের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনো কি শেষ হয় নাই?

কিন্তু প্রতিশোধের মূর্তি কি এতো করুণ? প্রতিশোধের ভাষা কি এতো দীন?

—তোমার সঙ্গে আমাকে নিযে চলো—

কে উচ্চারণ করিল একথা? নিরুপমার কণ্ঠ?

—আমার সঙ্গে? নিয়ে যাবো?

হতবুদ্ধি শক্তিনাথ আর কোনো ভাষা খুঁজিয়া পাননা, নিরুপমার কথারই পুনরাবৃত্তি করেন।

—হ্যাঁ তোমার সঙ্গে। পায়ে পড়ছি, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, চিরদিন তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি—তার শোধ নিতে তুমিও যেন আজ ফিরিয়ে দিওনা আমায়।

মুখ দেখা যায় ন'—পায়ের কাছে বালিশের উপর চাপিয়া-ধরা মুখ হইতে গলার স্বরটা শোনা যায় শুধু।...ছেলেবেলাতেও এমনি পায়ের দিকে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিত না নিরুপমা?...

কি আশ্চর্য্য! কি অদ্ভুত!

নিরুপমা এখনো কাঁদিতে পারে?

—নিরু ওঠো, মুখ তোলো, ওঠো।

পা গুটাইয়া কুণ্ঠিত হইয়া বসেন শক্তিনাথ।

—উঠবোনা, তুমি আগে বলো—

—কি বলবো? কিসের কথা? বুঝতে পারছিনা আমি।

এমন অসম্ভব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, একথা তো কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবা ছিলনা।

—আমায় নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? বলো—

—এ সৌভাগ্য যে আমার স্বপ্নের অতীত নীরু। কিন্তু তুমি কি পারবে?

—পারবো, পারবো, এখানে আর এক মুহূর্ত টিঁকতে পারছি না আমি। বলো নিয়ে যাবে?

—সৌভাগ্যটা বিশ্বাস করতে পারছিনা নিরু।

—বিশ্বাস করো। আর ক্ষমা করো আমাকে—আর পারছি না আমি। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন শক্তিনাথ। কতোক্ষণ? কতো যুগ? কতো যুগ এমনভাবে পায়ের কাছে পড়িয়া থাকিবে নিরুপমা?

—নিরু ওঠো, সব ঠিক হয়ে যাবে।...

ধীরে ধীরে নিরুপমার মাথার উপর একখানা হাত রাখেন শক্তিনাথ।

হাঁ, ঠিক হইয়া যাইবে বৈ কি।

বেঠিক মানুষটা নিজের ঠিকানায় ফিরিয়া গেলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।...সুদূর প্রবাসে যে শূন্যঘরখানা অপেক্ষা করিতেছে তাহার জন্য...এলোমেলো বিশৃঙ্খল সেই ঠিকানায়। শক্তিনাথের সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে তার।

সে-ঘরে শুধু শক্তিনাথকেই মানায়...শুধু স্বপ্নের নিরুপমাকেই স্থান দেওয়া চলে...কিন্তু রক্তমাংসের নিরুপমা? ...নাঃ, শক্তিনাথ নির্বোধ হইতে পারেন, কিন্তু পাগল নন।...

সব ঠিক হইয়া যাইবে...শুধু কাঁচের গ্লাসের জলটা পড়িয়া থাকিবে নিথর...শুধু বিছানাটা পড়িয়া থাকিবে শূন্য...অমিয়া বই দেখিয়া দেখিয়া যে নতুন রান্নাটা শিখিয়াছে, সেটা আর কাল রাঁধিতে হইবে না তাকে...অনেক যত্নে যে অমূল্য বইগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে শিবনাথ.. সেগুলি খোলা হইবে না...তা'ছাড়া আর কিছু নয়।...

জগতের সকলের জন্য ঘর আছে, নাই শুধু শক্তিনাথের জন্য।

শিবনাথ কি ভাবিবে—অমিয়া কি ভাবিবে?

অকৃতজ্ঞ?...হয়তো তাই।

নিরুপমা?...নিরুপমা ভাবিতে পারে প্রতিশোধ। ভাবিবে—তিন যুগ পরে প্রতিশোধ লইলেন শক্তিনাথ, প্রত্যাখ্যানের অসম্মান ফিরাইয়া দিয়া।...

কিন্তু নিরুপমা মত পরিবর্ত্তন করিল কেন?

—

স্বপ্নভঙ্গ

—:*:—

নেহাৎ যে ভাতের অভাব ঘটিয়াছিল এমন নয়, তবু—বেকারত্বের যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই উপার্জ্জনের চেষ্টায় একদিন মগের মুলুকে আসিয়া হাজির হইলাম।

বলা বাহুল্য আমার এই বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টায় বাড়ীতে কাহারও তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না; একে তো—মায়ের 'কোলের ছেলে' হইয়া জন্মানোর অপরাধে চিরকাল সকলে আমার বয়সটাকে হাসিয়া উড়ায়, আজ পর্য্যন্ত সাবালক বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার উপর একেবারে সমুদ্রপাড়ি।

সম্মতি থাকার কথা নয়।

আমি কিন্তু—উপার্জ্জনের জন্য যত না হোক নিজের নাবালকত্ব ঘুচানোর জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুরেশ থাকে বর্ম্মায়—বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র বছর দুই আগে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"র অনুপ্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, ঈশ্বর জানেন কি করে—চিঠিপত্রের আঁচে মনে হয় যেন 'লাল' হইতে সুরু করিয়াছে। লুকাইয়া তাহাকেই অনুরোধ করিয়াছিলাম আমার 'আখেরে'র চিন্তা করিতে। সে ঢালা হুকুম দিয়াছে, "চলে আয়—যা হয় একটা হবেই।"

অতএব 'কোন বাধা আমি মানিনা' গোছের মনোভাব লইয়া জাহাজে চড়িয়া বসিলাম।

মার অশ্রুসজল অভিযোগ, দাদাদের অভিমানব্যঞ্জক গম্ভীর মুখ, এবং বৌদিদিদের সস্নেহ অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়াও অটল ছিলাম, টলিলাম জাহাজে উঠিয়া। প্রথমে মাথা টলিল, তাহার পর পা, অতঃপর সর্ব্বাঙ্গ, এবং অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীণ ভাবে জড়িত যে হৃদয় সেও রীতিমত টলিতে লাগিল।

প্রথমে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হইল কি? পরে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হয় নাই, শেষ পর্য্যন্ত ভাবিলাম কাজটা গর্হিত হইয়াছে। মিথ্যা বলিব না—ফেরত ডাকেই ফিরিয়া আসিব, এমন সাধু সঙ্কল্পেরও উদয় হইয়াছিল।

তবে কথায় বলে 'জলে পড়া'। সেই জলে পড়া অবস্থায় মনের ভাব যতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, ডাঙায় পা ফেলিতে অনেকটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হাস্যোজ্জ্বল মুখ চোখে পড়ায় সমুদ্রপীড়ার গভীর পীড়া ভুলিয়া মুখে হাসি ফুটিল।

—কি রে এমন 'ডাইনে খাওয়া' চেহারা কেন? সুরেশ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—খুব বুঝি ভুগেছিস 'সী-সিক্‌নেসে'?

—আর বলিস কেন—পাঁচ দিন জল নেই পেটে। তুই এসেছিস তা' হলে? এমন ভাবনা ধরেছিল—

—আসব না মানে? কথার ভূমিকাস্বরূপ চিরপরিচিত থাপ্পড়টির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া সুরেশ উত্তর দেয়—জ্যান্ত থেকে আসব না? মরে গেলে প্রেতাত্মা হয়েও আসতাম তোকে রিসিভ করতে।

—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ততদূর করতে হ'ল না তোমায়, এখন দেখ আমার জিনিসপত্রগুলো:—

—সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্যে ভাবনা নেই, তোর জন্যে কাজে গেলাম না আজ। আয় দেখি—

দেখিলাম সুরেশ ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন—মায়ের 'কোলের ছেলে' তো নয়।

বাসায় যাইবার পথেই সুরেশ জানাইল—এসে পড়েছিস ভালোই হয়েছে—আমাদের বড় সাহেবের আলাপী একটা সাহেব—বার্ম্মিজ সাহেব অবশ্য, খোঁজ করছিল একটা লোকের। ইনসিয়োর-আফিস—মাইনেটা মনে হয় খুব খারাপ নয়, কালই একবার 'ইনটারভিউ' দিয়ে আয় না।

আসিতে আসিতেই যাই হোক একটা চাকরীর বার্ত্তা পাইয়া মনটা কিঞ্চিৎ খুসী হইল। জ্ঞাতব্য বিষয় দুই চারিটা জানিয়া লইতে লইতে বলি—তুই সঙ্গে যাবি তো?

—আমি? আমি—আমার কি করে যাওয়া সম্ভব হয়? আজ কামাই করলাম—কেন ভয় খাচ্ছিস না কি? তুই দেখছি সেই রকম নার্ভাস আছিস এখনো। কিছু ভাববার নেই, এখান থেকে বড় সাহেব ফোন্ করবে অখন—সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যাস বরং, কাজের ভীড় কম থাকে, কথাবার্ত্তার সুবিধে করতে পারবি। সার্টিফিকেটগুলো

এনেছিস-তো? হ্যাঁ—জায়গাটা একটু ঘিঞ্জিগোছের বটে, তা' ছাড়া পথঘাট তোর অজানা। আমি বলি কি একটা ট্যাক্সিই নিস, ঠিকানা বলে দিলে ঠিক পৌঁছে দেবে। বুকে বল আনো 'নওজোয়ান'।

পেটেন্ট থাপ্পড়ের জোরে সুরেশ আমায় চাঙ্গা করিয়া তোলে।

পরদিন সুরেশের উপদেশ ও বরাভয় সম্বল করিয়া বাহির হই—মংকু টুংকু কি গ্যাং-কো—ঈশ্বর জানেন কাহার উদ্দেশে—একেই তো অজানায় আমার বড় ভয়, তার উপর সারাদিন মেঘ করিয়া থাকার দরুণ মনটাও যেন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জায়গাটা—সুরেশ নিতান্ত বিনয় করিয়া "একটু ঘিঞ্জি গোছের" বলিয়াছে। 'একটু' নয়, যৎপরোনাস্তি। 'রাজরাস্তা' বলিতে সরল একটা পথই নাই, মনে হয়—যে যেখানে পাইয়াছে, যথেচ্ছভাবে দোকান গাড়িয়া বসিয়া আছে, রাস্তাই তাহাদের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে ঘুরিয়া বাঁকিয়া যেন তেন প্রকারে নিজের একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্কীর্ণ গলি সঙ্কীর্ণতর হইবার মুখে একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী থামাইয়া চালক মহাপ্রভু সসম্ভ্রমে জানাইলেন গাড়ীর আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই, অতএব নামা দরকার। বেশী হাঁটিতে হইবে না—ডানহাতি গলিটা পার হইয়া বাঁহাতি আর একটা ধরিলেই খান চারেক বাড়ীর পরেই দোতলা বাড়ী, কাঠের সিঁড়ি দিয়া সটান উপরে উঠিয়া গেলেই গন্তব্য স্থান মিলিবে। লোকটা ইংরাজি জানে, ভদ্রগোছের চেহারা, ভাড়া মিটাইয়া দিয়াও তাহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া দুরু দুরু হৃদয়ে অগ্রসর হইলাম। কি জানি বাবা গাড়ীটা ছাড়িয়া দিলে ফিরিতে পারিব কি না।

পরবর্ত্তী ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন, এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে যে—নিজে নিজেই স্বীকার করিলাম যে সাবালক হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে আমার। পূর্ব্ব দক্ষিণ ঈশাণ নৈঋত কোন পথেই অভীষ্ট স্থান খুঁজিয়া পাই নাই শেষ পর্য্যন্ত—একই পথে পাঁচবার ঘোরাঘুরি করিয়া অন্যের সন্দেহভাজন হইবার ভয়ে পূর্ব্ব-পরিচিত মোড়ে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি ট্যাক্সির কোনো চিহ্ন নাই।—কোথায় গেল—সেই জানে। অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য থাকিবেই বা কেন, সেটা আর মনে পড়িল-না। তবে—এটা যে সেই মোড়টাই কি না, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া গেল। সব দোকানগুলাই এক ধরণের, সব মুখগুলাই এক ছাঁচের।

ঠিক এই সময়—সারাদিনের বর্ষণোন্মুখ আকাশ বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিতে কবিত্বের মত, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আসলে মনের অবস্থা যা দাঁড়াইল, তাহাকে ঠিক কবিত্বের কোঠায় ফেলা চলে না।

কোনো রকমে মাথাটা বাঁচাইয়া একটা জুতার দোকানের শেডের নীচে দাঁড়াইলাম···—বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নাই। পড়ন্তবেলা মেঘের ছুতায় অসময়ে নোটিশ দিয়া গেল, কাজেই সন্ধ্যাদেবী আসিয়া চার্জ্জ বুঝিয়া লইলেন। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেই লাগিলাম।

দোকানদারটার সঙ্গে ইংরাজীতে একটু আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিয়া করিয়া ব্যর্থ হই, লোকটা—নীরেট ব্রহ্ম।

পাশেই একটা রুমালের দোকান হইতে—ওয়ালা নয়—ওয়ালী বোধহয় আমার দুরবস্থায় দয়াপরবশ হইয়া ভিতরে গিয়া বসিতে অনুরোধ জানাইতেছিল, ভাষা না বুঝিলেও ভাবে বুঝি—কিন্তু মার সনির্ব্বন্ধ সাবধান-বাণী মনে পড়িল, কাজেই সবিনয়ে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া ভিজিতেই থাকি।

একেই বলে সুখে থাকিতে ভূতের কীল খাওয়া! কি এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল সুখের কলিকাতা ছাড়িয়া এই ভাগাড়ে আসিয়া মরিতে? ভদ্রলোকের জায়গা নাকি? সুরেশ চিরকেলে ডাকাবুকো, ওর এসব হতচ্ছাড়া জায়গা পোষায়। কিন্তু আমার? নমস্কার বাবা! আপাত-দৃষ্টিতে এই জলেজলময় নোংরা ঘিঞ্জি পাড়াটাকেই সারা ব্রহ্মদেশের প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

বৃষ্টি যখন ধরিল, তখন রীতিমত অন্ধকার। অনেক অনুসন্ধানে একখানা অশ্বযান সংগ্রহ করিয়া চড়িয়া বসি, গাড়োয়ানটার মুখে দুই একটা বোধগম্য হিন্দি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। সুরেশের ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া গুছাইয়া বসিলাম। তখনো টিপি টিপি বৃষ্টির বিরাম নাই, ভিজে পোষাকের উপর জোলো হাওয়া লাগায় দস্তুরমত শীত করিতেছিল।

গাড়ী চলিতেছে···আমি ঢুলিতেছি···পথ ফুরাইবার লক্ষণ মাত্র নাই। প্রথমে ভাবি—হাজার হো'ক ঘোড়ার গাড়ী, চল্লিশ মাইল স্পীড আশা করাই অন্যায়, ন্যায্য সময়ে পৌঁছাইয়া দিবেই। গাড়োয়ানী করিয়া খায়, ঠিকানা দিলে পথ চিনিবে না?

হায়—মূঢ় হৃদয়! কি ভুলই করিয়াছ! এই বিশাল জগতে কোটি কোটি লোক পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর—এতো তুচ্ছ একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান।

ভুল যখন ভাঙিল তখন রাত্রি দশটা, হঠাৎ চমক ভাঙা হইয়া মনে হইল সারারাত বুঝি চলিতেছি···হয়তো বা ব্রহ্ম-দেশ হইতে বঙ্গদেশেই আসিয়া পড়িলাম। অগত্যা গাড়ীর জানালা খুলিয়া তারস্বরে চেঁচাই, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি আমায় হয়তো মাতাল ঠাওরাইয়া যথেচ্ছা চরিয়া বেড়াইতেছিল, সাড়া পাইয়া গাড়ী থামাইল এবং নামিয়া ভাড়া চাহিল।

বলা নিষ্প্রয়োজন, সুরেশের বাড়ীর চিহ্নমাত্র সেখানে নাই।

কাতর আমি, দীন ভাষার করুণ ভঙ্গীতে বারবার নিজের গন্তব্য স্থানের বিষয় প্রশ্ন করি···উত্তরে হতভাগা যাহা জানাইল, তাহার তাৎপর্য্য এই—ভুলক্রমে উল্টাপথে আসা হইয়া গিয়াছে! অতএব এই রাত্রে—এই দুর্য্যোগের রাত্রে ফিরিয়া সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব! অসম্ভব বলিলেও নাকি অন্যায় হয় না। ঘোড়া রীতিমত 'টায়ার্ড' হইয়া পড়িয়াছে—কাজেই সে বাধ্য হইয়া আমাকে এই অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজের আস্তানায় যাইতে চায়, শুধু তা'র আগে—চায় তাহার প্রাপ্য ভাড়া—নগদ তিন টাকা বারো আনা মাত্র।

সেই অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাতেও ধৈর্য্য অবলম্বন করি, চুপ করিয়া থাকি, গালাগাল দিয়া গাত্রদাহ মিটাইব, সে সাহস নাই। সরু গলির ঝাপ্‌সা মিটমিটে আলোয় সেই বাঘমুখো মগ গুণ্ডাটার পানে চাহিয়া আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইবার জোগাড়। গালমন্দ তো দূরের কথা।

আহাম্মুকির উপর আহাম্মুকি—পকেটে বাড়তি কতকগুলা টাকা। খরচের সুবিধা করিতে গোটা পঁচিশ টাকা এক টাকার নোটে চেঞ্জ করিয়া লইয়াছিলাম, সেটা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। যদিও কোটের ইন্‌সাইড্ পকেটে লুকানো আছে, তবু ভরসা করিতে কিছুই নাই। লোকটা যদি একবার আমার হাতটা চাপিয়া ধরে—টাকাতো টাকা, হাতে বাঁধা ঘড়িটা হইতে চোখের চশমাখানা পর্য্যন্ত খুলিয়া উহার অপর হাতে তুলিয়া দিব, নিজের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস রাখি।

অতএব তাহার বোকামীর জন্য কৈফিয়ত চাহিবার পরিবর্ত্তে নিজের বোকামীর খেসারত ধরিয়া দিই। পার্স খুলিয়া নগদ করকরে আস্ত টাকাই চারটে দিই। চার আনা কাটিয়া লইবার কথা মুখেও আনি না।

গুণ্ডাকৃতি হইলেও বোধ হয় নেহাৎ গুণ্ডা নয় লোকটা, আমার বদান্যতায় খুসীই হইল। বাঘ মুখে নেকড়ের হাসি হাসিয়া দিব্য আপ্যায়িতের ভঙ্গীতে সেলাম ঠুকিয়া জানাইল—ভাবনার কারণ কিছুই নাই, যৎসামান্য মূল্যের বিনিময়ে রাত্রিটুকুর মত আশ্রয় এখানে না কি বিস্তর মেলে, চাই কি আহারও জুটিতে পারে।

অনির্দ্দিষ্ট ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লোকটা খোস্ মেজাজে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মিথ্যা বলিব না—চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল সারা পৃথিবী কেবলমাত্র সরিষার ক্ষেতে পরিণত হইয়াছে।

নোংরা অপরিসর গলি, দু'ধারে ইতর বস্তি, বাঁকাচোরা জোড়াতালি দেওয়া কুশ্রী ঘরগুলা যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িতে চায়। গাড়ী ইহার ভিতর আসিল কেমন করিয়া, এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এখন উপায়?

ও তো বলিয়া গেল রাত্রির মত আহার ও আশ্রয় মেলে—কোথায় সে? কেমন আশ্রয়? নিশ্চয় হোটেল—সস্তার হোটেল। আহার চুলায় যাক্, আশ্রয় একটা অবশ্যই চাই। এইতো—আবার বৃষ্টি নামিল, সারারাত দাঁড়াইয়া কিছু আর ভেজা চলে না। তবে হাঁ, তেমন সন্দেহজনক ভাবে পথের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিলে রীতিমত আশ্রয় মিলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়; রাজার অতিথিশালা। সরকারি আশ্রয়। কিন্তু আপাততঃ তাহাতে তেমন উৎসাহ বোধ করি না।

'যা থাকে কপালে' গোছ ভাবে সামনের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকি। দুর্য্যোগের রাত—তাই ইতিমধ্যেই পাড়াটা নিঃঝুম মারিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘরে দুয়ার বন্ধ। আমি? মনে মনে কল্পনা করি···আমি—একা এই মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া একটা কুৎসিত পল্লীর গোপন পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি? অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে সহজে, কল্পনা করাই শক্ত।

কিন্তু এই অনির্দ্দিষ্ট যাত্রার সমাপ্তি ঘটে···সহসা অনুভব করি, পথ অনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, অসীম নয়। বিনা নোটিশে এক জায়গায় থামিয়া বসিয়াছে। ব্লাইণ্ড গলি।

হতভাগা গাড়োয়ানটা যে ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ভূতগ্রস্তের মত আবার উল্টামুখ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে সুরু করিয়াছি, সহসা পিছনে—নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না—পরিস্কার বাঙলায় প্রশ্ন হয়—আপনি কি বাঙালী?

কণ্ঠস্বর মধুর কিনা তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু—পথভ্রান্ত নবকুমারের কানে—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো?" এর চাইতে বেশী মধু বর্ষণ করিয়াছিল কি?

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যেন ধাক্কা খাইলাম।···অথচ—এ ছাড়া—এর চাইতে ভালো কি আশা করিবার ছিল—এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে?

তবে হাঁ—আশা করিবার মত নয়। বাঙালীর মেয়ে—সমুদ্র ডিঙাইয়া এই শত শত মাইল দূরে আসিয়া, চোখে কাজল আর মুখে খড়ি মাখিয়া কুৎসিত জীবন যাপন করিতেছে—এ দৃশ্য যে কতটা অসহ্য, সে বোধকরি চোখে না দেখিলে বোধগম্য হয় না।

বয়স হয়ত বেশী নয়—হয়তো বেশী, মুখ দেখিয়া সহসা অনুমান করা শক্ত, লালিত্যবর্জ্জিত মুখে অনেক অনাচারের ছাপ সুস্পষ্ট। একটা মোমবাতি উঁচু করিয়া ধরিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।···

গাটা কেমন ঘিন্‌ঘিন করিয়া ওঠে···তবু—বাঙলা কথার মোহ। আর এই বিশ্রী বেঘোর বেপোট অবস্থা। নিতান্ত

তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করি—এখানে হোটেল আছে কোথাও ?

হোটেল ? কেমন বিমূঢ়ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্তু সেখানে ? সেখানে কি আপনি থাকতে পারেন ? ভদ্রলোক—বাঙালী।

উপায় কি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সারারাত কাটাতে পারি না ? আবার তো জোরে বৃষ্টি আসছে—

যে রকম বীর বিক্রমে কথাটা উচ্চারণ করি, যেন আমার এই নিরতিশয় দুরবস্থা এবং আসন্ন বৃষ্টির জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী সেই।

সে কিন্তু নিজের দোষই স্বীকার করিয়া লয় যেন—কুণ্ঠিত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে—সত্যি বড্ড বিষ্টি আসছে যে—কি হবে বলুন তো ? সে তো ঠিক হোটেল নয়—বরং ভাঁটিখানা বলতে পারেন, খালি মাতাল গুণ্ডা আর ছোট লোকের আড্ডা—গেলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। হয়তো কেন নিশ্চয়ই—

বিরক্তভাবে বলি—এই বা কি সম্পদে পড়েছি ? দুর্ভোগ যখন রয়েছে কপালে—

—তাইতো—কিন্তু আপনি—আপনি এদিকে এ সময় কেনই বা এলেন ?

—ইচ্ছে করে মোটেই আসিনি, হতভাগা গাড়োয়ানটা পথ ভুল করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল। রাস্তা ফাস্তা কিছুই চিনি না—সবে কাল নেমেছি জাহাজ থেকে—

—কাল এসেছেন ? কলকাতা থেকে ?

বাতির আলোয় ওর খড়ি মাখা পাঙাশ মুখখানা যেন উজ্জ্বল দেখায় হঠাৎ।

—হাঁ।

বিরক্ত ভাব বজায় রাখিয়াই উত্তর দিই। দাঁড়াইয়া ইহার সঙ্গে কথা কহিতেছি—মনে করিতেই প্রেস্টিজে রীতিমত আঘাত লাগে।

—কল্‌কাতায়—কোথায় ? কোন্ রাস্তায় বাড়ী আপনার ? শ্যামবাজারের দিকে ?

কথাটা উচ্চারণ করে কেমন বোকা বোকা সরল মেয়ের মত। রাগ করিবার কথা নয়, তবু এই গায়ে-পড়া আলাপে গা জ্বালা করিয়া উঠে। ভাবি যে—পা চালাইয়া চলি—আর কথার উত্তর দিব না।

কিন্তু মধুসূদন নাকি দর্পহারী। ঠিক এই সময় এমন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, যে—চোখে কানে দেখিতে দেয় না, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই ঘৃণ্য জীবটার পিছন পিছন তাহারই কোটরে গিয়া ঢুকি।

হাঁ কোটর ছাড়া তাহার আর বিশেষণ নাই। ঘর বলিলে ঘর কথাটার অবমাননা করা হয়।

জীবনে কোনদিন—জীবনে কেন—স্বপ্নেও কি ভাবিয়াছি—এরকম আস্তানায়, রাত্রি কাটানো তো দূরের কথা, পা দিব ?

মেয়েটা হয়তো তা' বোঝে, আমি যে ভদ্রলোক এবং ওর ঘরটা যে নিতান্তই ভদ্রলোকের অনুপযুক্ত, সে জ্ঞানটা ওর আছে।

অথচ—এই দূর নির্বাসনে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঙালীকে—কলিকাতার লোককে—কাছে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পায়। কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া ওঠে।

খাতির জিনিষটার এমনি গুণ, অতি বিরূপ চিত্তকেও ঈষৎ নরম করিয়া আনে, কাজেই অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে বলি—

থাক্ থাক্ ব্যস্ত হতে হবে না। এই যে এই চেয়ারটায় বসছি।

গৌরব করিয়া—অথবা অন্য নামের অভাবে—চেয়ারই বলি, হয় তো—এক সময় ছিলই তাই, এখন টুল বলিলেও অন্যায় হয় না।

তাহার উপরই বসি, তা' ছাড়া আছেই বা কি ঘরে ? আসবাবের মধ্যে তো এই ময়ূর সিংহাসন, আর তিনপদ বিশিষ্ট একখানি চৌকী, যাহার চতুর্থ চরণের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা উপুড় করা প্যাকিং কেস্।

চৌকির উপর বিছানা পাতা, তাকাইলে ঘৃণা হয়, যেমনি ময়লা, তেমনি ছেঁড়া। মেয়েটার শরীরে সাধারণ জ্ঞান কিছু আছে, আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টিকটু জিনিষটা গুটাইয়া চৌকির পিছনে ফেলিয়া দেয় ; চৌকির তলা হইতে টানিয়া বাহির করে একখানা ক্যাম্প চেয়ার। ধূলায় ভর্ত্তি হইলেও জিনিষটা আস্ত। আঁচলে ধূলা ঝাড়িয়া সেটা পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করে।

ওরই যেন মাথা কি তেছি এইভাবেই গিয়া বসি। অথচ না বসিয়াও উপায় ছিল না। পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। একে গত ক'দিনের সমুদ্রপীড়ার দুর্ব্বলতা, তাহার উপর এই দুর্ভোগ।

মেয়েটা নিরুপায় ম্লান মুখে প্রশ্ন করে—আপনার তো খাবার দরকার ছিল ?

এখানে খাওয়া ? ভাবতেই গা কেমন করিয়া আসে, তাড়াতাড়ি বলি—না না খাবার দরকার কিছু মাত্র নেই।

—থাকলেই বা কি করতাম—কণ্ঠস্বরে করুণ একটা হতাশভাব ফুটিয়া ওঠে—এখানে এক গ্লাস জল খাবারও প্রবৃত্তি হ'বে না আপনার, কোনো ভদ্রলোকেরই হবে না।

হঠাৎ একটু করুণার সঞ্চার হয়। আহা বেচারা, নামিয়াছে বটে—জাহান্নমের তলায় তলাইয়া গিয়াছে হয়তে

—তবু—কতখানি নামিয়াছে, সে জ্ঞানটা এখনো হারায় নাই।

একটু লঘুভাবে বলি—ভিজে পোষাক গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলের দরকার কিন্তু সত্যই হয় না।

ও মলিন ভাবে একটু হাসে,—কিন্তু চা পেলে তো ভালো হ'ত? কোনো ভালো জায়গায় যদি উঠতেন, ভিজে পোষাকও বদলাতে পেতেন, গরম খাবারও খেতে পেতেন।

—কি আর করা যাবে, ভাগ্যে নেই যখন?...বলিয়া হাসি।

অগত্যাই একটু হাসিতে হয়।

বাতিটা আমারই মুখের সামনে বসানো আছে। ওর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের সেই কুশ্রী লালিত্যহীনতা, খড়ি কাজলের বিকৃতি, কিছুই আর চোখে পড়ে না।

হয়তো কথা কওয়া সহজ হইয়া আসে সেই জন্যই।

নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই বা কেমন লাগে? ঘুম—আসিবে না—আসা সম্ভব নয়, সারারাত্রি এই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রায়ান্ধকার ঘরে এক অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া থাকাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া—চুপচাপ? কথা কওয়াই সহজ বরং। অরুচিকর হইলেও অশান্তিকর নয়, মন্দের ভালো।

নিজেই কথা পাড়ি—আমি যে বাঙালী, জানলে কি করে?

কথা শুনে।

কথা শুনে? অবাক হইতে হয়—কথা আবার কখন কইলাম? কার সঙ্গে?

—নিজের সঙ্গেই, সেই যে যখন পথ বন্ধ দেখে ফিরলেন? বললেন "কি সর্ব্বনাশ"!

অসম্ভব নয়, অজ্ঞাতসারেই বলিয়া থাকিব। বলি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে না কি?

—রাস্তায় নয়, জানালায়। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিষ্টি দেখছিলাম, দেখলাম আপনি যাচ্ছেন—এ পাড়ায় এ রকম স্যুট্ পরা ভালো ভদ্রলোকের তো আনাগোনা বিশেষ দেখি না, বর্ম্মি গুণ্ডা, আর মুসলমান খালাসীর আড্ডা। কৌতুহল হ'ল, বাতি জ্বেলে দরজাটা খুলেছি—দেখি ফিরে আসছেন তাড়াতাড়ি। থাকতে পারলাম না ডেকে ফেললাম। আপনার গলা শুনে—বাঙলা কথা শুনে—ইচ্ছে হ'ল পুজো করি।

হাসিয়া ফেলি—কেন বাঙলা কথার এত দুর্ভিক্ষ না কি? বাঙালী তো এখানে অজস্র আছে?

—আছে তো, কিন্তু এদিকে আসবে কেন তারা? মানুষে কি আসে এখানে? পিশাচ পুরী। কারা আসে জানেন? শয়তান আর রাক্ষসের দল। নরকের কীট, আর আমাদের মত আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা!

ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শেষের দিকটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে।

কেমন যেন একটু মমতা জন্মায় মেয়েটার ওপর। ঈষৎ কোমল সুরে প্রশ্ন করি—তা' তুমি এখানে আছ কেন? এত দূরে এসে পড়লেই বা কি করে?

—সে অনেক ইতিহাস। শুনলে হয়তো আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আজ সাত বছর ধরে যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি, তা' মনে করলে নিজেই শিউরে উঠি, আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, এত লাঞ্ছনাতেও বেঁচে আছি কি করে! তবু—বেঁচেও রয়েছি। আশা হয়, হয়তো—আবার কখনো মানুষের মতন করে বাঁচবো! এই হীন জঘন্য জীবনই যে আমার একমাত্র জীবন, এ আমি এখনো ভাবতে পারিনে।

আহা বেচারা! হয়তো ভালো ঘরেরই মেয়ে ছিল। কে জানে কি ওর ইতিহাস।

—শ্যামবাজারে তোমার কেউ আছে বুঝি? প্রশ্ন করি।

—কেউ? সব—সব—সব্বাই আছে আমার সেখানে। আমাদেরই বাড়ী যে—দেখেননি আপনি? বাজারের দিকে যেতে ডান হাতি গোলাপী রঙের বাড়ী? পাশের দিকে দেওয়ালে একটু একটু শ্যাওলা পড়া? রঙ চটা সবুজ জানালা দরজা? মেরামত করা আর হয়ে ওঠে না—দেখেছেন তো সে বাড়ী?

সারা কলিকাতা সহরে নিত্য পথের দুই ধারে ও-রকম বাড়ী অসংখ্য আছে, অজস্র দেখিয়াছি, আলাদা করিয়া করিয়া মনে রাখার কথা নয়, তবু ওর আগ্রহব্যাকুল ভাবটা দমাইতে ইচ্ছা হয় না, অল্প চিন্তার ভান করিয়া বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে যেন—দেওয়ালের বালি টালিও কতক খসে গেছে, শ্যাওলা তো বিলক্ষণ।

—ঠিক্, ঠিক ধরেছেন আপনি—উৎসাহে আর উত্তেজনায় ওর গলার স্বর যেন বুজিয়া আসে,—সেই বাড়ী। হ্যাঁ খারাপ হয়ে তো যাবেই আরো, তারপর থেকে সাত বছর হয়ে গেল। বাবার কি আর বাড়ী মেরামত করবার সখ আছে? মুখে চুণ কালি পড়ে গেছে। উঃ! আমারই জন্যে।

আচ্ছা জ্ঞানপাপী বটে! অপেক্ষাকৃত কঠিন সুরে প্রশ্ন করি—যাতে চুণ কালি পড়ে এমন কাজ করলে কেন?

—নিয়তি আমার! বয়স ছিল কম, বুদ্ধি বিবেচনা আরো কম। চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া মানেই যে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, এ যদি জানতাম তখন।

গভীর একটা নিশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে আরো মন্থর করিয়া তোলে।

নিস্তব্ধতা ভাঙে ওই আগে—আপনি রাগ করছেন, কিন্তু যদি শুনতেন আমার দুঃখের জীবনের কাহিনী, বুঝতেন কত অসহায় আমরা। ভেবে দেখুন দিকিন, মাত্র পনের বোলো

বছরের একটা মেয়ে—জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, বিদ্যে যার ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত—

—ইস্কুলে পড়েছিলে নাকি ? কোন ইস্কুলে ?

বাধা দিয়া প্রশ্ন করি।

—পড়েছি বীণাপাণি স্কুলে। আমার নিজের নামটাও আবার বীণাপাণি ছিল—মেয়েরা এত ক্ষেপাতো—

আমার বড় ভাইঝিটাও বীণাপাণিতে পড়ে, ক্লাশ নাইনেই পড়ে। মনে পড়িতেই—বিদ্বেষবিমুখ চিত্ত অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন স্নেহকোমল হইয়া আসে।...

আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া যাই।...

মমতার সঙ্গে শুনিতে থাকি—ওর উৎপীড়িত জীবনের শোচনীয় ইতিবৃত্ত। ...ক্ষুধিত বর্ব্বরতার নৃশংস কাহিনী হয়তো এমনিই হয়, হামেসাই এমনিই ঘটে, এ কাহিনীতে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তবু বড় ভয়ঙ্কর, বড় করুণ।

প্রচ্ছন্ন প্রেমের বেদনায় মধুর সুন্দর যে হৃদয়, অম্লান ফুলের মত পাতার অন্তরালে নিঃশব্দে ফুটিয়া থাকিতে পারিত, পশুর দুর্দ্দান্ত লালসা তাহাকে ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে ধূলিধূসর রাজপথে, টানিয়া লইয়া গিয়াছে কঙ্করাকীর্ণ কঠিন প্রান্তরে, ঠেলিয়া দিয়াছে কাঁটার জঙ্গলে। সেখানে কত সংগ্রাম, কত ঝড়।

ঝড়ের ঝাপটে তুচ্ছ তৃণখণ্ড কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া পড়ে, কে তাহার হিসাব রাখে ?

একদা যাহার নাম ছিল বীণাপাণি, অতি সাধারণ এক গৃহস্থ ঘরের চারিখানি দেওয়ালের অন্তরালে কল্যাণী মূর্ত্তিতে বেড়াইত, আজ আর তাহাকে মনে রাখিবার দায়িত্ব কাহারও নাই।

জানিতে চাহিলে হয়তো বলিবে—বীণাপাণি বলিয়া কেহ ছিল না। বীণাপাণি বলিয়া যে ছিল—মরিয়াছে।

পুরুষ মানুষ হইলেও ঘরের বাহিরের যথার্থ পরিচয়টা কি, ছদ্মবেশী দুনিয়াখানার আসল চেহারা কত ভীষণ, সে সম্বন্ধে সত্যই কোনো বোধ ছিল না, মানুষের মুখে উপন্যাসের ঘটনা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। উপন্যাস বটে, কিন্তু অক্ষম লেখকের কুলিখিত উপন্যাস। কিন্তু ফিরাইয়া লেখা চলে না ? ফিরাইয়া দেওয়া যায় না ওকে—সুন্দর না হোক —সরল জীবন ? নিশ্চিন্ত জীবন ?

আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করি—তুমি পালাতে চেষ্টা করো না কেন ?

—পালাতে ? কি ক্ষমতা আমার ? এরা যদি জানতে পারে—কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে না ? এদের তো জানেন না আপনি ? কথায় কথায় ছোরা দেখিয়ে শাসায়, এতটুকু অবাধ্য হলে লোহা তাতিয়ে ছ্যাকা দেয়। মানুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান, নরকের কীট। এখন যার অধীনে আছি আমি—বুড়ো চীনেম্যান একটা, ও রকম জঘন্য প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা ঈশ্বর বলতে পারেন। সুধু—অর্দ্ধেক দিন নেশায় বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে এই সুবিধে। একটা মগ গুণ্ডার কাছে তিরিশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল আমায়, সে লোকটাই কি কম সাংঘাতিক ছিল ? তিনটে খুন করেছিল সে। এই যে আপনি বসে আছেন, তা'দের চোখে পড়লে আস্ত রাখতো ?

অজ্ঞাতসারে কাঁপিয়া উঠি...সভয়ে পিছনের অন্ধকার পানে তাকাই...কি জানি কেহ ছোরা উঁচাইয়া নাইতো ?

বীণাপাণি আমার অবস্থা বুঝিয়া অল্প হাসে, বলে—নাঃ আজ আর ভয়ের কিছু নেই। আজ ওরা ডাকাতি করতে যাবে এক জায়গায়, কাল সন্ধ্যার আগে আসবে বলে মনে হয় না।

আশ্বাসের কথা শুনিয়া হাতে পায়ে খিল ধরিয়া আসে। ...কি সব ভয়ঙ্কর কথাবার্ত্তা। দুই হাত ব্যবধানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সহজ ভাষায় যাহার সঙ্গে গল্প করিতেছি, সেই মেয়ে ডাকাতের ঘর করে। ঘরের যাহারা বাসিন্দা, হয়তো এই ঘরে বসিয়া ছোরা শানাইয়াছে মানুষের বুকে বসাইতে। এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ভিতরটা ছটফট্ করিয়া ওঠে। কিন্তু সকালের এখনো অনেক বাকী, তবু তো ঘরে আছি, পথে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে কেহ এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিবে কিনা তাহারই বা নিশ্চয়তা কি।

হতাশ ভাবে বলি—তা'হলে তোমার দেখছি কোন আশাই নেই।

ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া বীণাপাণি চুপি চুপি বলে —চুপ, দেওয়ালের কাণ আছে জানেন তো ? আশা ছিল না —একটু হয়েছে, আপনার কাছে অবশ্য বলতে বাধা নেই, বাঙালী—ভদ্রলোক, এক রকম বন্ধুই আমার। উপায়টা কি জানেন—স্কুলে যখন পড়তাম, সেলাই শেখাতেন—মিশনরি মেম একজন, মিসেস উড্। বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করা বা তা'দের সৎপথে চলবার সুযোগ দেওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত। অনেক চেষ্টায় তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সব কথা অবশ্য খুলে বলতে পারিনি, মানুষে পারেও না, বলেছি বিধবা—নিরাশ্রয়। তিনি আশ্রয় দিতে রাজী হয়েছেন, লিখেছেন—তাঁর কাছে পৌঁছতে পারলেই, আমার ভার নেবেন। তা'—পৌঁছতে হ'লে চাই টাকা—আর সুযোগ। পালাবার সুযোগ। মনে করেছি শেষ চেষ্টা একদিন করবোই—প্রাণপণ করে করবো। কথায় বলে—"মরার বাড়া গাল নেই"—তা' মরেই তো আছি এক রকম। মনে করেছি সরে পড়বো, বাঁচি বাঁচবো, মরি মরবো। চীনে বুড়োকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ দিয়ে—দিনের বেলাই পালাতে হয় বুঝলেন ? রাত্রে বেরোলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা

বেশী। এখানকার লোকগুলো নিশাচর কিনা। আঃ, একবার যদি যেতে পারি! মিসেস উডের আশ্রয়ে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়, যেখানে অন্ততঃ পুরুষ মানুষ নেই। পৃথিবীর বাইরেও যদি এমন কোনো দেশ থাকতো—যেখানে পুরুষের মুখ দেখতে হয় না।

ঈষৎ আহত ভাবে বলি—সব পুরুষ মানুষই কি সমান?

—বেশীর ভাগ। বিষাদম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয় বীণা—আপনার মতন মহৎ আর ক'জন আছে বলুন?

—মহত্ত্ব তো কত? বিনয় করিয়া বলি।

—আছে, আপনি বুঝবেন না। বয়সে বড় হ'লেও অনেক ছেলেমানুষ আছেন এখনো। সে যাক্ কিন্তু একটুও ঘুম হ'লোনা আপনার, অসুখ করবে।

হঠাৎ খেয়াল হয় সত্যই ভারী ঘুম পাইতেছে। কিন্তু ঘুমানো চলে না, তবে—শুধু ক্লান্তি দূর করিতে চোখের পাতা দুইটা বুজিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একে কিছু সাহায্য করিতেই হয়, টাকা সঙ্গে যখন আছেও কিছু।

একটু চুপ করিয়া বলি—টাকার কি করেছ?

—টাকা?

হঠাৎ ও চৌকি হইতে উঠিয়া আমার একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, অস্বাভাবিক ভীত কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে—আপনাকে যখন সবই বললাম—তখন বলি, টাকার যোগাড় কতকটা হয়েছে। দু' আনা এক আনা করে আস্তে আস্তে কিছু জমিয়ে ফেলেছি। বস্তির কারো কারো জামা টামা সেলাই ক'রে দিয়ে, ছেঁড়া রিফু ক'রে, মাঝে মাঝে দু'চার পয়সা পাই; ওখানে একটা নুলো মেয়েমানুষ আছে, কিছু করতে পারে না—তা'র রান্না করে দিয়ে আসি লুকিয়ে, সেও মাসে মাসে কিছু দেয়, তা' ছাড়া—চীনেটার যেদিন মন ভালো থাকে—

একটু ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বলে—তবু এখনও আরও পাঁচ সাত টাকা হ'লে ভালো হয়, প'রে যাবার মত একটা ভদ্র কাপড় জামাও নেই। কিন্তু কতদিনে যে হবে ভগবানই জানেন, যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ওরা টাকার কথা, ঠিক কেড়ে নেবে, খুন করে কেড়ে নেবে। এক একটি পয়সা আমার এক এক ফোঁটা রক্ত। প্রত্যেকটি টাকা আমার ভবিষ্যতের স্বপ্ন। এও তবু এক রকম আছি—চীনেটা কি বলে জানেন? একটা খালাসির কাছে নাকি বেচে দেবে! জাহাজের খালাসি—চাটুগেঁয়ে মুসলমান। কী ভয়ঙ্কর চেহারা, দেখলে আপনি পুরুষমানুষ—হয়তো মূর্চ্ছা যেতেন। এসেছিল একদিন—দরে বনল না। ওর হাতে পড়ে গেলে আর কোন ভরসা দেখি না—আগেই যাতে পালাতে পারি, এই দিন রাত্তিরের প্রার্থনা। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? যখন ভাবি—আবার কলকাতায় যেতে পাবো, ভদ্রলোকের মতন দিন কাটাতে পাবো, এত যন্ত্রণাও যেন সহ্য হয়ে আসে। স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা ভোলা আর কি? আচ্ছা এততেও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নি আমার?

উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি বাকী টাকাটা আমিই রাখিয়া যাইব—কাছেই তো আছে। ওর ব্যাকুলতা ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া মনে হয় এখনি এই দণ্ডেই যদি উহাকে এই ক্লেদাক্ত সংস্রব হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে পারিতাম?

নিতান্তই অসম্ভব কি? মনকে প্রশ্ন করি—উত্তর পাই না। আমার নাবালকত্বই বিবেককে মূক করিয়া রাখে।

সাহস কোথায়? সমাজের ভয়। সুনামের ভয়—সংস্কারের ভয়—নামহীন অজানা ভয়।

চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখি রীতিমত সূর্য্যালোক। মেঘমুক্ত আকাশ যেন গতরাত্রের সমস্ত দুর্য্যোগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। হঠাৎ, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

দিনের আলোয় চারিদিকে চাহিয়া ঘৃণায় সর্ব্ব শরীর সঙ্কুচিত হইয়া আসে। ময়লা দুর্গন্ধ জামা-কাপড়ের রাশি, ছেঁড়া জুতার পাটি, ভাঙ্গা সোরাই, ফুটা এনামেলের গ্লাস, ধূমপানের সরঞ্জাম ইতস্তত ছড়ানো। মেঝের ধূলা যে কত-দিন ঝাড়া হয় নাই, ঈশ্বর জানেন। পোড়া দেশলাই কাঠির স্তূপ তাহার নীরব সাক্ষী।

একটা ইতর ব্যক্তির রাত্রিবাসের চিহ্ন সম্বলিত এই কুৎসিত ঘরখানায় রাত্রি যাপন করিয়াছি, মনে করিতেই যেন বমি আসে।

বীণাপাণি ঘরে নাই।

না বলিয়া চলিয়া যায় না, অথচ তিলার্দ্ধ সময় এখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে রুচি হয় না। অধৈর্য্যভাবে মিনিট দুই পায়চারি করি। ডাকিবারই বা সুবিধা কই? কোথায়, পাত্তাই নাই।

দূর ছাই, টাকাটা এইখানে রাখিয়া সরিয়া পড়ি। আসিলেই যাহাতে চোখে পড়ে এমনভাবে রাখিতে হইবে। গোটা দশ? না আরো কিছু বেশী।

ভিজা কোটটা খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিই।.........

টাকা নাই।.........

পঁচিশ খানা নোট, একখানাও নাই, চিহ্নমাত্র নাই। অথচ—পাশের পকেটে পার্স টা ঠিক আছে। ইহাকেই বলে ধূর্ত্তামি! সহজে যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়।.........

প্রভাত-সূর্য্যের নির্ম্মল আলো···যেন নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয়···মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে···মনে হয় পড়িয়া যাইব বুঝি।

ভাবি—বীণাপাণি! মানুষ যে কত শয়তান হইতে পারে, সে কথা শুধু গল্প করিয়াও ক্ষান্ত হও নাই, প্রকৃষ্ট উদাহরণও দেখাইলে!

আর একবার নিজের নাবালকত্বকে ধিক্কার দিই। কত সহজেই অভিভূত হইয়া পড়ি? দুইটা করুণ কথা—দুই বিন্দু চোখের জল।

অথচ আজীবন শুনিয়া আসিতেছি—উহারা ছলনাময়ী অভিনেত্রীর জাত।

কিন্তু এমনি একটা বাজে মেয়ে—অনায়াসে জিতিয়া যাইবে?

টাকাটা এমন কিছু অগাধ নয়, পকেট মারা গেলে সহিত, কিন্তু—এ ক্ষতিটা যেন অসহ্য।

নাঃ, টাকা আমি বাহির করিবই—করিতে হইবেই—দেখি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কি না। ঘৃণা বিসর্জ্জন দিয়া ঘরের জিনিষ পত্র ওলট পালট করিয়া খুঁজি—রাখিবে কোথায়? বাক্স ফাক্সর বালাই তো ঘরে নাই।

অবিশ্বাস্য কথা সত্য হইলেও নাকি গোপন রাখাই রীতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তাই মত, তবু—না বলিয়া পারি না, হারানিধি ফিরিয়া পাইলাম। সহসা—যেন দৈব নির্দ্দেশেই চোখে পড়িয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ধূলিধূসরিত বিবর্ণ ছবি টাঙানো—তাহারই পিছনে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট বাণ্ডিল উঁকি মারিতেছে।

সন্দেহ থাকে না—পাড়িয়া লই। দ্বিধা করিবার আছেই বা কি? একটী একটী করিয়া গণিয়া লই পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার।

নাঃ, একটা কম—বোধ করি এখনি খরচ করিতে লইয়া গিয়াছে। এইবার আসিয়া বুঝিও বীণাপাণি, বুদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়।

বিনাবাক্যে চুলগুলা হাত চালাইয়া পাট করিয়া টুপিটা মাথায় চাপাই, ট্রাউজারের পা দুইটা টানিয়া চোস্ত করি, রুমাল ঘসিয়া মুখের যতটা উন্নতি সাধন সম্ভব সারিয়া, গম্ভীর চালে বাহির হইয়া পড়ি।

ভগবানের কাছে একমাত্র কামনা, যেন পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে না হয়।

কিন্তু পড়িতে হয়—ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাহার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম—সেই বীণাপাণির চোখে। দুই হাতে দুইটা জল ভরা বালতি কোন্ চুলা হইতে ভরিয়া আনিয়াছে কে জানে।

আমাকে দেখিয়া রীতিমত থতমত খাইয়া যায়। যাইবারই কথা!

বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন? মুখ ধোবার জন্যে ভাল জল আনলাম।

যাক্ যথেষ্ট হয়েছে—ব্যঙ্গ হাস্যে ঠোঁট বাঁকাই—এর পর বোধ হয় চায়ের লোভ দেখাবে? কিন্তু নিজেকে সব সময় অত চালাক ভাবতে নেই, বুঝলে বীণাপাণি! হ্যাঁ ভালো কথা, তোমাদের ঘরে রাত্তির কাটালে দাম দিতে হয়, না? এই নাও—

পার্স খুলিয়া দুইটা টাকা অবহেলা ভরে ফেলিয়া দিয়া 'গট্‌গট্' করিয়া পথ চলিতে থাকি।

পিছনে চাহিবার প্রয়োজন অনুভব করি না।······

কোন পথ দিয়া কত পথ ঘুরিয়া কেমন ভাবে যে সুরেশের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছাইলাম, স্মরণ করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু মনে আছে মাথা যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, বোধ হয় জ্বর আসিতেছে।

আসা বিচিত্র নয়। স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শরীর!

সুরেশ বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায় চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। আমাকে পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে আসিতে দেখিয়া বিদ্রূপ বিরক্তি স্বরে বলিয়া ওঠে—কি হে ছোকরা, রাত বেড়ানো অভ্যাস্ টভ্যাস্ ছিল না কি? না এখানে এসেই হঠাৎ—

ব্যস্ত ভাবে বলি—ভেতরে চলো সুরেশ, বোধ হয় জ্বর আসছে।

জ্বর আসছে? বলিস্ কি? চল—চল্—

মুহূর্ত্তে ওর মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে, উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—ব্যাপার কি বল্‌তো? কাল সারারাত ভোগান্তির একশেষ, খুঁজে হায়রাণ। চেহারা দেখে যে ভয় করছে, হ'ল কি?

বলছি ভাই, সব, আগে জল খাবো একগ্লাস।

সত্য মিথ্যায় মিশাইয়া গত রাত্রের কতকটা বিবরণ দিই সুরেশকে। বীণাপাণির কথা অবশ্য বাদ দিই, দিতেই হয়—মুখে আট্‌কায়।

সুরেশ আমার বিছানার ব্যবস্থা করিতে করিতে মৃদুহাস্যে বলে—ওহে বালক, মায়ের আঁচলটা ছেড়ে চলে আসা উচিত হয়নি তোমার। এই সহরে আজ ছ'বছর কাটালাম—গুণ্ডার টিকিও দেখলাম না, তুমি বাবা দেশে পা দিয়েছ আর তা'র কবলে পড়ে গেছ! হোপ্‌লেস্। তাছাড়া—এত কেয়ারলেস্ তুই? একরাশ টাকা সুদ্ধু কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস?

টাকা সুদ্ধু কোট?

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকি।

কি, এখনো হুস্ হচ্ছে না বাবুর? যাই ভাগ্যিস্ চাকরটার চোখে পড়েনি, পয়লা নম্বরের চোর ওটা। দেখে আবার সরিয়ে রাখি—এই নে—

বিছানা উল্টাইয়া গদির তলা হইতে এক গোছা নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দেয় সুরেশ।

পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার। খরচের সুবিধার জন্য কাল যেগুলা ভাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম।…এতক্ষণে খেয়ালে আসে কাল বাহির হইবার আগে গত দুই দিনের ব্যবহৃত কোটটা বদলাইয়া একটা টাট্‌কা ইস্ত্রি করা কোট গায়ে দিয়াছিলাম। নূতন সাহেব! নূতন চাকরী!

সুরেশ আমার তদারকের জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে, হইবে বইকি—ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশ বিভুঁইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আসন্ন জ্বরের আচ্ছন্নতায় হঠাৎ এক সময় মনে হয়…অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন ঠেলিয়া দিলাম……

ভয়ার্ত্ত একখানা মুখ……বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি……
…মাথা তুলিয়া শ্বাস লইতে চেষ্টা করে—পারে না।

তলাইয়া যাইতে থাকে…নীচে—আরো নীচে…জাহান্নমের অতল তলায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

অঙ্গার

—:•:—

সীতাহাট।

তারের বেড়ার গায়ে রংচটা কাঠের বোর্ড আঁটা। অনেকদিনের রোদ বৃষ্টি ঝড়, আর কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলার সাক্ষ্য দিচ্ছে—ঝাপসা হয়ে আসা অক্ষরগুলো। দীর্ঘ ঈকারের মাথাটা এমন পরিষ্কার মুছে গেছে যে, চলন্ত ট্রেণের আরোহীরা 'সাতাহাট' বলে ভুলে করে' অর্থবোধে অক্ষম হয়ে পড়ে।

মেল ট্রেণের এখানে থামার কথা নয়।

দৃকপাতও করে না, নাক তুলে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায় রংচটা কাঠের বোর্ডের মিনতি-দৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে। অনাথের নাথ প্যাসেঞ্জারখানা মিনিট খানেকের জন্যে একবার দাঁড়িয়ে যায়।

এখানে যারা ওঠানামা করে—প্রায়ই গ্রাম্য চাষী ক্লাসের লোক, দু'চারখানা গ্রামের মধ্যেই তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোকের দেখা কদাচ মেলে।

সুকান্তর মতো—চকচকে সুট পরা, ঝকঝকে সুটকেস হাতে, এমন ভবিষ্যুক্ত আরোহী দৈবাতের ঘটনা। হাল্কা বেডিং আর সুটকেসটা নিয়ে নিজেই এগিয়ে চললো সুকান্ত, শুধু কুলিখোঁজা বিড়ম্বনা বলেই নয়, দেশের মাটিতে নেমে মনের কোণায় কোথায় যেন বেজেছে একটু বৈরাগ্যের সুর।

সীতাহাটের মাটিতে—ঝোপ ঝাড় খানা-খন্দ ডিঙিয়ে শাওলাধরা মজা পুকুরের পাড় ধ'রে খালি গায়ে আর খালি পায়ে যে ছেলেটা ঘুরে বেড়াতো—যার নাম ছিল 'কানু', তাকে যেন ওর মনে পড়ে গেছে।

রামচন্দ্র নাকি চৌদ্দ বছর নির্ব্বাসনে ছিলেন······কিন্তু সুকান্তরই বা কমটা কি? তেরশো উনচল্লিশ সালে ও সীতাহাট ষ্টেশনে এসে ট্রেণে চেপেছিল—যখন 'সাতাহাট' বলে ভুল করতে হত না লোককে—সেই ট্রেণ থেকে নামলো এই তেরশো তিপ্পান্নয়।

মনে মনে একবার হিসেব করে নিয়ে হেসে উঠলো সুকান্ত।···চৌদ্দ বছর বটে, তবে রামচন্দ্রের মতো অমন গৌরবময় নির্ব্বাসন নয়। না ছিল সঙ্গ না ছিল সঙ্গিনী, নেহাৎ দুঃখীর মতো নিঃস্ব সেই যাত্রা।

থাক্ সে সব দিনের কথা। বিস্মৃত অতীত হাতড়ে দুঃখের স্মৃতিকে ফেনিয়ে তুলে উদাস হয়ে ওঠবার মত ভাববিলাসী সুকান্ত নয়।······হঠাৎ যেটুকু মনে পড়ে যায় যাক।

ভাগ্যচক্রের অনেক চক্র ভেদ করে দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে হয়েছে তাকে।······স্বপ্ন দেখার সময় কোথা?

দেশে এসেছে—উপেক্ষাকারীদের নাকের সামনে হঠাৎ বড়মানুষী দেখাতে নয়, নিতান্তই কর্ত্তব্যের খাতিরে।······লাভ লোকসান খতিয়ে মেজে কষে হিসেব ক'রে মোটাকিছু নিয়ে এসেছে পরিত্যক্ত পিতৃভিটার সংস্কার করতে।······ইচ্ছে করলে—পাঁচজনের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো অট্টালিকা ফাঁদাও হয়তো অসম্ভব ছিল না সুকান্তর পক্ষে, কিন্তু সে রকম বাজে সখ তার নেই। নেহাৎ যেটুকু না করলে নয় তাই করা।

একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে ভৃত্যটিকে সঙ্গে আনবার কথা, আসবার আগেই সে হতভাগা পড়লো জ্বরে। একলাই তাই চলে এসেছে।······দু'চারদিন অবিশ্যি ভাত জুটবেই কোথাও না কোথাও।······মনে ভাবলে পাপ নেই—দিয়ে কৃতার্থই হয়ে যাবে হয়তো—চকচকে সুট পরে আর সুটকেস ভর্ত্তি নোটের গোছা সঙ্গে করে এনেছে যখন।

একটা মিস্ত্রী ডেকে কণ্ট্রাক্ট গোছের করিয়ে নিয়ে কাজটা লাগিয়ে দেবার জন্যে যে ক'দিন লাগে। তারপর তো সুবোধই এসে দেখাশোনা করতে পারবে—সর্ব্বত্র সে সুকান্তর ডান হাত।

নিজের বাড়ী ঢোকার আগেই মেজ-জ্যাঠার সদর।

সরিকের বাড়ী, এক চৌহদ্দির মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করে বাস করছে জ্যেঠতুতো আর খুড়তুতোর দল। কাকা জ্যেঠা পিসি ঠাকুমার সংখ্যা কম নয়······অবশ্য এই চৌদ্দ বছর ধরে যদি সকলে একযোগে বেঁচে থাকে।······কে জানে কাকে দেখতে পাবে আর কাকে পাবে না।

এতদিন ধরে ওর ঠিকানাটা এত অনিশ্চিত আর পরিবর্ত্তনশীল ছিল যে—অবস্থার এতটা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর দল থেকে ছিটকে গিয়ে কেউ না পেতেছে হাত না দিতে পেরেছে কোনো মৃত্যু-সংবাদ, যার জন্যে বুকটা খালি হয়ে না যাক, পা দুটো খালি করতে হয় বাধ্য হয়ে। বৃক্ষচ্যুত শাখার মত ওকে সবাই ভুলেই ছিল, কে যে তাকে

তুলে নিয়ে করেছে কলমের চারা, জোগান দিয়েছে প্রাণরসের, কে হিসেব রেখেছে? এতদিন পরে সুকান্ত নিজেই তার হিসেব দিতে এলো না কি?

মেজ-জ্যাঠার দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়ালো ......ঢুকবে নাকি? না সরাসরি নিজের বাড়ীতেই উঠবে আগে? কিন্তু উঠবেই বা কেমন করে? আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে সদর বৈঠক, দরজায় লাগানো তালাচাবিতে মরচের 'জং' ধরে গেছে কিনা দেখতে হলেও আগে মজুর চাই।......আগাছার বাড় এমনিই বটে।

মেজ জ্যাঠার বাড়ীই ঢুকে পড়া ছাড়া উপায় কি?

শুধুই কি নিরুপায়? ভিতর থেকে বিশেষ একটা তাগিদ পাচ্ছে না! ছোটবেলায় যার আকর্ষণে মেজ জ্যাঠার বাড়ীটা ছিল লোভনীয়?......কিন্তু নতুন বৌদি কি এখনো নতুন আছে......আছে সেই বিদ্যুৎ-দীপ্তি? নাকি এবাড়ী-ওবাড়ীর আরো দশটা বৌয়ের মতো গণ্ডা গণ্ডা কুচো-কাচার আমদানী করে নিভে ঠাণ্ডা মেরে গেছে?

দূর ছাই, ঢুকে পড়লেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

অনন্ত দা, অবশ্য এ সময় বাড়ী নেই, জমিদারের নায়েবী, উদয়াস্ত সেখানেই বাস। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে ক'বার আসবে যাবে? তবু নাম ধরে ডাকতে হ'লে তাকেই ডাকতে হয়।......ছেলেবেলার মতো মৃদু-কুণ্ঠিত গলায় নয়, চাঁচা ছোলা চড়া সুরে—

—অনন্তদা!

—কে রে? কে?

ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত স্বর ভেসে এলো—কে ডাকছে আমার নাম করে?......কে? কে? সুস্থ মানুষের সহজ প্রশ্ন নয়, রোগীর আর্ত্তনাদের মতো।......তবু অনন্তেরই মতো।

হঠাৎ ভারী ভয় ধরলো সুকান্তর, ভাবলে পালাই...... কিন্তু সত্যি তো আর তাই পালানো যায় না? আবার গলা তুলে ডাক দিলে—অনন্ত দা! আমি। আমি সুকান্ত। মেজ জ্যেঠিমা! জ্যেঠামশাই! বাড়ীতে কেউ নেই নাকি?

এবারে বেরিয়ে এলেন মহামায়া।

দৃষ্টি যতটা দুর্ব্বল, চাহনির ভঙ্গীতে তার চাইতে ঢের বেশী দুর্ব্বলতা ফুটিয়ে তুলে থতমতভাবে বললেন—কে বাবা তুমি? চিনতে তো পাচ্ছি না!

—আমায় চিনতে পার্চ্ছেন না জ্যেঠিমা? আমি কানু।

—কানু! আমাদের কানু? সেজ ঠাকুরপোর ছেলে?

সুটকেসটা আর বেডিংটা মাঝখানে নামিয়ে রেখে ততক্ষণে সুকান্ত উঠে এসেছে দালানে...আলগোছে একটা প্রণামের মত করে হেসে উঠলো—আপনি যে দেখছি বেজায় বুড়ো হয়ে গেছেন জ্যেঠিমা! তা'পর—সব ভালো তো?

—ভালো? হা ভগবান! 'ভালো' যে কী জিনিষ, সে কথা ভুলে গেছি বাবা। যাবার তো পথ নেই, তাই দেখছি বসে বসে।

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন মহামায়া।

সুকান্ত অবশ্য খানিকটা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল—আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বিলাপ হজম করবার জন্যে।......তবু বাড়ী ঢুকতেই এমন প্রচণ্ড বিলাপের মুখোমুখি হয়ে দমে গেল বেচারা।

অথচ তাকিয়ে দেখছে—বিলাপের সব চেয়ে যা বড় কারণ মেয়েদের জীবনে, এখনো পর্য্যন্ত তার হাত এড়িয়ে এসেছেন মহামায়া। দুগাছা মোটা শাঁখের শাঁখা, একটা বিবর্ণ পাড় শাড়ী ও চওড়া টাকের উপর অনুজ্জ্বল সিঁদুর রেখাটুকু মাত্র সম্বল হলেও সৌভাগ্যের প্রমাণপত্র তো বটেই।...তবে?...ছেলেদের কেউ? বসন্ত? হেমন্ত? অনন্ত?......কিন্তু অনন্তর গলা তো এই মাত্র শুনেছে সুকান্ত।

সোজাসুজি প্রশ্ন করা কঠিন, অতএব হেঁট হয়ে জুতোর ফিতেটা খুলতে কিছু সময় নষ্ট করা চলে।

মহামায়াও অবশ্য কান্নাকাটি সম্বরণ করে নিয়েছেন ততক্ষণে।

—তুমি ভালো আছো তো বাবা?

যদিও সুকান্তর পোষাকের পরিপাট্যে আর দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহের লাবণ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু কুশল প্রশ্নের প্রথা হিসেবেই এই প্রশ্ন মহামায়ার।

—ভালোই আছি জ্যেঠিমা, কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন বলুন তো?

—কাকেই বা দেখবে বাবা! যে যার পথ দেখেছে। হেমন্ত বসন্ত দু'জনেই দেশছাড়া,—'অখদ্দে' 'অবদ্দে' 'নড়েভোলা' ক'টা পড়ে আছি এখানে।...আছে—নতুন বৌমা আছে, সে আর কোন্ চুলোয় যাবে! তার ছেলে-মেয়েগুলো কোথায় মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! কথা তো শোনে না কেউ, হাড়-বজ্জাত ছেলেমেয়ে সব...হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাটো করে বলেন—হবে না কেন, যেমন মা তেমনি ছা হবে তো?

ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সুকান্ত। কি বিশ্রী! পুরণো মানুষগুলোকে দেখতে পাবে বলে যে-আগ্রহ মনে ছিল, তার এক ছটাকও খুঁজে পাচ্ছে না যেন।

হয়তো না এলেই ভালো ছিল...আর কারো বাড়ী উঠলেও হ'ত। তবু চুপ ক'রে থাকা চলে না, তাই কথার পিঠেই কথা কয়—

—তা তিনি গেলেন কোথায়?—'মা'টি? তিনিও 'ছায়েদের' সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না কি?

—জানি না। হয়তো বা শুয়েই আছে, নবাবজাদীর মন মর্জ্জি।···চাল বাড়ন্ত বলে—গেরস্থ ঘরের বৌ বেলা দুপুর অবধি শুয়ে থাকে শুনেছ কখনো?

অনেক কথা একসঙ্গে কয়েই বোধকরি মহামায়া হাঁফাতে থাকেন।···

পরক্ষণেই ঘরের ভিতর থেকে অনন্তর নিরুপায় চীৎকার ভেসে আসে—কে কথা কইছে ওখানে? কে—কে?

সুকান্ত অভিভূতের মত চারিদিকে তাকায়···"চালবাড়ন্ত" এ কোন্ ভাষা? সুকান্তর বাবা শ্রীকান্ত মারা গেলে এমনি একটা রূঢ় কর্কশ শব্দ মাঝে মাঝে মায়ের মুখে শুনতে পেতো না? কিন্তু মেজ-জ্যাঠার বাড়ী! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা দুটো তবে গেল কোথায়?···'খামারবাড়ী' বোঝাই মুগ কলাই ছোলা অড়রের বস্তা! জালা ভর্ত্তি গুড়! উঠানে এসে পড়া পেল্লায় পেল্লায় রুই কাতলা···চাষার ঘরের বাগানের ফল, পুকুরের মাছ, ঘরে তোলা সরের গাওয়া ঘী—কোথায় সদ্‌গতি লাভ করবে—নায়েবের পাদপদ্ম ছাড়া? 'নায়েব' হবার স্বপ্ন কবে ভুললো সুকান্ত?···মা বলতো—"নায়েব হতে যাবি কি দুঃখে কানু, নিজে তুই জমিদার হবি—" মায়ের কথা পছন্দই হত না। মানুষ যদি হ'তে হয় মেজ-জ্যাঠার মতো।

অনন্ত তখনো ছেলেমানুষ—স্কুলে পড়ে···দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নায়েব হচ্ছেন মেজ-জ্যাঠা রাধাকান্ত দত্ত। জমিদারী যত সামান্য হোক, প্রতাপটা সামান্য ছিল না। কালীপুজো আর জগদ্ধাত্রী পুজো করতেন রাধাকান্ত, সমারোহ হ'ত প্রচুর!··· তখনকার সমৃদ্ধির চেহারাটা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সুকান্ত চারিদিকে তাকিয়ে।

কেমন যেন শ্রীহীন রিক্তভাব, তবু শুধু এক মিনিট দালানে দাঁড়িয়ে সমস্ত সংসারের দৈন্যের ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না সুকান্তর চোখে, যদি দালানের মাঝখানে অমন নির্লজ্জ-ভাবে মেলে দেওয়া না থাকতো হলুদের ছাপ লাগা পাড়ের রং উঠে যাওয়া আধ ময়লা শাড়ীখানা। যার সর্ব্বাঙ্গে দড়া দড়া সেলাইগুলো ফুটে আছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো।

চকচকে সুটপরা সুকান্তকে কেমন অসহায় অপ্রতিভ দেখতে লাগে।

মহামায়া আবার এক পালা সুরু করবার উদ্যোগ করছিলেন—কিন্তু অনন্তর বীভৎস চীৎকারে থেমে যেতে হয়···অপরিচিত কণ্ঠের পরিচয় জানবার জন্যে উৎকণ্ঠার শেষ নেই তার। বারে বারে আর্ত্তনাদের মত প্রশ্ন করছে··· কে-কে-কে?

—এই দেখ বাবা, আমার কপালের জোর—ব'লে মহামায়া বার্দ্ধক্যের ভারে ঝুঁকে পড়া দেহ-নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'ন। অগত্যা সুকান্তই বা করবে কি···পিছন পিছন না গিয়ে?

কিন্তু কী ভয়ানক! সুদীর্ঘকাল পরে এই বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যেই সীতাহাটে ফিরে এলো না কি সুকান্ত!

হাঁটুর নীচে থেকে দু'খানা পা-ই কাটা অনন্তর, আর সেই আধখানা দেহ নিয়ে বিছানা থেকে উঠবার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। দু'খানা হাতের উপর ভর দিয়ে এলোমেলো ঘসটাচ্ছে নিজেকে নিয়ে।

ওধারে জানলার গরাদে ধরে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মানুষটা অবিচল নিশ্চিন্ততায় দাঁড়িয়ে আছে—নতুন বৌ ভিন্ন আর কে হ'তে পারে সে?···কিন্তু জড় না বধির? না কি এই অক্ষম অসহায় জীবটার প্রাণান্ত কাকুতিতেও কর্ণপাত মাত্র করবে না, এই প্রতিজ্ঞা তার?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত;··· দেশের কথা ভাবতে গেলেই যে হঠাৎ মনে পড়ে যেতো এই নতুন বৌকে। হাস্যে লাস্যে উজ্জ্বল মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গী, কাজে আর অকাজে সমান তৎপর। ছেলেরা মুগ্ধ হতো··· মেয়েরা হিংসা করতো। সে নতুন বৌ কোথায়? মারা যায়নি তো? অনন্তর মূর্খামীর উদাহরণ দ্বিতীয়পক্ষ নয় তো এটি?

অনন্তর দুর্ব্বার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মহামায়া হতাশ ক্ষোভের সুরে বলে ওঠেন—নতুন বৌমা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ? আর বাছা আমার একটা কথার 'পিত্যেশে' প্রাণটা বার করে ফেলছে!

এতক্ষণে বোধকরি নতুন বৌমার টনক নড়ে; মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর দিকে দৃক্‌পাত না করে মহামায়ার উদ্দেশ্যে মুচকে হেসে বলে—তবুও পোড়া প্রাণ আর বেরোতে চায় না ···এই বড়ো আশ্চর্য্য মা!

স্তম্ভিত সুকান্তর মুখে কথা ফোটেনা। ও যে একটা পদস্থ লোক, একটা কোম্পানীর হাজার লোক ওর কথায় ওঠে বসে···সুধু কথার বাঁধুনিতেই যে ও সাহেব চরিয়ে খায়···এ সব কথা বিস্মৃত হয়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নতুন বৌয়ের মুখের পানে—পনের ষোলো বছর আগে একটি কিশোর বালক যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো···তরুণী নববধূর দোদুল্যমান কর্ণভূষামণ্ডিত হাস্যদীপ্ত মুখের পানে···

মহামায়া অবশ্য সুকান্তর মতো হতবাক হয়ে যান না। অত্যন্ত কানে কথাটা হয়তো বিষ বর্ষণ করে কিন্তু রসনাকে পাথর করে দেয় না।······বয়সের আঘাতে জর্জ্জরিত কুৎসিত মুখ ঘৃণায় আরো কুৎসিত ক'রে বলেন—মরণ যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য্য!···কানু দেখলি তো বাবা? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে—তুই ভাবিস?··· কিসের তেজে এত মটমট কর্চ্ছেন তাই ভাবি।···রূপ তো ওই

…গুণেরও সীমে নেই।…যেদিন থেকে ঢুকেছে—সেদিন থেকেই যেন সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে। মালক্ষ্মী কোন পথ দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন দেখতে দিলে না। নইলে আজ এই দুর্দ্দশা! উনি আজ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, টাটকা ছেলেটার এই অবস্থা, গোয়াল ভর্ত্তি গরু গুলো সুদ্ধু পট্ পট করে মরে গেল।…এ সংসারের সুখ ঐশ্বয্যি তোরা তো দেখেছিস বাবা?…আর এখন এই দেখ! সোহার অলক্ষ্মী ঘরে এনে—

অনন্ত এদের দেখেই নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়েছিল—মার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে—সব সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরোনা বাবু ভাল লাগে না, গিয়েছে—বেশ হয়েছে। পাপের ধন 'প্রাচিত্তে' গেছে।…কানু এতদিন পরে এলো—কোথায় একটু বসতে বলবে, ওর খবর নেবে—তা' নয়—নিজের কথাই সাত কাহন।…কানু ভালো আছিস তো ভাই? এতদিন পরে দেশকে মনে পড়লো?…

—কিন্তু না পড়লেই যেন ভালো ছিল অনন্ত দা'!

—কি আমার জন্যে বলছিস? সবই অদৃষ্ট! নইলে—রেলে চড়লাম না—এক্সিডেণ্ট হল না—লাইনটুকু পার হ'তে গিয়ে দু'খানা পা বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম!…মতিচ্ছন্ন! দেখছি ইঞ্জিনটা আসছে ছুটে—ভাবলাম ছুট্টে পার হয়ে যাবো—ব্যস!…

—তোমার এই বানানো কথাগুলো হাজার বার শুনতে শুনতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে…মাঝে মাঝে হঠাৎ সত্যি বলেই মনে হয়। প্রত্যেক শব্দটা মুখস্থ করে রেখেছ কি করে বলোতো? একবারো ভুল হয় না।…ঘরসুদ্ধ লোককে নির্ব্বাক করে দিয়ে নতুন বৌ ওদিকের দরজা দিয়ে উঠোনে নেমে যায়।

বাক্‌স্ফূর্ত্তির অবস্থা ফিরলে—অনেক আলাপ আলোচনা…ঈর্ষা বিস্ময়…সদয়-দরদের বিনিময় শেষ করে সুকান্ত ওর নিজের বাড়ীর চাবিটার খোঁজ করলে…মজুর না ডাকলে দোর খোলা যাবে না বোধহয় জেঠিমা, কি বলেন?…কিন্তু চাবি যে কার কাছে আছে—কে জানে। জানেন নাকি আপনি?

—চাবি!

মহামায়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়েন—চাবির খবর বলতে পারিনি বাবা। আজ একযুগ বন্ধ পড়ে আছে।…তবে…ইয়ে…এদিক দিয়ে ঢুকতে তুমি পারো। মাঝখানের পাঁচিল ধ্বসে এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর উঠোন এক হয়ে গেছে কিনা।

শেষের কথাটা প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেই বলতে হয় মহামায়াকে।

এ-বাড়ীর লোকের যে ও-বাড়ীতে গতিবিধি আছে সে তো বাড়ী ঢুকলেই ধরা পড়বে। সুকান্তদের উঠোনে শ্রীকান্তর অনেক সাধ করে গাঁথানো প্রকাণ্ড ইঁদারাটা একটু লোভনীয় বৈকি!…এবাড়ী এবং আরও পাঁচটা বাড়ীতে সুধু পাতকুয়া।…তাই না মহামায়াদের প্রয়োজন পড়ে ভাঙা দেয়ালের সুযোগ নেবার!

অগত্যা সুকান্তও সেই সুযোগ নেয়।

কিন্তু ঠিক এই সময়টাই কি জল নেবার দরকার পড়লো নতুন বৌয়ের? চকচকে দুটো পিতলের ঘড়া নিয়ে এসেছে ইঁদারার পাড়ে।

আশ্চর্য্য! হাসতে লজ্জাও করছে না?…

—কি গো, স্নানটান হবে না কি? বলো তো দু'ঘড়া জল তুলে দিয়ে যাই?

কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখবার মতো একটা ধুলো জঞ্জালহীন জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল সুকান্ত। অবশেষে একটা পেয়ারা গাছের নীচু ডালের 'ফেঁকড়ি'তে আটকে দিয়ে সুটকেস খুলে সাবান তোয়ালে বার করতে করতে বলে—জল তুলে দেবার দরকার নেই, আমি নিজেই পারবো।

—বল কি ঠাকুরপো, জল তুলবে? তোমার ময়ূরপুচ্ছের সম্ভ্রমহানি হবে না তো? না ভাই না থাক্, আমরা থাকতে মিথ্যে কষ্ট করবে কেন? রসো, ওবাড়ী থেকে বড় বালতি এনে দিই একটা—

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার কাজ সেরে নিয়ে যান, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।…আচ্ছা মার কতকগুলো এই সব কলসী-টলসী ছিল না? সে কি আছে এখনো? ভাঁড়ার খুঁজলে পাবো?

—কি জানি পেতেও পারো—

একটা ঘড়া উপুড় করে স্বচ্ছন্দে তার উপর বসে মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে নতুন বৌ।…

কিন্তু হাসিটা এমন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ মিশ্রিত কেন?

নানা কারণে নতুন বৌয়ের উপর মনটা প্রসন্ন ছিল না…তা ছাড়া—এরকম জনমানব-বর্জ্জিত পোড়ো জায়গায় একলা বসে গল্প করাটা অস্বস্তিকর। পল্লীগ্রামের মাটিতে গড়া সমস্ত সংস্কার…সহরের সভ্য হাওয়ায় চাপা থাকতে পারে—একেবারে উড়ে যাওয়া সম্ভব কি?

—কাজ হ'ল আপনার?

—কেন? তাড়াতে পারলেই বাঁচো বুঝি? যাচ্ছি গো যাচ্ছি, এখুনি হয়তো আমার দয়াময়ী শাশুড়ী, স্নেহময় শ্বশুর, আর প্রেমময় পতিদেবতা আমার অদর্শনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখবেন।…কিন্তু ঠাকুরপো, মিথ্যে জেদ করছো, জলটা আমি তুলে দিয়ে যাই, এতদিন পরে এসে কেনই বা কষ্ট করবে আমারা থাকতে—

—হঠাৎ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠে সুকান্ত বলে—আপনি ভুল করছেন বৌদি, আপনাদের অতিথি হয়ে আসিনি আমি, নিজের বাড়ীতে নিজের কাজে এসেছি। অসুবিধে তো হবেই সইতে।

—বেশ তো, মইতে পয়ালেই ভালো—ব'লে ভারী ভাটাকে টেনে টেনে তুলতে থাকে নতুন বৌ।

কিন্তু অগ্নিবিষের চেহারাটা যে এত প্রখর হবে, সেইটাই ধারণা ছিল না বেচারার।…চৌদ্দ বছর কমদিন নয়; ঘরের মেজের অবিশ্বাস্য পুরু ধুলোর স্তর তার প্রমাণ দেবে।…তবু—জানলার গরাদগুলোর পর্য্যন্ত চিহ্ন থাকবে না? থাকবে না দরজার কপাটের?…খাঁ খাঁ করবে শূন্যঘরগুলো?…শ্রীকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্ত আর তার মার ভাঁড়ারে 'চাল বাড়ন্ত' হ'ত সত্যি, কিন্তু সংসারের সমস্ত জিনিষগুলো? খেতে না পেয়েও তার মা প্রাণপণে যেগুলো আগলে রেখেছিল?…কোথায় সেই পিতল কাঁসা লোহালক্কর আসবাব পত্র?…জীবনযাত্রার অজস্র খুটি নাটি?…সেই বাড়ীভর্ত্তি জিনিষের চিহ্ন থাকে না চৌদ্দবছর বাড়ীছাড়া থাকলে?…'আড়ায়' তুলে রাখা বিছানা-গুলো স্বচ্ছ চোরে চুরি করে?…সুধু অবিকল পড়ে থাকে একটা মাটির কুজো?…ধুলো আর মাকড়সার জালে যার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেছে…যার থেকে—মারা যাবার আগে পর্য্যন্ত জল খেয়েছে সুকান্তর মা।…গভীর রাত্রে যখন সমস্ত পাড়া নিশুতি হয়ে গিয়েছিল…গেলাস গেলাস জল খাচ্ছিল সুকান্ত নিজে, আর ফোঁটা ফোঁটা করে দিচ্ছিল মার মুখে।…অদ্ভুত! এই কুঁজোটা তা'হলে কেউ নেয়নি? সুকান্তর মার শেষ চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছে বুঝি?…কপাট-হীন গরাদে, 'হাঁ হাঁ' করা খোলা ঘরের মেঝের বসে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কুঁজোটার দিকেই তাকিয়ে থাকে সুকান্ত।…

পাড়ার আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করে আর অনেকের বিষ-নিশ্বাস ফেলিয়ে বেশীরাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরে দেখলে দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা। মাথার কাছে একগ্লাস জল, আর আধখানা মোমবাতি।…কিছুক্ষণ থেকে জ্বলে যাওয়ার হিসাব দিচ্ছে।…

মহামায়ার উপরোধে সামান্য কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়লো।…জ্বলতে লাগলো বাতিটা।

কিন্তু মোমবাতি তো এক সময় শেষ হয়।…

গাঢ় অন্ধকারে ধরা পড়বার ভয়টা কি? নিঃশ্বাসের শব্দটা শাসন করে বন্ধ করা যায় যদি? ভয় হয়তো থাকতো না—পোড়ো বাড়ীর নিশ্চিন্ত বাসিন্দা—ইঁদুর, বেজি, পায়রা, চামচিকেদের অবাধ সঞ্চরণের সুযোগে মিলিয়ে যেত সতর্ক পদধ্বনি, কিন্তু মাথার বালিশের তলায় টর্চ্চ নিয়ে শুয়ে থাকবে সুকান্ত, একথা কে ভেবেছিল?

বালিশের তলা হাতড়ে সংগ্রহ করা সুটকেসের চাবিটা সমেত হাতখানা চেপে ধরে আচমকা টর্চ্চটা জ্বালবার কি দরকার ছিল সুকান্তের?…আলো জ্বেলেই অবশ্য হাত ছেড়ে দিয়েছে সে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পথ কোথায়?…ঘুমন্ত মানুষকে ভিজোনো যায় ব'লে তো আর জাগন্ত মানুষকে যায় না?

—এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম আমি।

বিছানায় উঠে বসে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললে সুকান্ত।

ধৃতব্যক্তি একটা কঠিন হাসি হেসে তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করে—তাই বুঝি ঘুমের ভাণ করে পাহারা দিচ্ছিলে?

—নাঃ। ভাণ করা আমার স্বভাব নয়, ভাগ্যক্রমে ভেঙেই গেল ঘুমটা, কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবেন?…এ রকম অদ্ভুত প্রবৃত্তি কেন? মুখের কথা খসালেই তো কাজ হতো। একবার চেয়ে দেখলে পারতেন।

—চেয়ে? ছিঃ! আমি কি ভিখিরী? চাইতে আমার ঘেন্না করে।

—আশ্চর্য্য! আত্মসম্মান-জ্ঞান! চাইতে ঘেন্না করে…করে না চুরি করতে!

—চুরি!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হাসির ধাক্কায় খান্ খান্ হয়ে যায় ঘরের অন্ধকার। টর্চ্চটা কখন নিভিয়েছে—মনে ছিল না সুকান্তের, খেয়াল হ'ল হাসির শব্দে।

—চুরি কে না করছে? এই যে তুমি, একমুঠো ভাতের জন্যে দোরে দোরে ঘুরে দেশ ছাড়া হয়ে আজ এসেছো বড়মানুষী দেখাতে—এর মূলে চুরি নেই কে বিশ্বাস করবে?…চুরি?……চুরি না করলে খাবো কি?

—বরং উপোস দিয়ে মরা ভালো।

রাগ লুকোবার চেষ্টা করেনা সুকান্ত।…ধিক্কারে লজ্জায় সমস্ত শরীর জ্বলতে থাকে তা'র। অধঃপতন মানুষেরই হয় সত্যি কিন্তু মেয়েমানুষের এত অধঃপতন সহ্য করা শক্ত। তা'ছাড়া নিজের তুলনাটাও অসহ্য লাগে। কিন্তু আরও সহ্য করতে হয়…

নতুন বৌ হেসে উঠে বলে—ওসব ধর্ম্মকথাগুলো বড় সেকেলে হয়ে গেছে ঠাকুরপো, লোক-ঠকানো ছেঁদো কথা মাত্র।…একজন খেয়ে ফুরোতে পারে না, রাখবার জায়গা পায় না, আর একজন না খেয়ে মরে, এর বিরুদ্ধেই না! শুনছি আজকাল লড়ালড়ি চলেছে তোমাদের?

—সে সব হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় কথা—বুঝলেন? অন্যের ঘরের ঘটিবাটী চুরির সপক্ষে কোন নীতিই নেই।

—আছে সুধু উপোস দিয়ে মরার উদার নীতি কেমন? আচ্ছা কানু, আন্দাজ করতে পারো, তোমার জ্যেঠির সাধের সংসারটী চলে কিসের জোরে?…বাগদী পাড়ার লোক এসে ঘরের মেয়ের অপমানের জবাব দিয়ে গেল তোমার দাদাকে

পঙ্গু করে···তার আগে শ্বশুর বিছানা নিয়েছেন।···আচ্ছা ঠাকুরপো, পক্ষাঘাত কেন হয় জানো?

বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে সুকান্ত উত্তর করে—থাক্ বৌদি, গুরুজনের কথা নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—প্রবৃত্তি আমারও নেই ঠাকুরপো, সুধু কথার কথা জানতে চাইছিলাম। স্বামীও কম গুরু নয়, তাঁর কথাও থাক্ কিন্তু উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু খাওয়ার মুখ—এর কি ওষুধ জোটাই আমি তাই বলো তো?···অথচ জোগান দিয়ে দিয়ে জীইয়ে রাখতে হবে মাংসপিণ্ডের ভেতর ধুক্‌ধুক করা সেই প্রাণটুকু।···অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'বার জো নেই, চিরকাল ভালো খেয়েছেন—তার ব্যতিক্রম সহ্য হয় না। আমি অলক্ষ্মী, আমার নিশ্বাসে নাকি সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে··· পৃথিবীতে বাধলো লড়াই, বাজারে লাগলো আগুন, সেও বোধকরি আমার অপরাধ।···এই চার বছর ধরে—তিলতিল করে সব গেছে। অবশেষে যেতে বসেছে নীতি-ধর্ম্ম, সভ্যতা, ভব্যতা।

—কিন্তু হেমন্ত দা—বসন্ত দা? তাঁরা কি কিছুই দেন না?

—দিতেন হয়তো সামান্য কিছু, কিন্তু শ্বশুর আমার মানী লোক, বেইমান ছেলেদের এক পয়সা নেন না—তাদের অপরাধ—তারা সক্ষম! অহরহ দু'টো জ্যান্তমরা পঙ্গুর কাতরানি শুনতে শুনতে নিজেদের জীবনটা পঙ্গু করে ফেলতে চায় নি, স্ত্রীপুত্র নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

—কিন্তু এ ভাবে ক'দিন চলবে?

—দেখি তো—হয়তো শেষ পর্য্যন্ত ধরতে হবে—মেয়েমানুষের সেই আদি ও অকৃত্রিম পথ।···বাঁধা রাস্তার বাইরে গিয়েই না এত বিড়ম্বনা? কিন্তু রুচিতে যে বড্ড বাধে, করি কি! যাকগে—ওসব কথা। আজ যখন হেরে গেলাম তোমার কাছে, তখন দয়াভিক্ষা ছাড়া উপায় কি? দয়া করে পথ দাও, আমি যাই।

—পথ আপনার আটকাইনি আমি—সুকান্ত অভিভূতের মতো বলে—শুধু ভাবছি ধন্য আপনার সাহস! হঠাৎ যদি এ অবস্থায় কেউ দেখে, দুর্নামের কিছু বাকী থাকবে কি?···

আবার খান খান হয়ে যায় অন্ধকার! কাঁচের বাসন ভেঙে যাওয়ার মত তীক্ষ্ণ শব্দ ওর তীক্ষ্ণ হাসির।

—বাকী থাকবে না বলেই তো রাতদুপুরে আসা গো—দুর্নামই যে আড়াল। দুপুর রাতে একলা তোমার ঘরে মনচুরি করতে না এসে—বাক্স ভেঙে তুচ্ছ টাকা চুরি করতে এসেছি, সুস্থ মানুষে কখনো বিশ্বাস করে এ কথা?···চরিত্রের অপবাদ তো বাঙালীর মেয়ের অঙ্গের ভূষণ, তোমার সঙ্গে একবার হেসে কথা কইলেই তো জাত যাবে—কিন্তু জেল তো হবে না? দত্তবাড়ীর বৌকে হাতে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে—দত্তবাড়ীর এত বড় অপমান কি করে ঘটাই বলো? দুর্নামের আড়ালে তাই আত্মরক্ষা করছি।

—তাই বলে ইচ্ছে করে মিথ্যে দুর্নামের বোঝা বইবেন? ···সুকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে···বলে, আপনি কি পাগল?

—পাগল! বলো কি, অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথা, নিজেই অবাক হ'য়ে যাই মাঝে মাঝে। আর একটু কম ঠাণ্ডা হলে—সংসারের আর পাঁচ জনের মতো হয়তো একটা খেলোমী করে বসতাম কোনোদিন।—জল, আগুন, বিষ, দড়ি, এতো আর কেড়ে নেয়নি কেউ? কিন্তু জো কি তার? বংশে বাতি দিতে অপগণ্ডের সংখ্যাও তো কম নয়?—এতোগুলো মাংসপিণ্ডের পিণ্ডির জোগাড় করে কে তবে?

••• ••• •••

—আচ্ছা, ভাঙা বাড়ী মেরামত করবার কী এত দরকার সুকান্তর? এ যাত্রায় নাই বা হ'ল? একেবারে [illegible] ক্ষতি কি? সুকান্তর মায়ের সমস্ত চক্ষুই [illegible] যখন! আরো চৌদ্দ [illegible] ভূমিকম্পে [illegible] বাকনা ফাটধরা [illegible] পচা [illegible] তাড়াগুলো বাসি [illegible]বরের কাগজ [illegible] যায়? তুচ্ছ এই টাকা ক'টার বিনিময়ে কিছুটা সংস্কার যদি হয় তো হোক না—ধ্বংসোন্মুখ একটা জীবনের···ঝড়ঝাপট আর ভূমিকম্পে যার চারিদিকের দেওয়ালে ধরেছে ফাটল··· লেগেছে লোনা।

টাকা তো সুকান্তর কাছে খোলামকুচি···আজ অজস্র আসছে—হয়তো একদিন কিছুই আসবে না, খুব বেশী তফাৎ কোথায়?

টর্চ্চের আলোয় সবগুলো উল্টে দেখে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো নতুন বউ—সত্যি নোট তো ঠাকুর পো? জাল টাল নয় তো?

—নাঃ, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। খাঁটিই!

—কতো আছে এতে?

—হাজার পাঁচেক আছে হয় তো!

—বড়ো আনন্দ হ'ল ঠাকুর পো, ইচ্ছে করলেই পাঁচ দশ হাজার নষ্ট করবার মতো অবস্থা তোমার হয়েছে দেখে··· এই নাও!

—কি আশ্চর্য্য! ফিরিয়ে নেবার জন্যে দিলাম নাকি?··· মান যান পালান! চলুন, আলোটা ধরি আপনাকে।···নিন, পাগলামী করবেন না।

—ছিঃ ঠাকুর পো, অবশেষে হাত পেতে তোমার কাছে নেবো টাকা?···বরং একটু যদি ভালবাসা দিতে পারো, দেখো চেষ্টা করে—

মুচকি হেসে নোটের গোছাটা ঘরের মেঝেয় ফেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায় নতুন বৌ।

—নেওয়া কি কিছুতেই চলে না?

—না গো মশাই, না। টের পেলে রাক্ষসের খিদে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে চাইবে, তা জানো?···মজা কি জানো? আমার রোজগারের অন্ন খেতে ওঁদের গলায় বাধে। নিরুপায় অপমানের বিকারটা হয়তো এমনিই হয়।

—কিন্তু জ্যেঠিমা—অনন্ত দা, এঁরাও কি সন্দেহ করেন যে—আপনি···

সঙ্কোচে চুপ করে যায় সুকান্ত।

হাসি নতুন বৌয়ের স্বভাব, হেসে উঠে বলে—এই এক আচ্ছা ছেলেমানুষ, সন্দেহ [illegible] বিশ্বাস বলো। ওঁরা তো আর সংসার ছাড়া মানুষ নয়?—কিন্তু কতদিন আর বুক [illegible]

···রংচটা কাঠের বোর্ডটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে···ট্রেণ ছেড়ে চলে গেল সীতাহাট ষ্টেশন।···হয়তো এই শেষ। অন্য কোন দিন···বহু বহু দিন পরে বৃষ্টিতে সমস্ত লেখাটা একেবারে মুছে ঝাপসা হয়ে গেল কি না, দেখতে আসবে কি সুকান্ত? আর কোনদিন?

বাইরে থেকে ছোট্ট গ্রামটাকে একটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না···আগাছা—তবু সবুজ পাতার সমারোহের অভাব নেই।···কে বলবে ওই শীতল আবেষ্টনের ভেতর লুকিয়ে আছে জলন্ত আগুন।

আগুন না অঙ্গার? জ্বলে জ্বলে নিজেকে কখন একদিন নিঃশেষে ভস্ম করে ফেলবেই কে জানে!

দুই হাত জোড় করে সীতাহাটের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলো সুকান্ত। হয়তো জন্মভূমি বলেই।

সমাপ্ত

—পরিচয়—

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ১৩১৫ সালের ২৩শে পৌষ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন চিত্রশিল্পী ৺হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গুপ্ত মহাশয়ের আদি নিবাস হুগলী জিলার বেগমপুর গ্রাম। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্কুল কলেজে পড়িবার কোন সুযোগ শ্রীমতী আশাপূর্ণা পান নাই। গৃহেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৩৩১ সালে কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীকালিদাস গুপ্তের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সাহিত্য জীবন—প্রথম রচনা : ১৩২৯ সালে মাসিক 'শিশুসাথী'তে "বাইরের ডাক" নামক একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। গোড়ার দিকে তিনি কেবলমাত্র শিশুসাহিত্যই রচনা করিয়াছিলেন। বড়দের লেখায় তিনি হাত দেন ১৩৪৩ সালে এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার প্রথম গল্প "পত্নী ও প্রেয়সী" প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজারে।

...

[illegible]মতী আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলীর

কালানুক্রমিক তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল—

[illegible]	...	আনন্দবাজার
[illegible]	...	দেশ
[illegible] ইল অন্তরে ব্যথা	...	ভারতবর্ষ
[illegible]	...	আনন্দবাজার
[illegible]	...	পত্রিকা
[illegible]	...	অরণি
[illegible]	...	জয়শ্রী
[illegible]	...	আনন্দবাজার
[illegible]	...	পরিচয়
[illegible]	...	পত্রিকা
[illegible]	...	বাতায়ন

আগুন (গল্পগ্রন্থ) :—

[illegible] আর আগুন—
[illegible] উত্তর—
[illegible]—
[illegible]লের ঘর—
[illegible]—
[illegible]—
[illegible]—
[illegible] জন—
[illegible] ছিলাম—
[illegible] ?)—
[illegible] মরুপথে—
[illegible]—
[illegible] আমি—
[illegible]—
[illegible]—
[illegible] গোধূলি—

১৩৪৮

[illegible]	...	জয়শ্রী
[illegible] কপাট	...	পত্রিকা
কারও পৌষমাস	...	আনন্দবাজার
খরস্রোতা	...	বাতায়ন
সংস্কার	...	জয়শ্রী
দেবাঃ ন জানন্তি	...	উদয়াচল
প্রহসন	...	পরিচয়

পাগল ?	...	আনন্দবাজার
শকুন্তলার পরাজয়	...	দেশ

১৩৪৯—৫০

নব কথামালা	...	আনন্দবাজার
অন্তরায়	...	বাতায়ন
হাসির গল্প	...	দেশ
সিঁদ কাঠি	...	আনন্দবাজার
উৎসব	...	সঙ্কলন
জীবন নাট্য	...	সওগাত
নির্লজ্জ	...	বাতায়ন
কঙ্কাবতীর ইতিকথা	...	পরিচয়
প্রগল্‌ভা	...	বাতায়ন
পূরবী	...	মৃত্তিকা
ইনোসেণ্ট	...	[illegible]

১৩৫[illegible]

মধু ও হুল	...	[illegible]
[illegible]	...	আনন্দবাজার
[illegible]		[illegible]
[illegible]বপদ আর কাকে বলে	...	[illegible]
উপসংহার	...	বর্ষশেষ
প্রেম ও প্রয়োজন (উপন্যাস		

১৩৫২

দুপুর রোদে	...	গল্পভারতী
না	...	"
মোহমুক্তি	...	"
অগস্ত্য	...	"
হোমশিখা	...	"
আমায় ক্ষমা করো	...	যুগান্তর
মাপকাঠি	...	সওগাত
গলায় দড়ি	...	বসুমতী
ছিষ্টিছাড়া	...	কৃষক
বাজে খরচ	...	কথাশিল্প
যুদ্ধোত্তর	...	আনন্দবাজার
লাল শাড়ী	...	অরণি
জর্জেট শাড়ী	...	শরতের ফুল
সোমেন পাণ্ডিতের মৃত্যু	...	অভিযান
পোড়া কপাল	...	সচিত্র ভারত

অনির্ব্বাণ—(উপন্যাস) ...
অগ্নি পরীক্ষা (উপন্যাস)— মহিলামহল

৩৫৩

সত্যাসত্য ... বসুমতী
কঙ্কণ ... গল্পভারতী
অঙ্গার ... "
ধ্বংসের মুখে নারী ... "
একাঙ্কিকা ... "
হোঁচট ... কৃষক
ভাস্তল সৈকতে ... মেয়েদের কথা
দুই নারী ... আনন্দবাজার
রাহু ... অরণি
পদ্মলতার স্বপ্ন ... বসুমতী
দাওয়াই ... যুগান্তর
মিত্তির বাড়ী—(উপন্যাস)

সাগর শুকায়ে যায় (গল্পগ্রন্থ) ঃ—
কার্য্যকারণ—
কলি—
বিনা মাশুলে—
দশচক্রে—
অবল'—
ঘুম কাতুরে—
অপদস্থ—
মুস্কিল আসান—
এক্সপেরিমেন্ট—
বৈজয়ন্তী—
প্রস্তাব—
সেফ্‌টিম্যাচ—
সাগর শুকায়ে যায়—

১৩৫৪

অনুপমার ঘর ... গল্পভারতী
শেষ খেয়া ... "
দৃষ্টি ... "
দ্বন্দ্ব ... "
চেঞ্জ ... আনন্দবাজার
সুনন্দা এম, এ ... মহিলা
ভস্মস্তূপ ... এশিয়া
নবাগতা ... বার্ত্তাবহ
অকারণ ... বসুমতী
সর্পখিত ... বর্ত্তমান
দেশ নেতার স্ত্রী ... মুখপত্র
দাম ... জয়শ্রী
বহুরূপী ... বঙ্গলক্ষ্মী
এক রাত্রি ... মেঘনা
অভাব ... মাতৃভূমি
অপচয় ... জয়শ্রী
সভ্যতার সঙ্কট ... চলন্তিকা
আত্মহত্যা ... চলন্তিকা
কামধেনু ... বর্ত্তমান
লড়াই ... যুগান্তর
সমাধান ... স্বরাজ
সিঁড়ি ... হসন্তিকা
দুর্নিবার (উপন্যাস) ... গল্পভারতী

১৩৫৫

ক্ষমতা হস্তান্তর ... বঙ্গশ্রী
তারপর ... বসুমতী
বন্দিনী ... গল্পভারতী
উদ্বাস্তু ...
অভিমত ...
আকস্মিক ... "
চক্র ... আনন্দবাজার
ডেলি প্যাসেঞ্জার ... স্বরাজ
দাসত্ব ... একাল
অসম্ভব কি ... যুগান্তর
শনি ... মহিলা
সংমনের বাড়ী ... বঙ্গলক্ষ্মী
ভুল ... স্বরাজ
কুটির শিল্প ... কল্যাণশ্রী
পৌনঃপুনিক ... পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা
অভিনয় ... অভিধারা
সর্ষে ও ভূত ... মাতৃভূমি
অপরাধ ... আনন্দবাজার

১৩৫৬

দৈন্য ... গল্পভারতী
এখনও নেভেনি হোমের আগুন "
ছিন্নমস্তা ... আনন্দবাজার
নীলরক্ত ... বনফুল
শুনে পুণ্যবান ... বসুমতী
মলাট ... যুগান্তর
বহুরূপী ... কালান্তর
চৌরঙ্গী ... সৈনিক
কাকজ্যোৎস্না ... দিশারী

[illegible]	...	সোনার তরী
[illegible]	...	বঙ্গলক্ষ্মী
[illegible]	...	মাসিকপত্র
রাহু	...	চলন্তিকা
সর্বজ্ঞ	...	"
পদাতিক	...	লোকসেবক
ধড়িবাজ	...	কল্যাণশ্রী
বলয়গ্রাস (উপন্যাস)	...	

১৩৫৭

লোকরহস্য	...	আনন্দবাজার
কাপুরুষ	...	গল্পভারতী
উপসংহার	...	"
পার্টনারশিপ	...	"
খাজনা	...	বর্ধবাণী
প্রতিপক্ষ	...	সত্যযুগ
দেশত্যাগী	...	বসুমতী
নেশা	...	যুগান্তর
ব্যাঙ্ক ফেল	...	কথাসাহিত্য
একটু কথোপকথন	...	সৈনিক
মৃত্যুবাণ	...	পুনশ্চ
পলাতক	...	বঙ্গলক্ষ্মী
মানদণ্ড	...	বনফুল
স্বীকারোক্তি	...	আনন্দবাজার

১৩৫৮

নীলকণ্ঠ	...	আনন্দবাজার
মহাগল্প	...	বসুমতী
অভিনেত্রী	...	যুগান্তর
স্বাধীনতার সুখ	...	বঙ্গলক্ষ্মী
সচিত্র	...	কথাসাহিত্য
অমৃত	...	বঙ্গশ্রী
স্খলন	...	উত্তরা
শাড়ী মাহাত্ম্য	...	অর্চনা
সমুদ্র	...	জনসেবক
পাকাঘর	...	গল্পভারতী
দুজনে একলা	...	"
লোকসান	...	বঙ্গশ্রী
নেশা	...	মহিলা
একটা ভাজাচোরা গল্প	...	গল্পভারতী
মৌলিক সখ	...	সৈনিক

আনুমানিক ১৩৫২ হইতে ১৩৫৫ সালের মধ্যে :—

বেহুঁস	...	বসুমতী
কালের হাওয়া	...	আনন্দবাজার
ঝরঝরা	...	সাধনা

কপালে নেইকো ঘি	...	দেশ
কলঙ্কিনী	...	দেশের কথা
ছেঁড়া তার	...	সপ্তগ্রাম
অভিশপ্ত	...	মন্দিরা
ছুটীর একবেলা	...	নব্য বাংলা
জগতসিংহ ও ওসমান	...	কল্যাণশ্রী
ডিরেক্টর রাত্তদা	...	সন্ধ্যা
দুই আর দুয়ে	...	বসুমতী

(ছোটদের গল্পগ্রন্থ)

ছোট্‌ঠাকুদ্দার কাশীযাত্রা— ১৩৪৫
হাক হদিডে— ১৩৪৭
রঙিণ মলাট— ১৩৪৭
ভাগ্যি মুছু বেঁধেছিল— ১৩৫২
বলবার মতন নয়— ১৩৫৪

১৩৫৩

নতুন দা	...	মৌচাক
আকাশ পাতাল	...	শিশুসাথী
একটুর জন্যে	...	ঝিকিমিকি
সাবধানের মার নেই	...	জয়ন্তী শিশুসাথী
বড় বাবু	...	পরাগ

১৩৫৪

দৃষ্টিযোগ	...	দেশের মাটি
ঘড়িয়াল	...	শিশুসাথী
মেক আপ	...	মাণিকমেলা

১৩৫৫

ডিটেক্‌টিভ গল্প নয়	...	আবাহন
সমঝদার	...	ছায়াপথ
মশা ও কামান	...	জয়যাত্রা

১৩৫৬

গোবিন্দ চরিতামৃত	...	মনোরথ
দূরদর্শী লাহিড়ী মশাই	...	শিশুসাথী
সেখানে সেখানে	...	জয়যাত্রা

১৩৫৭

অপরাধী	...	শিশুসাথী
সঙ্গীলাভ	...	সারথী
সোণালী মেঘ	...	বিচিত্রিত
স্বখাত সলিলে	...	সবুজ পাতা

১৩৫৮

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের জন্যে—		অভিষেক
আকাশের স্বাদ	...	সুপ্রভাত
প্রতিশোধ	...	শিশুসাথী
খোকার মামা	...	সাত সমুদ্র